নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী

একাদশ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৫

সম্পাদনা
আশা দেবী
অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট
অংকন—গৌতম রায়
মুদ্রণ—চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও বাণী মুদ্রণ, ১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলিকাতা-৯ হইতে বংশীধর সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

পদ্মপাতার দিন

কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার চক্রবর্তী

মাননীয়েষু

চেম্বারের সেই চেয়ারটিতে রোগিণীকে বসিয়ে দিয়ে, জোরালো আলো জেবলে, ডাক্তার সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন কিছুক্ষণ। ছোট পেন্‌সিল-টর্চটি ফেলে ফেলে পরীক্ষা করলেন, তারপর এতক্ষণে রোগিণীর মুখের দিকে তাকালেন।

লক্ষ্যভেদী অর্জুন যেমন মাছের চোখ ছাড়া কিছু দেখতে পান নি, সেইরকম আই-স্পেশ্যালিস্ট ডাক্তারও রোগিণীর চোখের দিকেই অভিজ্ঞ দৃষ্টিটাকে স্থির রেখেছিলেন—তার বাইরে মুখের কয়েকটা অস্পষ্ট রেখা ছাড়া আর-কিছুই তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় ছিল না। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে, একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে, একজন সামাজিক মানুষের মমতায় কিছু বিচলিত হয়ে—তিনি সম্পূর্ণ করে তাকালেন মেয়েটির মুখে। যেন খুব চেনা-চেনা ঠেকল, যেন একসময়—যেন অনেক দিন আগে—

হঠাৎ সমস্ত চেতনাটা চমকে উঠল ডাক্তারের। আবরণ সরে গেল। না, ভুল হওয়ার কথা নয়। প্রায় ত্রিশটা বছর পার হয়ে গেছে, তবু সাতাশ বৎসরের যৌবন তার সেই ক'টি আলো-তারা-বৃষ্টি-জ্যোৎস্নায় মাখা আশ্চর্য দিনকে কৃপণের মতো সঞ্চয় করে রেখেছে। কিছুই হারায় নি, হারাতে দেয় নি।

যন্ত্রণার একটা মোচড় লাগল বুকের ভেতর। গলার শেষ প্রান্তে এসে একটা ডাক থমকে থেমে দাঁড়ালো : চন্দনা! ঘরের জোরালো আলোটা হঠাৎ হাওয়া-লাগা একটা লণ্ঠনের শিখার মতো কেঁপে উঠল একবার, মৃদু অ্যান্টিসেপটিকের আমেজ-ভরা এই চেম্বারের ভেতর বৃষ্টিভেজা আমের বন আর জুঁইয়ের গন্ধের উচ্ছ্বাস এল।

একটা অন্ধ, আর একটা নিবন্তপ্রায় চোখ নিয়ে মেয়েটি তাঁকে দেখতে পেল না ; ভালোমানুষ চেহারার স্কুল-মাস্টার স্বামীটি বিষণ্ন শঙ্কিতভাবে স্ত্রীর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন, তিনি কিছু লক্ষ্যও করেন নি। ডাক্তার সামলে নিলেন নিজেকে।

'ডান চোখটা গেল কী করে ?'

মেয়েটি তাঁর গলার স্বর চিনতে পারল কি ? নিশ্চয় পারল না—অন্তত সেই আশাই করলেন ডাক্তার। যেন ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে—এমনিভাবে বসে রইল চেয়ারটার ওপর, ঘরের উজ্জ্বল আলো তার কপালের, তার সিঁথির টকটকে লাল সিঁদুরে ঝকঝক করতে লাগল।

স্বামী ভদ্রলোক ম্লান স্বরে বললেন, 'সে ভারি দুঃখের কথা স্যার, ছেলেবেলায় একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গিয়েছিল। কী করে খানিকটা কার্বলিক অ্যাসিড যেন পড়ে গিয়েছিল চোখটার ওপর।'

আর একবারের জন্যে ডাক্তারের মনে হল, এই ঘরটা, এই অ্যান্টিসেপটিকের গন্ধ, এই আলো, ওই কাচের আলমারিটা সব ঘুরপাক খেয়ে প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার একটা অসমাপ্ত নাটকের শেষ দৃশ্যের মধ্যে মিশে যাচ্ছে। সেদিন যে শেষ অংশটুকু দেখে আসা হয় নি—আজ তার একটা সংক্ষিপ্ত আর ইঙ্গিতময় পরিণতি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো।

কার্বলিক অ্যাসিড!

গলা পরিষ্কার করে ডাক্তার বললেন, 'ওঃ, সেজন্যেই বাঁ চোখটাও—! তা ওটা তো এখনো ম্যাচিয়োর করে নি দেখছি, আরো কিছু সময় লাগবে। মাস-দুই পরে আবার আসবেন।'

তেমনি নিস্পন্দ, নিশ্চল ভঙ্গিতে বসে রইল মেয়েটি। সে চোখে কিছু দেখছে না—হয়তো কেবল বাঁ চোখের আচ্ছন্ন অস্পষ্ট তারায় কয়েকটা ছায়া ঘুরছে তার সামনে। তার অনুভূতির রাজ্যেও হয়তো ওইরকম খানিকটা অন্ধকার, কয়েকটি ভাবনার ছায়া। ডাক্তারের আর একবার চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল: চন্দনা!

ঘোর ভাঙল স্বামীটির ভীরু জিজ্ঞাসায়।

'আজ্ঞে স্যার, বাঁ চোখটা ঠিক হয়ে যাবে তো? মানে—কোনোরকম ভাবনার—'

'না না, ভাবনার কিছু নেই। ছানি অপারেশন করলেই ঠিক হয়ে যাবে। বললুম তো, মাস দুয়েক পরে নিয়ে আসবেন আবার। আপাতত প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিচ্ছি একটা।'

আলো নিবিয়ে ডাক্তার এসে নিজের চেয়ারে বসলেন, প্রেসক্রিপশন লিখলেন, ভিজিটের টাকাটা অভ্যাসে তুলে নিয়ে পাশের ড্রয়ারে রাখলেন, স্বামী-স্ত্রীকে বিদায় দিলেন নমস্কার-বিনিময়ের পর। প্রায়-অন্ধ স্ত্রীর হাত ধরে, ভারাক্রান্ত পায়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন স্কুল-মাস্টার ভদ্রলোকটি।

একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ডাক্তার, বাঁ হাতের ওপর গাল রেখে দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, আবার ডুবে যেতে চাইলেন স্মৃতির ভেতরে। কিন্তু সময় ছিল না। বেয়ারা আবার স্লিপ নিয়ে এল। বাইরের ঘরে নতুন রোগী এসে অপেক্ষা করছে।

চেয়ারে সোজা হয়ে উঠে বসলেন, মুখে অভ্যস্ত গম্ভীর নিরাসক্তি ফুটিয়ে তুললেন, 'ডেকে নিয়ে আয়।'

কাজ—কাজ এখন। এ-সব ভাবা যাবে অনেক পরে।

ভাবা যাবে অনেক পরে—রাত্রে ঘুমুবার সময়। শোওয়ার আগে, ধনী পার্শী মক্কেলের দেওয়া মার্তিনির বোতল খুলে ডাক্তার যখন কিছুক্ষণের জন্য বসবেন—সেই তখন। মৃদু নেশাকে ছাপিয়ে স্মৃতি আসবে, যন্ত্রণা আসবে, ডাক্তার সাতাশ বছরের যৌবনে ফিরে যাবেন। রাত বাড়বে, যন্ত্রণা জ্বলতে থাকবে, অসমাপ্ত নাটকের শেষ দৃশ্যটা কল্পনা করতে করতে ডাক্তার নিজেকে ক্ষমা করতে চাইবেন না। তারপর ধীরে ধীরে যন্ত্রণা, নেশা, ঘুম—সব একসঙ্গে তাঁকে ঘিরে ধরতে থাকবে, বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দেবেন—তলিয়ে যাবেন ঘুমের ভেতর।

স্মৃতিটা আর একবার ফিরবে। ফিরবে দুই মাস পরে। যখন আর একবার স্ত্রীর চোখ দেখাতে আসবেন ভদ্রলোক।

॥ দুই ॥

তা হলে দু-মাস পরে নয়, প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে ফেরা যেতে পারে।

তখন পুরোদমে ইংরেজের রাজত্ব। তৃতীয় রাইখ এবং হিটলারের মতিগতি নিয়ে নেভিল চেম্বারলেন কিছু বিব্রত এবং বিরক্ত, কিন্তু দুর্ভাবনার কারণ তখনো বিশেষ ঘটে নি। বেনিতো মুসোলিনি তখন শিকলে বেঁধে চিতাবাঘ পুষছেন, কাগজচাপার বদলে রিভলভার ব্যবহার করছেন আর আবিসিনিয়া চোখের জল ফেলছে। দালাদিয়ের তাঁর মাজিনো লাইন নিয়ে তখনো নিশ্চিন্ত। ভারতবর্ষে অসহযোগের আন্দোলন শান্ত, কয়েকটা উজ্জ্বল উচ্ছ্বাসের পর বাঙালী বিপ্লবীরাও প্রশমিত—কারণ ইংরেজের জেলখানায় বিনাবিচারে বন্দীর দল তখন নতুন মত আর পথের কথা ভাবছেন।

আর সাধারণ বাংলা দেশ, এবং ভারতবর্ষ, চিরকালের ছন্দ নিয়েই চলেছে। গ্রামের বুকে কাঁচা মাটির পথ, ক্বচিৎ কখনো হাইস্কুল; ভাগ্যবান জোতদার তখনো সুখে আছে, প্রজাস্বত্ব আইনে চক্রবৃদ্ধির মাকড়শা মহাজনের মন একটু খারাপ, জমিদারিগুলো ভাঙন-ধরা আর কোর্ট অব ওয়ার্ডসের করুণা-প্রার্থী, নতুন ফসল ওঠবার আগে কৃষকের ঘরে প্রায় তিন মাস অনাহার; সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, নায়েব, দারোগা, দেওনিয়া (অর্থাৎ দেওয়ানী আদালত-বিশেষজ্ঞ—কৃষককে মামলার ভেতরে ঠেলে দিতে পারলেই যার প্রাপ্তিযোগ)।

গোরুর গাড়িতে চেপে মাইল-আটাশের রাস্তা পাড়ি দিতে দিতে এই ধরনের নানা চিন্তাতেই মগ্ন ছিল ডাক্তার প্রশান্তদেব লাহিড়ী, এম-বি। কাল সন্ধ্যার পর গাড়ি ছেড়েছে শহর থেকে, এখন ভোর ছ'টা, সামনে অনেকটাই পথ এখনো বাকি। গোরুর বাড়িতে ছেলেবেলায় দু-চার মাইল যে সে পাড়ি না দিয়েছে তা নয়, হরিশচন্দ্রপুর স্টেশনে নেমে মামাবাড়িতে যেতে হলে মাইল-চারেক গোরুর গাড়ি ছাড়া গতি ছিল না, বর্ষায় ডুবো মাঠের ওপর দিয়ে যেতে হত নৌকোয়। কিন্তু এই আদিম যানটিতে চেপে এতখানি জয়যাত্রা তার জীবনে এই প্রথম।

গাড়োয়ান দেশী ভাষায় বলেছিল, 'আরাম করে ঘুমোন ডাক্তারবাবু, ভয়ের কিছু নেই।'

'সারা রাত ধরে যাব—ডাকাত-টাকাত পড়বে না তো আবার?'

'না বাবু। জেলা-বোর্ডের বড়ো সড়ক, সারা রাত গাড়ি চলে—ও-সব কোনো ভয় নেই এদিকে।'

'বাঘ?'

গাড়োয়ান হেসে উঠেছিল: 'বাঘ কোথা থেকে আসবে বাবু? বনবাদাড় কোথায়? সে তো দু-চারটে আছে গোবিন্দনগরের জঙ্গলে।'

'গোবিন্দনগর? সে আবার কতদূর?'

'ঢের দূর বাবু—ঢের দূর। দু-দিন দু-রাতের রাস্তা। কিছু ভাববেন

না, আরাম করে ঘুমোন।'

আরাম করে ঘুমুনোর ব্যবস্থায় অবশ্য কোনো ত্রুটি ছিল না। মোটা করে খড় বিছানো, গাড়োয়ান বলেছিল, 'পোয়াল'। শক্ত-পোক্ত ছই—গাড়োয়ান গর্ব করে বলেছিল, 'আমাদের গোটা থানায়, ডাক্তারবাবু, এমন ভালো টাপ্পর কারো নেই। সব বাবুরা তাই আমার গাড়ি আগে পছন্দ করে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ুক—একফোঁটা জলও আসবে না ভেতরে।'

সন্দেহ নেই, সুখ, আরাম এবং আশ্বাসের পুরো আয়োজন। খড়ের ওপর বিছানা পেতে, পেছন দিকে রাখা বাক্স দুটোর ওপর পা তুলে রেখে, ছইয়ের গায়ে চশমা গুঁজে দিয়ে, মাথার খড়ের নিচে জুতো রেখে পরম আরামে শুয়ে পড়েছিল ডাক্তার। আগের দিন মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পরে বাইরে অম্লান উজ্জ্বল কৃষ্ণপক্ষের আকাশ। চিত হয়ে বিছানায় শুয়ে, পায়ের কাছে ঝুলিয়ে দেওয়া চটের ফাঁক দিয়ে সেই আকাশ দেখছিল ডাক্তার। দেখছিল, সপ্তর্ষি জ্বলছে, ধ্রুবতারা স্থির হয়ে আছে, মধ্যে মধ্যে এক-একটা অন্ধকার আর অচেনা গাছের মাথা ঝাঁকড়া হয়ে সেই আকাশটাকে আড়াল করে ফেলছে।

গাড়িতে খড়ের গন্ধ, ছই থেকে বাঁশের বুনুনি আর পুরোনো কাপড়ের গন্ধ, হাওয়ায় রাত্রির মাঠের ভিজে ঘাসপাতার গন্ধ, গোরুর গাড়ির চাকায় দলিত কাদার গন্ধ—সব মিলে যে ঘুমের আমেজ না আসছিল তা নয়; আরামের যে অভাব ঘটছিল তা-ও নয়। তবু ডাক্তার ভালো করে ঘুমুতে পারে নি। থেকে থেকে গাড়ির ঝাঁকুনি, ছপাস-ছপাস করে কাদার মধ্যে পড়া এবং ঠেলে ওঠার শব্দ, নড়াচড়া করলে শরীরের নিচে খড়ের মচমচানি, আর একান্ত অনভ্যস্ত এই নৈশবাসের আয়োজন থেকে থেকে তার চটকা ভেঙে দিচ্ছিল। তার মধ্যে গাড়োয়ান গাল দিচ্ছিল গোরুকে, শাঁটা হাঁকড়াচ্ছিল ঘন ঘন, বলছিল, 'চল্ চল্ মহামাই।' 'মহামাই' শব্দটা আগেও শুনেছে প্রশান্ত, গোরুকে 'মা-জননী' বললেও আপত্তি নেই, কিন্তু দুটো বলদকে ওই নামে সম্ভাষণ করা কেন, অনেক ভেবেও আজ সে তার কোনো হদিস পাচ্ছিল না।

তবু—এই ছাড়া-ছাড়া ঘুমুনো এবং জাগার ভেতরে একসময় সে টের পেলে, গাড়োয়ানও আর জেগে নেই, তার ছোট জায়গাটিতে গামছা-জাতীয় কিছু-একটা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। গাড়ি চলেছে নিজের আনন্দে।

'গাড়োয়ান—ও গাড়োয়ান!'

'জী?'

'ঘমুচ্ছো যে? গাড়ি চালাবে কে?'

গাড়োয়ান একবার মাথা তুলল। একটু হাসতে চেষ্টা করল, তারপর ঘুম-জড়ানো স্বরে বললে, 'চেনা ঘাঁটা বাবু, গোরু আপনি চলবে। কিছু ভাববেন না—আপনি শুয়ে যান।'

একটু পরেই আবার গভীর ঘুমে তলালো গাড়োয়ান। তাকে জাগাবার

আর ব্যর্থ চেষ্টা না করে ডাক্তার ভাবতে লাগল : 'তা ঠিক, গোরু আপনিই চলবে। চোখ বেঁধে দিলেও তারা কিছুতেই পথ ভুল করবে না বছরের পর বছর ধরে—এক রাস্তা—এক গতি। এক কাদা, এক গর্ত, এক ঝাঁকুনি। চারদিকের জীবনটাও ঠিক এইভাবেই চলছে। জেলা-বোর্ডের রাস্তা—এইটে বলবার সময় গাড়োয়ান একটু আভিজাত্য আনতে চেয়েছিল গলার স্বরে। কিন্তু জেলা-বোর্ড এই পথটি তৈরি করে কোনো অতুলনীয় কীর্তির পরিচয় দেয় নি। দু-হাজার বছর আগেও এই পথ এইরকম ছিল—আজো তাই আছে। পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরে মহাপ্রলয় ঘটে যাক, ঝড়ের গতিতে ঘুরতে থাকুক ইতিহাসের চাকা, এখানে কিছুই বদলাবে না। না পথ, না জীবন, না গোরুর গাড়ি। গোরু আর মানুষ একই জীবনের রেখা ধরে এক পরিণামের দিকে এগিয়ে চলেছে।'

ঝাঁকুনি, নানা স্বাদের গন্ধ, খড়ের মচমচানি, চটের পর্দা সরে সরে যাওয়ার ভেতর দিয়ে তারা-জ্বলা আকাশ আর গাছের মাথা দেখতে দেখতে ছাড়া-ছাড়া ঘুমের পথ বেয়ে রাত কেটে এল। ভোরের দিকে ঘুমটা বোধ হয় একটু গাঢ় হওয়ার চেষ্টা করছিল, হঠাৎ তীব্র একটা চিৎকার এবং খানিকটা বিকট আওয়াজে চমকে উঠে বসল ডাক্তার। ডাকাত পড়ল নাকি সত্যিই—গাড়োয়ানের অভয় সত্ত্বেও ?

ডাক্তার দেখল বাইরে সাদা ভোর। মাঠের রং ফুটে উঠছে, অস্পষ্ট আভা দেখা দিয়েছে সামনের আকাশে। পাশ দিয়ে ছইবিহীন একটা গোরুর গাড়ি জোরে হাঁকিয়ে কারা চলে গেল উলটো মুখে, জন-তিনেক মিলে বেসুরো গলায় চেঁচিয়ে গান গাইতে গাইতে চলল :

'তুমি কেমন মানুষির ছাও,
ছোয়া-পোয়ার কথা শনি আগু করিয়া যাও—'

তার পরেই হাসির হর্‌রা—নিশ্চয় কোনোরকমের মজার গান। গাড়োয়ান অনেক আগেই জেগে উঠেছিস, শাঁটা ধরে পিটছিল গোরুকে। ডাক্তারের দিকে ফিরে চাইল।

'রাতে ঘুম হয়েছিল বাবু ?'

'হ্যাঁ, তা হয়েছে একরকম। কিন্তু আর কতটা রাস্তা ?'

'দু-ঘড়ির মধ্যে পৌঁছে যাব, বাবু।'

দু-ঘড়ি—অর্থাৎ আরো দু-ঘণ্টা ! ডাক্তার নিঃশ্বাস ফেলল, বালিশে কনুই রেখে উঠে বসল একটু। মাঠে চিকচিক করছে ঘোলাটে জল, নতুন ধানের শিষ দুলছে তাতে। এক-একটা বাবলা গাছ ছাড়া-ছাড়া-ভাবে আলোর ওপর দাঁড়িয়ে। দূরে গাছপালার আড়ালে গ্রাম, দু-একজন মানুষ এই সকালেই কী কাজে জলভরা মাঠের ভেতরে নেমে পড়েছে। পথের ধারে ধারে শিরীষ-তেঁতুল-তালের ছায়া। পাখির ডাক উঠেছে।

একটা নির্মল সকাল। বাংলা দেশের উদার সমতল। ধানে ধানে লক্ষ্মীর ঝাঁপি ভরে ওঠে এখানেই। তবু কী উপেক্ষা—কী অনাদর। আটাশ মাইল

পথ গোরুর গাড়িতে পাড়ি। হিটলার-মুসোলিনী-বাংলা দেশের বিপ্লবীরা—সব এখানে স্বপ্নের চাইতেও অবাস্তব বলে মনে হয়। ডাক্তার কলেজে পড়বার সময় কিছুদিন রাজনীতি করেছিল, এসেছিল বিপ্লবীদের কাছাকাছি, সমস্ত জিনিসটাই তার খারাপ লাগল।

'গাড়োয়ান!'

'জী?'

'তোমার নামটা ভুলে গেছি।'

'জী—ওয়াহেদ বক্‌স্‌।'

'তোমার গ্রাম কোথায়?'

'কাশিমপুর থেকে আরো তিন মাইল পুবে। নিলপুর।'

কাশিমপুর ডাক্তারের গন্তব্যস্থল। ডাক্তার জিগ্যেস করল: 'তোমাদের গ্রামে স্কুল নেই?'

'ইস্কুল!'—গাড়োয়ান আশ্চর্য হল: 'চাষাভুষার গাঁয়ে কি ইস্কুল থাকে বাবু? ইস্কুল আছে কাশিমপুরের গঞ্জে।'

'তোমাদের ছেলেরা লেখাপড়া করে না?'

'না।'

পরিষ্কার জবাব। হকচকিয়ে গেল ডাক্তার; হিটলার—মুসোলিনী—স্বাধীনতা আন্দোলন—বিপ্লববাদ। আর-এক পৃথিবীর খবর। সে-জগৎ এদের কাছে মঙ্গল-গ্রহের চাইতেও দূরে।

'লেখাপড়া শেখাতে ইচ্ছে করে না ছেলেপুলেদের?'

'জী—মন তো করে।' জিভ দিয়ে গোরুর উদ্দেশে কয়েকটা টক-টক করে আওয়াজ তুলল গাড়োয়ান। ধীরে ধীরে আবার ডাক্তারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'কিন্তুক হবার নয়।'

'হবার নয় কেন? তোমরা একটু চেষ্টা করলেই হয়।'

গাড়োয়ান একটু চুপ করে রইল। জোরে বার-দুই শাঁটা হাঁকড়ালো গোরু দুটোর পিঠে, হঠাৎ হুড়মুড় করে ছুটতে লাগল গাড়িটা। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'একটা মাদ্রাসা হয়েছিল বাবু, দুটো গাঁয়ের মানুষ মিলে যা পারে পয়সাকড়ি দিত। কিন্তু মৌলবীটা ছিল পয়লা নম্বরের হারামী। শেষে একজনের বিবিকে নিয়ে—'

'থাক, থাক—' চমকে উঠে থামিয়ে দিল ডাক্তার। সামনের আকাশে সূর্য উঠছিল। মাঠের ওপারে, দিগন্তের রেখায় জবাকুসুমসংকাশ একটি বৃত্ত ভেসে উঠছে ধীরে ধীরে, আবীরের রঙ পড়েছে মাঠের জলে, ধানের শিষে, গাছপালার মাথায়, পাখিদের গলায় আলোর সুর উঠেছে। মুহূর্তে ডাক্তারের চোখে সব বিশ্রী, সব বিস্বাদ, সব অপবিত্র হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ নীরবতা। গোরুগুলোর মন্থর গতি। পা যেন আর চলতে চায় না তাদের।

গাড়োয়ান জিগ্যেস করল, 'আপনি কাশিমপুরে থাকবেন তো ডাক্তারবাবু?'

সুপারনিউমারি ডিউটি—আন্দাজ মাস-দেড়েকের জন্যে। কিন্তু মুখ ফুটে আপাতত ডাক্তার সেটা প্রকাশ করল না। বললে, 'এ-কথা জিগ্যেস করছ কেন ?'

'আপনি থাকলে গাঁয়ের লোকের ভালো হবে।'

ডাক্তার একটু আশ্চর্য হয়ে গেল।

'কী করে জানলে ?'

'আপনি লোক ভালো বাবু !'

ডাক্তার হাসল।

'কাশিমপুরে তো এখনও পা-ই দিই নি। কেমন করে জানলে যে আমি ভালো লোক ? খুব মন্দও তো হতে পারি।'

'বুড়ো হয়ে গেলাম বাবু। মানুষ দেখলে চিনতে পারি।'

ডাক্তার চুপ করে রইল। যুক্তিহীন, সরল বিশ্বাস। ভাড়ার টাকা নিয়ে দরাদরি করে নি, এক কথায় রাজী হয়ে গিয়েছিল, সেইজন্যেই কি ? কিন্তু ওভাবে ভাবতে ইচ্ছে করল না।

'তোমাদের আগের ডাক্তারবাবুও তো লোক ভালো ছিলেন।'

'জানি না।'

'কেন ?'

'মুখ ভারি খারাপ ছিল বাবু। সবসময় কিটকিট করতেন। গাঁয়ের লোক বোকা-হাবা আছেই, সেটা তো ডাক্তারবাবু জানেন। একটু বুঝে-সুঝেই নিতে হয়। কিন্তু—'

থেমে গেল। 'কিন্তু'টা অনেকখানি অর্থ বহন করছিল।

'তুমি তো অন্য গাঁয়ের লোক। এত জানলে কী করে ?'

'বাবু, পাঁচ-ছ' কোশ এলাকার ভেতরে ওই তো আমাদের সরকারী দাওয়াখানা। ওখানেই ছুটে যেতে হয় সবাইকে। গাঁয়ের লোক—দূর থেকে অসুখে ধুঁকতে ধুঁকতে আসে, রুগী টেনে আনে—হাসপাতালের সময় বুঝে আসতে পারে না সকলে। আর বুড়ো ডাক্তারবাবু অমনি খেপে যান, যা মুখে আসে গালাগাল দিয়ে—হাঁট্—হাঁট্ মহামাই—গোরু যেন নবাবের নাতি হে!'

গাড়ির শব্দে মাঠের ধার থেকে একটা সারস উঠে পড়ল, ভারী ভারী পাখা টেনে বাতাসে শব্দ করে করে উড়ে যেতে লাগল আরক্তিম সূর্যোদয়ের দিকে। ডাক্তার সেই দিকেই চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

ওয়াহেদ বক্‌স্ আচমকা বললে, 'কাশিমপুর বড়ো গঞ্জ, কিন্তু লোক-গুলো সুবিধের নয়, বাবু।'

ডাক্তার উৎকর্ণ হল ঃ 'তাই নাকি ?'

'সে এখন আমি কিছু বলব না বাবু, ছোট মুখে বড়ো বাত মানায় না। নিজের চোখেই সব দেখবেন। কিন্তু সেজন্যে যেন রাগ করে চলে যাবেন না ওখান থেকে, তা হলে চাষা ছোটলোকগুলোই মারা পড়বে।'

কথাটার অর্থ ভালো করে বুঝল না ডাক্তার, কিন্তু ছায়া পড়ল মনে।

'আমার স্পারিনিউমারি চাকরি, দেড় মাসের মামলা, ও-সবে আমার কী আসে যায়', এ-কথাও বলতে পারল না। শুধু অনুভব করতে লাগল, অত্যন্ত অস্বস্তিভরেই অনুভব করতে লাগল—কোথায় একটা অবাঞ্ছিত অনিশ্চিত নাটকের মধ্যে পা দিতে চলেছে সে।

॥ তিন ॥

গাড়ি এসে থামল জেলা-বোর্ডের চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির সামনে।

'এই তো সরকারী হাসপাতাল বাবু, এসে গেছি।'

বলবার দরকার ছিল না—এ ডিসপেনসারির চেহারা ডাক্তারের চেনা। মোটামুটি সবগুলো একই ধরনের। টালির চাল দেওয়া ডাকবাংলো ধরনের বাড়ি। লম্বা বারান্দায় খান-তিনেক হেলান দেওয়া কাঠের বেঞ্চি। সামনে দুটো বড় বড় গাছ, বকুল বলে মনে হল।

ভিড় জমেছে বিস্তর। বারান্দায় বসে আছে কিছু, বকুলগাছের তলায় দুখানা মোষের গাড়ি, তাতে করেও রোগী বয়ে আনা হয়েছে নিশ্চয়। বারান্দার বাঁ দিকে এক জায়গায় জমাট ভিড়, ওষুধ দেওয়া হচ্ছে ওখান থেকে—ওইটেই কম্পাউন্ডারের কাউন্টার। নতুন দাগ-কাটা মিকচারের শিশি হাতে বেরিয়ে যাচ্ছিল কেউ কেউ, অস্থিসার একটা ছোটখাটো জীর্ণশীর্ণ বুড়ীকে পাঁজাকোলা করে বয়ে আনছিল একজন—হয়তো ছেলেই হবে।

ডাক্তার খড়ের তলা থেকে জুতো জোড়া বের করে পায়ে পরল, তারপর লাফিয়ে নামল নীচে। লোকগুলো আশ্চর্য হয়ে তার দিকে চেয়ে দেখল।

ধীরে ধীরে ডিসপেনসারির দিকে এগোল ডাক্তার। হোক অজ পাড়াগাঁ, পেশেন্ট তো এখানে প্রচুর। এখন মাত্র সাড়ে আটটা—তার মানে আধ ঘণ্টা মাত্র খুলেছে। এরই ভেতরে এত ভিড়! গাড়োয়ান ওয়াহেদ বক্‌সের কথা মনে পড়ে গেল প্রশান্তর: 'পাঁচ-ছ' কোশ এলাকার মানুষের এই তো সরকারী দাওয়াখানা!'

তার মানে ভালো ডাক্তার এখানে নেই, না থাকাই স্বাভাবিক। আর ভালো ডাক্তার কেন, কোনো ডাক্তারই কি আছে? প্রকৃতির হাতে এরা নিরুপায় শিকার, তাই অথই জলে একটা ঘাসের শিষ দেখলেও আঁকড়ে ধরতে চায়, তাই দূর-দূরান্ত থেকেও এই ডাক্তারখানায় ছুটে আসে।

ডাক্তার ধীরে ধীরে ডিসপেনসারিতে পা দিলে। ভিড় ঠেলেই ঢুকতে হল তাকে।

ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল। ডাক্তারের সেই টেবিল, কাগজপত্র, কালি-কলম, পাশের একটা শেলফে খানকয়েক পুরনো ডাক্তারি বই, সবই আছে। আর যেখানে ডাক্তারের বসা উচিত, সেখানে বসে আছেন এক স্থূলকায় মাঝবয়েসী ব্যক্তি—একটি রোমশ এবং বিশাল চরণ টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে বই পড়ছেন তিনি। বইটির সঙ্গে ডাক্তারীর কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হল না, তার

রঙিন প্রচ্ছদপটে ছুরিকাবিদ্ধ একটি পুরুষ, নৃত্যোন্মুখ ভঙ্গিতে অর্ধনগ্না একটি নারী এবং রক্তঝরা অক্ষরে লেখা : 'মৌত আউর মৌত—জাসুসী কহানী'।

লোকটি 'জাসুসী' অর্থাৎ গোয়েন্দাকাহিনীর অতি রোমাঞ্চকর অংশে পৌঁছেছিলেন নিশ্চয়। ডাক্তারের আবির্ভাব টেরও পেলেন না তিনি, শুধু নিঃশব্দে পাতা উলটে গেলেন।

প্রশান্ত অগত্যা গলা-খাঁকারি দিলে।

রোমাঞ্চিত লোকটি বিরক্ত হয়ে বই সরালেন মুখ থেকে। তারপর একজন ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিতান্ত অনিচ্ছাতেই টেবিল থেকে পাদপদ্ম নিচে নামালেন।

'কাকে খুঁজছেন?'

প্রশান্ত আস্তে আস্তে বললে, 'আপনি তো ডাক্তারবাবু?'

'না, আমি ডাক্তারবাবু না। ডাক্তারবাবু নাই। কুছু বলবার থাকে উইদিকে কম্পাউন্ডারবাবু আছে, গিয়ে বোলেন তাকে।'

'আপনি তা হলে ডাক্তারবাবু নন?'

লোকটির গলায় বিরক্তি এবারে আর গোপন রইল না।

'না—না—না! একটা কোথা কোতোবার বলতে হবে আপনাকে?'

'আর বলবার দরকার নেই।'—প্রশান্তর স্বর শক্ত হয়ে উঠল: 'ডাক্তার যদি না হন, তা হলে আপনি এখুনি এই চেয়ার থেকে উঠে পড়ুন। পা তুলে নভেল পড়বার জন্যে টেবিলটা নয়।'

কাঁচা-পাকা জাঁদরেল গোঁফের নিচে ভদ্রলোকের মুখখানা ফাঁক হয়ে গেল, বেরিয়ে এল পানে-রাঙানো একসারি অসমান দাঁত। লোকটি যেন ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারলেন না।

'কী বোলছেন আপনি?'

'যা বলছি, সে তো শুনতেই পাচ্ছেন।' আদেশের স্বরে প্রশান্ত বললে, 'উঠে যান ওই চেয়ার ছেড়ে।'

'আপনি কে মশাই যে এ-সব বোলতে এসেছেন?'—মোটা ভদ্রলোক প্রায় চিৎকার করে উঠলেন।

'চেয়ার ছেড়ে নেমে দাঁড়ান, তার পরে বলছি।'—দপদপ করে উঠল প্রশান্তর চোখ।

'কী হয়েছে এখানে—কী হল শ্যামরতনবাবু'?—বাইরের উৎসুক জনতা। দৃষ্টি এর মধ্যেই ঘরের দিকে ঘুরে গিয়েছিল, কিছু কিছু লোক ঘন হচ্ছিল কাছাকাছি। তাদের ঠেলে এইবার আর-একজন এগিয়ে এলেন সামনে। হাতে লম্বা একটি ছুরি, হলুদ রঙের কিছু জিনিস মাখা আছে তার ওপর। একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়েই প্রশান্ত বুঝতে পারল ইনিই কম্পাউন্ডারবাবু—মলম তৈরি করছিলেন।

তাঁর দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত বললে, 'আমার নাম প্রশান্তদেব লাহিড়ী—আমি এই ডিসপেনসারির চার্জ নিতে এসেছি।'

জাসুসী কহানীর পাঠক শ্যামরতনবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, মুখ বন্ধ করলেন। তৎক্ষণাৎ নেমে দাঁড়ালেন চেয়ার থেকে। কম্পাউন্ডার চকিত হয়ে বললেন, 'ও স্যার—আপনি ? নমস্কার—নমস্কার। আমি ভূপালচন্দ্র বাগচী, কম্পাউন্ডার এখানকার। ভালোই হল স্যার, আপনিও বারেন্দ্র, আমিও বারেন্দ্র।'

শ্যামরতন আর দাঁড়ালেন না। 'মৌত আউর মৌত' বগলদাবা করে—দু-দিকের মানুষগুলোকে প্রায় কনুইয়ের ধাক্কায় ছিটকে দিয়ে দুমদুম করে বেরিয়ে গেলেন। গেলেন মত্ত মাতঙ্গের মতোই।

ভূপাল একবার চেয়ে দেখলেন সেদিকে, একবারের জন্যে ছায়া পড়ল তাঁর মুখে।

'আপনি আসবেন স্যার—খবর পেয়েছিলুম। কিন্তু আজই যে এসে পৌঁছুবেন তা ভাবতে পারি নি। আমরা মনে করেছিলাম আরো তিন-চার দিন দেরি হবে।'

'ডিসপেনসারি খালি পড়ে আছে, ওঁরা সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। এইমাত্র এসে পৌঁছেছি আমি। বাইরে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ডাক্তারের কোয়ার্টারের চাবি কি আপনার কাছে ? দিন—আমি—'

'ডাক্তারের কোয়ার্টার ?'—একটু বিব্রত হয়ে কম্পাউন্ডার বললেন, 'সে তো স্যার সুবিধে হবে না। আগের ডাক্তারবাবু তাতে জিনিসপত্র বন্ধ করে রেখে চলে গেছেন—বলেছেন, ওগুলো নিয়ে যেতে তাঁর হপ্তা-দুয়েক দেরি হবে। কেবল একটা ঘর—'

'ওতেই হবে, ওতেই হবে। একটা ঘরের বেশি আমার দরকার নেই। চাবিটা দিন।'

'চলুন স্যার—আমি যাচ্ছি।'

প্রশান্ত টের পাচ্ছিল ডিসপেনসারিতে জমায়েত মানুষগুলো একটু অধৈর্য হয়ে উঠেছে। অনেকেই দূর থেকে এসেছে, অনেকক্ষণ হল এসেছে, আবার অনেকটা পথ ফিরে যেতে হবে। একটা ঘোমটা-টানা চাষী-বউয়ের কোলে দু-তিন বছরের ন্যাড়ামাথা একটি শিশু ঘন্-ঘন্ শব্দ করে কাঁদছিল। প্রশান্ত ঘুংরি কাশির পরিষ্কার আওয়াজ পেল তার গলায়।

'না—আপনার যাওয়ার দরকার নেই, এতগুলো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ওষুধের জন্যে। চাবিটা দিন, তা হলেই হবে। আর বেয়ারা যদি কেউ থাকে—'

'নিশ্চয়—নিশ্চয়। মথুর—ওরে মথুর—'

মিশকালো চেহারা—আঠারো-উনিশ বছরের সুঠাম একটি ছেলে এসে দাঁড়ালো।

'নতুন ডাক্তারবাবু এসেছেন।'

মথুর সঙ্গে সঙ্গে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। উঠে দাঁড়ালো একগাল হাসি নিয়ে।

'ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যা, ওঁর কোয়ার্টারের ডান দিকের যে-ঘরটা খালি আছে খুলে দে, জিনিসপত্র গুছিয়ে দে। আর—' মথুরের কানের কাছে মুখ এনে নিঃশব্দে কিছু বললেন, মথুর হাসিমুখে মাথা নাড়ল।

প্রশান্ত বললে, এখন সাড়ে-আটটা বেজে গেছে। ডিসপেনসারি তো দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—দশটা পর্যন্ত।'

'আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি আসছি।'

'সে কি স্যার! সারারাত গোরুর গাড়িতে এসেছেন, ঘুম-টুম নিশ্চয় কিছু হয় নি। এ-বেলাটা বরং বিশ্রাম করে, বিকেলে ধীরেসুস্থে—'

বাধা দিয়ে প্রশান্ত বললে, 'বিশ্রামের জন্যে আটকাবে না, সে দুপুরেও হতে পারবে। তার আগে এইসব রোগীদের দিকটা দেখা দরকার। ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি আসছি। কই হে মথুর—'

'চলুন বাবু!'

প্রশান্ত বেরিয়ে গেল। কম্পাউণ্ডারের ভ্রূ দুটো ঘন হয়ে এল এক-বারের জন্যে।

'নতুন পাস-করা ছোকরা—ডিউটি-জ্ঞানটা বড্ড বেশি টনটনে।'—একবার বিড়বিড় করলেন ভূপাল।

'ও কম্ফটারবাবু, আমি যে অনেকক্ষণ—' কার একটা কাতর মিনতি ভেসে এল।

বিরক্ত হয়ে ধমক দিলেন কম্পাউণ্ডার: 'দাঁড়া রে বাপু—ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এসেছেন সব! আমি একটা মানুষ—দশখানা হাত আমার নেই, আসছি, আসছি।'

আগেকার ডাক্তার একেবারে অবিবেচক নন। একটা ঘর খোলা আছে, সে ঘরে তক্তপোশ আছে, চেয়ার-টেবিল রয়েছে, দেওয়ালে চুনের পোঁচড়ায় আধখানা-তলানো ব্র্যাকেটও আছে একটা। চেয়ার-টেবিল-তক্তপোশ নিশ্চয় ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের সম্পত্তি—ব্র্যাকেটটা বোধ হয় অনেক আগে কোনো ডাক্তার টাঙিয়ে-ছিলেন, যাওয়ার আগে ওই মূল্যবান সম্পদটি উত্তরাধিকারীদের দান করে গেছেন। স্বাস্থ্যদীপ্ত হাসিমুখ একটি শিশুর ছবিওলা ওষুধ কোম্পানির রঙিন ক্যালেণ্ডারটাও ফাউ—তবে সেটা গত বছরের।

মথুর গাড়ি থেকে বাক্স-বিছানা নামিয়ে ফেলল। প্রশান্ত ভাড়ার টাকা মিটিয়ে দিলে ওয়াহেদ বক্‌সকে।

'সেলাম ডাক্তারবাবু।'

'সেলাম।'

'আসতে তো হবে জী দাওয়াখানায়। আবার দেখা হবে।'

'দেখা হোক, সেটা ভালোই। কিন্তু ওষুধের দরকার যেন না পড়ে।'

ওয়াহেদ বক্‌স একটু হাসল। তারপর গাড়ি হাঁকিয়ে বিদায় হয়ে গেল।

প্রশান্ত ফিরে এল বাড়ির ভেতর। ক্লান্তভাবে চেয়ারটার ওপর বসে পড়ল।

মথুর কাজের লোক। চটপট ঝাঁটা চালিয়ে ঘর পরিষ্কার করে ফেলল। ইঁদারা থেকে আলকাতরা দিয়ে ডি-বি লেখা দুটো বড়ো বড়ো বালতিতে জল এনে রাখল ভেতরের বারান্দায়। কোত্থেকে টোল-পড়া পেতলের ঘটিও এনে হাজির করল একটা। এটাও কি জেলা-বোর্ডের জিনিস? কে জানে।

'হাত-মুখ ধুয়ে নিন, বাবু।'

সুটকেস খুলে তোয়ালে, টুথব্রাশ, পেস্ট বের করে প্রশান্ত এসে বসল ভেতরের বারান্দায়। ছিমছাম ছোট বাড়ি। আগের ডাক্তারের ফুলের শখ ছিল মনে হয়, বেল ফুটেছে, জুঁই ফুটতে শুরু করেছে, রজনীগন্ধা মাথা তুলেছে গোটা কয়েক। ক'টা কলার ঝাড় রয়েছে, ইঁদারার ওপর নুয়ে এসেছে সজনে গাছের ডাল—তাতে পলকের জন্যে একটা টুনটুনির চঞ্চলতা দেখা গেল। বাড়ির পেছনে ঘননীল আকাশের নিচে একটা আমবাগানের অরণ্যবিস্তার।

মুখে-চোখে ঠাণ্ডা জল দিতে দিতে বাড়িটা ভালো লাগল প্রশান্তর। খান-দেড়েক ঘর বন্ধ আছে—তাতে তার অসুবিধে হবে না। এই শান্তি আর নির্জনতার মধ্যে সে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে।

মথুর বললে, 'আমি তা হলে চায়ের ব্যবস্থা করি বাবু।'

প্রশান্ত বললে, 'আমার বাক্সে চা আছে, বিস্কুটের টিন আছে। বের করে দিচ্ছি।'

'সে হবে এখন।'—মথুর কোন্ দিকে চলে গেল।

জ্বালাধরা চোখ আর গরম-হয়ে-যাওয়া মাথাটা ইঁদারার ঠাণ্ডা জলে অনেকক্ষণ ধরে ধুলো প্রশান্ত। শরীরটা একটু স্বাভাবিক হল এতক্ষণ পরে। ঘরে ফিরে এল, জামকাপড় বদলালো, চুল আঁচড়ালো, ঘড়ির দিকে তাকালো। আধ ঘণ্টা প্রায় হতে চলল, ডিসপেনসারি যদিও মিনিট-দুয়েকের রাস্তা—তবুও আর দেরি করা চলে না।

'মথুর—মথুর—'

'আসছি বাবু—' যেন অনেকটা দূর থেকে সাড়া এল মথুরের। তার পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির।

তার হাতে একখানা চকচকে থালায় লুচি মিষ্টি, বেগুনভাজা।

'এ-সব কী?'—প্রশান্ত আশ্চর্য হয়ে গেল: 'কোত্থেকে এল এ-সব?'

টেবিলে খাবারগুলো রাখতে রাখতে মথুর বললে, 'কম্পাউণ্ডারবাবুর বাসা থেকে। পাশেই তো থাকেন। মা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি করে দিলেন।'

'কেন ওঁদের বিব্রত করতে গেলি?'—প্রশান্ত বিরক্ত হল: 'সকালে বেশি খাওয়ার অভ্যাস নেই আমার, তার ওপর—'

'আমি জানি না, বাবু। কম্পাউণ্ডারবাবু বলে দিয়েছিলেন।'

'না—না, এ-সব ঠিক নয়, আমি—'

বলতে বলতে থেমে গেল প্রশান্ত। চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঘরে ঢুকেছে পনেরো-ষোলো বছরের শ্যামলা একটি সুশ্রী মেয়ে। চান করে ভিজে চুলের

রাশ মেলে দিয়েছে পিঠের ওপর, পরনে ডুরেশাড়ি, কপালে লাল টিপ একটি। মাথার তেলের একটা মৃদু সুগন্ধে চকিতে ভরে উঠল ঘরটি।

ভীরু, শান্ত পায়ে টেবিলের কাছে এসে মেয়েটি চায়ের পেয়ালা নামালো। তারপর প্রশান্ত কিছু বলবার আগেই নিচু হয়ে তার পায়ের ধুলো নিলে।

'আরে এ কি—আপনি—'

বড়ো বড়ো চোখ দুটি তুলে মেয়েটি প্রশান্তর দিকে তাকালো।

বললে, 'আমি কম্পাউন্ডারবাবুর মেয়ে, আমার নাম চন্দনা। মা বলে দিয়েছেন, আজ দুপুরে আপনি আমাদের ওখানেই খাবেন।'

প্রশান্ত আপত্তি করতে চাইল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই বলবার মতো কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না। মেয়েটির চোখ দুটি তার ভারি গভীর আর সুন্দর মনে হল। ছেলেবেলায় তাদের বাড়িতে পোষা হরিণ ছিল, দুষ্টুমি করত, একটু ছাড়া পেলেই বাগানের সব গাছপালা খেয়ে শেষ করে দিত। তাকে কেউ ধমক দিলে এইরকম গভীর শান্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকত সে।

যেমন এসেছিল, তেমনি বেরিয়ে গেল চন্দনা।

মথুর বললে, 'দিদিমণি এখানে থাকে না বাবু, শহরে বোর্ডিং-এ থাকে, ইস্কুলে পড়ে।'

'হুঁ—' অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিয়ে প্রশান্ত চায়ের পেয়ালাটাই আগে কাছে টেনে নিল।

॥ চার ॥

আধ ঘণ্টায় হল না, যেতে হল প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে। তখনো ডিসপেনসারিতে প্রচুর ভিড়—কম্পাউন্ডারবাবু হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। তবু ছুটে এলেন প্রশান্তকে দেখে।

'চা খাওয়া হয়েছে, স্যার?'

'চা কেন—আপনার স্ত্রী তো লুচি-মিষ্টির একটা পাহাড় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কেন এ-সব করতে গেলেন? তার পরে দুপুরে আবার খাওয়ার নিমন্ত্রণ—'

'কিছু না স্যার। খাবার-টাবার করবার আর সময় পেল কখন? আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসবেন বলে যা তাড়া আপনি দিলেন।'

'না—না, ওঁকে বিরক্ত করবার দরকার ছিল না। চা-বিস্কুট সবই আমি সঙ্গে করে এনেছি। আপনি দুপুরেও—'

'স্যার, কিছু মনে করবেন না। বয়েসে আপনি ঢের ছোট। আপনারা এগুলো নিছক ভদ্রতা বলে মনে করেন, কিন্তু আমাদের কাছে এ-সব কর্তব্য। সবে আজ এসে পৌঁছেছেন, ব্রাহ্মণের ছেলে, স্বজাতির ঘরে এ-বেলা না-হয় আতিথ্যটা নিলেনই।'

প্রশান্ত চুপ করে গেল। একটু পরে বললে, 'আজ দিন-পাঁচেক তো

ডাক্তার নেই—এ-সব পেশেন্টরা—'

'কী আর করা যাবে স্যার, পুরোনো প্রেসক্রিপশনই রিপিট করছি। আর সাধারণ অসুখ হলে এক-আধ ডোজ কারমিনেটিভ মিকশ্চার—'

চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির সর্বরোগের মহৌষধি! প্রশান্ত মৃদু হাসল।

'বুঝেছি।'

ভূপালবাবু আবার বললেন, 'এ-বেলাটা কিন্তু স্যার আপনি রেস্ট নিলেই পারতেন। গোরুর গাড়ির ঝাঁকানিতে আমরাই কাহিল হয়ে পড়ি—তায় আপনি নতুন লোক। আর তো ঘণ্টাখানেক, আমিই চালিয়ে নিতুম।'

'ঠিক আছে—একটু দেখি দু-চারজনকে।'

'বয়েস অল্প, আপনাদের এনার্জিই আলাদা।'—মৃদু হেসে কম্পাউণ্ডার নিজের কাজে চলে গেলেন।

প্রশান্ত ডাকল: 'ওহে, কী নাম তোমার? এসো এগিয়ে—'

ঠিক দশটায় হল না, আরো একটু দেরি হয়ে গেল। ম্যালেরিয়া, কাশি, বিষাক্ত ঘা, ক্রনিক পেটের অসুখ, দু-জনের টি-বি বলেও সন্দেহ হল। অসুখের রাজসূয় যজ্ঞ চারদিকে। আর সবচেয়ে বড়ো ব্যাধি—ম্যালনিউট্রিশন। আশ্চর্য, ধানের দেশ এই জেলা, আসবার সময় পথের দু-ধারে জলে-ছলো-ছলো মাঠে নতুন ধানের অফুরন্ত সম্ভাবনা দেখে এসেছে সে। এখানকার মানুষেও খেতে পায় না।

শেষ রোগীটির দিকে চেয়ে প্রশান্ত বিষণ্ন স্বরে বললে, 'তোমার বুকের একটা ছবি নিতে হবে।'

'বুকের ছবি!'—লোকটা হাঁ করে রইল।

'হ্যাঁ, এক্স-রে। তুমি শহরে যাও।'

ধুলোভরা খালি পা, গায়ে একটা বিবর্ণ শার্ট, রুক্ষ চুল, কোটরে-বসা চোখ লোকটা সেইভাবেই হাঁ করে রইল। কথাটার মানে সে বুঝতে পারছে না।

কম্পাউণ্ডার এসে দাঁড়িয়েছিলেন পাশে। একটু হাসলেন।

'এক্স-রে করবে—শহরে যাবে, পয়সা পাবে কোথায়?'

'কিন্তু এ তো টি-বি কেস। আমরা কী করতে পারি এখানে?'

'কিছুই পারি না। এইভাবেই এদের চলছে চিরকাল। দিন যা হয় একটা-কিছু ওষুধ লিখে—অন্তত ট্রীটমেণ্ট হচ্ছে এই কথা ভেবে সান্ত্বনা পাক।'

প্রশান্ত নিঃশব্দে বসে রইল কিছুক্ষণ। বাইরে বকুলগাছ দুটোর তলায় যা-হোক একটু ছায়া, তা ছাড়া চারদিকে ঝনঝন করছে দুপুরের রোদ। পৃথিবীটা হঠাৎ যেন নিষ্ঠুর আর কঠিন হয়ে উঠেছে।

লোকটা যেন কিছু-একটা বুঝতে চেষ্টা করছিল। বিভ্রান্তভাবে বললে, 'আমাকে কী বলছেন ডাক্তারবাবু?'

'কিছু না। একটা ওষুধ লিখে দিই। পরশু আবার আসবে।'

'জী।'

'কত দূরে থাকো?'

'জী—বন্দীপুর। সাত মীল ঘাঁটা এখান থেকে।'

'এই সাত মাইল রাস্তা হেঁটেই আসতে হয় তোমাকে ?'

'জী।'

প্রশান্ত চোখ নামালো, লোকটার দিকে আর চাইতে পারল না। ম্যাল-নিউট্রিশন, টি-বি, তারপর যাতায়াতে চোদ্দ মাইল কেবল এই সান্ত্বনাটুকুর জন্যে! কলমের মাথায় যা আসে, তেমনিভাবেই ঘসঘস করে প্রেসক্রিপশন লিখল একটা। কম্পাউন্ডার নিঃশব্দে হাসলেন আবার। এ-সব দেখে দুঃখ বোধ করবার মতো দুর্বলতা তাঁর আর নেই। তিনি জানেন, চিরকাল এরা এইভাবেই বাঁচে—এইভাবেই মরে। এই এদের ইতিহাস।

দুপুরে স্নান করে তক্তপোশটার ওপর শরীর এলিয়ে দিলে ডাক্তার। পাশের জানলা দিয়ে অল্প অল্প হাওয়া আসছিল। তার মনে পড়ছিল তাদের সহপাঠী অখিলেশকে।

'কী হবে এ-সব পড়ে ?'

'সেকি রে, হঠাৎ এরকম তত্ত্বকথা মনে এল কেন ?'

একটু চুপ করে রইল অখিলেশ।

'বাংলা দেশের ইন্টিরিয়রে গেছিস কখনো ?'

'মাঝে মাঝে মামাবাড়ি যেতুম ছেলেবেলায়।'

'সে তো দেশকে দেখা নয়। যদি কোনোদিন সত্যিই দেশের ভেতরের চেহারা দেখতে পেতিস, তা হলে বুক চমকে যেত তোদের। দেখতিস—চিকিৎসা নেই, খাবার নেই, স্বাস্থ্য নেই, সে এক আশ্চর্য নরক। আমরা এখান থেকে ডাক্তারী পাস করব, কেউ কেউ ডিগ্রি নিয়ে আসব বিলেত থেকে, তারপর হয় কলকাতায় নইলে বড়োগোছের কোনো মফস্বল শহরে গিয়ে প্র্যাকটিস করব। আর সেই সময় দেশের শতকরা নব্বুই জন লো[illegible] অস্বাস্থ্য আর এপিডেমিকে দিনের পর দিন উচ্ছন্ন যাবে। কী হবে এইসব মেডিসিন-সার্জারি-গাইনোকোলোজি পড়ে—যদি দেশের কোনো কল্যাণে আমাদের এই সব বিদ্যে কাজে লাগাতে না পারি ?'

'কিন্তু আমরা তার কী করতে পারি ? এ-সব দায়িত্ব গভর্নমেন্টের।'

'কোন্ গভর্নমেন্ট ? যাদের সঙ্গে আমাদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, তারা এ নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে ? ব্যক্তিগতভাবে দেশ সম্পর্কে কিছু করবার নেই আমাদের ?'

'আছে নিশ্চয়। কিন্তু আমাদেরও তো বাঁচতে হবে—জীবিকা আমাদেরও দরকার।'

'মানি। কিন্তু গ্রামে গিয়েও তো আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি। হয়তো গাড়ি-টাড়ি করতে পারব না, কিন্তু বেঁচে থাকতে পারব। আর তার চাইতেও বড়ো কথা—দেশের মানুষকে—'

'থামো সেনগুপ্ত, ও-সব ভালো ভালো বুলি তুলে রেখে দাও। গ্রাম! গ্রামের

লোকে একটা পয়সাও দেবে না। দু-দিনের ভেতরেই সব আদর্শ মাথায় উঠে যাবে, ডাক্তারী ভুলতে হবে; তখন বাঁচবার জন্যে ধান-চাল-পাটের ব্যবসা শুরু করতে হবে। আইডিয়ালিজম খুব ভালো জিনিস, শুনতেও মন্দ লাগে না, কিন্তু ও-সব আলেয়ার পেছনে ছুটলে ডুবে মরতে হবে শেষ পর্যন্ত।'

প্রচণ্ড তর্ক করেছিল অখিলেশ সেনগুপ্ত। টেবিলে কিল মেরে, চায়ের পেয়ালা উলটে দিয়ে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলেছিল, 'জানি—জানি। বড়োলোকের ছেলে তোমরা সব, কেউ বাপের টাকায়, কেউ শ্বশুরের পয়সায় ডাক্তারী পড়তে এসেছ। তোমাদের লক্ষ্য শুধু নিজের দিকে—কবে বত্রিশ টাকা চৌষট্টি টাকা ভিজিটের ঘরে গিয়ে পৌঁছুবে, সেই স্বপ্নেই মশগুল হয়ে আছ। কিন্তু আমি প্রমাণ করব যে—'

কী প্রমাণ করতে চেয়েছিল অখিলেশ, সে-কথা আর ভালো করে জানা হয় নি। ক'দিন বাদেই এক ভোরবেলায় হস্টেলে পুলিশ এসেছিল, তন্নতন্ন করে সার্চ করেছিল অখিলেশের ঘর, তারপর তাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়েছিল সংশোধিত ফৌজদারী আইনে—লোকে যাকে বলত বেঙ্গল আর্ডন্যান্স।

বিপ্লবীদের সঙ্গে নাকি যোগ ছিল অখিলেশের।

কিন্তু প্রশান্ত অখিলেশকে ভুলতে পারে নি। সে শুধু বক্তৃতা দেয় নি, শুধু আদর্শের ফাঁকা আওয়াজ তোলে নি, তার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল, সত্যও ছিল। খুব সম্ভব সে আজো জেল থেকে বেরিয়ে আসে নি, ডাক্তার হওয়াও তার পক্ষে হয়তো কোনোদিন ঘটে উঠবে না। কিন্তু প্রশান্ত ভেবেছিল—সে নিজে অন্তত বাংলা দেশের গ্রামের কাছে একবার পৌঁছোতে চেষ্টা করবে; একবার দেখতে চাইবে—সত্যিই কিছু করা সম্ভব কি না। প্র্যাকটিস করে বড়োলোক হওয়ার জন্যে ডাক্তারের অভাব ঘটবে না, কিন্তু গরিব বাঙালীর তো সত্যিই কেউ নেই।

ভাববার কারণ ছিল আরো। স্বদেশীর একটা হাওয়া তাদের বাড়িতে বয়ে আসছে বরাবর। ত্রিশ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অনেক আগে থেকেই তাদের বাড়িতে বিলিতি কাপড় আসা বন্ধ—নিতান্ত যা না হলে নয়, তা ছাড়া বিলিতি জিনিসপত্রও ঢুকতে পারত না। বাবা খদ্দরের কোট-প্যান্ট পরতেন—বাধ্য হয়েই পরতেন, কারণ ধুতি-পাঞ্জাবি চড়িয়ে ওকালতি করতে যাওয়া যায় না।

এম-বি পাস করবার পরে বাবা বলেছিলেন, 'এখানেই প্র্যাকটিস করবি তো?'

'না।'

'তবে কোথায়? কলকাতায়?'

'না—কলকাতাতেও নয়। গ্রামে যাব।'

'গ্রামে?'—আইনের কাগজপত্র থেকে মাথা তুলে, চশমার নীচ দিয়ে বাবা তাকিয়ে দেখলেন একবার।

'চেষ্টা করতে দোষ কী। তা ছাড়া দেশ সম্পর্কে আমাদের তো কিছু কর্তব্য আছে।'

'তা আছে।'—বাবা একটু হাসলেন, 'তা হলে দেখতে পারো একবার পরীক্ষা করে। বাট ইট মাইট বী এ কস্টলি এক্সপেরিমেণ্ট—আয়্যাম অ্যাফ্রেড।'

বাবা বাধা দেন নি, কিন্তু কথাটার মধ্যে একটা খোঁচা ছিল আর সেই খোঁচাটা প্রশান্তর ভালো লাগে নি। বাবা নিজেও শহরের একজন স্বদেশীওলা —অনেক মিটিং-এ তিনি বক্তৃতা করেন, দেশের জন্যে তিনি ভেবে থাকেন। তাঁর কাছ থেকে এর চাইতে বেশি ঔদার্য আশা করেছিল প্রশান্ত।

কোন্ গ্রামে সে যাবে, কোথায় তার কর্মক্ষেত্রটি নির্বাচন করা উচিত এই জটিল চিন্তায় যখন সে বিব্রত ছিল কিছুদিন, তখন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুল একটা জেলা-বোর্ডের পক্ষ থেকে। কয়েকজন ডাক্তার চাই তাঁদের—এল-এম-এফ হলেই চলবে। বদলির চাকরি, একশো কুড়ি টাকার মতন মাইনে, প্রাইভেট প্র্যাকটিস অ্যালাউড।

মন্দ কী, এই তো একটা সুযোগ সামনে। একেবারে উপোসের ভয় নেই, বাঁধা মাইনের ব্যবস্থা একটা তো আছেই। প্রশান্ত দরখাস্ত করে দিলে।

উত্তর এল চার দিনের মধ্যেই। সানন্দে তাকে নিয়োগ করা হয়েছে।

যথাস্থানে দেখা করতে গেল প্রশান্ত। অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেবার মালিক জেলার সিভিল সার্জন কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তার দিকে।

'তুমি এম-বি পাস করে এ চাকরি করতে চাও কেন? আমরা তো এল-এম-এফ চেয়েছিলাম।'

'স্যার, আমি কি ওভার-কোয়ালিফায়েড?'

'ওভার-কোয়ালিফিকেশন বলে কিছু নেই—আই ডু নট বিলিভ ইন ইট।' —প্রৌঢ় সিভিল সার্জন বললেন, 'দেয়ার ইজ নো এনড্ টু এ সায়েন্স। কিন্তু এই অল্প মাইনে—পাড়াগাঁয়ের একেবারে ইন্টিরিয়রে এইসব চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি—তোমার মন টিকবে? তুমি তো আবার দেখছি বি-এসসি।'

'মন টিকবে বলেই এসেছি।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ভাবলেন সিভিল সার্জন।

'এটা একটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার যে এই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েসে সব অ্যাম্বিশন ছেড়ে দিয়ে—এনি ওয়ে, আই লাইক ইয়োর অ্যাটিচ্যুড। তবে অ্যাসোসিয়েশন পাবে না, অ্যাটমোসফীয়ার পাবে না—'

প্রশান্ত হাসল, জবাব দিল না।

'তা ছাড়া আর-একটা অসুবিধে আছে। আপাতত তোমাকে কোনো স্টেশন দেওয়া যাচ্ছে না, কিছুদিন সুপারনিউমারি ডিউটি করতে হবে। অর্থাৎ ছোটাছুটি করে বেড়াতে হবে। ভালো লাগবে তোমার?'

'ভালো লাগাতে চেষ্টা করব, স্যার।'

'উইশ ইউ বেস্ট অভ লাক, দেন।'

প্রায় এক বছর হয়ে গেছে তার পরে। সুপারনিউমারি ডিউটির পালা

এখনো শেষ হল না, তবে এবার পুজোর ছুটির পরেই তাকে কোনো ভালো একটা জায়গায় পোস্টিং-এর ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এর মধ্যে তিন-চার জায়গায় ঘুরেছে প্রশান্ত, অনেক দুঃখ, অনেক অস্বাস্থ্য, অনেক ব্যাধির চেহারা দেখেছে, দেখেছে এরই ভেতরে কিভাবে পসার জমিয়ে বসেছে হাতুড়ের দল; বিরক্তি ধরেছে, আদর্শবাদ টোল খেতে চেয়েছে কখনো কখনো—কিন্তু মনের ভেতরে এখনো দৃঢ় হয়ে আছে প্রশান্ত। এত সহজেই সে হাল ছাড়বে না।

কিন্তু এই গ্রাম, এই গঞ্জ তার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। এমনভাবে তাকে এর আগে আর কোনোদিন গোরুর গাড়িতে চেপে আটাশ মাইল পথ পেরুতে হয় নি; কোনো ডিস্‌পেনসারিতে এমন করে সে রোগীর ভিড় দেখে নি, এমন নিষ্ঠুর কঠিন দারিদ্র্যের রূপ আর কখনো বুঝি তার চোখে পড়ে নি। সে এখানে কাজ করতে এসেছে। কিন্তু কী কাজ করতে পারবে, কতটুকু করাই বা সম্ভব? এইসব হাসপাতালে ওষুধপত্রের আয়োজন যে কী, সে-সব তথ্য জানতে তো তার আর বাকি নেই!

ভাবতে ভাবতে প্রশান্তর চোখ জড়িয়ে এল। কাল সারাটা রাতের প্রায় অনিদ্রা, সেই সঙ্গে গোরুর গাড়ির ঝাঁকুনিও যে তাকে অনেকখানি কাহিল করে এনেছে, এতক্ষণে সেটা সে টের পাচ্ছিল। বাইরে টুনটুনি ডাকছিল, সজনেগাছের পাতায় শব্দ হচ্ছিল, হাওয়া আসছিল, প্রশান্ত ঘুমিয়ে পড়ল।

'স্যার, কষ্ট করে একটু উঠতে হবে যে।'

চমকে জেগে উঠল। প্রসন্ন মুখে কম্পাউণ্ডারবাবু দাঁড়িয়ে।

'খেতে চলুন স্যার, রান্না তৈরি। একটু বেলা হয়ে গেল, তা—'

'ও কিছু নয়, দেড়টা-দুটোয় খাওয়া আমার অভ্যাস আছে।'—তক্তপোশ থেকে নেমে পড়ল প্রশান্ত। ঘুমে আর ক্লান্তিতে তার খাওয়ার বিন্দুমাত্রও স্পৃহা ছিল না। কিন্তু তার জন্যে কম্পাউণ্ডারবাবুরা সবাই বসে আছেন।

'চলুন—' অনিচ্ছা সত্ত্বেও পা বাড়ালো প্রশান্ত।

কম্পাউণ্ডারের কোয়ার্টার প্রায় পাশেই, মাঝখানে চোরকাঁটা-ছাওয়া ছোট একটি মাঠের ব্যবধান কেবল। বাড়িটা ডাক্তারের মতো ইটের নয়, মাটির দেওয়াল, বাঁধানো মেজে। কিন্তু তকতক করছে চারদিক—একটা সযত্ন গৃহিণীপনার ছাপ আছে।

ভেতরের বারান্দায় হাতে-বোনা আসন পাতা। পাশে ঝকঝকে গ্লাসের ওপর লেসের ঢাকনি। প্রশান্ত গিয়ে আসনে বসতেই নাক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে বারকোশের মতো একখানা প্রকাণ্ড থালা এনে সামনে নামালেন কম্পাউণ্ডারবাবুর স্ত্রী।

'সর্বনাশ, এ কি কাণ্ড! রাক্ষস পেলেন আমাকে?'

'রাক্ষসের কিছু নেই স্যার, কাউকে খেতে দেবার মতো ভালো জিনিস কি আর পাওয়া যায় এখানে? একটু টাটকা মাছ আর বাড়ির কিছু শাকপাতা—এই আর কি!'

কম্পাউণ্ডার যতই বিনয় করুন, চার-পাঁচ রকমের তরকারি, তিন রকমের

মাছ, ক্ষীর এবং রসগোল্লার সঙ্গে পাল্লা দিতে যথাসাধ্য কম খেয়েও নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল প্রশান্তর। তার মধ্যে কম্পাউন্ডার-গৃহিণী ঘোমটার আড়াল থেকে আভাসে ইঙ্গিতে কী-সব নির্দেশ দিতে লাগলেন আর হাসিমুখে একটার পর একটা বাটি এগিয়ে দিতে লাগল চন্দনা। মেয়েটার চোখ সুন্দর, হাসিও মিষ্টি, কিন্তু তাই বলে আত্মহত্যা করা চলে না। অগত্যা শেষ পর্যন্ত লাফিয়ে উঠল প্রশান্ত।

'মাপ করবেন, আর আমাকে দিতে হবে না।'

চন্দনা বললে, 'ক্ষীরটা যে—'

'ওটা থাক, এ-যাত্রা আর নয়।'

ঘোমটার আড়াল একটু সরে গেল, একবারের জন্যে কম্পাউন্ডারের স্ত্রীর মুখখানা দেখল প্রশান্ত। বয়েস হয়েছে, কিন্তু মেয়ের শ্রীটুকু যে কোথা থেকে এসেছে, তা আন্দাজ করা শক্ত নয়। বোঝা গেল প্রশান্তর ভোজন-ক্ষমতা দেখে তিনি খুশী হন নি।

ভূপালবাবু বললেন, 'আপনারা ছেলেমানুষ—অথচ একেবারে কিছুই খেতে পারেন না। অথচ আমরা—'

'আপনিও যে এ-দুঃসাধ্য সাধন করতে পারেন, আপনার খাওয়া দেখে তা মনে হল না। যাই হোক আপাতত আর চলবে না—এর পরে এগোতে চেষ্টা করলে আমি মারা পড়ব।'

'ছি-ছি—বলতে নেই ও-সব। ও চন্দনা—হাত ধোবার জল দে শিগগির—'

বাইরের বারান্দায় দুখানা চেয়ার পড়ে ছিল, দুজনে এসে বসল সেখানে। চন্দনা পান এনে দিলে। কয়েকটা নরম আঙুলের ছোঁয়া লাগল তার হাতে—চকিতের জন্যে প্রশান্ত অন্যমনস্ক হল।

পরক্ষণেই লজ্জা পেল সে। কম্পাউন্ডার কথা বলছিলেন।

'আগের ডাক্তার—মানে মুকুন্দবাবুর বয়েস হয়েছিল। মাথায় ছিটও ছিল একটু। লোককে যা-তা বলতেন, চটে গেলে তাড়া করে যেতেন পেছনে পেছনে। কিন্তু মানুষ নেহাত মন্দ ছিলেন না, চিকিৎসাপত্রও ভালোই করতেন। এখানে প্র্যাকটিসও ছিল খুব।'

'তা হঠাৎ চলে গেলেন কেন?'

'খেয়াল স্যার, খেয়াল। সদরে গিয়েছিলেন, সেখানে অফিসে কী নিয়ে চটাচটি করে বসলেন: এই রইল তোমাদের চাকরি, আমি রিজাইন দিচ্ছি। দেশে যা জমিজমা আছে, তাতে বুড়ো বয়েসে আমার বাকি দিনগুলো চলে যাবে।'

'আশ্চর্য লোক তো!'

'হ্যাঁ স্যার, ভারি অদ্ভুত। এদিককার লোকগুলো কিরকম বোকা—সে তো দেখলেনই। ইনজেকশনে এদের দারুণ ভয়। একবার একটা সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে একটা লোকের পেছনে মাঠের ভেতর প্রায় মাইলখানেক ছুটে

গিয়েছিলেন—ধরতে পারেন নি।'

প্রশান্ত হাসল, কম্পাউন্ডারবাবু হাসলেন।

একটু চুপ করে থেকে প্রশান্ত জিগ্যেস করল: 'এদিকের লোকজন খুব গরিব, তাই না?'

'চাষাভুষো গরিব বইকি। কিন্তু জায়গাটা গরিব নয়।'

'তার মানে?'

'মানেটা কিছু শক্ত নয় স্যার। ছোটখাটো জমিদার, বড়ো বড়ো জোতদার, ধনী মহাজন এদিকে অনেক।'

'তাই নাকি?'

'ধান-চালের ব্যবসা এদিকে খুব ফলাও। গঞ্জ জমাট। ডিসপেনসারি তো বলতে গেলে গ্রামের বাইরে, বিকেলের দিকে একবার বেরিয়ে সব দেখতে পাবেন। ছোট নদীটায় বর্ষার জল নেমেছে—এখন পশ্চিম থেকে পর্যন্ত নৌকো আসবে ওখানে। প্রাইভেট প্র্যাকটিসের পক্ষে এমন জায়গা স্যার এ-জেলায় খুব বেশি নেই।'—কম্পাউন্ডার একবার থামলেন: 'ভালো কথা, সাইকেল আনেন নি? সাইকেল তো দেখি নি।'

'সাইকেল আসবে দু-একদিন পরে। সারাতে দিয়েছি। একসাইজ সাব-ইন্সপেক্টর আসবেন এদিকে, আমার চেনা লোক, তিনিই তাঁর গাড়িতে আনবেন বলেছেন।'

'হ্যাঁ স্যার, সাইকেলটা এখানে খুব দরকার। দূরে দূরে যেতে হবে। এই তো মাইল-আড়াই দূরে তিনদীঘি গ্রাম—দশ-বারো ঘর ছোট ছোট মুসলমান জমিদারের বাস সেখানে। টাকা-পয়সা বিস্তর, মেজাজ দিলদরিয়া, খুব কল আসে ওখান থেকে। সাইকেল না হলে বিস্তর ক্ষতি হয়ে যাবে।'

প্রশান্ত হাসল: 'টাকার ভাবনাটা আমার বড়ো নয়—এইসব গরিব লোকগুলোর জন্যে কিছু করা যায় কি না, সেইটেই চেষ্টা করে দেখব একটু। ভালো কথা, সকালে ডিসপেনসারিতে ডাক্তারের চেয়ারে যে শ্যামরতনবাবুকে দেখলুম—উনি কে, বলুন তো?'

ভূপালবাবুর কপালে আবার ছায়া পড়ল। চুপ করে রইলেন একটু।

'ওঁর নাম শ্যামরতন প্রসাদ। গঞ্জের বড়ো মহাজন।'

'তা ডাক্তারখানার চেয়ার কি ওঁর গোয়েন্দা উপন্যাস পড়বার জায়গা নাকি? চমৎকার ব্যাপার তো!'

কম্পাউন্ডার আস্তে আস্তে বললেন, 'আগের ডাক্তারবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল, সেই সুবাদে আসে যায় ডিসপেনসারিতে—বসে থাকে।'

'বসে থাকে? টেবিলে পা তুলে?'—গলার স্বরের বিরক্তি ডাক্তার গোপন করতে পারল না।

'টাকাই আছে, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই। যাই হোক—' কম্পাউন্ডার একটু গলা-খাঁকারি দিলেন: 'লোক মন্দ নয়। তা ছাড়া—নানা ব্যাপারে—মানে এইসব লোকের ওপরেই তো নির্ভর করতে হয়।'

তেমনি বিরক্তভাবে প্রশান্ত বললে, 'নির্ভর করবার দরকার নেই, এর পর এ-ধরনের অসভ্য লোক বিনা কাজে ডিসপেনসারিতে ঢুকলে আমি বার করে দেব। সে যাক—এবার আমি উঠি। আপনারা বিশ্রাম করুন।'

উঠে দাঁড়াল প্রশান্ত। আবার বললে, 'আপনার স্ত্রীকে জানাবেন, চমৎকার তাঁর রান্না, আমি খুব তৃপ্তি করে খেয়েছি।'

কম্পাউণ্ডার হাসলেন, জবাব দিলেন না। অন্য কিছু ভাবছিলেন তিনি। ছায়া ঘনাচ্ছিল তাঁর কপালে।

প্রশান্ত নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এল। ভরা পেটে ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিলে বিছানায়। সেই ভেঙে-যাওয়া ঘুমটা ফিরে এল আবার, চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল ধীরে ধীরে, আর সেই আচ্ছন্নতার ভেতরে কয়েক-বার ভেসে উঠল চন্দনার মুখ। মেয়েটার চোখ দুটো সুন্দর—হরিণের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

॥ পাঁচ ॥

বিকেলে ডিসপেনসারির কাজ বেশি ছিল না। সাড়ে-পাঁচটার মধ্যেই মিটে গেল। প্রশান্ত ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে ডিসপেনসারির সামনে বকুলগাছ দুটোর কাছে এসে দাঁড়ালো।

মথুর এসে বললে, 'বাবু।'

'কী হল ?'

'রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা কী হবে ? আমি দুধ এনে রেখেছি। চাল-ডাল কিছু আনতে হলে এ-বেলাই তো গঞ্জে যেতে হয়।'

'আজ আর কিছু দরকার নেই। কম্পাউণ্ডারবাবুর বাড়িতে বড্ড খাওয়া হয়েছে দুপুরে। ওই দুধ আছে তো ? ওতেই হয়ে যাবে।'

'কিন্তু কিছু এনে রাখলে তো ভালো হত। কাল সকালে হাসপাতালের কাজ—আমার তো যেতে দেরি হয়ে যাবে।'

'ঠিক কথা।'—পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে মথুরের হাতে দিলে প্রশান্ত। মথুর চলে গেল।

প্রশান্ত ভাবল, সেও একবার গঞ্জের দিকে ঘুরে এলে পারত—একবার দেখা হয়ে যেত জায়গাটা। কিন্তু আজ আর তার শরীরে একবিন্দু উদ্যমও অবশিষ্ট ছিল না কোথাও। যেখানে ছিল, দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই।

সামনে মাঠের পর মাঠ। বর্ষার জল আর নতুন ধানের শিষে টলমল করছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে—ভোরবেলায় এই সূর্যকে সে এমনি করেই চার-দিক রাঙিয়ে উঠে আসতে দেখেছিল। মাঝখান দিয়ে সাদাটে কাদায় ভরা জেলাবোর্ডের রাস্তাটা এগিয়ে গিয়ে দূরের তিনটে তালগাছের কাছে ঝাপসা আর কালো হয়ে গেছে। ওই পথটা ধরেই এসেছে প্রশান্ত। একটা গোরুর গাড়ি চলে যাচ্ছে দুলতে দুলতে—ওয়াহেদ বক্সের নাকি ? না—তার

টাম্পরের রঙটা ফিকে গোলাপী।

মাঠ ভরে ধান ওঠে এখানে। গঞ্জে ধান-চালের ব্যাপার চলে বিরাটভাবে। ধনী মহাজন, ধনী জোতদার। অথচ দেশের লোকের ম্যালনিউট্রিশন। টি-বি, ম্যালেরিয়া, ক্রনিক পেটের অসুখ, থেকে থেকে এক-একটা এপিডেমিক। মহাসমুদ্রে হাজার হাজার ডুবন্ত মানুষের জন্যে একটা কলার ভেলা—পাঁচ-ছ' ক্রোশ অঞ্চলের ভরসা একটিমাত্র চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি। কী হবে হিটলার-চেম্বারলেন-মুসোলিনী-দালাদিয়েরের কথা ভেবে? এই বাংলা দেশের কাছে ও-সব বড়ো বড়ো খবর কোনোদিনই এসে পেঁছুবে না।

অখিলেশ সেনগুপ্তই ঠিক বলেছিল।

ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ আসছিল কিছুক্ষণ থেকে, ডাক্তার খেয়াল করেনি। খেয়াল করল, যখন ঘোড়াটা পেছন থেকে এসে একেবারে তার পাশে দাঁড়িয়ে গেল।

ডাক্তার ফিরে তাকালো। ঘোড়া থেকে বিশিষ্ট চেহারার মুসলমান ভদ্রলোক নামলেন একজন। ধবধবে সাদা পাজামা, সাদা পাঞ্জাবির ওপরে কালো কোট একটি। বয়েসে তারই মতো হবেন, বড়োও হতে পারেন দু-এক বছরের। ভালো চেহারা—শৌখিন মানুষ। হাতে অনেকগুলো আংটি—আতরের গন্ধ আসছিল।

ভদ্রলোক বললেন, 'আদাব।'

'আদাব।'

'আমি তিনদীঘির নুরুদ্দীন চৌধুরী। বাজারে কম্পাউণ্ডারবাবুর সঙ্গে দেখা হল, বললেন, নতুন ডাক্তারবাবু এসেছেন। বাড়ি যাচ্ছিলুম, ভাবলুম আলাপ করে যাই।'

'বেশ তো—বেশ তো, আসুন।'

'ব্যস্ত হবেন না, পরে গল্প করা যাবে এখন। নতুন এসেছেন, ঠিক হয়ে বসুন। তারপর প্রাণ খুলে আড্ডা দেওয়া যাবে। আমি খুব আড্ডাবাজ—বুঝলেন?'

নুরুদ্দীন হাসলেন, প্রশান্ত হাসল।

'আপনি তো একেবারে ছেলেমানুষ দেখছি। চাকরিতে নতুন?'

প্রশান্ত মাথা নাড়ল।

'এত অল্প বয়েসে ডাক্তারিতে পসার হওয়া শক্ত। পাকা চুল না হলে লোকের বিশ্বাস হতে চায় না। আমি মশাই ও-সব মানি-টানি না। আমার তো ধারণা, টাটকা যারা পাস করে আসে, তাদেরই সব মনে-টনে থাকে, বুড়োরা ডাক্তারী ভুলে যায়। আর এই জেলা-বোর্ডের চাকরি! সব বুন্ধু গেঁয়ো লোক, কদরই বা বুঝবে কে—চিকিৎসাই বা কার করবেন।'

প্রশান্ত চোখ তুলে তাকালো: 'কিন্তু বুন্ধু গেঁয়ো লোকেরও তো অসুখ-বিসুখ করে!'

'করে বইকি—আলবৎ করে। কিন্তু আপনাদের কাছে আসে কখন—

জানেন? যখন আর-কিছু করবার নেই—যখন কবরের তলায় এক-পা বাড়িয়েছে—তখন। ভেবেছেন কোনোদিন আপনাকে ডাকবে? ডাকতে পারে—যখন কাফনের কাপড় কেনবার জন্যে দৌড়োতে হবে—সেই সময়। ভিজিট তো দিতে পারবে না, বরং বাড়িয়ে ধরবে এককাঁদি কলা, কি একহালি মুলো। যত সব!'—বলতে বলতে পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন: 'নিন।'

'মাপ করবেন, খাই না।'

'একেবারে গুডবয় ডাক্তার—অ্যাঁ?'—নুরুন্দীন হেসে উঠলেন: 'নাঃ, আপনার সঙ্গে সুবিধে হবে না মনে হচ্ছে। তবু আমাকে আসতে হবে আপনার কাছে—আমি আড্ডাবাজ লোক। আচ্ছা—আদাব, আজ চলি—'

'আদাব।'

নুরুন্দীন টক করে সহজ ভঙ্গিতে ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠলেন, বোঝা গেল, পাকা ঘোড়সওয়ার তিনি। তারপর টকাটক করে ঘোড়াটা জেলা-বোর্ডের রাস্তা ধরে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেল।

সূর্য ডুবেছে, মাঠের জল কালো, সামনের নালা থেকে ব্যাঙের ডাক। ডাক্তার চলে এল কোয়ার্টারের দিকে। গঞ্জে যাওয়ার আগেই মথুর ঘরের লণ্ঠনটা একটুখানি জ্বালিয়ে রেখে গেছে, আবছা অন্ধকারে তার মধ্যে পা দিয়ে একবারের জন্যে, অচেনা আর রহস্যময় বোধ হল প্রশান্তর। আলোটা বাড়িয়ে দিলে, ঘর উজ্জ্বল হল, দেওয়ালে খুশিতে ঝকঝক করে উঠল ওষুধ কোম্পানির ক্যালেণ্ডারের স্বাস্থ্যসুন্দর শিশুটির মুখ।

বিছানাটার ওপর বসে পড়ল প্রশান্ত। একেবারে নিঃসঙ্গ, একান্ত নির্জন সন্ধ্যা। এর আগে যে-সব ডিসপেনসারিতে সে গেছে, তাদের কোথাও এমন নিঃসঙ্গ শূন্যতা ছিল না। একদিক থেকে এ ভালোই, একা-একা বসে নিজের মনের মুখোমুখি হওয়া যায়—আর এইভাবে, নিজের মাঝখানটিতে তলিয়ে যেতে প্রশান্তর ভালো লাগে।

চাষাভুষোদের কাছে তার পসার হবে না—নুরুন্দীন চৌধুরী বলেছিলেন। তিনদীঘির যে-জমিদারদের গল্প ভূপালবাবু করেছিলেন, নিশ্চয় নুরুন্দীন তাঁদেরই একজন। কিন্তু এই গ্রামে—এই গরিব মানুষদের ভেতরে, প্রশান্ত তো প্র্যাকটিস করতে আসে নি। সে ইচ্ছেই যদি তার থাকত, তা হলে বাংলা দেশে জায়গার অভাব হত না, তার নিজের শহরেই সে জমিয়ে বসতে পারত।

হঠাৎ হারমোনিয়মের সুর এল কানে। তার পরেই গান। একটি অল্প-বয়েসী মেয়ের গলায়।

সন্দেহ নেই, কম্পাউণ্ডারবাবুর বাড়ি থেকেই। আরো নিঃসন্দেহ, চন্দনার গান। ও-বাড়িতে কম্পাউণ্ডারের স্ত্রী ছাড়া তৃতীয় আর কোনো মেয়েকেই সে দেখে নি; জেনেছে—এই মেয়েটিই তাঁদের একমাত্র সন্তান।

উৎকর্ণ হল প্রশান্ত।

বাংলা দেশের গান, চিরকালের চেনা কীর্তন। খুব একটা ভালো গাইছিল তা নয়, কিন্তু স্বাভাবিক সুরেলা গলার সঙ্গে মনে পড়ছিল মেয়েটিকে,

তার চোখ দুটিকে। সন্ধ্যাটা যেন ভরে উঠল হঠাৎ।

বিছানায় আধশোয়া ভঙ্গিতে শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগল প্রশান্ত। কতক্ষণ ধরে? আধ ঘণ্টা? চল্লিশ মিনিট? ঠিক খেয়াল ছিল না। পর পর গুটিচারেক গান গাইল মেয়েটি; সব-ক'টিই কীর্তন।

কীর্তন শুনলেই তার ছেলেবেলার কথা মনে আসে। ঠাকুরদার ছবিটা ভেসে আসে অস্পষ্টভাবে। পাকা চুল, পাকা গোঁফ, সবসময় হাসিতে চোখ দুটো চকচক করত। পরম বৈষ্ণব ছিলেন, শ্বেতচন্দনের ফোঁটা পরতেন কপালে। কোথাও কীর্তন হলেই ছুটতেন সেখানে, সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন ছেলেমানুষ প্রশান্তকে।

'চল দাদু, গান শুনে আসি।'

আসরে দাদুকে সামনে নিয়ে বসাত। খাতির করত সবাই। গান শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতেন, মাথা নাড়তেন, 'আহা-আহা' করে উঠতেন, চোখ দিয়ে জল পড়ত কখনো কখনো। এই মেয়েটির গানের সঙ্গে তার মিল নেই, সে আবহাওয়াও নেই—তবু প্রশান্তর মনটা ভারী হয়ে উঠল হঠাৎ। চন্দনা যে খুব ভালো গাইছিল তা নয়—তবু কোথা দিয়ে যেন ছুঁয়েছে তার একটা নিভৃত চেতনাকে।

বাইরে জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। বারান্দায় কে যেন উঠল। তার কাছেই কেউ আসছে।

প্রশান্ত উঠে বসল বিছানায়। বাইরে থেকে ডাক দিলেন কম্পাউন্ডার।

'ডাক্তারবাবু।'

'আসুন—আসুন—'

ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকলেন কম্পাউন্ডার: 'বিশ্রাম করছিলেন নাকি?'

'না—বিশ্রাম দুপুরে বিস্তর হয়েছে। শুয়ে শুয়ে গান শুনছিলুম। আপনার মেয়েটি গাইছিল, তাই নয়?'

কম্পাউন্ডারের মুখে একই সঙ্গে লজ্জা আর বিনয়ের ছায়া পড়ল।

'ওই স্যার গায় একটু একটু—তেমন বিদ্যে নেই তো। আমিই যা পারি শিখিয়েছি।'

'গানের চর্চাও আপনার ছিল নাকি? বেশ—বেশ!'

'কিছু না স্যার, সামান্য একটু শিখেছিলুম আর কি! কিন্তু আমাদের কি আর কিছু হয়, "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রস্য মনোরথাঃ"। এই জেলা-বোর্ডের কম্পাউন্ডারী করেই জীবন কেটে গেল! তা স্যার, আপনিও কি গান-টান—'

'কিছুদিন সেতার নিয়ে টুংটাং করে ছেড়ে দিয়েছি—আপনার কম্পাউন্ডারীর মতোই ডাক্তারীর পড়াও আমাকে শেষ করল। কিন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন, বসুন—ওই চেয়ারটাতে বসুন।

কম্পাউন্ডার চেয়ারে বসলেন। তারপর মেয়ের কথায় চলে গেলেন আবার।

'ওই একটামাত্র সন্তান আমার—ওই মেয়ে। ভারি ভাবনা হয় স্যার ওর

জন্যে।'

'ভাবনা কেন?'

'শহরে বোর্ডিংয়ে রেখে পড়াচ্ছি, কিন্তু এখন বড়ো হয়ে উঠল, বিয়ে-টিয়ে একটা না দিলে—'

'এখনই বিয়ে দেবেন কি মশাই, পাস করুক, কলেজে পড়ান।'

'আর কলেজ! ও-সব কি স্যার কম্পাউণ্ডারের আয়ে কুলোয়! একটা মেয়ে বলেই এ-সব পারছি, আরো দু-চারটে ছেলেমেয়ে থাকলে কি আর কিছু করে উঠতে পারতুম।'—কম্পাউণ্ডার নিঃশ্বাস ফেললেন, 'দেখা যাক, ভগবান কী করেন।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে লজ্জিত প্রশান্ত অনুভব করল, সে চন্দনার কথাটাই ভাবছে। চকিত হয়ে আলোচনাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইল।

'গঞ্জে গিয়েছিলেন নাকি?'

'ও—হ্যাঁ হ্যাঁ।'—কম্পাউণ্ডার বললেন, 'সেইজন্যেই এসেছিলুম স্যার। একটা কথা ছিল।'

'বলুন।'

'যদি কিছু মনে না করেন—'

'মনে করব কেন? কী বলবেন বলুন।'

'আমার মনে হয় স্যার—' ভূপালবাবু একটু থামলেন: 'কাল একবার আপনার ওদিকে যাওয়া উচিত। মানে—মান্যগণ্য যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে একবার একটু আলাপ-টালাপ—'

বালিশে একটুখানি হেলান দিয়েছিল প্রশান্ত, সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল আবার।

'তার মানে?' সুর একটু তীক্ষ্ন হল তার: 'প্রণাম করে আসতে হবে নাকি বাড়ি-বাড়ি গিয়ে?'

কম্পাউণ্ডার জিভ কাটলেন: 'আরে ছি-ছি, কে বলছে সে-কথা! ধনী-মানী লোক সব, মানে এখানে যিনিই আসুন—ডাক্তার হোন, দারোগা হোন, সবাই গিয়ে একবার—'

'আর ডাক্তারের বুঝি মান-সম্মান বলে কিছুই নেই? কেন, তাঁরা এসে দেখা করতে পারেন না?'

প্রশান্তর মেজাজ দেখে একবারের জন্যে থমকালেন কম্পাউণ্ডার। মাথাটা চুলকে নিয়ে বললেন, 'তা হলে আসল কথাটা বলি, ডাক্তারবাবু। সকালে শ্যামরতনবাবুকে আপনি চেয়ার ছেড়ে উঠতে বলেছিলেন, তাই নিয়ে একটা ঘোঁট হচ্ছে বন্দরে।'

'বটে!'

'আপনি বোধ হয় জানেন না যে ওঁর দাদা রামরতনবাবু এখানকার সবচেয়ে বড়ো মহাজন, তিনি আবার ডিসপেনসারি কমিটির মেম্বার—'

'তাতে আমার কী?'—প্রশান্ত উগ্র হয়ে উঠল: 'আমাকে কি মাপ চাইতে

যেতে বলছেন ওঁদের কাছে ?'

'আরে না—না, রাম-রাম, এমন কথা কে বলে।'—কম্পাউণ্ডার আবার জিভ কেটে বললেন, 'ও-সব কিছু করতে হবে না। আমি শ্যামরতনকে পালটা বলে এসেছি, তোমারই তো দোষ বাপু, সাতসকালে নভেল পড়বার জায়গা আর তুমি খুঁজে পেলে না ? ওঁরা ইয়ংম্যান, ডিউটিফুল, তায় কেউকেটা নন —দস্তুরমতো এম-বি। সাতজন্ম তপস্যা করলেও এমন ডাক্তার এ-তল্লাটে আর দু-জন আসবে না। তবু ব্যাপারটা কি জানেন—এদের টাকা-পয়সাই আছে, বিদ্যের ছিটে-ফোঁটাও তো মগজে নেই। নতুন ডাক্তারের বড্ড মেজাজ —মানীর মান রাখতে জানে না, এইসব বলাবলি করছে। তাই—'

প্রশান্ত ফেটে পড়ল এবার।

'শুনুন কম্পাউণ্ডারবাবু, সাফ কথা বলে দিচ্ছি আমি। বন্দরে যখন দরকার হবে আমি যাব, কারো অসুখ হলে যদি ডাকে, ভিজিট দেয়, গিয়ে দেখে আসব। কিন্তু আমি কারো চাকর নই যে হাত জোড় করে মন যোগাতে যাব দোরে দোরে। আর শ্যামরতন তো শ্যামরতন—ডিসপেনসারির কাজের সময় যদি স্বয়ং সিভিল সার্জন এসেও ওইভাবে ডাক্তারের চেয়ারে বসে, টেবিলে পা তুলে নভেল পড়তে থাকে—তা হলে তাকেও আমি মথুরকে দিয়ে বের করে দেব।'

কম্পাউণ্ডারের বিনীত চোখের দৃষ্টি বদলে গেল পলকের জন্যে। ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল একবার, অপ্রীতিকর কিছু বলতে গিয়েও সামলে নিলেন নিজেকে।

'আপনি ছেলেমানুষ, ডাক্তারবাবু—' কম্পাউণ্ডার দেঁতো ধরনের হাসি হাসলেন: 'যা বলছেন, তা ঠিকই। কিন্তু জানেন তো—পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার, এখানকার লোকজনও একটু প্যাঁচালো—মানে, সব দিক বাঁচিয়ে চলাফেরা করাই ভালো।'

ওয়াহেদ বক্সের কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল ডাক্তারের: 'লোকগুলো সুবিধের নয়—তাই বলে রাগ করে চলে যাবেন না গরিবদের ছেড়ে', আর মনে হতেই রাগটা যেন ব্রহ্মরন্ধ্রে চড়ে গেল তার।

'ও-সব বাঁচানোর মধ্যে আমি নেই, কম্পাউণ্ডারবাবু। ও-সব ধাতে নেই আমার।'

কম্পাউণ্ডার একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। আরো কিছু বোধ হয় বলতে যাচ্ছিলেন, মথুর এল সেই সময়।

'চাল ডাল তেল-তরকারি নিয়ে এলুম, বাবু। রাতে কি দুটো—'

চটেই ছিল প্রশান্ত। রুক্ষ গলায় বললে, 'বললুম যে কিছু খাব না ? একটু দুধ গরম করে দিলেই হবে।'

সন্ত্রস্ত হয়ে কম্পাউণ্ডার বললেন, 'সে কি স্যার—রাত-উপোসী থাকবেন ! আমি বরং বাড়ি থেকে—'

'না—না, মাপ করবেন। দুপুরে যা বিরাট খাওয়া খাইয়েছেন, এখনো তা

হজম করতে পারি নি। আজ আর কিছুই দরকার নেই আমার।'

কম্পাউন্ডার উঠে দাঁড়ালেন।

'কোনো দরকার-টরকার হলে ডাক দেবেন স্যার। পাশেই তো আছি।'

'নিশ্চয়—নিশ্চয়।'

কম্পাউন্ডার বেরিয়ে এলেন। নিজের কোয়ার্টারে যেতে যেতে জ্বলন্ত চোখ মেলে একবার চাইলেন ডাক্তারের ঘরের দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় বললেন একবার: 'মরবে!'

দিন তিনেকের মধ্যে বিশেষ কিছু ঘটল না। ডিসপেনসারিতে দশটা সাড়ে-দশটা পর্যন্ত কাজ করল, দুপুরে বিশ্রাম করল, মা-কে চিঠি লিখল; তিন দিনের মধ্যে বৃষ্টি হয় নি, ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তাটা অনেকখানি শুকিয়ে গিয়েছিল, সন্ধ্যার মুখে সেই পথ ধরে অনেক দূর পর্যন্ত বেড়িয়ে এল। কম্পাউন্ডার বললেন, 'রাত করে মাঠের দিকে বেশি ঘুরবেন না স্যার, খুব সাপের উপদ্রব হয় এই সময়ে।'

সেই টি-বি রোগীটি এসেছিল আবার বন্দীপুর থেকে, আবার তাকে যা-হোক একটা ওষুধ দিলে প্রশান্ত। লোকটিকে দেখা করতে বলেছে সপ্তাহ-খানেক পরে। ভেবেছে, নিজেই কিছু টাকা আর একখানা চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দেবে সিভিল সার্জনের কাছে। যদি একটা এক্স-রে হয়, কিছু করা যায় যদি।

একসাইজ সাব-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে সাইকেলটা এল তৃতীয় দিনে। হাস-পাতালের কাজ সেরে বন্দরে বেড়াতে গেল প্রশান্ত।

ফাঁকা মাঠের ভেতরে ডিসপেনসারি, ডাক্তার-কম্পাউন্ডারের কোয়ার্টার। সেখান থেকে কল্পনাই করা যায় না—এত বড়ো একটা গঞ্জ আছে আধ মাইল দূরে। প্রায় ছোটখাটো একটা শহরের মতো, মাটকোঠা আর একতলা-দোতলা দালানের ঘিঞ্জি বসতি। মানুষের পায়ে পায়ে আর গোরু-মোষের গাড়ির চাকায় চাকায় পথ কাদায় একাকার। বাজারে সাইকেলের টায়ার থেকে মোতিচুরের লাড্ডু পর্যন্ত বিক্রি হয়, মানুষ অধিকাংশই হিন্দুস্থানী—আচমকা মনে হয় বিহার কিংবা উত্তরপ্রদেশের একটা গ্রামকে কেউ হাওয়ায় উড়িয়ে এনে এইখানে বসিয়ে দিয়েছে। প্রশান্ত এতক্ষণে একটা প্রশ্নের উত্তর পেল। ডিসপেনসারিতে হিন্দীভাষী রোগীর ভিড় এই ক'দিন তার মনে ধাঁধাই জাগিয়েছিল দস্তুরমতো

রামরতন প্রসাদ যদি এই বন্দরের সবচাইতে বড়ো মহাজন হন, সন্দেহ নেই অনেক টাকা আছে তাঁর।

এই তিন দিনের মধ্যে বন্দরের কোনো মান্যগণ্য পায়ের ধুলো দেন নি তার ওখানে—নিশ্চয় অভিমান করে আছেন। তা থাকুন, তাতে প্রশান্তর কিছু যায়-আসে না। ডাক্তারের ওপর রাগ করে থাকা চলে না, দরকার হলে

নিজেদেরই ছুটে আসতে হবে, তা প্রশান্ত জানে। কম্পাউন্ডারবাবু ছাড়া তার সামান্য আলাপ হয়েছে পোস্টমাস্টারের সঙ্গে—একগাদা ছেলেপুলে নিয়ে বিব্রত ভালোমানুষ, কাতর হয়ে জিগ্যেস করেছেন: 'আচ্ছা মশাই, আরথ্রাইটিসের কোনো চিকিৎসা কি আপনাদের শাস্ত্রে নেই—যা কষ্ট পাচ্ছেন আমার স্ত্রী!' থানার দারোগাসাহেব একদিন এসেছিলেন, জিগ্যেস করেছিলেন, 'বাড়ি কোথায়?' রাজশাহী শুনে খুশী হয়ে বলেছেন—'তবে তো আপনি আমার জেলার লোক মশাই, নেমন্তন্ন করে খাওয়াব একদিন। মুসলমানের বাড়িতে খাওয়া চলে তো?' প্রশান্ত হেসে বলেছে—'চলে।'

এ-সব আলাপ এখনো উপর-উপর, হৃদ্যতা কারো সঙ্গে এর মধ্যে ঘটে নি। প্রশান্তর ধরনের মানুষের পক্ষে তা সম্ভবও নয়। নিজেকে নিয়েই তার সময় কাটছে; কাজ না থাকলে একা মাঠের পথ ধরে ঘুরে বেড়ানো, বারান্দায় চেয়ার টেনে এনে যত দূর চোখ যায় খোলা আকাশ আর ঝকঝকে তারাগুলোর দিকে চেয়ে থাকা।

কিন্তু এর মধ্যে আরো বারকয়েক এসেছে চন্দনা।

আপাতত তার রান্নাবান্না আর সংসারের সব কাজই মথুর চালিয়ে আসছে। প্রশান্ত আপত্তি করেছিল।

'ডিসপেনসারির এমপ্লয়িকে আমি নিজের কাজে লাগাতে চাই না।'

শুনে কম্পাউন্ডার যেন আকাশ থেকে পড়েছিলেন।

'বলেন কি, বরাবরই তো ব্যাটা ও-কাজ করে আসছে।'

'তা হোক—আমার প্রিন্সিপ্‌লে বাধে। আপনি অন্য একটা কাজের লোক ঠিক করে দিন।'

'আরে মশাই, আপনি তো আচ্ছা লোক! ও কি আর সারাদিন ডিসপেনসারি নিয়ে থাকে নাকি? এখানকার কাজকর্ম সেরেই তো যায় আপনার ওখানে। বেশ তো—কিছু মাইনে দিয়ে দেবেন, তা হলেই হল। ও-ব্যাটা রান্না-টান্না সব জানে। যদি উটকো কোনো লোক এনে ধরে দিই, দেখবেন—সে উচ্ছে, চিংড়িমাছ আর ধনেপাতা মিশিয়ে ঝোল রান্না করে বসে আছে। মারা যাবেন নাকি বিদেশে এসে?'

অগত্যা আর তর্ক করে নি প্রশান্ত। সত্যিই তো—কী হবে অত খুঁৎখুঁৎ করে? তার তো দেড় মাসের চাকরি। কী হবে আর ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে।

অতএব মথুরই রাঁধছে। কিন্তু কম্পাউন্ডারবাবু তার রান্নার যত সুখ্যাতিই করুন, বেশ বোঝা গেল, তাঁর স্ত্রী সেটা বিশ্বাস করেন না। তাই খেতে বসলেই চন্দনা এসে হাজির। কখনো ডাল, কখনো একটা তরকারি, কখনো মাছের ঝোল।

'আহা—এ-সব কেন আবার?'

'মা পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'তোমার মা-র রান্না ভালো, লোভও সামলানো যায় না, কিন্তু তাই বলে

এইভাবে উৎপাত করাটা কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না।'

'আমি জানি না।' মাথা নিচু করে মেয়েটা জবাব দেয়।

প্রশান্ত হাসে: 'তা ঠিক। তুমি দূতী—অবধ্য। তোমার বাবাকেই বলতে হবে।'

কিন্তু কম্পাউন্ডার একেবারে উড়িয়ে দেন কথাটা। 'আরে রাম-রাম—বাড়ির শাকপাতা, তা ছাড়া চন্দনার মা রাঁধতে ভালোও বাসে—'

সবটাই শাকপাতা নয়, কিন্তু শেষ কথাটা বিশ্বাস করে প্রশান্ত। চন্দনার মা রাঁধতে ভালোবাসেন, খাওয়াতেও—প্রথম দিনেই সেটা বুঝতে পেরেছে প্রশান্ত। কম্পাউন্ডার যতই বলুন—'বারেন্দ্র মশাই, স্বজাতি—' প্রশান্তর মন থেকে অস্বস্তিটা কোনোমতে যেতে চায় না। সে জানে, জেলা-বোর্ডের চ্যারিটেব্‌ল ডিসপেনসারির একজন পাসকরা কম্পাউন্ডার কী মাইনে পায়! তার ওপর ভদ্রলোক খরচে মানুষ, মেয়েকে শহরের বোর্ডিংয়ে রেখে পড়াতে নিশ্চয় বেশ পয়সা দিতে হয়। অবশ্য, প্রশান্ত লক্ষ্য করেছে, কম্পাউন্ডারও কিছু কিছু প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন—গরিব মানুষদের বাড়িতে গিয়ে নাড়ী-টাড়ি টিপে হয়তো দিনে দুটো-একটা টাকা রোজগারও করেন, কিন্তু তা নিশ্চয় এমন বেশি নয় যে সেজন্যে তাঁর বাড়ি থেকে নিয়মিত মাছ-তরকারি খাওয়া চলে।

যেদিন সে গঞ্জ থেকে ঘুরে এল, সেদিনও খাওয়ার সময় বাটিতে মাছ নিয়ে এসে হাজির হল চন্দনা। সে কখন খেতে বসবে, কী করে টের পায় ওরা? নিশ্চয় মথুরটাকে টিপে দেওয়া আছে তলায় তলায়।

হাল ছেড়ে দিয়ে প্রশান্ত বললে, 'নাঃ, তোমাদের নিয়ে আর পারা গেল না। এখানকার রান্নাবান্নার পাট চুকিয়ে তোমার ওখানে পাকাপাকি অতিথি হলেই হয়।'

চন্দনা হেসে বললে, 'বেশ তো।'

প্রশান্ত হরিণের মতো চোখ দুটির দিকে চেয়ে দেখল একবার। মেয়েটার গাল রাঙা হল, মাথা নুয়ে পড়ল।

'তুমি রাঁধতে পারো না?'

'পারি অল্প অল্প।'

'তোমার রান্না তো খাওয়ালে না একদিনও।'

'সে আপনি খেতে পারবেন না।'

'আমি কী খেতে পারি বা না পারি, সে-সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই।'—প্রশান্ত হাসল: 'স্কুলে পড়ছ—তাই না? কোন্ ক্লাস?'

'নাইন।'

'আসছে-বারে ম্যাট্রিক দেবে।'

'যদি ফেল না করি।'

'ফেল করবে কেন?'—স্নিগ্ধ চোখে প্রশান্ত তাকালো: 'শুনেছি, তুমি লেখাপড়ায় ভালো।'

'ম্যাথামেটিক্সে ভীষণ কাঁচা। দারুণ ভয় করে।'

ম্যাট্রিকে দুটো অঙ্কে লেটার-পাওয়া প্রশান্ত কৌতুক বোধ করল।

'অঙ্কে কেউ ফেল করে? ও তো ভীষণ সোজা।'

'বাবাঃ!'

প্রশান্ত হেসে ফেলল: 'আমি তোমাকে অঙ্কে ভালো করবার খুব সোজা রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারি।'

'সত্যি?'

'সত্যি। কিন্তু তোমার বোধ হয় স্কুল খোলবার সময় হয়ে এল, তুমি বোধ হয় চলে যাবে দু-একদিনের মধ্যে।'

'না, আরো তিন সপ্তাহ বাকি আছে স্কুল খুলতে।'

'এত দেরি কেন?'

'স্কুল-বিল্ডিং রিপেয়ার হচ্ছে কিনা, তাই ছুটি এবার একটু বেশি।'

খাওয়া বন্ধ করে প্রশান্ত তরল হয়ে বলল, 'তা হলে আর ভাবনা কী, কাল দুপুর থেকেই চলে এসো খাতা-বই নিয়ে। খুব সিম্পল কয়েকটা মেথড শিখিয়ে দেব। আর ভাবতে হবে না, তরতর করে অঙ্ক মিলে যাবে।'

চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল চন্দনার। সেই চোখের দিকে চেয়ে প্রশান্ত মুগ্ধ হয়ে গেল।

'সত্যি বলছেন?'

'সত্যি! এই ভাত ছুঁয়ে।'

'আপনার অসুবিধে হবে না?'

'বিন্দুমাত্র না। আমার দিবানিদ্রার অভ্যাস নেই, বরং মাস্টারী করে চমৎকার কেটে যাবে।'

চন্দনা আর দাঁড়ালো না—আনন্দে ছুটে বেরিয়ে গেল।

বিকেলেই প্রায় বিগলিতচিত্ত এসে হাজির হলেন কম্পাউন্ডার।

'স্যার, আপনি নাকি মেয়েটাকে একটু অঙ্ক-টঙ্ক দেখিয়ে দেবেন, বলেছেন? মেয়েটা তো খুশীতে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেছে।'

প্রশান্ত হেসে বললে, 'অঙ্কের নামে ছেলেপুলে তো ছুটে পালায় বলেই জানি, কিন্তু খুশীও যে হয় সে আমি এই প্রথম দেখলুম।'

কম্পাউন্ডার বললেন, 'সত্যিই স্যার পড়াশুনোয় ওর খুব ঝোঁক। কিন্তু গরিব মানুষ, কষ্টের সংসার—কিছুই করে উঠতে পারি না। আপনি ওকে একটু দেখিয়ে-টেখিয়ে দেবেন, সে যে ওর কত বড়ো সৌভাগ্য—'

'কিছু সৌভাগ্য নয়—আমার খানিকটা সময় কাটবে। দেবেন পাঠিয়ে।'

কম্পাউন্ডার চলে গেলে একটা ছোট চিন্তা কাঁটার মতো বিঁধল প্রশান্তর মনে। পরশু একবার ভূপালবাবুকে বলেছিল, 'ওষুধ আর জিনিসপত্রের স্টকগুলো একবার মেলানো দরকার।' উত্তরে কম্পাউন্ডার বলেছেন, 'আচ্ছা।' কিন্তু সেটা যে কবে এবং কখন করা যাবে, এ-সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় নি তাঁর কাছে। আজও কথাটা মনে হয়েছিল, কিন্তু বলা গেল না। স্নেহ-আতিথেয়তা আর ভদ্রতা দিয়ে ভদ্রলোক তাকে অভিভূত করে

ফেলেছেন, তার ভেতরে বাবে বারে প্রশ্নটা তুললে কেমন বিসদৃশ দেখাবে, হয়তো ভাববেন—

কিন্তু স্টকটা একবার মিলিয়ে নেওয়া দরকার। কর্তব্যের দিক থেকেই দরকার। অথচ—

ডাক্তার—ডাক্তারই। তার ব্যবহারে রাগ-করা চলে, কিন্তু ভুলে থাকা চলে না। কাজেই বন্দরে তাকে নিয়ে যা-ই ঘোঁট পাকানো চলুক, কয়েকবার তার ডাক পড়ল এখানে-ওখানে। বেশির ভাগই ম্যালেরিয়া। বাঁধা ভিজিট—দু-টাকা। গোত্রভেদ নেই, এম-বি, এল-এম-এফ সব এক-দর।

টাকার জন্য প্রশান্ত এখানে আসে নি, প্রাইভেট প্র্যাকটিসও তার উদ্দেশ্য নয়। তবু লক্ষ্য না করে পারা গেল না, তার চাইতে কম্পাউন্ডারবাবুর কদর বেশি—চারদিক থেকে তাঁরই ঘন ঘন ডাক আসে। কী ভিজিট নেন তিনিই জানেন, আইনত তাঁর এভাবে প্র্যাকটিস করার অধিকার আছে কি না তা নিয়েও তার মাথা ঘামাবার দরকার ছিল না। তবে তার দেখা অন্যান্য কম্পাউন্ডারদের চাইতে ভূপালবাবু কেন যে অনেক বেশি সচ্ছল, তার একটা উত্তর পাওয়া গেল। আরো চোখে পড়ল, আউটডোরের সাধারণ রোগীরাও যেন ডাক্তারের চাইতে তাঁর সম্পর্কেই বেশি ভক্তিমান, প্রায়ই তাঁকে একটু আড়ালে ডেকে নেয়, ফিসফিস করে কী-সব আলোচনাও চলে।

ও-সব দ্রষ্টব্য নয়, তবুও একটু ঘা লাগে ভ্যানিটিতে। হতে পারেন কম্পাউন্ডার অভিজ্ঞ লোক, অন্তত বছর-ত্রিশেক আছেন এই কাজের ভেতর, হয়তো অল্পবয়েসী ডাক্তারের চাইতে অনেক সময় বোঝেনও ভালো, কিন্তু—

পরক্ষণেই লজ্জিত হয় প্রশান্ত। শেষকালে কম্পাউন্ডারকে হিংসে করছে নাকি সে? আর যে-ভদ্রলোক তাকে এত স্নেহ করেন, সব দিক থেকে এত সাহায্য করছেন! ছি-ছি!

দুপুরে চন্দনাকে অঙ্ক করাচ্ছিল প্রশান্ত। দু-দিন ধরে আসছে মেয়েটা। অঙ্কে মাথা নেই তা নয়, আসলে অঙ্কটাকে ভালো লাগাতেই শেখে নি। ওর দোষ নেই, স্কুলে পড়ানোর জন্যেই এমনটা হয়।

কয়েকটা অঙ্কে চোখ বুলিয়ে বললে, 'বাঃ—এই তো বেশ হয়েছে। তবে এত ভয় কেন? মন নেই বলে?'

'ভালো লাগে না যে!'

'ভালো লাগাতে হবে।' —চন্দনার চোখের দিকে চোখ তুলে ধরল প্রশান্ত: 'তা হলে দেখবে, কোথাও কিছুই শক্ত নেই—মনের আনন্দেই সব আপনা থেকে সহজ হয়ে গেছে।'

মেয়েটা কী বুঝল কে জানে, মাথা নামিয়ে চুপ করে রইল। প্রশান্ত দেখল, হাতের আঙুলগুলো তার ছোট আর সরু সরু, আর্টিস্টের মতো। ইচ্ছে করলে মেয়েটা ছবি আঁকতে পারত। আর ছবির কথাটায় এই শামলা মেয়েটিকেই তার একখানা ছবি বলে মনে হল। পরনের নীল শাড়ি, রোগা

অথচ সুঠাম শরীরটি, সুন্দর মুখের ডৌল, ঘরের ভেতর রোদের আভা আর বাইরে টিনটিন করে টুনটুনির ডাক—সব মিলে একটা ছবিই তৈরি হল। আর সেই ছবিটার সঙ্গে সুর ছিল।

কিন্তু সুর কাটল। বাইরে সাইকেলের আওয়াজ।

'ডাক্তারবাবু!'

'আঃ!'—বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এল প্রশান্ত। গেঞ্জি গায়ে লুঙ্গিপরা একটি লোক সাইকেল হাতে দাঁড়িয়ে।

'আদাব ডাক্তারবাবু—' একটা চিঠি বের করে দিলে লোকটি।

নাম-ছাপানো প্যাডের চিঠি। 'মহম্মদ ইদ্রিস চৌধুরী। এম-এল-এ (এক্স)। মেম্বার, জেলা-বোর্ড। তিনদীঘি। জেলা—'

খুব মাননীয় লোক সন্দেহ নেই। আজ এই দিন-সাতেকের মধ্যে এ-ধরনের কোনো সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে তার দেখা হয় নি—পরিচয়ও হয় নি। বন্দরের বড়ো মহাজনেরা তো সবাই বোধ হয় তার ওপর রাগ করেই বসে আছেন। সসম্ভ্রমে চিঠিটা পড়ে ফেলল প্রশান্ত।

ইংরেজিতে লেখা। সে-ইংরেজি নির্ভুল নয়। তবু বোঝা যায়, এক্স এম-এল-এ সাধ্যমতো রাজভাষার চর্চা করে থাকেন।

চিঠিতে ছিল: 'আমার কন্যা খুব অসুস্থ বোধ করছে। অবিলম্বে চলে আসবেন। বিশ্বস্ত এম. আই. চৌধুরী।'

অর্থাৎ জরুরী কল।

কল আসুক—আড়াই মাইল দূরের জমিদারদের গ্রাম থেকে ডাক আসুক, তার মতো সুখের কথা আর কিছু নেই। কিন্তু প্রশান্ত খুশী হতে পারল না। ডাকটা অন্য সময় এলেই যেন ভালো লাগত।

'দাঁড়াও—আসছি।'

ঘরে ঢুকে ক্ষুন্ন গলায় প্রশান্ত বললে, 'চন্দনা, আজ আর পড়ানো হল না। জরুরী কল এসেছে। কিছু মনে কোরো না তুমি।'

'বা—রে, মনে করব কেন?'—চন্দনা হাসল: 'রোগী দেখতে যাওয়াই তো আগে দরকার।' বই-খাতা গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

'কাল এসো।'

'আসব।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রশান্ত জামা-কাপড় পরল, মথুর বারান্দায় ঘুমুচ্ছিল, তাকে ডেকে তুলে ঘরটা বন্ধ করতে বলল, বারান্দায় দাঁড় করানো ছিল সাইকেলটা—সেটা নামিয়ে নিয়ে রওনা হল লোকটির সঙ্গে।

ক'দিন খরার পালা চলছে এখন। মাঠের জল শুকিয়ে এসেছে, সদ্য-ওঠা ধানের শিষগুলো প্রায় বিষন্ন। দুপুরের রোদ চড়া হয়ে উঠেছে। প্রশান্ত একটা শোলার হ্যাট পরে নিয়েছে, মাথায় রোদ লাগছে না, কিন্তু তাপের ছোঁয়া লাগছে সারা গায়ে। পথটা শুকনো কাদায় দুর্গম, অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চালাতে হচ্ছে সাইকেল।

সঙ্গের লোকটিকে সে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী অসুখ হয়েছে ?'

লোকটি বলেছে, 'আমি কিছু জানি না হুজুর। চৌধুরীসাহেব আমাকে কেবল বললেন, এই খত নিয়ে সোজা সরকারী দাওয়াখানায় যা—বড়ো ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনবি।'

তা হলে ছোট ডাক্তারবাবুও একজন আছেন—তিনি নিশ্চয়ই কম্পাউন্ডার। ডাক্তার একটু হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাসতে পারল না—কোথায় একটা অস্বস্তি বিঁধতে লাগল মনে।

হাসপাতালের স্টকটা একবার মিলিয়ে নেওয়া উচিত ছিল।

মাইল দেড়েক জেলা-বোর্ডের রাস্তা পেরিয়ে ঘুরতে হল ডান দিকে। আরো প্রায় মাইলখানেক এখান থেকে। প্রশান্ত দেখল এই রাস্তাটা একটু ভালো, শুধু কাঁচা মাটির নয়—কোনো এক সময় খোয়াও ফেলা হয়েছিল।

'এও কি জেলা-বোর্ডের পথ নাকি ?'

'জী না।'—লোকটি হাসল : 'এটা তিনদীঘির চৌধুরীসাহেবরা করেছেন। আগে হাওয়া-গাড়ি চলত কিনা।'

'মোটর ? এখনো চলে ?'

'না জী, সে সব দিন আর নেই। অবস্থা পড়ে গেছে এখন।'

আবার নিঃশব্দে চলল দু-জন। চলতে চলতে প্রশান্ত দেখল, বড়ো বড়ো বাড়িতে ভাঙন ধরেছে, বিরাট মসজিদের গম্বুজগুলো কালো হয়ে এসেছে শ্যাওলায়। বোঝা গেল একসময় খুব সমৃদ্ধ ছিল এদিকটা, এখন অবস্থা পড়ন্ত। আরো একটু এগিয়ে বন্দরের সঙ্গে তিনদীঘির তফাতটা যেন তার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই অঞ্চলের এই দুটো গ্রামই সবচেয়ে নামকরা ; কিন্তু বন্দর বাড়ছে দিনের পর দিন; তার একতলা-দোতলাগুলো নতুন—এখানকার অতিকায় বাড়িগুলো জীর্ণ হয়ে আসছে ক্রমশ। মহাজন আর জমিদারের গ্রামের যা তফাত।

পুকুর, মসজিদ, বাগান। জালালী পায়রার ঝাঁক উড়ছে। এক জায়গায় নিচু প্রাচীরে ঘেরা কোনো পীরের সমাধি। একটা জীর্ণ একতলার সামনে কয়েকটা অস্পষ্ট অক্ষর : 'এতিমখানা'। ঘিঞ্জি নয়—খোলামেলা, দুরন্ত বাঁচানো আভিজাত্য—পরিচ্ছন্নতা দেখেই বোঝা যায় মুসলমানের গ্রাম। দু-একটা দালানের মাথায় রেডিয়োর এরিয়াল।

প্রকাণ্ড বাড়ি ইদ্রিস চৌধুরীর। বড়ো বড়ো থামওলা পুরোনো ধরনের দোতলা। সামনের উঁচু বারান্দায় সুপুরুষ এক বৃদ্ধ ইজিচেয়ারে শুয়ে গড়গড়া খাচ্ছিলেন। পাশে খানকয়েক চেয়ার, একটাতে কালো টুপি-পরা অল্পবয়েসী একজন বসে ছিল কেউ।

সাইকেল দুটো এসে থামতেই বৃদ্ধ গড়গড়া রেখে উঠে পড়লেন। নেমে এলেন সিঁড়ি বেয়ে। বুক পর্যন্ত সাদা দাড়ি উড়তে লাগল হাওয়ায়। সঙ্গের লোকটি সসম্ভ্রমে বললে, 'চৌধুরীসাহেব।'

সাদা দাড়ির ভেতর থেকে অভ্যর্থনার হাসি ফুটে উঠল : 'আসুন

আসুন—আদাব।'

'আদাব।'

সাইকেল থেকে ব্যাগ খুলে নিয়ে প্রশান্ত উঠে এল বারান্দায়। সমাদর করে ইদ্রিস চৌধুরী তাকে চেয়ারে বসালেন। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল প্রশান্ত। আর তাই দেখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন চৌধুরীসাহেব।

'এই—পাখা আন—পাখা আন—'

'না—না, কোনো দরকার নেই।'

'দরকার নেই কি, খুব আছে। এত দূর থেকে রোদ্দুরের মধ্যে এলেন! আলি—পাখা কই রে?'

'আনছি—' বলে প্রশান্তর সঙ্গের লোকটি এক-ছুটে ভেতরে গেল, পাখা নিয়ে এল। অল্পবয়সী ছেলেটি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিল, সে বললে, 'জোরে হাওয়া দে ভালো করে।'

অভ্যর্থনায় মিনিট কয়েক কাটল। ইদ্রিসসাহেব পাকা ভ্রূ-দুটো একসঙ্গে জড়ো করে একমনে দেখছিলেন প্রশান্তকে। বললেন, 'এম-বি ডাক্তার, অথচ একদম বাচ্চা ছেলে!'

সেই এক কথা। অল্প বয়সে ডাক্তার হওয়াটা যে কী বিসদৃশ ব্যাপার, এখানে এসে সেটা বার বার টের পাচ্ছিল প্রশান্ত। জবাব দিল না, উত্তরে অল্প একটু হাসল।

ইদ্রিসসাহেব ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন: 'আপনাদের দেখলেও আনন্দ হয়। মানুষ হয়েছেন, লেখাপড়া শিখেছেন। কিন্তু এখানকার হতভাগা-গুলোকে দেখুন একবার। সব বয়ে যাচ্ছে—সব গোল্লায় যাচ্ছে। বরাত!'

মিনিটখানেক চুপচাপ। তারপর চৌধুরীসাহেব বললেন, 'ডাক্তারবাবু, চা-পানির ব্যবস্থা করি একটু?'

'কিন্তু আমার পেশেণ্টকে তো আগে দেখা দরকার।'—প্রশান্ত জিগ্যেস করলে, 'তাঁর কী হয়েছে?'

'খুব অস্থির হয়ে পড়েছিল খানিক আগে। ওর মা আমাকে তো পাগল করে দিলে, বললে—এখুনি ডাক্তার আনতে পাঠান, আমার দিল ধড়ফড় করছে। তাই আলিকে পাঠিয়েছিলুম আপনার কাছে। একটু ভালো আছে এখন।'

'কী হয়েছে?'

'কী আর হবে?'—সামান্য একটু হাসলেন ইদ্রিসসাহেব: 'মা হবে—এই আর কি! তা প্রথমবার, ভাবনা-চিন্তা একটু হয়ই। আপনি দেখে যান একবার। তার আগে একটু চা—'

'চা পরে হবে, ডাক্তারের কাজটা আগে।'

'আচ্ছা, বেশ, একটু বসুন—' ইদ্রিসসাহেব ভেতরের দিকে চলে গেলেন। আলি তাকে বাতাস করতে লাগল, অন্য লোকটি তেমনি চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে রইলো নিঃশব্দে। দু-তিনটে পায়রা বারান্দায় উড়ে বসল এসে। ঘুঘুর ডাক শোনা যেতে লাগল কোথা থেকে।

ইদ্রিসসাহেব ফিরে এলেন মিনিট পাঁচেক পরে। বললেন, 'আসুন।'

সম্ভ্রান্ত মুসলমান-পরিবারের অন্তঃপুরে প্রথম পা দিল প্রশান্ত। দোতলার ঘরে প্রকাণ্ড উঁচু পালঙ্কে শুয়ে মেয়েটি। ঘর আবছা অন্ধকার—মোটা মোটা পর্দা টাঙিয়ে জানলা দিয়ে দুপুরের আভাটুক—বাইরের রোদটুকুও আসবার পথ বন্ধ করে রাখা হয়েছে—আবরুর তাগিদে। মেয়েটির মাথা থেকে পা পর্যন্ত চাদরে মুড়ি দেওয়া। এই অবস্থায় রোগীকে কীভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব, ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু এটা বোঝা গেল, চাদরের তলায় এই গরমে মেয়েটা যে নেয়ে উঠছে।

প্রশান্ত বললে, 'হাতটা—'

ইদ্রিস বললেন, 'হাতটা বের কর বেটী।'

চাদরের তলা থেকে ফর্সা একটি শীর্ণ ঘর্মাক্ত হাত বেরিয়ে এল। তাতে সোনার চুড়ি, আঙুলে আংটি, নখে মেহেদির রঙ। আন্দাজ করা যায়, চাদরের তলায় মেয়েটি সুন্দরী।

প্রশান্ত নাড়ী দেখল। সঙ্গে ব্লাডপ্রেসার দেখার যন্ত্রটা ছিল, তার প্রয়োজনে একটি বাহু পর্যন্ত বেরিয়ে এল।

কিন্তু তার পরেই মুশকিল। ফিটাসের পজিশনটা জানা দরকার।

সে-কাজ করতে গেলে পেটটা দেখতে হয়। কিন্তু চাদরের তলায় যেভাবে সন্তর্পণে মেয়েটির পর্দা রক্ষা করা হচ্ছে, তাতে সে-কথা বলতে গেলে অবস্থা কী দাঁড়াবে ডাক্তার বুঝতে পারল না। কপালে আবার তার ঘাম ফুটল।

তবু ডাক্তারের কাজ করতেই হবে।

গোটা তিনেক ঢোক গিলে প্রশান্ত বললে, 'তা হলে একবার পেট—'

ইদ্রিস চৌধুরী বললেন, 'ও আর কী দেখবেন —বেশ অ্যাডভান্সড। ওর মা বলছিল, ন'মাস পেরিয়ে গেছে।'

'বেবির পজিশনটা বোঝা দরকার ছিল।'

'ওর মা দেখেছে। বলেছে, ভাবনার কিছু নেই।'—চৌধুরীসাহেব হাসলেন।

মুহূর্তে বিরক্তিতে সমস্ত মুখ বিস্বাদ হয়ে গেল প্রশান্তর। পর্দা চাপা দেওয়ার নমুনা থেকেই আন্দাজ করেছিল সে। ডাক্তারই হও আর যেই হও, তুমি বাইরের লোক, তুমি পুরুষ। হাতটুকু যে দেখতে দেওয়া হয়েছে—এই তোমার পরম সৌভাগ্য।

প্রশান্তর মুখ থেকে বেরুতে চাইল: 'হাতটা তো ওর মা-ই তা হলে দেখে দিতে পারতেন, আমাকে ডেকে আনবার কী দরকার ছিল এখানে?' কিন্তু ডাক্তার ডাকাটাই বোধ হয় বড়লোকির নমুনা—পরীক্ষা করানো না করানোয় কিছু আসে-যায় না। ঠোঁটের পেশীগুলো তার শক্ত হয়ে উঠল একবার।

বললে, 'ঠিক আছে, আমার দেখা হয়ে গেছে, চলুন।'

হ্যাঁ, চলে যাওয়াই ভালো। মেয়েটির শরীর ভারী হয়ে গেছে, চাদরের ওপর থেকেও বোঝা যাচ্ছিল সেটা। একটা অসুস্থ মানুষকে অমন করে

গরমের মধ্যে আর যন্ত্রণা দিয়ে লাভ নেই।

'ভাবনার তো কিছু নেই?'—ইদ্রিসসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন। একটা বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে অধৈর্য চুড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল—অর্থাৎ মেয়ের মা-ও সংবাদটার জন্যে উৎসুক।

'না—সে-রকম কিছু মনে হল না।'

রোগী দেখার সংক্ষিপ্ত পালা চুকিয়ে প্রশান্ত আবার বাইরের বারান্দায় এসে বসল। চা এল, মিষ্টি এল। ভদ্রতায় এবং আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি ঘটল না কোথাও।

ইদ্রিস চৌধুরী গল্প-টল্প করলেন কিছুক্ষণ, এম-এল-এ হয়েছিলেন একবার, সে-কথা বললেন। কিন্তু তাঁর ভালো লাগে নি। বিস্তর তেল দিতে হয় মুসলীম লীগের কর্তাদের, তার ওপর টাকার শ্রাদ্ধ। এখন ছেড়ে দিয়েছেন। তবে লোকে ছাড়তে চায় না—তাই জেলা-বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত আছেন। ঋণ-সালিশী বোর্ডেরও চেয়ারম্যান ছিলেন কিছুদিন, কিন্তু কাজটা ফজলুল হক সাহেব ভালো করেন নি, অনেক নিরীহ মহাজনের বিস্তর ক্ষতি হয়ে গেল।

গল্প সেরে, পকেটে চার টাকা ভিজিট নিয়ে প্রশান্ত উঠল।

'শুধু একটা কথা ছিল চৌধুরীসাহেব।'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, বলুন।'

'পারেন তো শহর থেকে লেডি-ডাক্তার এনে মেয়েটিকে একবার দেখাবেন।'

ইদ্রিস চৌধুরীর কপালে ভাবনার ছায়া পড়ল: 'কেন বলুন তো ডাক্তারবাবু? চিন্তার কিছু দেখলেন নাকি?'

'না-না, সে-রকম কিছু না। তবু সব তো ওপর-ওপর দেখে বোঝা যায় না, সম্ভব হলে একজন লেডি-ডাক্তারকে দিয়ে একটু দেখিয়ে নেবেন।'

'আচ্ছা—আচ্ছা—ভেবে দেখি।'

শেষ আদাবের পালা মিটিয়ে প্রশান্ত সাইকেলে উঠল। আলি পথ দেখিয়ে সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, বারণ করল তাকে: 'দরকার নেই, আমি ঠিক চিনে যেতে পারব।' তারপর পুরোনো বাড়ি, বাগান, মসজিদ আর জালালী পায়রার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সে।

'আরে, ডাক্তারবাবু না? শুনুন মশাই—আরে শুনুন—'

প্রশান্ত ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। ধানের গোলা-সাজানো পাশের একতলা বাড়িটির সামনে দাঁড়িয়ে আর-এক ভদ্রলোক চিৎকার করে ডাকছেন তাকে। চিনতে দেরি হল না, নুরুদ্দীন চৌধুরী।

সাইকেল থেকে নেমে পড়ল সে।

নুরুদ্দীন এগিয়ে এলেন।

'আরে—হঠাৎ আমাদের এদিকে যে! কার বাড়িতে?'

'ইদ্রিস চৌধুরী সাহেবের।'

ওঃ—চাচার ওখানে ? তা কী ব্যাপার ?'—নুরুন্দীন কৌতূহলী হলেন : 'কার অসুখ ?'

'ওঁর একটি মেয়ে—মানে ফার্স্ট প্রেগনেন্‌সি—'

'বুঝেছি, লায়লা। তা বাচ্চা-ফাচ্চা হয়ে গেল নাকি ?'

নুরুন্দীনের কথার ভঙ্গিতে প্রশান্ত হেসে ফেলল। লোকটার সঙ্গে সেই আসবার দিন বিকেলে একটুখানি আলাপ কিন্তু পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই বেশ লেগেছিল। প্রাণখোলা সিধে জাতের মানুষ, দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন চিনে নেওয়া যায়।

'না, বাচ্চা হয় নি। একটু দেরি আছে।'

'তবু ভালো—' —নুরুন্দীন ভ্রূকুটি করলেন : 'এবার একটু সুমতি হয়েছে। বড়ো ছেলের বৌটাকে তো নিজের গোঁয়ারতুমির জন্যে মেরেই ফেললেন। ছেলেও রাগ করে কলকাতায় চলে গেছে, সেখানে এক পাঞ্জাবী মেয়েকে আবার বিয়েও করেছে, কিন্তু গ্রামে আর ফিরল না। কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি আর কথা হয় ডাক্তারবাবু ? আসুন না একবার গরিবখানায়, একটু বসে যান— চা খান।'

'চা আমি এক্ষুনি খেয়ে এসেছি।'

'আহা, তা তো খাবেনই। চাচা খানদানী বড়লোক—না খাইয়ে কি আর ছেড়ে দেবেন! তবে গতবারে ইলেকশনে দাঁড়িয়ে— হেরে গিয়ে বিস্তর টাকা গচ্চা দিয়ে একটু দমে গেছেন—এই যা। সে যাকগে, গরিবের বাড়িতে আর-এক পেয়ালা চা খেলে কোনো ক্ষতি হবে না আপনার—আসুন।'

নুরুন্দীন ছাড়লেন না—জোরে করে টেনে নিয়ে গেলেন ডাক্তারকে।

॥ সাত ॥

ডাক্তার সাইকেল নিয়ে আবার রাস্তায় পড়ল প্রায় ঘণ্টা-দেড়েক পরে। নুরুন্দীন বলেছিলেন, তিনি আড্ডাবাজ লোক—হাতে হাতে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। প্রথমেই ডাক্তারের বয়েস জেনে নিয়ে বললেন, 'আরে আমিও তো সাতাশ—একই বয়েস দেখছি আমাদের। তা হলে দোস্ত হওয়া যাক ?'

ডাক্তারের আপত্তি ছিল না। মৃদু হেসে রাজী হয়ে গেল সে।

সম্পর্কটা তৎক্ষণাৎ 'তুমি'তে নামল। তারপর প্রাণখোলা গল্প।

সেইসব গল্পের ভেতর দিয়ে অনেকগুলো খবর জানা গেল।

এই গ্রামে সাত-আট ঘর চৌধুরীর বাস—খুচরো শরিক আরো ছিলেন, তাঁরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছেন। গোড়াতে ছিলেন হাজী ইমদাদুল চৌধুরী—দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার তিনি। তাঁর পর থেকে সম্পত্তি ভাগ হতে আরম্ভ করল।—'জানো তো মুসলমানের সম্পত্তি—তাতে মুরগীরও হিস্‌সা থাকে। এখন অবিশ্যি লাখোপতি আর নেই, তবে জমি-জমা ধান-পান আছে —মোটের ওপর সকলেরই অবস্থা সচ্ছল।

'আরে থানা, ডিসপেনসারি সব তো এখানেই হওয়া উচিত ছিল। কেন হয় নি? তোমার মতো বুদ্ধিমান লোককেও কি সে-কথা বুঝিয়ে বলতে হবে? চৌধুরীদের আইন তো আর ইংরেজের হুকুমমাফিক চলত না—গায়ের জোরটাকেই তারা সেরা কানুন বলে জানত। যে-সব কাজ তারা করে বেড়াত, সে কি আর পুলিশের পছন্দ হত? ঘুষে অবশ্য অনেক কাজই হয়, তবু থানাটা একেবারে সামনে থাকলে—! হ্যাঁ, চৌধুরীদের চেষ্টাতেই থানা এক ধাক্কায় ছিটকে ওই হিন্দুস্থানীদের গঞ্জে চলে গেল।

'আর ডাক্তারখানা? ইংরেজের ওষুধ—সে তো হারাম! কে ব্যবহার করবে? তখন এখানে হেকিম ছিল, কবিরাজ ছিল। তাই ছিল শাস্ত্রসম্মত চিকিৎসা। শরিয়তের গ্রামে ইংরেজি ডাক্তারখানা হবে? চৌধুরীদের গায়ে একফোঁটা মুসলমানী রক্ত থাকতে—দলে দলে তাদের লাঠিয়াল থাকতে?

'বললে বিশ্বাস করবে না ডাক্তার, দশ বছর আগেও ইদ্রিস চৌধুরী ডাক্তারকে বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে দিতেন না। বড়ো ছেলের স্ত্রীর অসুখ করল, সাংঘাতিক অসুখ। কবিরাজী চিকিৎসা হল, আল্লার কাছে দোয়া করা হল। বড়ো ছেলে বললে, "ও-সবে কিছু হবে না, শহর থেকে ডাক্তার আনাও। যদি তা না হয়, তা হলে অন্তত গঞ্জের ডাক্তারখানায় খবর দাও।" ইদ্রিস চৌধুরী রাগ করে বললেন, "বেতমিজ বাঁদর কোথাকার—আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা।"

'বৌটা মারা গেল। ছেলে সেই যে দেশ ছাড়ল, এখনো ফেরে নি।'

শরিয়তের দেশ! নুরুদ্দীন বলেছিল, 'চৌধুরীদের ছেলেরা অনেকেই মদ ধরেছে। যাদের পয়সা আছে, শহর থেকে বিলিতি আনিয়ে নেয়; যাদের নেই, তাদের সরকারী দোকানের ধেনো থেকে চোলাই মদ, তাড়ি, সব চলে। খারাপ রোগ গিজগিজ করছে। গরিবের ঘরের মেয়েদের আগে তো ইজ্জত বাঁচানোই দায় ছিল —তারপর জেলায় এক কড়া ম্যাজিস্ট্রেট এসে বি-এল কেসে কয়েকটাকে জেলে পোরবার পর উৎপাত একটু কমেছে এখন। ভালো লোক নেই তা নয়—আঙুলে গোনা যায়। ভালো ছেলে যারা, তারা শহরে লেখাপড়া শিখে সেখানেই চাকরি-বাকরি করে, উকিল-মোক্তারও আছে দু-একজন।

'যাই হোক, এখন এখানে তোমার খুব ডাক পড়বে ডাক্তার। চৌধুরীদের হেকিমি-কবিরাজের নেশা কেটেছে। তা ছাড়া খারাপ রোগ আছে, ইনজেকশনও নিতে হবে।

'আর তোমার বন্দর? ওদের কথা ছেড়ে দাও। ধান-পাটের গন্ধে শকুনের মতো উড়ে এসেছে সব। বালিয়া থেকে, গোরখপুর থেকে। টাকা ছাড়া আর মাথায় কিছু নেই। আগে তিনবেলা এসে চৌধুরীদের জুতো চাটত—এখন তাদের মহাজন হয়ে বসেছে। দুটো গ্রামই জঘন্য, ডাক্তার, এখানে ভদ্রলোক টিকতে পারে না।'

একটু চুপ করে থেকে নুরুদ্দীন বলেছিল, 'ডাক্তার, তোমার সঙ্গে দু-দিনের আলাপ। কিন্তু কেমন ভালো লেগে গেল, দোস্ত বানিয়ে বসেছি।

যদি রাগ না করো, একটা কথা বলি।'

'বলো, রাগ করব না।'

'তোমার ওই কম্পাউন্ডারবাবুটি—মানে ওই ছোট ডাক্তারবাবু, ওর ওপরে একটু নজর রেখো।'

প্রশান্ত চমকে উঠল : 'সে কি! ওঁকে তো খুব ভালো লোক—'

'ভালো লোক তো বটেই—নইলে পনেরো বছর এখানে আছে, বদলি হয় না কেন?' নুরুন্দীন হেসে উঠল : 'রামরতন প্রসাদের এত নেকনজর কেন ওর ওপর? এই সেদিনও ত্রিশ বিঘে ধানী জমি কিনল কী করে? এত প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সুযোগ এখানে—কিন্তু কোনো ডাক্তার এসে এখানে টিকতে চায় না কেন? কেন লোককে বলে বেড়ায়—ডাক্তাররা আর কী চিকিৎসা জানে—তারা তো খসখস করে কাগজে সই দিয়েই খালাস। ওষুধ দেওয়া, ব্যান্ডেজ বাঁধা—সবই তো কম্পাউন্ডার করে।'

গলার ভেতরে কিছু-একটা আটকে ধরেছে, এইরকম অনুভূতি নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেছিল প্রশান্ত। তারপর বলেছিল, 'তোমার বোধ হয় একটু অন্যায় সন্দেহ আছে লোকটির ওপর। আমি কিন্তু কাছ থেকে দেখছি। আমার ধারণা, ভূপাল বাগচী মানুষ মন্দ নন।'

নুরুন্দীন হেসেছিল একটু।

'তা হতে পারে ভাই, সব মানুষেই তো ভুল করে। যাই হোক, একটু সাবধানে থেকো। এই জায়গাগুলো একেবারেই ভালো নয়।'

তার পরেই প্রশান্ত বেরিয়ে পড়েছিল।

তিনদীঘির রাস্তা ছাড়িয়ে জেলা-বোর্ডের সড়ক। আবার সেই শুকনো কাদায় ভরা গোরুর গাড়ির চাকায় এবড়ো-খেবড়ো পথ। পাশ দিয়ে গ্রামের মানুষ, গাড়ি, সাইকেল, কখনো বা দুটো-একটা ঘোড়ার আনাগোনা। ভরা বর্ষা নামলে এদিকে বোধ হয় সাইকেল অচল, তখন গরুর গাড়ি আর ঘোড়াই ভরসা।

বিকেলটা সুন্দর, কিন্তু ডাক্তারের মন ভারী হয়ে গিয়েছিল। তিনদীঘির কাহিনী শুনে সে বিশেষ বিচলিত হয় নি, বন্দর সম্পর্কেও বিশেষ আশা সে রাখে না—শ্যামরতনবাবুকে দেখেই অনেকটা আন্দাজ করেছে সে। কিন্তু কম্পাউন্ডার—

মরুকগে, তার কী! তার মেয়াদ তো বড়ো জোর আর মাসখানেক। কোনোমতে ঠেকো দিয়ে চলে যাবে। তবু একটা যন্ত্রণা তাকে বিদ্ধ করছে ক্রমাগত। ভূপালচন্দ্র বাগচী সম্বন্ধে এ-সব কথা কোনোমতেই তার মন মেনে নিতে চাইছে না। নুরুন্দীন একটু বেশি কথা বলে—হয়তো বাড়িয়েই বলেছে কথাটা। আর ডাক্তার সম্পর্কে কম্পাউন্ডারের কম্প্লেক্স! ওটা বোধ হয় একটু থাকেই—স্বাভাবিক কারণেই হয়তো থাকে। দরকারমতো ডাক্তারের এক-আধটু নিন্দে-মন্দও করতে হয় বইকি, না হলে প্র্যাকটিসই বা জমে কী করে।

ঘরের ভেতর মেঘ ঘনাচ্ছিল। তবু সেই মেঘ আলো করে একটা ছবি ফুটে উঠল। আজ দুপুরেই চন্দনা একটা সুরে বাঁধা ছবি হয়ে গিয়েছিল।

সন্ধ্যার পর দারোগা এসে হাজির।

'কী মশাই, আপনার যে টিকিও দেখা যায় না। কেমন আছেন এখানে?'

প্রশান্ত হাসল: 'খুব ভালো।'

'হ্যাঁ, এরিয়াটা মন্দ না।'—বি-এ পাস দারোগা বললেন, 'ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউডস্ ইগ্নোব্ল স্ট্রাইফ! তা একা একা বসে কী করছেন এই সন্ধ্যাবেলায়? মশা তাড়াচ্ছেন?'

মশা তাড়াচ্ছিল না প্রশান্ত। একটু আগে চন্দনা গান গাইছিল—সেই সুর তার কানে আসছিল, বিকেলবেলাকার সেই যন্ত্রণাটা আবার চমকে উঠছিল তার মনে। তারপর গান থামলে প্রাণপণে চেষ্টা করছিল একটা ডাক্তারী বইয়ের ভেতরে মন দেবার। এমন সময় দারোগা এলেন।

'একটু পড়তে চেষ্টা করছিলুম।'

'ধুত্তোর, রেখে দিন আপনার পড়া। কত পড়বেন আর? তার চেয়ে চলুন আমার ওখানে। একটু আড্ডা দেওয়া যাক।'

গ্রেপ্তার করেই নিয়ে গেলেন থানায়। অর্থাৎ থানার লাগাও নিজের কোয়ার্টারে।

বসবার ঘরে একটা টেবিলে লণ্ঠন জ্বলছিল। টেবিলের দু-দিকে দুখানা কালো-হয়ে-যাওয়া পুরোনো চেয়ার। একটা ছোট কাঠের শেল্ফ আছে এক-দিকে, তাতে কিছু মাসিক পত্রিকা আর ডাঁই-করা খবরের কাগজ। ঘরের ডান দিকে দেওয়াল ঘেঁষে নিচু তক্তপোশ, সুজনি পাতা তার ওপর। আর দুটো ছোট ছোট তাকিয়া।

দারোগা বললেন, 'আসুন আরাম করে বসা যাক এই তক্তপোশে। নিন, ঠেসান দিন তাকিয়ায়। তামাক চলে?'

'নাঃ!'

'দূর মশাই, কোনো কাজের নন আপনি। আগের ডাক্তার তো এসেই ডাক ছাড়তেন: 'কই দারোগাসাহেব, গয়ার তামাক কোথায়? বুড়ো মানুষ মন্দ ছিলেন না, কিন্তু খিটখিটে—ডিসপেপটিক হলে যা হয়।'

প্রশান্ত হাসল, জবাব দেবার কিছু ছিল না।

দারোগা আবার বললেন, 'আপনি মশাই, ভারি আন্সোশ্যাল। পাত্তাই পাওয়া যায় না আপনার।'

'আপনারাও তো ব্যস্ত লোক।'

'তা যা বলেছেন। বিরাট থানা—মস্ত এরিয়া, মাইল-বারো দূরে একটা ডাকাতি কেসের এনকোয়ারি নিয়ে খুব ঝঞ্ঝাট যাচ্ছে। আপনাকে একদিন বিরিয়ানি পোলাও খাওয়াবার ব্যবস্থাই করা গেল না, অথচ আপনি আমার জেলার লোক। কিন্তু তা হলেও আপনার মশাই আর একটু সামাজিক হওয়া

উচিত—বাইরে আপনার বদনাম রটে যাচ্ছে এ-ব্যাপারে।'

দারোগা হালকাভাবেই কথাটা বললেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উৎকর্ণ হল প্রশান্ত।

'বদনাম মানে?'

'এই বন্দরের দিকে যান-টান না—কারো খোঁজ-খবর নেন না—'

সেই কথা—দারোগাও কম্পাউন্ডারেরই প্রতিধ্বনি করছেন। ঝাঁ করে রাগ চড়ে গেল মাথার ভেতরে।

'আমার কাজ রোগীর চিকিৎসা করা, আড্ডা দিয়ে ঘুরে বেড়ানো নয়। ওঁদের অসুখ-বিসুখ করলে—ডাকলে নিশ্চয় যাব। কিন্তু অকারণে কাজ-কর্ম ফেলে মহাজনদের গদিতে গিয়ে বসে থাকতে হবে নাকি?'

কথার ঝাঁঝটা লক্ষ্য করলেন দারোগা।

'ইউ আর রাইট, নিশ্চয় এ-কথা বলতে পারেন। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানেন? আমরা যারা পাবলিক সার্ভেন্ট—আমাদের একটু সোশ্যাল হতেই হয়। ওটাও আমাদের ডিউটি। এক-এক সময় ঘুরতে ঘুরতে সাইকেল নিয়ে না-হয় চলেই গেলেন, একটু কুশল-টুশল নিলেন—'

হঠাৎ প্রশান্তর মনে হল, এই কথাটা বলবার জন্যেই যেন দারোগা তাকে ডেকে এনেছেন, যেন সাবধান করে দিতে চাইছেন তাকে। হঠাৎ তার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত আগুন ধরে গেল।

'পাবলিক সার্ভেন্ট আমরা নিশ্চয়, কিন্তু বন্দরের মহাজনদের সার্ভেন্ট নই।'

আশ্চর্য হয়ে দারোগা একবার তাকালেন ডাক্তারের দিকে, একবারের জন্যে ঝকঝক করে উঠল তাঁর চোখ। কিছু-একটা বলতেও যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বাইরে থেকে ডাক এল: 'দারোগাসাহেব!'

দারোগা উঠে বসলেন তৎক্ষণাৎ। গলা বাড়িয়ে বললেন, 'আসুন—আসুন—'

ঘরে ঢুকলেন তিনজন। কম্পাউন্ডার, পোস্টমাস্টার, মোটা চেহারার আর একজন ভদ্রলোক—কান পর্যন্ত তাঁর বিশাল ছড়ানো গোঁফ। চোখ কুঁচকে মোটা লোকটি একবার চাইলেন ডাক্তারের দিকে।

কম্পাউন্ডারই কথা বললেন প্রথম।

'আরে স্যার, আপনি এখানে?'

জবাব দিলেন দারোগা: 'ধরে এনেছি। বই মুখে করে বসে ছিলেন।'

ছাপোষা পোস্টমাস্টার শুকনো মুখে বিবর্ণ হাসি হেসে বললেন, 'ডাক্তারবাবুর সব খবর ভালো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, চলছে একরকম।'

প্রকাণ্ড গোঁফের মোটা ভদ্রলোক কোনো কথা বললেন না। ঘড়-ঘড় শব্দে একটা চেয়ার সরিয়ে নিয়ে বসে পড়লেন। দারোগা লক্ষ্য করলেন সেটা। বললেন, 'আরে ওঁকে বুঝি চেনেন না ডাক্তারবাবু? উনি বন্দরের কাপড়ের মহাজন—বাবু মহাবীরপ্রসাদ।'

সর্দি-বসা ভারী গলায় মহাবীরপ্রসাদ বললেন, 'উনি হামাদের চিনেন না,

কিন্তু হামরা ওঁকে চিনি। নমস্তে।'

'নমস্তে।'

হঠাৎ কেমন অস্বস্তি বোধ করল প্রশান্ত। একসঙ্গে এই তিনটি লোকের আবির্ভাব—নিশ্চয়ই আকস্মিক একটা ব্যাপার নয়, উদ্দেশ্য কিছু আছেই। এর ভেতরে নিজেকে ভারি অবাঞ্ছিত মনে হল তার।

'দারোগাসাহেব, আমি বরং আজ উঠি। আপনার বোধ হয় কাজ-টাজ—'

'আরে মশাই, কাজ! আপনিও যেমন।'—দারোগা হা-হা করে হেসে উঠলেন: 'কাজ মানে তো পাশার আড্ডা। আমার যেদিন হাঁফ ছাড়বার সময় থাকে, সেদিন আমরা এই চারজনে পাশায় বসে যাই। কোনোদিন আমার এখানে, কোনোদিন পোস্ট অফিসে, কোনোদিন কম্পাউন্ডারের বাসায়, আর মহাবীরজীর ডেরায় যেদিন যাই সেদিন তো রাজভোগ খেয়ে আসি।'

গোঁফে চাড়া দিয়ে মহাবীর বললেন, 'না-না, সে-সব কিছু না। একটা লাড্ডু কি একটা পটলি। দারোগাসাহেব বাড়াইয়ে বলছেন।'

'সে যাক মশাই, বিনয়ে পারবেন না ওঁর সঙ্গে।'—দারোগা বললেন, 'ডাক্তারবাবুর পাশা চলে তো? তা হলে আজই পাঁচ নম্বর মেম্বার হিসেবে আপনাকে রিক্রুট করা যাক। আমার জন্যে প্রায়ই এঁদের লোক কম পড়ে।'

পাশায় প্রশান্তর আপত্তি ছিল না। কিন্তু এই মহাবীরপ্রসাদ, এই কম্পাউন্ডারবাবু, এঁদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে 'বারো পাঞ্জা সতেরো' নিয়ে চিৎকার করার কথা ভাবতে তার কেমন খারাপ লাগল। সত্যিও বলল না, মিথ্যাও বলল না, প্রশান্ত পাশ কাটিয়ে গেল।

'মাপ করবেন, পাশা-টাশা আমার সুবিধে হবে না।'

'আপনি মশাই একেবারে হোপলেস!'—দারোগা হতাশভাবে বললেন, 'শুধু ডাক্তারীই শিখলেন, আর কোনো কাজেই লাগলেন না। তা হলে বসুন, চা খান, আমাদের খেলা দেখুন।'

'তার চেয়ে কোয়ার্টারে গিয়ে একটু পড়াই যাক বরং। একটা ইন্টারেস্টিং কেস এসেছে হাতে। যদি অনুমতি করেন—'

'আরে চা-টা—'

'হবে আর-একদিন। কাল সন্ধ্যায় আছেন তো? আমি আসব।'

'তাই আসবেন তবে।'—দারোগা বললেন: 'দারুণ বেরসিক আপনি। কিন্তু আমরাও সহজে ছাড়ছি না, আপনাকে ঠিক পাশার দলে কনভার্ট করে নেব।'

'আচ্ছা—' মৃদু হাসল প্রশান্ত। তারপর বেরিয়ে এল। যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, কম্পাউন্ডার তক্তপোশের ওপর পাশার ছক বিছোতে শুরু করে দিয়েছেন।

॥ আট ॥

এখানকার ডাক্তারখানায় থাকা উচিত নয়, তবু কী করে পুরোনো শেলফটার ভেতরে বইটা চলে এসেছে। আগেকার কোনো ডাক্তার কিনেছিলেন খুব সম্ভব, শখ করেই।

ডাক্তারী বই, কিন্তু গোয়েন্দা-কাহিনীর চাইতেও চমকপ্রদ। বিখ্যাত রাকস্টন মার্ডার কেস। লোকটি জাতিতে ভারতীয়, নাম রুস্তমজী, ইংল্যাণ্ডে গিয়ে হয়েছিল রাকস্টন। পেশায় ছিল ডাক্তার। স্ত্রী এবং মেড্‌কে হত্যা করে তাদের শরীর টুকরো টুকরো করে কেটে বহুদূরের এক নদীর ভেতরে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত আর নির্বিঘ্ন হতে চেয়েছিল। কিন্তু ধরা পড়ল লোকটা। ধরা পড়ল, ডাক্তারী বিদ্যার দৌলতেই। অমনভাবে টুকরো টুকরো করে যে কাটতে পারে, অ্যানাটমি-বিদ্যায় সে নিপুণ। অতএব খুঁজতে খুঁজতে রাকস্টন।

ব্যাপারটা যতই বিকট হোক, আসল কৃতিত্ব হল তদন্তের। টুকরো টুকরো শরীর, হাড়ের অংশ, করোটি, এইসব জুড়ে দুটি নারীর শরীর রি-কন্‌স্ট্রাক্‌ট্‌ করা হয়েছিল যেভাবে, সেইটেই হল এর আসল আকর্ষণ। এদিক থেকে বইটি অসাধারণ।

এ-ধরনের বীভৎস কাহিনী, সত্যই হোক আর কাল্পনিকই হোক, প্রশান্তর ভালো লাগে না। গোয়েন্দা-কাহিনী তার কাছে অত্যন্ত অরুচিকর—এক শারলক হোম্‌স আর ফাদার ব্রাউন ছাড়া। কিন্তু বইটার ডাক্তারী বিশেষত্বই প্রশান্তকে আকর্ষণ করেছিল। দারোগার ওখান থেকে ফিরে এসে, বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে, টিপয়ের ওপর লণ্ঠন রেখে সে বইটাতেই মন দিলে। একটু আগে যে ডাক্তারী বইখানা সে নাড়াচাড়া করছিল, সেটার পাতা ওলটাবার জন্যে আর সে উৎসাহ বোধ করছিল না। একটু অন্য ধরনের কিছুই পড়া যাক।

'আদাব ডাক্তারসাহেব, আসতে পারি?'

প্রশান্ত রাকস্টন নামিয়ে চেয়ে দেখল। না—নুরুদ্দীন নন। আর-একজন ভদ্রলোক, তিনদীঘিরই হবেন। সাজ-পোশাক দেখেই বোঝা গেল, অবস্থা ভালো। গায়ে তসরের কোট। রং কালো, ভারী চেহারা, বয়েস পঞ্চাশ ছাড়িয়ে। চপর-চপর শব্দে পান চিবুচ্ছিলেন, একটা চাপা মিষ্টি গন্ধ আসছিল, হয়তো পান থেকে, হয়তো আতর মেখেছেন, তা থেকে।

প্রশান্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আদাব।'

'আমি তিনদীঘি থেকে আসছি।'

'আসুন আসুন—' অভ্যর্থনা করল প্রশান্ত। একটা ছাড়া চেয়ার ছিল না, সেইটে তাঁর দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, 'বসুন।'

তিনি বসলেন না, বললেন, 'আপনি তিনদীঘি গিয়েছিলেন? ইদ্রিস চৌধুরীর ওখানে?'

'আজ্ঞে। কিন্তু কিছু বলেছেন নাকি চৌধুরীসাহেব?'—নুরুন্দীনের কথাগুলো মনে পড়তে একটু অস্বস্তি বোধ করল প্রশান্ত।

'না, তিনি কিছু বলেন নি। নুরু আপনার খুব প্রশংসা করছিল। আমার ভাগনে হয় সে সম্পর্কে।

'ও!'

একটু চুপ করে থেকে ভদ্রলোক বললেন, 'একটু প্রাইভেট কথা আছে আপনার সঙ্গে। কলই দিতাম, কিন্তু বাড়িতে—সে যাক, ঘরের ভেতরে চলুন একবার।'

'কথা এখানেই বলতে পারেন, কেউ নেই।'

'না, শুধু কথা নয়। একটু পরীক্ষা করতে হবে আমাকে।'

ব্যাপারটা আন্দাজ করল প্রশান্ত। নুরুন্দীনের আরো কতগুলো কথা মনে পড়ে গেল তার।

'আসুন তবে।'

ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল, পরীক্ষা করল ভদ্রলোককে। সিফিলিস।

কী করে হল, রোগীকে এ-সব প্রশ্ন জিগ্যেস করা উচিত নয়। প্রশান্তও করল না। কিন্তু নিজের অপরাধের সাফাই গাইবার জন্যেই চমৎকার একটি কৈফিয়ত দিলেন তিনি।

'আর বলবেন না, বুড়ো বয়েসে একটা বিয়ে করে—'

'এই রোগ নিয়ে বিয়ে করলেন আপনি? না সারিয়ে? আর একটা নিরীহ মেয়ের সর্বনাশ হয়ে যাবে যে!' চুপ করে থাকবে ভেবেও প্রশান্ত নিজেকে সামলাতে পারল না।

ভদ্রলোক হাসলেন। তসরের কোটের পকেট থেকে রুপোর পানের ডিবে বের করলেন একটা। একটা পান মুখে পুরলেন, তারপর ডিবেটা এগিয়ে ধরলেন প্রশান্তর দিকে।

গা ঘিনঘিন করে উঠল প্রশান্তর। বললে, 'আমি পান খাই না।'

'খান না? তবে থাক।'—নিশ্চিন্তে আর-একটা খিলি মুখে পুরে, তেমনিভাবে সুগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে ভদ্রলোক বলে চললেন, 'আমি সর্বনাশ করব কী, বিবিই আমার সর্বনাশ করেছে, ডাক্তারবাবু।'

'মানে?'

'মানে—এ-রোগ তাঁর কাছ থেকেই আমি পেয়েছি।'

নোংরা আবহাওয়াটা আরো নোংরা হয়ে গেল। প্রশান্ত যেন প্রথমটায় নিজের কানকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারল না।

'কী বললেন?'

'ঠিকই বলছি ডাক্তারবাবু।'

'তা হলে আপনি বলতে চান—' প্রশান্ত একটা ঢোক গিলল, 'আপনার বিবি—'

'হ্যাঁ, ক্যারেকটার খারাপ।' অকুণ্ঠস্বরে ভদ্রলোক বললেন, 'ভাবছি,

তালাক দেব।'

কিছুক্ষণ থ হয়ে বসে রইল প্রশান্ত। তারপর শুকনো ঠোঁটের ওপর একবার জিভ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'কিছু যদি মনে না করেন—'

'না, মনে করব কেন। কী জিগ্যেস করবেন, বলুন।'

'কত বয়েস হবে আপনার স্ত্রীর ?'

'তা—তা এই তেরো-চোদ্দ হবে।'

'তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ের এই রোগ !'—প্রশান্তর মাথা ঘুরতে লাগল।

'বলবেন না মশাই—' ভদ্রলোক বিষন্ন হয়ে গেলেন: 'দিনকালই খারাপ হয়ে গেছে এখন। গুনায় ছেয়ে গেছে চারদিক। পাকী ইস্‌মতী—পবিত্র সতীত্ব আর এ-দেশে—'

প্রশান্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কতকক্ষণ। অখিলেশ সেনগুপ্ত ঠিকই বুঝেছিল। পচ ধরেছে একেবারে গোড়া পর্যন্ত। ফ্রেন্ড্‌স, ইউ কা'ন্‌ট্‌ মেন্‌ড্‌ ইট, ইউ আর টু এন্‌ড্‌ ইট !

প্রশান্তকে চুপ করে থাকতে দেখে আরো উৎসাহ পেলেন ভদ্রলোক। বলে চললেন, 'দেখুন দিকি, পরের দোষে শেষকালে বুড়ো বয়েসে আমার—'

'বিয়ে করেছেন কতদিন ?'

'তা মাস-ছয়েক হবে।'

আর-একবার চমকালো প্রশান্ত। শুধু চমকালো না—মনে হল, পায়ের ডগা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত তার অসহ্য ঘৃণায় জ্বালা করে উঠেছে। ছ'মাস অথচ এই ভদ্রলোকের রোগ অন্তত দু-বছরের পুরোনো !

পৃথিবীতে মানুষের পাষণ্ডতার সীমা নেই—কিন্তু এ বুঝি সবকিছুকে ছাপিয়ে যায়। ভদ্রলোকের বয়েস পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে, অবস্থা ভালো, লেখা-পড়াও নিশ্চয় কিছু জানেন। অথচ, কত অবলীলাক্রমে মেয়ের বয়সী স্ত্রীর ওপর এই কদর্য কলঙ্কটা চাপিয়ে দিলেন। আবার সেই স্ত্রীকে তালাক দেবার কথাও ভাবছেন ! রাক্‌স্‌টন মার্ডার কেস এর কাছে তো অতি সুকোমল নিষ্পাপ ব্যাপার।

প্রশান্ত কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ভদ্রলোকের দিকে। সরল, অনাসক্ত মুখ। অত্যন্ত পরিতৃপ্তভাবে পান চিবিয়েই চলেছেন। এই সময় যদি তার হাতের কাছে একটা চাবুক থাকত—

একটু সময় লাগল নিজের জান্তব ক্রোধটা সামলে নিতে। তারপর প্রশান্ত বললে, 'স্ত্রীকে তালাক দেবেন না—তাঁর বোধ হয় দোষ নেই। তার আগে নিজের চিকিৎসা করান।'

'কিন্তু ইস্‌মতীই যদি না থাকে—'

'কিছু মনে করবেন না, রোগ আপনার পুরোনো।'

পান চিবুনো বন্ধ করলেন ভদ্রলোক। গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'তা হলে আপনি বলছেন—'

'ডাক্তারের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। রোগ আপনি নিজেই

এনেছেন।'

'আমি? তোবা—তোবা!'—যেন আকাশ থেকে পড়লেন ভদ্রলোক: 'কী করে হল?'

'আপনিই জানেন।'

কাটা-কাটা কথার ভঙ্গিতে ভদ্রলোক এবার একটু থতমত খেলেন: 'তা হলে বোধ হয়—সেই যেবার কলকাতায় গিয়েছিলাম, কোনো পাবলিক ইয়ে থেকে—ও-সবেও তো হয়, কী বলেন ডাক্তারবাবু?'

হ্যাঁ, মিথ্যার ছলনা দিয়ে চাপা দিতে গেলে ও-রকম এক-আধটা সম্ভাবনা ভাবলেও ক্ষতি নেই। হোক না লাখে একটি, কিন্তু ডাক্তারীশাস্ত্রে তারও অনুমোদন আছে। প্রশান্তর আর এই কদর্যতার জের টানতে প্রবৃত্তি হল না।

'তা হতে পারে। কিন্তু বিনা-দোষে বিবিকে দুঃখ দেবেন না।'

'আপনি যখন বলছেন, তখন মানতেই হবে সে-কথা।'—ভদ্রলোক যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন: 'কিন্তু এর একটা ব্যবস্থা করে দিন। এই বয়েসে এমন একটা খারাপ রোগ নিয়ে—তোবা, তোবা! তা ছাড়া বেড়েই যাচ্ছে ক্রমশ, কষ্টও হচ্ছে—'

'দেখুন, এর ট্রিটমেণ্ট এখানে হবে না। আপনি শহরে যান, ভালো করে চিকিৎসা করান।'

'আপনি ইন্‌জেক্‌শন-টন দিয়ে—'

'না, ও-সব হাতুড়ে চিকিৎসার কাজ নয়। নেগলেক্ট করবেন না, চলে যান। নইলে পরে ফল মারাত্মক হবে। আর শুনুন, ট্রিটমেণ্টটা আপনার স্ত্রীরও করাবেন।'

'হুঁ, দেখি।'—একটা নিঃশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, দশ টাকার নোট একটা এগিয়ে দিলেন প্রশান্তকে। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, 'দেখুন, কথাটা কাউকে—'

এই লোকটারও লজ্জা আছে তা হলে! গলা ফাটিয়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল প্রশান্তর।

তার বদলে শুকনো গম্ভীর মুখে সে বললে, 'আমরা কাউকে বলি না। ওটা আমাদের প্রোফেশনের নিয়ম।'

'চলি তা হলে ডাক্তারবাবু—আদাব—'

কদর্য, কদর্য! ভদ্রলোকের নামটাও জানা হল না, কিন্তু তার জন্যে আপসোস নেই প্রশান্তর। তাঁর একটা বিশ্রী রোগ হয়েছে, সেজন্যেও রাগ করতে পারে না—সাধারণ মানুষ সবাই শুকদেব হয় না। কিন্তু কী অদ্ভুত কাপুরুষতা—কী কুৎসিতভাবে নিজের ছেলেমানুষ স্ত্রীর মুখে একমুঠো কালি মাখিয়ে দিলেন!

'ইউ আর নট্ টু মেন্ড্ ইট—ইউ আর টু এন্ড্ ইট।' শিকড় পচে উঠেছে। এখন উপড়ে ফেলাই দরকার। কিন্তু কীভাবে?

বারান্দায় বসে বসে একটু একটু ঝিমোচ্ছিল প্রশান্ত, কিন্তু আবার ডাক এল। এবারে মথুর।

'কী রে?'

'তুলো-আইডিন কিছু আছে এখানে?'

'না তো। কেন, কেটে গেল নাকি কোথাও?'

'আজ্ঞে না, আমার নয়। যাকগে, জল-টল দিয়েই ধুয়ে ফেলি বরং।'

'কার ধুয়ে ফেলবি?'—প্রশান্ত বিরক্তি বোধ করল: 'তুইও কম—' সামলে নিয়ে বললে, 'তুইও ডাক্তার হলি নাকি? কার কেটেছে?'

'আজ্ঞে আমার কাকার।'

'কোথায় সে?'

'কাকা, এসো এখানে—' মথুর ডাকল। বারান্দার নিচে কোথায় ছায়ার ভেতরে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা, মথুরের ডাক শুনে আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে এল।

রোগা আধবুড়ো লোকটার ঠোঁটের একদিক দিয়ে রক্ত পড়ছে একটু একটু —ফেটে গেছে ওখানে। কপাল ফুলে আছে অনেকটা। লণ্ঠনের লালচে আলোতেও প্রশান্ত বুঝতে পারল খুব মার খেয়েছে লোকটা।

'নাম কী তোমার?'

'আজ্ঞে ছিকিষ্ট।'

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। প্রশান্ত বললে, 'মারলে কে?'

ছিকিষ্ট নিরুত্তর। ধৈর্যচ্যুতি হল প্রশান্তর। চটে বলল, 'কথার জবাব দিচ্ছ না যে? মারলে কে?'

লোকটা তবু কথা বললে না, কেবল জিভ দিয়ে ঠোঁটের রক্ত চেটে নিলে একবার। উত্তরটা এবার দিলে মথুর।

'বাবু, কাকা ছোট দারোগার বাসায় কাজ করে।'

তার মানে, থানার এ-এস-আই। কিন্তু ডাক্তারের চাইতেও যেমন কম্পাউন্ডারের প্রতাপ বেশি, তেমনি দারোগার চাইতেও জমাদার আরো দুর্ধর্ষ হবেন এইটেই স্বাভাবিক। বুঝতে বাকি রইল না প্রশান্তর।

'তিনিই পিটিয়েছেন? কী করেছিলে?'

সহজে কথা বেরোয় না ছিকিষ্টর। অনেক কষ্টে আদায় করা গেল ব্যাপারটা। কয়েকটা বাসন ধুতে যাচ্ছিল কুয়োতলায়। জায়গাটা অন্ধকার ছিল, পিছল ইঁটে পা হড়কে গিয়েছিল তার। হাত থেকে পড়ে গেল বাসন-গুলো। গোটা কয়েক চায়ের পেয়ালা আর কাচের গেলাস গেল ভেঙে। তার পরেই জুতো-পেটা এবং যদিও মাস শেষ হয়েছে, তবু মাইনে না দিয়ে পত্রপাঠ বিদায়।

এইটেই নিয়ম। তবু প্রশান্ত বিরস স্বরে বললে, 'নালিশ করবে?'

'এজ্ঞে?'—কাটা ঠোঁট নিয়ে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো ছিকিষ্ট।

'নালিশ করোগে দারোগাবাবুর কাছে। দরকার হলে আমি সাক্ষী দেব।'

মথুর বললে, 'আজ্ঞে জমাদারবাবুর নামে নালিশ দারোগাসাহেবের কাছে ?'

তা ঠিক। এ যেন ঢোঁড়া সাপের তাড়া খেয়ে ব্যাঙের আশ্রয় খোঁজা কেউটে সাপের গর্তে।

হতাশ চোখ মেলে বিষন্ন জ্যোৎস্নায় ছাওয়া মাঠের দিকে একবার চাইল প্রশান্ত। তারপর মথুরকে বললে, 'তুই চাবি নিয়ে ডিসপেনসারি খোল। যা হয় ড্রেস করে দে।'

এ-সব কাজ মথুর জানে। খুশী হয়ে বললে, 'আজ্ঞে।'

প্রশান্ত বসে রইল চুপ করে। বিশ্রী একটা গরম লাগছে হঠাৎ। মনে হল, এখন বেশ হত ঝমঝম করে এক পশলা বৃষ্টি নামলে।

॥ নয় ॥

'এদিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিলে দ্বার—'

সকালে ঘুম ভাঙতেই এই গানের কলিটা যে কেন তার মনে হল প্রশান্ত বুঝতে পারল না। অথবা হয়তো পূর্ব সংস্কারেই মানুষ টের পায়।

সাধারণত বরাবরই খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠা তার অভ্যাস। কিন্তু এ-ক'দিন সকালে ঘুম ভাঙলেও সে ইচ্ছে করেই বিছানা ছাড়ে নি—অনেক-ক্ষণ পর্যন্ত এপাশ-ওপাশ করেছে, পাখিদের ডাক শুনেছে, ভোরের হাওয়ায় বুক ভরে বাইরের ঘাস-মাটি-ধানের গন্ধ নিয়েছে। তারপর মথুর চা নিয়ে এলে, জানলা দিয়ে ঘরে রোদ পড়লে, শুয়ে শুয়েই চা খেয়েছে।

তারপর উঠে পড়া। তারপর দিনের কাজ।

কাল রাতে, ঘন নিবিড় ঘুমের মধ্যেও, কোথাও একটা নড়া দাঁতের মতো, শরীরের কোথাও ছোট্ট একটি ফোড়ার মতো কেমন একটা বিরক্তিকর চেতনা থেকে থেকে ভেসে উঠতে চাইছিল। নুরুদ্দীনের কথাগুলো কম্পাউন্ডার সম্পর্কে ? কিন্তু সে তো প্রায় মন থেকে ঠেলেই দিয়েছে—তার চাকরি আর এক মাসের জন্যে, এ-সব দুর্ভাবনায় কী লাভ ? কালকে থানার সেই মার-খাওয়া লোকটা ? কিন্তু তাতেই বা মনখারাপ করবে কেন ? নইলে সেই কদর্য লোকটা—যে নিজের ব্যাধি স্ত্রীর নামে—

একটা নড়া দাঁতের মতো, একটা বিষিয়ে-ওঠা ফুসকুড়ির মতো চেতনাটা রাত্রে ছিল, কিন্তু সকালবেলায় ডাক্তারের মনে হল, আজ একটা আশ্চর্য দিন ফুটে উঠতে যাচ্ছে। কোথায় যে কী ঘটবে, একটা নতুন গান বাজবে, একটা নতুন ফুল ফুটবে কোনোখানে। সেই আশ্চর্য প্রত্যাশার ঢেউ তার বুকের মধ্যে বাজতে লাগল, বাইরে পাখির ডাকগুলো যেন নতুন একটা অর্থ বয়ে আনল :

'আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার—'

ঘর থেকে বেরিয়ে এল দরজা খুলে। আলো ফুটতে দেরি আছে এখনো। বাইরে ফিকে অন্ধকার, কাকের বুকের মতো তার রঙ। দু'একটা

সাদাটে রেখা দেখা দিচ্ছে আকাশে, তার কোলে নিভন্ত শুকতারা। ডাক্তারখানার টালির চাল এখনো লাল হয়ে ওঠে নি, তার কাচের জানলাগুলো চিকচিক করছে। বকুলগাছ দুটোর মাথাগুলো এখনো কালো, সেখানে পাখিদের কোলাহল।

সামনের পথটা দিয়ে পায়চারি করছিল প্রশান্ত। 'এদিন আজি কোন্ ঘরে গো—'। আলো জাগে নি এখনো, মানুষের ঘুম এখন ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসছে। এখনো সব সুন্দর, সব শান্ত, সব গভীর। তার পরে দিন আসবে, কাজ আসবে, স্বার্থপরতা আসবে, কুশ্রীতা আসবে, সন্দেহ দেখা দেবে। কিন্তু এখনো মনের মধ্যে ভোঁরোর সুর বাজছে। এখনো সুন্দর কোনো সম্ভাবনা আছে একটা, কোনো ফুলের, কোনো গানের, এখনো গুনগুন করে মন বলবে ঃ 'কার হৃদয়ের মাঝে হল, কাহার মালা গাঁথা—'

চলতে চলতে কখন প্রশান্ত কম্পাউণ্ডারবাবুর বাসার সামনে এসে পড়েছিল। এইবার সে দেখতে পেল। তার সমস্ত চেতনা চকিতে গুঞ্জন করে উঠল ঃ এই তো—এরই জন্যে। ভোরে ঘুম ভাঙবার আগে এই খবরটাই তার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল।

চন্দনা।

কম্পাউণ্ডারের বাসার সামনে বাখারির বেড়া দেওয়া ছোট্ট একটি বাগানের মতো। তাতে কিছু কিছু ফুল ফোটে, কয়েকটা শাক-সবজিও আছে। সেই বাগানটির মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল চন্দনা। তার চোখ শুকতারার দিকে।

প্রশান্ত ডাকল ঃ 'চন্দনা!'

চন্দনা চমকে ফিরে তাকালো। তখনো কাকের বুকের মতো ফিকে রঙের অন্ধকার। তবু চন্দনার চোখ উজ্জ্বল। নিভন্ত শুকতারার আলো পড়েছে সেখানে।

মনে হল, এই ভোরে, এই চোখ দুটি নিয়ে কিশোরী মেয়েটি এমন করে দেখা দেবে—তার সব প্রত্যাশা এরই জন্যে অপেক্ষা করে ছিল, এই আবির্ভাবটুকুর জন্যে। সূর্য ওঠবার আগে ঊষা। একটা নতুন দ্বার খুলবে, আলো আসবে, তারই শুভ সূচনা মুহূর্তটির জন্যে।

বাগান থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল চন্দনা। কাছে এসে দাঁড়ালো।

'এত ভোরে উঠেছেন যে!'

'ঘুম রোজ ভোরেই ভাঙে। আলসেমি করে ওঠা হয় না।'

একটু চুপ করে রইল চন্দনা। তার সেই আশ্চর্য চোখের দৃষ্টি মেলে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে রইল প্রশান্তর দিকে। তারপর বললে, 'খুব অদ্ভুত কিন্তু।'

'অদ্ভুত কেন?'

চন্দনা মাথা নামালো।

'আমার সকালে উঠেই মনে হচ্ছিল, আজকের দিনটায় সকলের আগে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।'

'কেন বলো তো?'

'জানি না। ঘুম থেকে উঠে আপনার কথাই মনে হচ্ছিল কেবল।'

বুকের ভেতরে ছোট্ট একটুখানি ঢেউ উঠল প্রশান্তর।

'আমিও ঠিক এইরকম একটা-কিছু ভাবছিলুম।'

'সত্যি ?'

'সত্যি।'

'দাঁড়ান, তা হলে আগে একটা প্রণাম করি আপনাকে।'

'প্রণাম ? কেন ?'

'বলছি।'—চন্দনা একটু হাসল, তারপর গলায় আঁচল দিয়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করল প্রশান্তকে। পায়ের ওপর কয়েকটি আঙুল আর একমুঠো চুলের স্পর্শ লাগল।

উঠে দাঁড়িয়ে চন্দনা বললে, 'আজ যে আমার জন্মদিন।'

আবার সেই দোলাটা দেখা দিল প্রশান্তর বুকের ভেতরে। ঝিনঝিন করতে লাগল রক্ত। এই জন্যেই। এই জন্যেই আজকের সকালটা এমন করে সুরে-সৌরভে-অর্থে ভরে উঠছিল।

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন না ?'

'আশীর্বাদ ? নিশ্চয়—করতে হবে বইকি।'

তার পরে যা ঘটল তার জন্যে প্রশান্ত বিন্দুমাত্রও তৈরি ছিল না। অথবা সেই প্রথম দিনটি থেকে, প্রথম দেখার সেই মুহূর্তটি থেকে—ওই চোখ দুটি তিলে তিলে তাকে এই ভোরটির জন্যে তৈরি করে আনছিল—প্রশান্ত নিজেও তা জানতে পারে নি। চকিতে একবার চারদিকে চেয়ে দেখল সে, কোথাও কেউ নেই—সে আর চন্দনা ছাড়া যেন এই লগ্নটির জন্যেই পৃথিবী সম্পূর্ণ নির্জন হয়ে আছে। হঠাৎ দু-হাত বাড়িয়ে দিলে প্রশান্ত, সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত, চকিত একটি নরম ছোট শরীরকে টেনে আনল বুকের ভেতর, এক হাতে কোমল মুখখানাকে তুলে ধরল, তারপর নিজের ঠোঁট দুটি পলকের জন্যে চেপে ধরল চন্দনার ঠোঁটে।

থরথর করে কেঁপে উঠল মেয়েটা।

অস্পষ্ট ধরা গলায় প্রশান্ত তার কানে কানে বললে, 'আজ এই আশীর্বাদই আমার রইল।'

কখন হাত আলগা হয়ে গেল, কখন বুকের ভেতর থেকে সরে গেল পাখির মতো কাঁপন-ধরা শরীরটুকু—প্রশান্ত জানতেও পারল না। তার পরে দেখল, চন্দনা নেই।

প্রশান্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। রক্তে তখনো ঝংকার বাজছিল, তবু হঠাৎ কানের কাছে কে যেন গর্জন করে উঠল ঃ 'এ কী হল—এ তুমি কী করলে প্রশান্তদেব লাহিড়ী! আইডিয়ালিস্ট তুমি—তুমি ভালো ছেলে—জনসাধারণের সেবা করবার জন্যে এম বি.পাস করেও ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের চাকরি নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিলে! অথচ তোমার চেয়ে এগারো-

বারো বছরের ছোট, একটি সাধারণ গ্রামের মেয়ের বিশ্বাসের সম্মানটুকু রাখতে পারলে না। ছি ছি, এত ইতর তুমি, এত ইতর!'

মনে হল, সেই সহপাঠী অখিলেশ সেনগুপ্তর গলা—আজো বুঝি সে ইংরেজের জেল থেকে খালাস পায় নি!

দ্রুত পা চালিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল প্রশান্ত; ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারটায়।

কী হল, এ কী হল! সাত-আট দিনেরও পরিচয় নয়, আর এর মধ্যেই অসংকোচে এতদূর এগিয়ে গেল সে! অগ্রপশ্চাৎ ভাবল না, পরিণাম চিন্তা করল না—হঠাৎ এইরকম একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটিয়ে বসল। জন্মদিনের সকালে মেয়েটি কী অসীম বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা নিয়ে তাকে প্রণাম করতে এসেছিল, এক মুহূর্তে সে তার সব বিষিয়ে দিলে! যে-সুরে আর গন্ধে সকালটা ভরে উঠতে যাচ্ছিল—কালি আর নোংরা ছিটিয়ে কী কুৎসিতভাবে সে তার সবটুকু নষ্ট করে ফেলল!

চেয়ারে প্রশান্তর শরীর শক্ত হয়ে গেল। কী ভাবছে চন্দনা, কী করছে এখন? বাড়িতে গিয়ে বলে দিয়েছে তার মাকে, তার বাবাকে? চকিতে ঘামের বিন্দু ফুটে উঠল তার কপালে। হয়তো এখনই এসে হাজির হবেন কম্পাউণ্ডার, জানতে চাইবেন, এ ব্যবহারের অর্থ কী—প্রশ্ন করবেন, মনে মনে এইরকম একটা জঘন্য উদ্দেশ্য ছিল বলেই কি সে উপযাচক হয়ে চন্দনাকে অঙ্ক শেখাতে চেয়েছিল?

তার জীবনের আশপাশ দিয়ে এর আগে মেয়েরা যে আনাগোনা করে নি তা তো নয়। সেই দূর-সম্পর্কের মেয়েটি—যার সঙ্গে মা তার বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তার চোখ এখনো তার মনে আছে; সে-দৃষ্টির অর্থ বোঝে নি, এত ছেলেমানুষ প্রশান্ত ছিল না। আর কলকাতার সেই সুন্দরী নীরা চ্যাটার্জি—

'প্রশান্তবাবু, পুরুষেরা শুধু দূরের দিকেই চেয়ে থাকে। সামনের কিছু তারা দেখতে পায় না।'

অন্তত প্রশান্ত দেখেছিল, তবুও ইচ্ছে করেই সে দেখে নি। তার সময় ছিল না—মনও না। কিন্তু—কিন্তু আজ—

অ্যাকসিডেন্ট? বিজ্ঞানের ছাত্র প্রশান্ত জানে জগতে আকস্মিক বলে কিছু নেই—সব একটা অনিবার্য কার্য-কারণে বাঁধা আছে। তারও মন এই দুর্বল মুহূর্তটার জন্যে তিলে তিলে তৈরি হচ্ছিল, তাই—। কিন্তু চন্দনা? কী ভাবল চন্দনা?

'বাবু?'

দারুণভাবে চমকে উঠল প্রশান্ত। কম্পাউণ্ডার?

না—মথুর। চা নিয়ে এসেছে। প্রশান্তকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল সে।

'এত ভোরেই যে আজ উঠেছেন বাবু?'

শুকনো হাসি হেসে প্রশান্ত বললে, 'এমনিই ঘুম ভেঙে গেল।'

তারপর জানলা দিয়ে সূর্যের প্রথম আলো পড়ল ঘরে, পথে লোকজনের সাড়া উঠল, একটু একটু করে দিনের শুরু হয়ে গেল। প্রশান্ত তৈরি হল, জলখাবার খেল, বেরিয়ে গেল ডিসপেনসারিতে। প্রতিদিনের মতো হাসিমুখে দেখা দিলেন কম্পাউণ্ডার। কিন্তু প্রশান্ত তাঁর দিকে আর চাইতে পারল না।

কাজের পর কাজ—রোগীর ভিড়। সময়ই ছিল না কোনো দিকে তাকাবার। একটির পর একটি প্রেসক্রিপশন লিখতে হয়, আগের ওষুধ রিপিট করতে হয়। থেকে থেকে আত্মগ্লানি জাগে, এত অসুখ, এত দুঃখ—কী প্রতিকার, কতটুকু প্রতিকার তার সম্ভব এই চ্যারিটেবল ডিসপেনসারিতে? যৎসামান্য ওষুধ—চিকিৎসার নামে মানুষগুলোকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া কী আর সার্থকতা আছে এর? যারা মরবার তারা মরবেই, শুধু মরবার আগে জেনে যায়, তাদেরও ডাক্তার দেখেছিল, তাদেরও চিকিৎসা হয়েছিল।

প্রতিদিনের এই গ্লানির ভেতরে আজ আর একটা লজ্জা চমক দিচ্ছিল ঘন ঘন। বিশ্বাসঘাতকতা—একটি সরল সহজ গ্রামের মেয়ের মনে আর শরীরে সেই অশুচিতার স্পর্শ বুলিয়ে দেওয়া। সম্ভাবনায় ভরা এমন একটা সুন্দর ভোরকে সে নিজের হাতে হত্যা করে বসবে—এমন একটা ভাবনা স্বপ্নেও কি কোথাও ছিল প্রশান্তর? কম্পাউণ্ডার কাজের ফাঁকে ফাঁকে যতবার কাছে আসছিলেন, প্রত্যেকবারই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে আসতে চাইছিল তার। হয়তো কিছুই জানেন না—হয়তো ছোট ভীরু মেয়েটা এই বিশ্রী লজ্জার কথাটা মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারে নি, কিন্তু নিজের কাছ থেকে সে পালাবে কী করে! সেখানে কার কাছে কী কৈফিয়ত সে দেবে!

দুপুরবেলা খেতে বসে দেখল, মথুর কোথা থেকে এক বাটি পায়েস নিয়ে এসেছে।

'এ কি রে!'

'ও-বাড়ির মা দিলেন। আজ দিদিমণির জন্মদিন।'

আজ হয়তো এটা হাতে করেই নিয়ে আসত চন্দনা। কিন্তু সে আসেনি। প্রশান্ত জানে, সে আর আসবে না।

মথুর কী বুঝল সে-ই জানে। বলল, 'দিদিমণি আজ আর এল না। বললে তার লজ্জা করছে। মা বকলেন, মেয়ে যেন আজ একেবারে আকাশ থেকে নেমে এসেছে হঠাৎ। কিন্তু দিদিমণি এল না।'

চন্দনা আর আসবে না।

খাওয়ার একবিন্দু স্পৃহা কোথাও আর ছিল না। কিন্তু হঠাৎ মনে হল, মথুর কিছু-একটা ভাবতে পারে। চামচে করে একটু পায়েস তুলে নিল। তার বিশেষ স্বাদ ছিল, সুগন্ধ ছিল। কিন্তু প্রশান্তর মুখে তা বিশ্বাস-ঘাতকতায় কটু হয়ে গিয়েছিল।

তা হলে চন্দনার মা-ও জানেন না। জানলে এমন করে পায়েস পাঠাতেন না।

মথুর দুঃখিত হয়ে বললে, 'সেকি বাবু, আর খেলেন না? মা দুঃখ

পাবেন যে।'

'আমার শরীরটা ভালো নেই।'

দুপুরে একটু একটু মেঘ দেখা দিল আকাশে। প্রশান্ত জানলা দিয়ে দেখতে লাগল, মাঠে ছায়া পড়েছে, হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে উঠেছে বকুলগাছ দুটো। বাইরে লোক চলছে না—ঠিক প্রতিদিনের মতো একটা নিঃসঙ্গতা নেমে এসেছে চারপাশে। ঠিক এই সময়েই চন্দনা আসে অঙ্ক কষতে। আজ এল না। হয়তো জন্মদিন, হয়তো আজ পড়তে নেই—না, চন্দনা আর আসবে না।

প্রশান্ত নিঃশ্বাস ফেলল। একটা কাজ করা যায়? বলা যায় কম্পাউন্ডারকে ঃ 'আপনার মেয়েটিকে আমি বিয়ে করব?' স্বজাত, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ—হয়তো আটকাবে না। আর ভূপালবাবুও তো মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ের হিসেবমতো মেয়েটি তো এখন অরক্ষণীয়া।

কিন্তু বলা যায়? অথবা বলতেই হবে। অশুচি স্পর্শ দেবার পর এখন চন্দনাকে বিয়ে করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই তার নেই।

বৃষ্টি হল না—সারা দুপুর মেঘের ছায়া আনাগোনা করে গেল, ঠাণ্ডা হাওয়া বইল, কিন্তু সারা শরীরে অদ্ভুত জ্বালা করতে লাগল তার। প্রশান্ত উঠে বসল। দুটো মোটা মোটা ডাক্তারী বই নিয়ে পড়বার চেষ্টা করল, এক লাইনেরও কোনো অর্থবোধ হল না। জ্বরের যন্ত্রণা শরীরে বয়ে দুপুর গড়িয়ে গেল প্রশান্তর।

বিকেলে ডিসপেনসারিতে কাজ ছিল না, আজ রবিবার। বারান্দায় চেয়ার টেনে বসে রইল সে। ভোরে শুকতারা দিয়ে তার দিনটা শুরু হয়েছিল—কী সম্ভাবনা ছিল তাতে। এখন মেঘের ছায়ায় সূর্য ডুবল, পরাভূত পীড়িত মন নিয়ে প্রশান্ত ভাবতে লাগল, আজকের উজ্জ্বল নির্মল সূর্যোদয়কে নিজের হাতেই খুন করেছে সে।

ঘোড়ার শব্দ। জেলা-বোর্ডের রাস্তা দিয়ে ঘোড়সওয়ার আসছে একজন। চেনা-চেনা মনে হল। তারপর ঘোড়াটা বাঁক নিলে ডিসপেনসারির দিকে। নুরুদ্দীন চৌধুরীই বটে।

দূর থেকেই ডাকল ঃ 'ও ডাক্তার!'

'এসো—এসো।'

নুরুদ্দীন নেমে পড়ল। ঘোড়াটাকে বাঁধল বারান্দার কাঠের খুঁটিতে। চেয়ার ছেড়ে দিয়ে প্রশান্ত বললে, 'বোসো ভাই।'

'তা তো বসব। কিন্তু চেয়ার যে একটাই।'

'আনছি।'

মথুরের একটা জলচৌকি ছিল, সেইটেই নিয়ে এল প্রশান্ত। হাত থেকে সেটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল নুরুদ্দীন।

'দাও—ওটাতে আমি বসছি।'

'আরে না না—'

'রাখো ডাক্তার, বেশি বোকো না। তুমি তো আমাদের মেহমান হে। তোমাকেই আমাদের খাতির করা দরকার। বোসো চেয়ারটায়—এই চৌকিতেই আমার বেশ হবে।'

'তা হলে বরং ঘরের তক্তপোশে—'

'আরে ধ্যাৎ—এই সন্ধ্যেবেলায় ঘরের ভেতরে বসতে বয়ে গেছে।'—সংক্ষেপে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিলে নুরুন্দীন।

প্রশান্ত বললে, 'চা খাবে?'

'উঁহু, চায়ের মুড নেই। আরো কড়া দরকার এখন।'

'মানে?'

'মানে আবার কী?'—নুরুন্দীন হাসল: 'দোস্ত বলে স্বীকার করে নিয়েছ, শুনলে চটতে পারবে না। তোমার এখান থেকে যাব বন্দরের দিশি মদের দোকানে। দুটো ষাটের বোতল কিনতে হবে।'

'ওঃ—তোমারও চলে!'

'ব্রাদার, এক-আধটু। কী করব বলো, সঙ্গদোষে অভ্যেস করে ফেলেছি। তবে মাতাল নই, দুটো বোতলে আমার এক হপ্তা কুলিয়ে যায়। রাগ করলে?'

'না—রাগ করব কেন? তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি খাবে।'

'দোস্ত, তুমি জানো না, বন্দরের গাঁজা-মদের দোকানের ইনকাম কী! ওই কালীচরণ গাউ এখানকার অনেক জমিদার-মহাজনকে কিনতে পারে। তিন-দীঘি কিংবা বন্দরের আঙুলে গোনা দু-চারজন ছাড়া প্রায় সব মিঞাই ওখানে পায়ের ধুলো দেন, কেউ লুকিয়ে, কেউ হাফ-লুকিয়ে। বদনাম হয় কেবল ছোটলোকের, দেহাতী তুরী-ওরাওঁ-সাঁওতালদের। আমরা তো আছিই—একদম খোলাখুলি, লুকো-ছাপা নেই।'

'আচ্ছা নুরুন্দীন, তোমাদের তো শরিয়ত-মানা গ্রাম। মদ খেতে ইসলামে বারণ নেই?'

নুরুন্দীন হা-হা করে হেসে উঠল: 'হুঁ, ইসলামের সবই তো মেনে চলছি আমরা। লোকের উপকার করছি, সত্যি কথা বলছি, পরের জন্যে সব খয়রাত করছি, জাকাত দিচ্ছি! নমাজ-রোজা আর এক হজ করে আসতে পারলেই সব চুকে গেল—সব গুনাহ্ চাপা পড়বে তার তলায়। তোমাদের হিন্দু বামুনেরা যেমন ধর্মের ধ্বজা। আরে, শহরের বিদ্যেধরীপাড়ায় সেদিন একজন মেয়েমানুষের দালালি করছিল, দেখলুম ইয়া মোটা পৈতে তার গলায়। কিছু ভেবো না হে—হিন্দু-মোসলমান সব ভাই-বেরাদার—ধর্মটার দরকার হয় দাঙ্গা করা আর পয়সা নেবার বেলায়। কী, রাগ হল?'

প্রশান্ত হাসতে লাগল: 'না, রাগ হয় নি। আরো অনেক অপ্রিয় কথা বলতে পারতে, ভদ্রতা করে থেমে গেলে।'

'যেতে দাও ভাই, আদার ব্যাপারি আমরা। ও-সব ব্যাপারে পুরুতে-মোল্লার বুঝবে। কাজী নজরুল খুব জুতিয়েছেন ওদের, তা গণ্ডারের চামড়া!'

'নজরুলের কবিতা পড়েছ নাকি?'

'আরে, খুব ভালো আবৃত্তি করতুম ইস্কুলে। নাম ছিল হে—ডাক্তার। কিন্তু ম্যাট্রিকটা ফেল করে সব বিগড়ে গেল। এখন জমিজমা, মামলা-মকদ্দমা নিয়ে আছি, গোল্লায় গেছি একেবারে।'

'তা একটু আবৃত্তি করো না নজরুল। মনে আছে?'

'মনে আছে, কিন্তু থাক।'—হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল নুরুদ্দীন: 'সব এলোমেলো হয়ে গেছে ভাই। শহরে পড়বার সময় এক হিন্দু মেয়ের প্রেমে পড়লুম—আমাদেরই উকিলবাবুর মেয়ে। সতেরো-আঠারো বছর বয়সে—এঁচোড়ে-পাকাও ছিলুম একটু, কিন্তু দুনিয়ার ঘোর-প্যাঁচ কি ছাই জানি! ও-তরফ থেকেও যে এক-আধটু সাড়া আসে নি তা নয়—মেয়েটা ভারি ভালো ছিল হে। কিন্তু উকিলবাবু বাবাকে চিঠি লিখলেন, আর বাবা শহরে গিয়ে কষে চটিপেটা করলেন আমাকে: "বদমাশ, লিখতে পড়তে পাঠিয়েছি, না আশনাই করতে?" সব ভেস্তে গেল। সেই দুঃখেই ম্যাট্রিক ফেল করলুম, চোখের সামনে মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেল। নেমন্তন্নও করেছিল, যাই নি। আর সেই থেকে ঠিক করেছি, আর কোনোদিন কবিতা পড়ব না, কবিতা আওড়াব না—ঘোড়ার ডিম!'

অন্য সময় হলে এই গল্পে হেসে উঠত প্রশান্ত, বাপের চটিপেটা খেয়ে প্রেমের এই যবনিকা-পতন ভারি উপাদেয় বলে মনে হত তার। কিন্তু আজ সে হাসতে পারল না। কম্পাউণ্ডার যদি তাকেও চটি নিয়ে তাড়া করে আসেন, একটা কথাও তার বলবার নেই।

'ভোলো মোর গান, কী হবে লইয়া
এতটুকু পরিচয়,
আমি শুধু তব কণ্ঠের হার
হৃদয়ের কেহ নয়—'

বিড়বিড় করে নজরুলের ক'টা লাইন আবৃত্তি করল নুরুদ্দীন। তারপর থেমে গিয়ে আবার বললে, 'ঘোড়ার ডিম!'

কিছুক্ষণ চুপ। সন্ধ্যা ঘন হয়ে এল। দু-একটা তারা ফুটল মেঘের ফাঁকে। মথুর এসে বললে, 'আলো আনব বাবু বারান্দায়?'

নুরুদ্দীন বললে, 'না, থাক।'

মথুর চলে গেল। তখন নুরুদ্দীন ডাকল: 'ডাক্তার?'

'হুঁ।'

'তোমার পসার হবে না এখানে।'

'কেন হে?'

'তুমি কী বলে এসেছ ইদ্রিস চাচার ওখানে গিয়ে?'

আর-এক জগতে ফিরে এল প্রশান্ত। স্থূল, কর্কশ একটা বাস্তবতার মধ্যে। চকিত হয়ে বললে, 'কেন—কী হয়েছে? অন্যায় কিছু বলি নি তো।'

'লেডি-ডাক্তার দেখাবার পরামর্শ দিয়েছ নাকি?'

সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ চোখে ডাক্তার নুরুদ্দীনের দিকে তাকালো: 'দিয়েছিই

তো। পুরুষ-ডাক্তারকে ওঁরা ডেকে নিয়ে যাবেন—অথচ ভালো করে দেখাবেন না। তার চেয়ে লেডি-ডাক্তারকে কন্‌সাল্‌ট্‌ করাই তো ভালো।'

'তোমার মাথায় কিছুই নেই—একদম নিরেট। আরে—এরা কি চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার ডাকে? টাকা দিতে হয়—মান বাড়ে, তাই ডাকে। তোমাকে জেনানামহলে নিয়ে গেছে—এই তোমার সাত-পুরুষের ভাগ্যি। বাইরে থেকে হাওয়া শুঁকে ওষুধ দিতে বলে নি—তোমাকে এতখানি খাতির করেছে ইদ্রিস চাচা। তাতে আবার তুমি লেডি-ডাক্তারের শলা দিয়ে এসেছ। তার মানে তুমি ডাক্তারী কিছুই জানো না। আমাদের ছোট ডাক্তারবাবু তো তিনদীঘিতে গেলে গাঁয়ে ঢোকবার আগেই রোগ ঠাওরাতে পারেন। ডাক্তার, এখানে তোমার পসার হবে না, কোনো আশা নেই।'

রাগে ফোঁস ফোঁস করে উঠল প্রশান্ত।

'প্র্যাকটিসে আমার দরকার নেই এখানে। যত কুসংস্কার—যত ইডিয়সি—'

'ডাক্তার, এদের ওপর রাগ করে কোনো লাভ নেই। ও হল খেপে গিয়ে পাথরে মাথা ঠোকা, তাতে শেষ পর্যন্ত নিজের কপালটাই ভাঙে।'

'ডাগদরবাবু!'

আলোচনা থেমে গেল। বরকন্দাজ-চেহারার হিন্দুস্থানী একজন।

নুরুন্দীন বললে, 'এ যে দেখছি রামরতনজীর পাইক। কী খবর হে জগলাল?'

'হুজুর ডাগদরবাবুকে বোলাইছেন।'

প্রশান্ত সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে উঠল। সে উপযাচক হয়ে বড়ো মহাজন আর ডিসপেনসারি-কমিটির মাননীয় ব্যক্তিটির পদবন্দনা করে নি, তাই কি এই এত্তেলা পাঠানো?

কর্কশ স্বরে প্রশান্ত বললে, 'ডেকেছেন কেন?'

'বাড়ি মে বিমার আছে।'

'কার বিমার?'

'হামি জানি না।'

একটা জিনিস লক্ষ্য করল প্রশান্ত। আলী হোক, জগলাল হোক, এখানকার পাইক-বরকন্দাজেরা সবাই আশ্চর্য রকমের স্বল্পবাক্। হুকুমের অতিরিক্ত একটা কথাও তাদের মুখ থেকে জানবার জো নেই।

নুরুন্দীন বললে, 'তা হলে ওঠো ডাক্তার, তোমার কল এসেছে।'

হ্যাঁ, কল এসেছে। আর কল এলে যেতেই হবে—ডক্‌টরস্‌ ডিউটি। প্রশান্ত বললে, 'ঠিক আছে, তুমি যাও। আমি একটু পরেই আসছি।'

'কেত্‌না দেরি হোবে?'

'পনেরো-বিশ মিনিট।'

'তো ঠিক আছে। কোঠী মালুম আছে তো ডাগদরবাবু? শিউ-মন্দিরকে বগলমে যো বড়াসা—'

'আমি চিনে নেব। তুমি যাও।'

অভিবাদন করে লোকটা চলে গেল। নুরুন্দীন উঠে দাঁড়ালো।

'তা হলে চলি ডাক্তার, দুটো ঘাটের বোতল কিনতে হবে এখন আমাকে। পরে আসা যাবে আবার।'

'নিশ্চয় আসবে। তুমি এলে আমার ভালো লাগে।'

'আমার বকবকানিতে মাথা ধরে না?'

'না—এখানে তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু।'

নুরুন্দীন একটু আশ্চর্য হল ডাক্তারের গলার স্বরে। কথা বলল না, একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে। তার মুঠোর মধ্যে উত্তপ্ত আন্তরিকতার অকৃত্রিম স্পর্শ পেল প্রশান্ত। তার পরেই নুরুন্দীন নেমে গেল, ঘোড়া খুলল, এক লাফে টক করে চেপে বসল তাতে, টগবগিয়ে ছুটিয়ে এগিয়ে গেল বন্দরের দিকে।

বিস্বাদ মন আরো কটু করে দিয়েছিল ইদ্রিস চৌধুরীর প্রসঙ্গটা। অত্যন্ত বিরক্তি এবং ক্লান্তি নিয়ে প্রশান্ত বন্দরে গিয়ে পৌঁছুল। রামরতনের বাড়িটা চেনাবার কোনো দরকার ছিল না, এর আগেই বন্দরে এসে বাড়িটাকে লক্ষ্য করে গিয়েছিল সে, দেখেছিল তার মস্ত গদি, তার বিশাল ধান-চালের আড়ত।

সেই জগলাল বাইরে দাঁড়িয়েই ছিল, আপ্যায়ন করে বললে, 'ডাগদরবাবু, আইয়ে।'

নিয়ে গেল গদিতে। প্রকাণ্ড ফরাস পাতা, তার ওপরে তাকিয়া কোলে নিয়ে পাকা গোঁফ, শীর্ণ চেহারার এক ভদ্রলোক, সামনে তাঁর ক্যাশবাক্স। তিন-চারজন কর্মচারী সামনে এক-একটা লাল খেরোর খাতা নিয়ে হিসেব দেখছিল।

জগলাল বললে 'বাবুসাব, ডাগদরবাবু আ গিয়া—'

'নমস্কার—নমস্কার!'—সেই শীর্ণ চেহারা পাকা গোঁফের লোকটি উঠে দাঁড়ালেন। পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'আমার নাম রামরতন প্রসাদ। আপনি এসেছেন জানি, আলাপ হওয়াও দরকার, কিন্তু কাজের ভেতরে এমন করে ফেঁসে গেছি যে যাওয়াই হয় না। কিছু মনে করবেন না।'

মনে করবেন না? প্রশান্ত সন্দিগ্ধভাবে তাকালো: ঠাট্টা করছেন রামরতন? কিন্তু বুড়ো মানুষটির শান্তপ্রায় আধ্যাত্মিক মুখের দিকে তাকিয়ে তা ভাবা গেল না।

রামরতন আবার বললেন, 'তা একটু বিপদে পড়েই আপনাকে বিরক্ত করতে হল।'

'বিরক্ত কেন? এ তো আমাদের কাজ। কিন্তু অসুখটা কার?'

'আমার ভাই শ্যামরতনের।'

শ্যামরতনের!—একবারের জন্যে সংকুচিত হল প্রশান্ত, সেই প্রথম দর্শন, জাসুসী কহানী 'মৌত আউর মৌত', সেই চেয়ার থেকে তাঁকে ঠেলে তোলা! অত বড়ো ষণ্ডা জোয়ানের হঠাৎ কী এমন ঘটল যে—

ঠোঁটের ওপর একবার জিভ বুলিয়ে নিয়ে প্রশান্ত বললে, 'কী অসুখ?'

'কী জানি—বলছে পায়ে একটা দারুণ যন্ত্রণা—চিৎকার ছাড়ছে। দয়া করে একবার দেখে আসুন। আমি এখানেই আছি, দেখে আসুন তারপর গল্প করা যাবে। জগলাল—লে যাও।'

দূরে নয়, পাশেই একতলার একটা ঘরে একখানা তক্তপোশে লম্বমান ছিলেন শ্যামরতন। কিন্তু একাই নন। ঘরে একখানি বেঞ্চিতে আরো জন-চারেক বসে ছিলেন—সম্ভবত দেখতে এসেছেন শ্যামরতনকে। তাঁরা সবাই একসঙ্গে ডাক্তারের দিকে তাকালেন। তাঁদের চাউনিতে অর্থ ছিল একটা।

শ্যামরতন ক্ষীণস্বরে বললেন, 'ডাগদরবাবু, নমস্তে।'

'নমস্তে।'—বৈষয়িক গলায় প্রশান্ত বললে, 'কী হয়েছে আপনার পায়ে?'

'জানি না। বহুৎ দরদ। খুব বেথা হোচ্ছেন।'

'দু-পায়েই?'

'জী।'

ঘরে জোরালো একটা আলো জ্বলছিল, সেই আলোয় শ্যামরতনের মোটা মোটা কালো পায়ে কোনো রোগের লক্ষণ দেখতে পেল না প্রশান্ত।

শ্যামরতন আবার বললেন, 'বহুৎ দরদ—উফ্!'

প্রশান্ত পায়ের পাতা দুটো ভালো করে টিপে দেখল। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

'লাগছে নাকি?'

চকিতে পায়ের পাতা টেনে নিয়ে সোজা তক্তপোশে উঠে বসলেন শ্যামরতন।

'না—লাগছে না। সব ভালো হয়ে গেছে।'

'মানে?'

'মানে—কুছু না।' শ্যামরতন বেঞ্চির মহাজনদের দিকে তাকালেন এবার: 'দেখা তুমলোগ?'

সমস্বরে জবাব এল: 'হাঁ, দেখা।'

'কেয়া দেখা?'

'ডাগদার তুমকো পয়ের দবায়া।'

'বাস্—বাস্ হো গিয়া—'

সমস্ত ঘরময় অট্টহাসির রোল পড়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত প্রশান্ত পাথর হয়ে রইল। বুঝতে তার বাকি নেই। সেদিনের অপমানের শোধ তুললেন শ্যামরতন। সাক্ষী রেখে—পা টিপিয়ে। এমন ইতরও মানুষে হতে পারে!

ইচ্ছে করল একটা ঘুঁষি মেরে শ্যামরতনের সব-কটা দাঁত সে ছরকুটে দেয়। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে সে। তারপর সব হাসি ছাপিয়ে তার স্বর বেজে উঠল বজ্রের মতো: 'আমার ভিজিট—'

সেই গর্জনে আচমকা থেমে গেল হাসির ঝড়। একটু থতমত খেয়ে শ্যামরতন বললেন, 'হাঁ, জরুর। লিজিয়ে চার রুপেয়া।'

তেমনি বজ্রস্বরে প্রশান্ত বললে, 'না—আট টাকা। দিনে দুই, রাতে চার, অকারণে ডাকলে আট। দিন আট টাকা।'

শ্যামরতন ভ্যাবাচাকা খেলেন মুহূর্তের জন্যে। তার পরে তাঁরও আত্মমর্যাদা জেগে উঠল।

'ঠিক হ্যায়, আট রুপেয়াই দেঙ্গে।'

গুনে গুনে আট টাকা নিয়ে পকেটে পুরল প্রশান্ত। একটা কথাও না বলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। পেছনে আবার একটু হাসির আওয়াজ উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু জমল না—ডাক্তারের গলা তখনো যেন গমগম করছিল সেখানে।

গদিতে বসে ছিলেন রামরতন, প্রশান্তকে দেখে ডাকলেন।

'আসুন, বসুন। কী দেখলেন?'

হয়তো রামরতন সবই জানেন, হয়তো কিছুই জানেন না। কিন্তু প্রশান্ত কোনো কথা ভাবতে পারল না। উগ্র বিষাক্ত স্বরে বললে, 'আপনারা বড়োলোক হতে পারেন, অনেক ক্ষমতা থাকতে পারে আপনাদের। কিন্তু একটা সোজা কথা জেনে রেখে দেবেন। অকারণে ডাক্তারকে ডেকে তাকে নিয়ে রসিকতা করলে সেটা ক্রিমিন্যাল অফেন্স—তার জন্যে আমি আপনাদের নামে মামলা করতে পারি।'

তার পরে প্রশান্ত আর দাঁড়ালো না। সাইকেলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল বন্দর থেকে।

রাতটা অসহ্য, রাতটা বিকৃত।

প্রশান্তর জীবনে এমন দুঃসহ রাত্রি কখনো আসে নি। অথচ কী আশ্চর্য ইঙ্গিত দিয়ে, কোন্ সম্ভাবনা ছড়িয়ে শুরু হয়েছিল আজকের ভোরটি। নিজের হাতেই তার স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতাকে কলুষিত করেছে প্রশান্ত—বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এমন একটি মেয়ের সঙ্গে, যে তাকে শ্রদ্ধা করেছিল, যে জন্মদিনের সকালে তাকেই প্রথম সকলের আগে প্রণাম করতে চেয়েছিল, তার আশীর্বাদ চেয়েছিল।

সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত সারাটা দিন। শ্যামরতনের মধ্য দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত শুরু।

চলে যাব—চলে যাব এখান থেকে—এই কথাটাই প্রথম মনে হল। চলে যাওয়া? ওই রামরতন-শ্যামরতনের কাছে হার স্বীকার করে? চন্দনার কাছে ক্ষমা না চেয়ে, একটা-কিছু নিশ্চয় না করে? অসম্ভব!

মাথায় যেন আগুন ফুটছিল। রাত বারোটা বাজল, একটা বাজল, দুটো বাজল থানার পেটা-ঘড়িতে। আর শুয়ে থাকতে পারল না প্রশান্ত। বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

মেঘ কেটে গেছে। আসবার দিন গোরুর গাড়িতে যেমন দেখেছিল, তেমনি আকাশভরা তারা। কিন্তু তারাগুলোর অর্থ যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে আজ।

নিষ্ঠুর, কঠিন, ভয়ংকর।

প্রশান্ত দাঁতে দাঁত চাপল। আর তখন তার নজর পড়ল ডিসপেনসারির দিকে।

ও কি! আলো পিছলে গেল কাচের জানলায়? টর্চ জ্বেলে ভেতরে কেউ ঘুরছে বলে মনে হয়। এত রাতে কে ওখানে? চোর?

প্রশান্ত চিৎকার করল: 'মথুর—মথুর—মথুর—'

ধড়মড়িয়ে উঠে মথুর ছুটে এল।

'কী হয়েছে বাবু?'

'লাঠি দে। ডিসপেনসারিতে চোর ঢুকেছে।'

'কই—কোথায় চোর!'

'টর্চের আলো ফেলছিল।'

মথুর একটা লাঠি কুড়িয়ে নিলে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল দুজনে। ডিসপেন-সারির তালা বন্ধ। কেউ আছে বলে মনে হল না।

'চাবি খোল্।'

খোলা হলঘর। প্রশান্তর টর্চের আলোয় দেখা গেল, সব ঠিক আছে। কোথাও কিছুই নেই, কোনো জিনিস চুরি হয়েছে বলেও বোঝা গেল না। শুধু পেছনের একটা জানলা খোলা।

'কেউ এসে থাকলে ওই জানলা দিয়ে বেরিয়ে আমবাগানের মধ্য দিয়ে পালিয়েছে। আর ধরা যাবে না।'

'কিন্তু জানলাটা তুই খুলে গিয়েছিলি?'

'না, বাবু। ও-সব তো কম্পাউন্ডারবাবুই—'

একটু চুপ করে থেকে প্রশান্ত বললে, 'ঠিক আছে, চল।'

'কম্পাউন্ডারবাবুকে ডেকে শুধোবেন একবার?'

'কী হবে এত রাতে ভদ্রলোককে বিরক্ত করে?'—ভ্রূকুটিকুটিল মুখে কোয়ার্টারের দিকে ফিরে আসতে আসতে প্রশান্ত বললে, 'উনি বিশ্রাম করুন।'

॥ দশ ॥

পীড়িত মন আর ভারগ্রস্ত একটা শরীর নিয়ে সকালে প্রশান্ত ডিসপেনসারিতে পৌঁছুল। কালকের সমস্ত বিরক্তির সঙ্গে নতুন আর একটা জিনিস এসে ছায়া ফেলেছে তার ভাবনার ভেতরে। একটা বিশ্রী সন্দেহ। এইসব চ্যারিটেবল ডিসপেনসারিতে একটা ছোট আলমারিতে কিছু রেয়ার মেডিসিনস রাখা হয়। তাদের দাম বেশি এবং গুরুতর কতগুলো ক্ষেত্র ছাড়া সে-সব ওষুধ ব্যবহার করা হয় না। তা ছাড়া সার্জারির জন্যে দরকারী দামী সাজ-সরঞ্জাম আর যন্ত্রপাতিও তাতে থাকে।

কাল রাত্রে প্রশান্তর মনে হয়েছিল, টর্চের আলো এবং ছায়াটা যেন এই-খানেই বিশেষভাবে ঘোরাফেরা করছে। এইসব গ্রামাঞ্চলের সাধারণ চোর—

যারা কাপড় টাকা গয়না ধান চালের জন্যে সিঁদ দেয়, তারা এখানে আসবে না, এগুলো চুরি করে বেচবেই বা কার কাছে? তা ছাড়া ডিসপেনসারির যে ছোট ঘরটিতে অপারেশনের টেবিল আছে, এক-আধটা মড়াও কখনো কখনো সেখানে থাকে। রাত্রে এসব জায়গায় ভূতের ভয়েই মানুষ ঘেঁষতে চায় না— চোরেরাও তাদের ব্যতিক্রম নয়।

এ-আলমারিতে দরকার থাকতে পারে তাদেরই—ওষুধ-বিষুধের অর্থ যারা বোঝে। রাত্রের ডিসপেনসারিতে যাদের ভূতের ভয় নেই। অর্থাৎ তাদের অল্পবিস্তর ডাক্তার হওয়া চাই। বন্দরে জন-দুই হাতুড়ে আছে, একজন হোমিওপ্যাথও বোধ হয়। প্রথম দু'জন এ-সবের নামই জানে না, তৃতীয় জনের কোনো কাজই নেই।

তা হলে—বাই ল অব এলিমিনেশন—দুজন থাকে। হয় ডাক্তার নিজেই, নয়—

এই সন্দেহটাই বার বার জাগছিল, অথচ এইটেকেই কোনোমতে মনে জায়গা দিতে পারছিল না প্রশান্ত। নুরুদ্দীন তো খেয়ালী গোছের মানুষ, অনেক কথাই বলে; ওগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো অর্থ হয় না। তা ছাড়া এমন হতে পারে, সবটাই তার চোখের ভুল; কম্পাউন্ডারের কাছে নিজে যে অন্যায় সে করেছে, সেইটেকে আড়াল করবার জন্যেই সেই ভদ্রলোকের ওপর—

চোখের ভুল—তাই সম্ভব। কাল রাতটা তো তার পাগলের মতো কেটেছে। ঘুম হয় নি, চোখের সামনে এমনিতেই কতগুলো এলোমেলো ছায়া ভাসছিল। প্রশান্ত জোর করে চিন্তাটাকে সরিয়ে দিতে চাইল, পারল না। কম্পাউন্ডার জানলাটা কেন খোলা রাখলেন? এ-রকম একটা ভুল কিছুতেই তাঁর করা উচিত ছিল না। ধরা যাক—ভূতের ভয় নেই, এমন একটা চোরও তো আসতে পারত? দেওয়াল থেকে খুলে নিতে পারত ঘড়িটা, দু-একটা চেয়ার নিয়েও সরে পড়তে পারত।

কাজ—কাজ—কাজ।

নাড়ী দেখি? আচ্ছা। জিভ বের করো—হ্যাঁ, আর-একটু। 'ডাগদরবাবু, কাল রাতমে বহুৎ বোখার'—হুঁ, বুকে ঠাণ্ডা আছে। 'সকালে তো বুইনের বাড়ি গেনু, সেইঠে থাকি আসিতে ঢের ব্যালা হৈল। তখন ভাবিনু— আগিলায় গোরু গিলাক'—আরে বাপু, সাত-কাহন ইতিহাস থাক, পেটে ব্যথা কখন হল, তাই বলো।

ওদিকে সামনে কম্পাউন্ডারের চিৎকার: 'আরে দাঁড়া দাঁড়া, একে একে হচ্ছে। আমি তো আর দশভুজা নই, দেখতেই পাচ্ছিস কিরকম ভিড়। বেশি চেঁচামেচি করলে কাউকে ওষুধ দেব না, তা বলে রাখছি।'

এরই মধ্যে জগলাল এসে সেলাম দিলে। রামরতন প্রসাদের পাইক। দেখেই পিত্তি জ্বলে গেল প্রশান্তর।

'তোমার আবার কী চাই?'

'বাবুসাহেব খত ভেজ দিয়া।'

ইচ্ছে হল, না পড়ে ফেরত দেয়, তবু চিঠিটা নিল। রামরতন প্রথমে ইংরেজিতে লিখেছেন 'মাই ডিয়ার ডক্টরবাবু', তার পরে বাকিটুকু হিন্দি ধাঁচের বাংলা হরফে লেখা।

তাতে বক্তব্য এই, তাঁর ভাইয়ের ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত। ভাইটি নির্বোধ এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন। যাই হোক, তার অন্যায়ের জন্যে রামরতন প্রসাদ নিজে ক্ষমা চাইছেন। আর প্রশান্তর মনে যাতে কোনো গ্লানি না থাকে, এজন্যে তিনি তাকে একদিন চায়ে ডাকতে চান। কবে প্রশান্তর সময় হবে—তাঁর ওখানে গিয়ে সে তাঁকে অনুগৃহীত করবে, এই তথ্যটিও তিনি অবগত হতে চাইছেন।

ক্ষমা করা উচিত ছিল, কিন্তু সেই কদর্য দৃশ্যটা মনে পড়বামাত্র প্রশান্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল। নীরস গলায় জগলালকে বললে, 'আচ্ছা তুমি যাও, আমি পরে জানিয়ে দেব।'

'আভি লিখ্ দেনে বোলা।'

প্রশান্ত দাঁত খিঁচিয়ে বললে, 'আমি বসে বসে খেলা করছি নাকি? দেখছ না—কতগুলো লোক দাঁড়িয়ে আছে?' একটি রোগীর পিঠে স্টেথিসকোপ বসাতে বসাতে সে বললে, 'বলো গিয়ে, আমি পরে জানিয়ে দেব।'

'ঠিক হ্যায়।' লোকটা আর সেলাম করল না, একটু উদ্ধতভাবেই বেরিয়ে গেল এবার।

অন্যদিন সকালে প্রশান্ত দু পেয়ালার বেশি চা খায় না, আজ মথুরকে দিয়ে আরো এক পেয়ালা কড়া চা আনালো। সিগারেট সে খায়ই না, তবু হাঁপানি সম্পর্কে উপদেশ নিতে এসে একজন জোতদার যখন তাকে সিগারেট দিলেন, তখন সেটা সে ধরালো, তারপর তার তেতো আস্বাদে বিরক্ত হয়ে, বারকয়েক কেশে, সেটাকে অন্যমনস্ক ভাবে ডুবিয়ে দিলে নিজের চায়ের পেয়ালায়।

সব এলোমেলো হয়ে গেছে—সব বেসুরো বাজছে। আরো এক মাসের ওপর তাকে এখানে থাকতে হবে, অথচ সেই দুর্বিষহ অবস্থাটা সে কল্পনাই করতে পারছে না।

ডিসপেনসারি বন্ধ করবার আগে প্রশান্ত বললে, 'কম্পাউণ্ডারবাবু!'

'বলুন।'

'ওই ছোট আলমারিটার চাবিটা কোথায়?'

একেবারের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন কম্পাউণ্ডার, তাঁর মুখের ওপর দিয়ে যেন কয়েকটা অস্পষ্ট ঢেউ দুলে গেল বলে মনে হল। গোল বড়ো চশমার আড়ালে চোখ প্রখর হয়ে চেয়ে দেখল প্রশান্তর দিকে।

প্রশান্ত আবার বললে, 'চাবিটা কি আপনার কাছে?'

'আমার কাছে কেন হবে?' কম্পাউন্ডার যেন আশ্চর্য হয়ে গেলেন: 'ও তো ডাক্তারই রাখেন। আপনার ড্রয়ারটা খুলে দেখুন, ওতেই রয়েছে বোধ হয়।'

তাই বটে। চাবিটা ড্রয়ারেই ছিল।

'ওখানে রেখেছি ? আমি ?'

'আপনারই তো রাখবার কথা। যেদিন আপনি এলেন, সেদিনই আমি চাবিটা দিয়েছি আপনার হাতে। কথা কইতে কইতে আপনি রেখে দিলেন ওর ভেতর।'

প্রশান্ত চুপ করে রইল। কী আশ্চর্য, কিছুই তার মনে পড়ছে না। অথচ ব্যাপারটা একেবারে অসম্ভব নয়। এই ডিসপেনসারির চার্জ নেবার দিন শরীর-মন কিছু তার আয়ত্তে ছিল না; গোরুর গাড়ির ঝাঁকুনিতে এমনিতেই সব কেমন হয়ে গিয়েছিল, তার ওপর আবার ওই শ্যামরতন প্রসাদ! হতে পারে—অসম্ভব নয়।

একটু পরে প্রশান্ত আবার বললে, 'কিন্তু স্টকটা এখনো মেলানো হল না তো।'

'কাজ তো দেখছেন এখানে।'—কম্পাউন্ডারের মুখ ভারী হয়ে উঠতে লাগল: 'দশটায় বন্ধ হওয়ার কথা, অথচ এগারোটা সাড়ে-এগারোটার আগে ছুটি পাওয়া যায় না। আগের ডাক্তারেরা কড়া ছিলেন, দশটার আগে না এলে সোজা হাঁকিয়ে দিতেন রুগীদের। আপনার তো আবার দয়ার শরীর—কাউকে ফেরাবেন না। এইসব করব, না স্টক মেলাব—বলুন ?'

কথাগুলোর ভেতরে যুক্তি ছিল, নালিশ ছিল, একটু ঝাঁঝও ছিল। সেই বিনীত, ভদ্র, প্রায়-স্নেহ-বিগলিত কম্পাউন্ডারের মুখ থেকে এই রকম একটা সুর এর আগে কখনো শোনা যায় নি আর।

'তা ঠিক, একটু বেশি চাপই বোধ হয়ে পড়ে গেছে আপনার ওপর।'—প্রশান্ত মনে মনে সংকুচিত বোধ করল একটু: 'তা হলে আসছে রবিবার বরং বসা যেতে পারে—কি বলেন ?'

নিরুত্তাপ শুকনো গলায় কম্পাউন্ডার বললেন, 'বেশ, তাই বসবেন।'

দুটো-তিনটে দিন কেটে গেল একটানাভাবে। সেই ডিসপেনসারি, সেই কাজ, সেই রোগীদের ভিড়। বন্দীপুরের টি-বি পেশেন্টটিকে সে কিছু টাকা দিয়ে শহরে এক্স-রে করার জন্যে পাঠাতে চেয়েছিল, লোকটা রাজী হল না। ফাঁকা আকাশের মতো অর্থহীন চোখ মেলে চেয়ে রইল কেবল।

'যাও না—দেখিয়ে এসো।'

'কী বা হবে ?'

'কেন, বাঁচবে।'

'গাঁও থাকি শহরে চলি গেইলে কেউ বাঁচে না। মরিতে হয়, এইঠেই মরিমু। বাবা দাদা চৌদ্দপুরুষের ভিটায়।'

কিছুই করা গেল না। নিয়তির হাতে সঁপে দিয়ে বসে আছে নিজেকে। প্রশান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে দারোগা এসে একদিন হাঁক দিয়ে গেলেন, একদিন পোস্টমাস্টার এলেন কানে-পুঁজওলা ছেলেটাকে দেখাতে। আর কিছু নেই,

আর কিছুই না।

পোস্টমাস্টার বলছিলেন, 'এত ছেলেপুলে নিয়ে—এই মাইনের চাকরি—আর চলে না মশাই।'

প্রশান্ত জবাব দেয় নি। সহানুভূতি জানানোর কোনো মানে হয় না এ-সব ক্ষেত্রে।

'পাশা খুব চলছে দারোগাসাহেবের ওখানে। যাবেন না একদিন।'

'আমার ওতে সুবিধে হয় না, কী করব শুধু শুধু বসে থেকে?'

এ ছাড়া সন্ধ্যা কেটেছে একা বারান্দায় বসে থেকে থেকে। দুপুর কেটেছে অকারণে ডাক্তারী বইয়ের পাতা উলটে, একটা লাইনও পড়া হয় নি। আর এই তিন দিনে চন্দনাকে সে একবারও দেখতে পায় নি, তার গান শোনে নি, খাবার নিয়েও সে আসে নি।

সব নষ্ট করে দিয়েছে প্রশান্ত। চন্দনা আর আসবে না।

না আসুক, ভালোই। আজও দুপুরে চোখ বুজে পড়ে থাকতে থাকতে সে ভাবল: 'না আসাই ভালো। চন্দনা এখনো ছেলেমানুষ, কিশোরী। আজকের ক্ষতটা তার বেশি নয়, দু-দিন পরেই তা মুছে যাবে, একটু একটু করে সব ভুলে যাবে সে—মনের ভেতরে যে-অপরাধ জমে উঠেছে প্রশান্তর, তাও লঘু হয়ে আসবে। এই ভালো, চন্দনা সরে গেছে তার কাছ থেকে। নিজে মুক্তি পেয়েছে, তাকে মুক্তি দিয়েছে।

কিন্তু সব মুক্তিই মুক্তি নয়। তারও একটা যন্ত্রণা থাকে। সে-যন্ত্রণাটা প্রশান্ত ভুলতে পারছিল না। যেভাবে চন্দনা তাকে জেনেছে সেইটেই কি তার আসল রূপ? সেই একবারের দুর্বলতাটুকু? প্রশান্ত দেব লাহিড়ীর আর কোনো পরিচয় কি কোথাও নেই? একটি মেয়ের সরল বিশ্বাসের ওপর সুযোগ নেওয়া ছাড়া তার চরিত্রের অন্য দিকও যে আছে—সে-কথাটাও কি চন্দনার জানবার দরকার ছিল না?

'আসব?'

প্রশান্ত প্রায় লাফিয়ে উঠল। ভুল শুনল? নিজের কল্পনা দিয়ে তৈরি করল ডাকটা?

'আসব ভেতরে?'

সত্যিই তা হলে চন্দনা। রক্তের ভেতরে তুফানের মাতলামি টের পেল প্রশান্ত। তবু নিজের গলাটাকে সে এতটুকুও কাঁপতে দিল না। প্রাণপণে স্বাভাবিক হয়ে বললে, 'এসো।'

চন্দনা ঢুকল। নীল নয়, পরনে সেই ডুরে শাড়ি। কপালে ছোট্ট একটি কুঙ্কুমের ফোঁটা। মেলে-দেওয়া চুলে স্নানের সুরভি। হাতে বইখাতা।

মিনিটখানেক কোনো কথা খুঁজে পাওয়া গেল না। চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে পা দিয়ে চন্দনা দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক একটি ছবির মতো, প্রশান্ত চেয়ে রইল তার পায়ের দিকে। পাতা দুটি প্রায় দেখাই যায় না, শাড়ির পাড় আর এক-ঝলক সাদা লেস যেন হাওয়াতেই কেঁপে উঠছিল।

প্রশান্ত একবার গলাটা পরিষ্কার করে নিলে।

'দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোসো চেয়ারটা টেনে নিয়ে।'

চন্দনা বসল। স্নানের গন্ধ আরো নিবিড় হয়ে আসতে লাগল প্রশান্তর চারদিকে। বাইরে দুপুরটা হঠাৎ দপ করে নিবে গেল, মেঘের ছায়া ঘনিয়ে নেমেছে সেখানে।

অস্বস্তি থেকে চন্দনাই বাঁচালো। টেবিলটার ওপর বইখাতাগুলো মেলে দিয়ে বললে, 'আপনার দেওয়া অংক কিন্তু সব-ক'টা করতে পারি নি, কয়েকটা বাকি রয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে, করে ফেলো।'

'হ্যাঁ, করে ফেলব।'—চন্দনা সেই হরিণের মতো চোখ দুটো একবার মেলে ধরল প্রশান্তর দিকে: 'এই দু-দিন আমার শরীরটা খারাপ ছিল বলে—'

'শরীর খারাপ? কী হয়েছিল? তোমার বাবা তো কিছু বলেন নি।'

চন্দনা একটু হাসল।

'সামান্য জ্বর-জ্বর, সে কিছু না।'

'এখন ছেড়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, আজ তো স্নান করেছি।'

'দেখি হাত—' ডাক্তারীর অভ্যাসেই বলে ফেলল প্রশান্ত, আর বলেই সংকুচিত হল। উচিত ছিল না, কিছুতেই উচিত ছিল না। কিন্তু ডাক্তারের আর ফেরবার পথ নেই।

চন্দনা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। হাতটা কাঁপছিল। একবারের জন্যে মুঠোর ভেতরে চেপে ধরল ডাক্তার।

'না, ঠিক আছে, নর্ম্যাল।'

একবার মনে হল, জিগ্যেস করা দরকার—চন্দনা রাগ করেছে কি না; মনে হল একবার, ক্ষমা চাওয়া উচিত। কিন্তু বলতে পারল না প্রশান্ত। কথাগুলো ধুকধুক করতে লাগল হৃৎপিণ্ডের ভেতর, ঝিনঝিন করতে লাগল রক্তে।

কিন্তু মেয়েরা আশ্চর্য। কিছু বোঝা গেল না চন্দনাকে দেখে। যেন কিছুই ঘটে নি—যেন তিন দিন আগেকার সেই সকালটা কখনো ছিল না, কখনো আসে নি। সহজ স্বাভাবিকভাবে সে অ্যালজেব্রার পাতা খুলে ধরল।

'এই ফ্যাক্টরগুলো একটু—'

যেন বেঁচে গেল প্রশান্ত। বই টেনে নিয়ে বললে, 'দেখি?'

অংক কষা চলল, বোঝানো চলল। আজ প্রশান্ত পড়ানোর ভেতরে সমস্ত মন ঢেলে দিতে পারল, আজ চন্দনার মনোযোগের কোনো শেষ রইল না। সত্যিই সব মুছে ফেলেছে চন্দনা। তিন দিন আগেকার সকালটাকে নিজের নির্মলতা দিয়ে নিঃশেষে ধুয়ে ফেলেছে।

মুক্তি পেয়েছে প্রশান্ত, তবু মুক্তি নয়। তা হলে কি প্রশান্ত এতই তুচ্ছ যে চন্দনা তাকে ওইটুকুও স্বীকার করতে চায় না? মনের মধ্যে পৌরুষ একটা ঘা খেল। তবু যা হল, ভালোই হল। নিজের ভুলের দাম দিতেই

হবে— চন্দনার উপেক্ষা আরো কঠিন একটা দহন হয়ে জেগে রইল সেখানে।

বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। মাটির গন্ধ উঠল, ঘাসের গন্ধ উঠল, পেছনের আমবাগান থেকে ভিজে পাতার গন্ধ আসতে লাগল পুবের হাওয়ায়। আবছা অন্ধকার ঘনালো ঘরের ভেতর। ডুরে শাড়িপরা চন্দনা সেই ছায়ার ভেতর কেমন সুদূর আর অস্পষ্ট হয়ে যেতে লাগল।

অল্প আলোয় অঙ্ক কষতে গিয়ে দুটি মাথা অনেক কাছে চলে এল, চন্দনার চুলের ছোঁয়া লাগল, তার স্নানের গন্ধ আবিষ্ট করতে লাগল প্রশান্তকে; বাইরে বৃষ্টির ধারা চলছিল, বাড়িতে মথুর ছিল না— কাকের বুকের মতো সেই ভোরটিতে যেমন পৃথিবীতে কেউ ছিল না, ঠিক তেমনি করে, তারো চাইতে একান্ত হয়ে দুজনে দুজনের কাছে চলে এল। কিন্তু তখনো কিছু ঘটল না। চন্দনা কী ভাবছিল সে-ই জানে, প্রশান্ত ভাবছিল— জীবনের এক-একটা কঠিন জটিল মুহূর্তে অ্যালজেব্রার চাইতে ঘনিষ্ঠ বান্ধব বোধ হয় আর কেউ নেই।

বৃষ্টি কমে এল. চন্দনা উঠে দাঁড়ালো।

'এবার যাই?'

'বৃষ্টি পড়ছে যে।'

'ও কিছু নয়, গুঁড়িগুঁড়ি। দৌড়ে চলে যাব।'

'আমার একটা ছাতা আছে বোধ হয়, নিয়ে যাও।'

'না, কোনো দরকার নেই।'—চন্দনা দাঁড়িয়ে পড়ল, কিন্তু গেল না। তারপর মৃদু গলায় বললে, 'আপনি নেমে আসবেন না একটু?'

'কেন বলো তো?'

আস্তে আস্তে চন্দনা বললে, 'প্রণাম করব যে।'

'আজ আবার প্রণাম কেন?'—হাসিমুখে খাট থেকে নেমে এল প্রশান্ত: 'আজ তো জন্মদিন নয়।'

আবার গলায় আঁচল দিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে বসল চন্দনা, ধীরে ধীরে মাথা রাখল প্রশান্তর পায়ে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এখন আমার রোজ প্রণাম। দু-দিন আসতে পারি নি, কিন্তু দূরে থেকে প্রণাম করেছি।'

আর, আর প্রশান্ত দেখল, প্রণাম করেই সে সরে গেল না। উৎসুক ফুলের মতো মুখ তুলে চেয়ে রইল তার দিকে—হরিণের মতো চোখ দুটি তার গভীর হয়ে এল।

তৎক্ষণাৎ সব কথার উত্তর পাওয়া গেল। তিন দিনের সব যন্ত্রণা চকিতে সমুদ্রে মিলিয়ে গেল।

আবার একটি নরম শরীর বুকের ভেতর; আবার দুটি ছোট ছোট ঠোঁটের ওপর প্রশান্তর ঠোঁট। কিন্তু এবার আর সেই ভয়ের শিহরণটা ছিল না; ছিল বিশ্বাস, ছিল ভক্তি, ছিল আত্মসমর্পণ আর প্রথম প্রেমের সেই অপরিসীম বিস্ময়।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল, তারই মধ্যে দিয়ে ছুটে চলে গেল চন্দনা।

আর প্রশান্ত চোখ বুজে আবার শুয়ে পড়ল বিছানায়। স্বপ্ন দেখতে লাগল নববধূর, কানে আসতে লাগল শানাইয়ের সুর।

পরের দিন ডিসপেনসারির কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—কোথা থেকে হাউমাউ করতে করতে একটি লোক ছুটে এল ডাক্তারখানায়। একেবারে জড়িয়ে ধরল প্রশান্তর পা।

'আরে কী হল? কী হল?'

ছেঁড়া গেঞ্জি পরা রুক্ষ চুল লোকটার দু-চোখে প্রায় পাগলের দৃষ্টি।

'একবার চলুন ডাক্তারবাবু, একটিবার চলুন।'—এই অঞ্চলের ভাষায় সে তারস্বরে আর্তনাদ করতে লাগল: 'আমার জোয়ান ব্যাটাটা বুঝি বাঁচে না—বুঝি ধড়ফড়িয়ে মরে যায়।'

চেনা দু-চারজন তটস্থ হয়ে উঠল: 'কী হয়েছে জয়নন্দী? মকবুলের কী হয়েছে?'

'চোখ লাল, ভুল বকছে, ছটফট করছে, কেমন যেন করছে।'—ডাক্তারের পা আঁকড়ে রইল লোকটা: 'আমার ব্যাটাটাকে বাঁচান, খোদা আপনার ভালো করবেন।'

'কোথায় তোমার বাড়ি? কত দূরে?'

'ওই নিলপুরে—ক্রোশখানেক হাঁটা হবে এখান থেকে।'

কাঁচি হাতে এগিয়ে এলেন কম্পাউন্ডার। শিশির জন্যে দাগ কাটছিলেন।

'বড়ো ডাক্তারকে তো ডাকতে এসেছিস, ভিজিট দিতে পারবি? না, নিয়ে গিয়ে একছড়া কাঁচকলা আর চারটে মুরগীর ডিম ধরিয়ে দিবি? ও-সব হবে না, বরং টিকিট করে ওষুধ নিয়ে যা—'

প্রশান্ত একবার কম্পাউন্ডারবাবুর দিকে তাকালো। তারপর উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে।

'আমি যাচ্ছি কম্পাউন্ডারবাবু। ক'টা রিপিট আছে, দিয়ে দেবেন।'

'পাগল হয়েছেন স্যার!'—কম্পাউন্ডার আশ্চর্য হয়ে গেলেন: 'ও ব্যাটারা অমনিই বলে। গিয়ে দেখবেন ম্যালেরিয়া, দশ ঘটি ঠান্ডা জল মাথায় ঢাললেই জ্বর নেমে যাবে।'

'ম্যালেরিয়া না বাবু, ম্যালেরিয়া না।'—জয়নন্দী চিৎকার করতে লাগল: 'ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে সারা হয়ে গেনু—চিনি না আমরা? এ কালজ্বর বাবু, চোখ জবাফুলের মতো লাল! দোহাই ডাক্তারবাবু—'

'ভিজিট দেবে না মশাই, একটা পয়সা ছোঁয়াবে না—হা-ঘরের গ্রাম।'

হা-ঘরের গ্রাম তো নিশ্চয়ই, প্রশান্তর মনে পড়ে গেল, সেই গাড়োয়ান ওয়াহেদ বক্সের গ্রাম। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, মৃত্যু। চক্ষের পলকে ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে এল সে।

'মথুর—আমার সাইকেল—'

কম্পাউন্ডার আরো কিছু বলছিলেন, প্রশান্ত শুনতে পেল না।

লোকটাকে সাইকেলের পেছনে তুলে নিয়ে, জেলা-বোর্ডের পথের চাইতে আরো খারাপ কাঁচা মাটির রাস্তায়, কাদা ঠেলতে ঠেলতে, আছাড় খাওয়া সামলাতে সামলাতে সে ছুটল। আর ডিসপেনসারির বারান্দায় দাঁড়িয়ে শিকার ছিনিয়ে নেওয়া বাঘের মতো জ্বলন্ত চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন কম্পাউন্ডার। একবার বিড়বিড় করে বললেন, 'এইসব পাগলের জন্যেই—'

নিলপুরে পৌঁছুল প্রশান্ত।

মুসলমানের গ্রাম তিনদীঘি সে দেখেছে, আর-একটা গ্রামও দেখল। অবিশ্বাস্য, কল্পনাতীত দারিদ্র্য চারদিকে। পচা খড়ের চাল, মাটির দাওয়া, ভাঙা বেড়া। স্বাস্থ্যহীন গোরু, শ্রীহীন মানুষ। ধানের দেশ এই জেলা, এরাই লক্ষ্মীর বুকের ছেলে, অথচ কোথাও একবিন্দু লক্ষ্মীর কৃপা চোখে পড়ল না।

অন্ধকার নিচু ঘরের ভেতরে বাঁশের মাচায় ছেঁড়া কাঁথার ওপর তার রোগী। বিশ-বাইশ বছর বয়েস হবে। দুটো রক্ত-মাখানো চোখ মেলে দিয়ে প্রলাপ বকছে, ছটফট করছে, মুঠো করে কী যেন ধরতে চাইছে শূন্যে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে বুক শিউরে ওঠে, প্রলাপের মধ্য দিয়ে সে যেন পৃথিবীর সব দুঃস্বপ্ন একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছিল।

'ঘরের মধ্যে শিয়াল ঢুকিছে হে—শিয়াল। ওই কালা বিলাইটা কুথা থাকি আসিল ? হামাকে কামড়াবার চাহোছে। ওইটে ওই মানুষটা কে হে ? ডাকছি কেনে ? হামি নি যামু—হামি নি যামু।'

গায়ে যেন আগুন ছুটছিল লোকটার। মুহূর্তে বুঝতে পারল প্রশান্ত। মেনিনজাইটিস।

ঘরে আবছা অন্ধকারে 'ফতা'-পরা দুটি মেয়ে ফুপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। বাইরে হাহাকার করছিল বাপ জয়নন্দী: 'মরি গেইল—হামার জোয়ান ব্যাটার্টা মরি গেইল—'

বাঁচবে যে এমন আশা প্রশান্তও করতে পারল না। তবু ধমক দিল একটা। বললে, 'চেঁচামেচি করলে তো চিকিৎসা হবে না, আমাকে কাজ করতে দাও। আমি একটা ইনজেকশন দিচ্ছি আগে। আর—তোমাদের এখানে কেউ সাইকেল চড়তে জানে ?'

বাইরে গ্রামের লোক এবং খুব সম্ভব কিছু আত্মীয়স্বজন জড়ো হয়েছিল। তাদের মধ্যেই একটু বুদ্ধিমান চেহারার একজন এগিয়ে এল।

'আমি জানি।'

'তা হলে আমি একটা চিঠি লিখে দিই। এই চিঠিটা নিয়ে আমার সাইকেলে চেপে সোজা চলে যাও হাসপাতালে। সেখানে কম্পাউন্ডারবাবু না থাকেন, চলে যাও তাঁর বাড়িতে। বলবে, এই ওষুধগুলো এক্ষুনি দিয়ে দিতে হবে।'

ব্যাগে ছোট একটা প্যাড ছিল, সঙ্গে কলম ছিল, ঘসঘস করে লিখে ফেলল

প্রশান্ত। সাইকেল দিয়ে লোকটাকে পাঠিয়ে দিলে ডিসপেনসারিতে। কে যেন কোথা থেকে ভাঙা-মতন একটা টিনের চেয়ার যোগাড় করে এনেছিল, সেইটে পেতে সে বসে গেল মকবুলের পাশে।

মনে হল, সামান্য একটু কাজ হয়েছে ইনজেকশনটায়। কিন্তু কোনে ভরসা রাখা যায় না। কঠিন রোগ, কঠিন চিকিৎসা। তা ছাড়া কোনো ওষুধ পড়ে নি, আজ অনেকক্ষণ ধরে তাকে যুঝতে হবে রোগের সঙ্গে।

বাইরে সাইকেলের আওয়াজ পাওয়া গেল। এত তাড়াতাড়ি? দশ-বারো মিনিটের মধ্যে ফিরল নাকি লোকটা?

কিন্তু সে-লোক নয়। আর-একজন। চিৎকার করে ডাকল: 'ডাক্তার-বাবু—ডাক্তারবাবু—'

প্রশান্ত বেরিয়ে এল, আর এসেই চিনল। এ ইদ্রিস চৌধুরীর লোক। আলী নয়—যে লোকটি তার সঙ্গে কথা কইছিল সে-ই। নামটা মনে পড়ল, সুলেমান। সম্পর্কে চৌধুরীসাহেবের ভাগনে।

'ব্যাপার কী, সুলেমানসাহেব?'

'আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। খবর পেলাম আপনি এখানে এসেছেন। আমিও ছুটতে ছুটতে আসছি পেছনে পেছনে। এখনি যেতে হবে আপনাকে।'

গলার স্বরে যেন হুকুম। প্রশান্ত ঠোঁট কামড়ে ধরল।

'কেন?'

'লায়লার বোধ হয় বাচ্চা হবে। ব্যথা উঠেছে। চৌধুরীসাহেব খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এক্ষুনি চলুন।'

প্রশান্ত ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। বললে, 'এখানে মেনিনজাইটিস কেস, খুব সিরিয়াস অবস্থা। পেশেণ্ট ছেড়ে এখন আমি কোথাও যেতে পারব না।'

'যেতে পারবেন না!'

'না। ব্যথা উঠেছে, দাই ডাকুন। আমার কিছু করবার নেই।'

'চৌধুরীসাহেব ডাকছেন—আপনি যেতে পারবেন না!' সুলেমান যেন বিশ্বাস করতে পারল না।

'ভগবান ডাকলেও আমি যেতে পারব না।'

রাগে মুখ রাঙা হয়ে উঠল সুলেমানের: 'এখানে অনেক ডাক্তার এসেছে গেছে, কিন্তু ইদ্রিস চৌধুরীকে অপমান করার মতো বুকের পাটা কারো হয় নি। তাঁর মেয়ের চাইতে একটা চাষার চিকিৎসা বড়ো হল আপনার কাছে? কত টাকা চান?'

'কত টাকা দেবেন? একশো, দুশো, হাজার? কিন্তু টাকা দিয়েই সব হয় না। আপনারা অনেক ডাক্তার দেখেছেন, কিন্তু সব ডাক্তারকে দেখেন নি। কেন আমি যাব? পেশেণ্ট আপনারা দেখতে দেবেন না; তার ডেলিভারি করাতে দেবেন না; আমি শুধু সাক্ষীগোপাল হয়ে বসে থাকব আপনাদের ভ্যানিটিকে খুশী করবার জন্যে? আর এই সিরিয়াস রোগীটা বিনা চিকিৎসায় মরে যাবে?'—প্রায় চিৎকার করে উঠল প্রশান্ত।

গ্রামের লোকগুলো নিঃশব্দে এই নাটক দেখছিল এতক্ষণ—আতঙ্কে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ঘরের মধ্যে মেয়েদের ফোঁপানি থেমে গিয়েছিল, জয়নন্দী বিহ্বল হয়ে চেয়ে ছিল, এমন কি রোগী পর্যন্ত বোধ হয় প্রলাপ বকা ভুলে গিয়েছিল। শেষকালে গ্রামের একজন মুখ খোলবার সাহস পেল।

'আপনি যান বাবু, চৌধুরীসাহেবের ওখানেই যান। আমাদের নসীবে যা আছে তাই হবে। গরিবকে আল্লাই দেখবেন।'

'আল্লা নিজে থেকে কিছু দেখেন না, দেখবার ভার তিনি মানুষের হাতেই তুলে দেন। আর যে-মানুষ তাঁর সেই হুকুম তামিল করে না—সে জানোয়ার। সুলেমানসাহেব, আপনি যান। দাই ডাকুন। যদি সেফ-ডেলিভারি না হয়, ফরসেপের দরকার পড়ে, তখন আমায় খবর দেবেন।'

সুলেমানের মুখ-চোখ যেন রাগে ফেটে পড়তে চাইল।

'তার মানে—আপনি যাবেন না?'

'না।'

'ইদ্রিস চৌধুরী কে, জানেন?'

'না। কিন্তু তিনি ভগবানের চাইতে বড়ো নন, আমার বিবেকের চাইতেও নয়।'

'ঠিক আছে।'—সাপের মতো হিসহিস করে উঠল সুলেমান: 'কিন্তু আপনি নিজের কবর নিজে খুঁড়লেন।'

তারপরেই আর দাঁড়ালো না। ঝড়ের বেগে সাইকেলটা ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ এগারো ॥

প্রশান্ত জানত, ব্যাপারটা অনেকদূর পর্যন্ত গড়াবে। গড়ালো।

নিলপুর থেকে সে ফিরল বেলা তিনটেয়। রোগী খানিকটা শান্ত। এখনো কিছু বলা যায় না, হয়তো টিকেও যেতে পারে। তার সামর্থ্যের ভেতর যতটুকু করা সম্ভব, তা সে করেছে।

স্নান হয় নি, খাওয়াও হয় নি। ওরা আদর করে চিঁড়ে-কলা-দই এনে দিয়েছিল, কিছু খেতে হল, কিন্তু মনে উৎসাহ ছিল না, মুখে রুচিও না। দারিদ্র্য, হতাশা আর মৃত্যুর একটা শিথিল পরিবেশ তার সব শিরা-স্নায়ু-গুলোকে যেন অবশ করে দিয়েছিল।

মাথায় রোদ জ্বলছিল, হাওয়ার আঁচ লাগছিল, মাঠের ভেতরে ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে চিল কাঁদছিল। সাইকেলে প্যাড্‌ল আর যেন চলতেই চাইছিল না। মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা শূন্যতা বোধ করছিল প্রশান্ত। এই গ্রাম-গুলোতে—চারদিকের এই মানুষগুলোর ভেতরে, আর-এক পৃথিবী—যা জীর্ণ হয়ে গেছে, বিকৃত হয়ে যাচ্ছে—যা ধীরে ধীরে যে-কোনো চেতনাকে লোভী, স্বার্থপর আর অসুস্থ করে তোলে, তার মধ্য থেকে ছুটে পালাবার

জন্যে তার প্রাণ ছটফট করছিল।

শুধু একটি আলো সে পেয়েছে এখানে। চন্দনা। এই জীবনের মধ্যে থাকলে সেই চন্দনাও ইতর হয়ে যাবে, লোভী হয়ে যাবে, ছোট হয়ে যাবে। এখন একটিই কাজ আছে প্রশান্তর। এখান থেকে চলে যাওয়ার সময় চন্দনাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে সে।

আজ দুপুরে চন্দনাকে তার পড়ানো হল না। আর—

নিঃশ্বাস ফেলল প্রশান্ত। এগিয়ে চলল কাদা ঠেলতে ঠেলতে।

কোয়ার্টারে পৌঁছুতেই ছুটে এল মথুর।

'খুব দেরি হয়ে গেল, বাবু!'

'হ্যাঁ, তা হল।'—সাইকেলটা মথুরকে ধরিয়ে দিয়ে বারান্দায় উঠতে উঠতে প্রশান্ত বললে, 'বেশি করে স্নানের জল দিস, সারা গা আমার জ্বালা করছে।'

চিঁড়ে-দই সে খেতে পারে নি। মথুর সব গরম করে দিয়েছিল, কিন্তু ভাত-তরকারিও মুখে রুচল না। ডাক্তারের অবেলায় খাওয়া, একবেলা না খাওয়া এমন-কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়—সে-অভ্যাস বরাবরের। কিন্তু আজ সব তার অন্য রকম লাগছিল। এমন একটা কুশ্রী তিক্ততা সে এর আগে কোনোদিন অনুভব করে নি।

ইদ্রিস চৌধুরী? সুলেমান? না। ওগুলো মনে হলে তার মাথা গরম হয়ে ওঠে। অল্প ক'দিনের মেয়াদ এখানে, সুপারনিউমারি ডিউটি, তবু ইচ্ছে করে, স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধে এখানে—একবার দেখে নেয় লোকগুলোকে। চিরকাল যারা এদের চাটুকারিতা করে এসেছে, তারা ছাড়াও পৃথিবীতে অন্য ধরনের মানুষও যে থাকতে পারে, সে-কথা সে ভালো করে বুঝিয়ে যায় এদের।

বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে রইল প্রশান্ত। মা-র কথা ভাবছিল, বাবার কথা মনে পড়ছিল, অখিলেশ সেনগুপ্তের গলার স্বর যেন কানে আসছিল তার। আর চন্দনা বার বার একটা বেদনা-জড়ানো সৌরভের মতো ভেসে যাচ্ছিল সব-কিছুর ওপর দিয়ে।

চন্দনা।

তাকে নিয়ে ঘর গড়বার কল্পনাটাকে সে জোর দিতে চাইছে, কিন্তু পেরে উঠছে না। কম্পাউণ্ডারবাবু। আর-একটা বিশ্রী ছায়া। যে ওষুধগুলো নেবার জন্যে নিলপুর থেকে সে লোক পাঠিয়েছিল, তার সব পাওয়া যায় নি। অথচ প্রশান্তর মনে হয়েছিল, সেগুলো ডিসপেনসারিতে থাকা উচিত। আর—আর জয়নন্দীর সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কম্পাউণ্ডারবাবুর মুখে যে নিষ্ঠুর বৈষয়িকতার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল, তাও খুব অস্বস্তিকর মনে হয়েছিল তার। আর-একটু সহৃদয় হলে—মানুষ সম্বন্ধে আর একটা করুণা থাকলে, কোনো ক্ষতি ছিল না।

ভাবতে ভাবতে প্রশান্ত চকিত হল। সামনেই কম্পাউণ্ডার

'স্যার কখন ফিরলেন?'

'তিনটেয়।'

'খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ, হল।'

কম্পাউন্ডার দাঁড়িয়ে আছেন দেখে প্রশান্ত একটু ব্যস্ততা দেখালো, 'কম্পাউন্ডারবাবু, দাঁড়িয়ে থাকবেন ? কিন্তু একটাই তো চেয়ার—কিসে যে আপনাকে বসতে দিই—'

'আপনি ব্যস্ত হবেন না স্যার—' কম্পাউন্ডার তটস্থ হয়ে উঠলেন : 'এ তো আমার ঘর-বাড়ি। বসবার জন্যে কোনো তাড়া নেই। তা কেমন দেখলেন কেস ?'

'মেনিনজাইটিস। আজকের দিনটা না কাটলে বলা যাবে না।'

বারান্দার একটা কাঠের থামে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন কম্পাউন্ডার। বললেন : 'ওষুধ দিতে পারেন, চিকিৎসাও করতে পারেন, কিন্তু বাঁচাতে পারবেন না। পথ্য কোথায়, সেবা করবে কে ? পণ্ডশ্রমই করবেন, কোনো লাভ হবে না।'

প্রশান্ত জবাব দিল না। কম্পাউন্ডারের মনস্তত্ত্ব সে বুঝতে পেরেছে। দুজনের চিন্তা কোথাও মিলবে না।

একটা মৃদু হাসির রেখা ভূপালবাবুর ঠোঁটে ফুটল কি ফুটল না। তারপর আবার বললেন, 'আমিও ফিরেছি এইমাত্র। একটু আগেই।'

'কোথায় গিয়েছিলেন ?'

'তিনদীঘি। ইদ্রিসসাহেব ডেকেছিলেন।' যেন রসিয়ে রসিয়ে বলতে লাগলেন কম্পাউন্ডার : 'একটা নাতি হয়েছে একটা নাগাদ। হেলদি, নর্ম্যাল। কিছুই করতে হয় নি, গিয়ে বসে ছিলাম। পঞ্চাশ টাকা দিয়েছেন।'

প্রশান্ত হাসল।

'আপনি গেলে অন্তত একশো টাকা—'

'কী করা যাবে, কপালে নেই।'—প্রশান্তর হাসিটা তীক্ষ্ন হয়ে উঠল : 'আমার জন্যে অবশ্য চারটে টাকার যোগাড় হয়েছিল, কিন্তু নিতে পারি নি। নেওয়া গেল না।'

এবার চুপ করে রইলেন কম্পাউন্ডার। তারপর কেটে কেটে বললেন, 'কিন্তু স্যার, কাজটা বোধ হয় ভালো করলেন না। ওদের চটানোটা ঠিক নয়—বেপরোয়া জমিদার সব, অপমান ওরা ভোলে না।'

ধক করে উঠল প্রশান্তর চোখ : একটা মানুষের জীবনের কোনো দাম নেই, বড়োলোকের খেয়াল মেটানোই আমার কাজ ?

'কে অপমান ভুলল কি না ভুলল তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই কম্পাউন্ডারবাবু। আমার ডিউটি আমি জানি।'

'নিশ্চয় স্যার, নিশ্চয়। তবে অনেক দেখেছি কিনা এ-সব, বয়েসেও ঢের বড়ো, তাই একটুখানি বলছিলুম আর-কি। আচ্ছা বসুন, আমি চলি।'

চলে গেলে প্রশান্ত আবার খানিকটা বিস্বাদ হাসি হাসল। ছোট

ডাক্তারবাবু যখন পঞ্চাশ, তখন বড়ো ডাক্তারের একশো তো নিশ্চয়ই, সুলেমানকে চাপ দিলে হয়তো দুশো টাকাও বেরিয়ে আসত। কিন্তু সবার ভাগ্য সমান হয় না—হাতে পাওয়া চারটে টাকাও সে নিতে পারল না।

লাভের মধ্যে ইদ্রিস চৌধুরীর মতো দুর্দান্ত একজন এম-এল-এ-কেও শত্রু করে তুলল। ঠিক কথা, উপদেশ কম্পাউন্ডার নিশ্চয়ই দিতে পারেন।

আবহাওয়াটা যে থমথমে হয়ে আছে, সেটা বুঝতে বাকি ছিল না ডাক্তারের। পরের দিন ডিসপেনসারিতে গিয়েই সেটা যেন আরো বেশি করে টের পাচ্ছিল সে। কেউ যে কোনো কথা বলছিল তা নয়, তবু মনে হল অনেকগুলো চোখে আজ একটু আলাদা দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। এদের কেউ কেউ কাল ডাক্তারখানায় হাজির ছিল, জয়নন্দীর সঙ্গে তার চলে যাওয়াটা দেখেছিল, সুলেমানের আসা-যাওয়া এবং তার পরের ব্যাপারটাও হয়তো ওদের জানা। ইদ্রিস চৌধুরীর মতো মানী লোকের অপমানের খবরটাও নিশ্চয় তাদের কাছে পৌঁছে গেছে।

তা হোক, তাতে কিছু তার আসে যায় না। কম্পাউন্ডারের মুখে ছায়া ঘনিয়ে আছে, থাকুক। প্রশান্ত নিজের মনে কাজ করে যেতে লাগল।

'ডাক্তারবাবু!'

জয়নন্দীর গ্রামের সেই লোকটি। যার হাতে সে ওষুধ আনতে পাঠিয়েছিল।

'কী খবর ?'

'অনেক ভালো, বাবু। আজ আর ভুল-টুল বকছে না, জ্বর অনেক নেমে গেছে।' কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ: 'আপনার দয়াতেই বোধ হয় এ-যাত্রা বেঁচে গেল বাবু।'

প্রশান্ত আরো দু-চারটে দরকারী খবর নিলে। তারপর কয়েকটা ওষুধ দিয়ে বললে, 'ঠিক আছে, এগুলো চলুক। যদি দরকার হয়, কাল আমি যাব।'

সমস্ত গ্লানি ছাপিয়ে এই তৃপ্তিটুকুই আজ মনে বাজতে লাগল বার বার যে, একটা লোককে সে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। ডাক্তারখানায় দরকারী ওষুধ নেই, তার অভিজ্ঞতাও সামান্য, হয়তো মরতে মরতে যারা বাঁচে তাদের সেই প্রাণশক্তিতেই লোকটা ক্রাইসিস কাটিয়ে উঠেছে, তবু উপলক্ষ হওয়ার যৎকিঞ্চিৎ গৌরবটুকুই তার লাভ। এই লাভটুকুর জন্যেই পৃথিবীর সব ইদ্রিস চৌধুরীদের ক্ষমা করা চলে। মনের ভার তার অনেকটা লঘু হয়ে এল।

হাসপাতালের কাজ সেরে কোয়ার্টারের দিকে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় কল এল একটা। আধবুড়ো একজন হিন্দুস্থানী। বেশ ঝরঝরে করে বাংলা বলে।

'একবার চিতলমারীর খেয়াঘাটে যেতে হবে, বাবু।'

'চিতলমারী ? সে কোথায় ?'

'বন্দর থেকে দেড় মাইল পুবে। আমি ঘাটোয়াল।'

'কার অসুখ ?'

'আমার ভাইয়ের। অনেকদিন ধরে জ্বর। মাঝে মাঝে ছাড়ে, আবার হয়। এখন হাত-পা-মুখ বিলকুল ফুলে গেছে। নড়াচড়া করতে পারে না ভালো করে। এখান থেকে তো অনেকবার দাওয়াই নিয়ে গেছি। দু-দিন ভালো থাকে, আবার বোখার আসছে। এখন আর উঠতে পারে না। না-হলে গাড়ি করেই নিয়ে আসতাম।'

আরো দু-চারটে কথা জিগ্যেস করে প্রশান্তর মনে হল, রোগটা ক্রনিক ম্যালেরিয়া। বললে, 'আচ্ছা চলো। কিন্তু আমি তো সাইকেলে যাব, তুমি যাবে কী করে ?'

'জী, আমিও সাইকেল এনেছি।'

সাইকেল যখন এনেছে, তখন অবস্থা ঘাটোয়ালের ভালোই, অন্তত ডিস্ট্রিক-বোর্ডের ডাক্তারের চাইতে খারাপ নয়। প্রশান্ত হাসল। বললে, 'আচ্ছা, চলো।'

আপত্তি করল মথুর। বললে, 'অনেক বেলা হয়েছে, খেয়ে-দেয়ে বেরোন বাবু।'

'থাক, দেরি হবে।'

'এতদিন ধরে যে অসুখে ভুগছে বাবু, দু-ঘণ্টা দেরিতে তার কিছু হবে না।'

'তুই যে সত্যি সত্যিই ডাক্তার হলি দেখছি!'—প্রশান্ত বিরক্ত হয়ে তাকালো মথুরের দিকে ঃ 'একেই বোধ হয় সঙ্গগুণ বলে। কই হে, চলো ঘাটোয়াল।'

বন্দরের পাশ দিয়ে, মেঠো রাস্তার দু-ধারে আকন্দ, ভাঁট আর বৈঁচির ঝোপ ছাড়িয়ে, প্রশান্ত পৌঁছুল চিতলমারীর খেয়াঘাটে। জায়গাটা নির্জন, লোকের বসতি নেই ; ছোট নীল নদীটার ধারে খেয়া-মাঝির চালা। দুপুরের হাওয়ায় নদীর বালি উড়ছিল। দু-তিনখানা বড়ো বড়ো খেয়া নৌকো রয়েছে—মানুষ, গোরু, গাড়ি সব পার হয়।

চালার সামনে ছায়ার ভেতর গামছা পেতে জন-দুই শুয়ে ছিল, একজন বুড়ী বসে ছিল চুল মেলে দিয়ে। প্রশান্তকে দেখে উঠে দাঁড়ালো তারা, ভক্তিভরে বললে, 'গোড় লাগি ডাগদরবাবু।'

প্রশান্ত ঢুকল চালার ভেতরে। খাটিয়ায় তার রুগী কম্বল জড়িয়ে পড়ে আছে। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স হবে লোকটার। শরীরে কিছু নেই, কিন্তু হাত-পা-মুখ ফুলে একাকার। নেগ্‌লেক্‌টেড্‌ ম্যালেরিয়া এবং ফলে অ্যানিমিয়া। অথচ সময়মতন কয়েকটা কুইনাইন ইন্‌জেক্‌শন পড়লে—

বুড়ীটা এসে ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল। বোঝা গেল, এদের মা।

প্রশান্ত বললে, 'ভাবনা নেই, ভালো হয়ে যাবে। ওষুধের ব্যবস্থা করে
।'

'একটু তাড়াতাড়ি ভালো করে দিন ডাক্তারবাবু!'—ঘাটোয়াল মিনতি

করতে লাগল ঃ 'এত বড়ো খেয়াঘাট, একা সামলাতে পারি না—ভাইটা যদি চটপট ভালো হয়ে না যায়—'

প্রশান্তর রাগ হল।

'চটপট ভালো করে দেব, আমি কি ধন্বন্তরি নাকি? এতদিন চিকিৎসা করাও নি কেন? কী করছিলে বসে বসে?'

'ইলাজ তো করিয়েছি, বাবু। ছোট ডাক্তারবাবু তো কবার দেখে গেছেন।'

ছোট ডাক্তারবাবু, অর্থাৎ ভূপালচন্দ্র বাগচী। মাথার মধ্যে জ্বালা করে উঠল প্রশান্তর। চারদিকেই যেন লোকটার বিষাক্ত অপচ্ছায়া ছড়িয়ে আছে। এইসব স্বয়ংসিদ্ধ ডাক্তারের হাতেই যমরাজ তাঁর পরোয়ানা পাঠিয়ে দেন। একটা বিজাতীয় বিদ্বেষে প্রশান্ত ভাবল, এ নিয়ে কম্পাউন্ডারের সঙ্গে একটা ভালোরকম বোঝাপড়া করতে হবে তাকে। কম্পাউন্ডার যদি প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ না করেন, সে চিঠি দিতে বাধ্য হবে সিভিল সার্জনের কাছে।

একটু চুপ করে থেকে প্রশান্ত বললে, 'ঠিক আছে, কাল সকালে একবার হাসপাতালে যেয়ো। আর যদি লোক থাকে, তা হলে তাকে আজই শহরে পাঠিয়ে দাও, কটা ওষুধ আনাতে হবে।'

'এখানকার দাওয়াইয়ে সারবে না?'

তীব্র স্বরে প্রশান্ত বললে, 'না, সারবে না। মরে যাবে।'

ভয় পেয়ে থমকে গেল ঘাটোয়াল। তারপর মিনমিন করে বললে, 'আচ্ছা, তবে তো পাঠাতেই হবে।' কিন্তু তার কথার সুরে মনে হল, শহরে ওষুধ আনবার জন্যে লোক পাঠাবার প্রস্তাবটা তার আদৌ পছন্দ হয় নি। খুব সম্ভব কাল ডিসপেনসারিতেও যাবে না, বরং চুপিচুপি দেখা করে কম্পাউন্ডারকে বলবে ঃ 'বড়ো ডাক্তার কোনো কাজের নয়, কেবল গরিবকে ঝুটমুট খরচা করতে বলে। আপনিই চলুন ছোট ডাক্তারবাবু, আপনিই আমাদের মা-বাপ।'

মরুক, মরুক এরা। অজ্ঞানের দেনা এমনি করেই শোধ হতে থাকুক।

প্রশান্ত চালার বাইরে বেরিয়ে এল। রুক্ষভাবে বললে, 'আমি যাব এবার। ভিজিট দাও আমার।'

তিনটে টাকা নিয়ে এল ঘাটোয়াল।

একবার তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে চেয়ে দেখল প্রশান্ত। বললে, 'চার টাকা।'

'গরিব আদমি বাবু—'

কঠোর হয়ে প্রশান্ত বললে, 'অনেক টাকা দিয়ে ঘাট ইজারা নিয়েছ তুমি, কিন্তু তোমার রোজগার। পয়সা দিয়ে তুমি সাইকেল কিনতে পারো। চার টাকার কমে চলবে না।'

একটার পর একটা ব্যাপারে মন তেতো হয়ে আছে। শ্যামরতন প্রসাদ, ইদ্রিস চৌধুরী, হাসপাতালের স্টক—সবগুলো একসঙ্গে মিশে এক-একটা বিষফোড়ার মতো টনটন করতে থাকে। কিছুক্ষণ জোর করে ভুলতে চায়, আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তখন আর কারো মুখের দিকে তাকানো যায় না—সব একাকার মনে হয়, মানুষের ওপরে সমস্ত বিশ্বাস, সব ভালোবাসা হাওয়ার

মিলিয়ে যেতে চায়।

চার টাকাই নিল প্রশান্ত। তারপর সাইকেলে উঠতে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়ালো। সামনে নীল নদীটা—মাথার ওপরে আয়ত উজ্জ্বল আকাশ, চারদিকে গাছপালার অম্লান ছায়া, তবু এরই মধ্যে একটা বীভৎস পচা গন্ধ সব দিক আবিল করে তুলছিল। একটু একটু গন্ধ আগেই আসছিল, এখন নাড়ীর ভেতরটা একেবারে পাক দিয়ে উঠল।

'কিসের গন্ধ ঘাটোয়াল ?'

অর্থপিশাচ ডাক্তারের ওপর ঘাটোয়াল মনে মনে চটে গিয়েছিল। গম্ভীর-ভাবে বললে, 'নদী থেকে গন্ধ আসছে। মুর্দার।'

নদীতে মড়া ?

'কুকুর-গোরুটোরু নাকি ?'

'নেহি জী। আদমি।'

'মড়া মানুষ ? থানায় খবর দাও নি ?'

'কাঁহে ? ও তো বন্দর থেকে গাংসই করেছে।'

গাংসই ? একটু পরে বোধগম্য হল ব্যাপারটা। বন্দরের হিন্দুস্থানীদের এই নিয়ম। মড়া পোড়ানোর অনেক খরচা—ঝামেলাও বিস্তর। কে পোয়ায় ও-সব ? তাই মুখে আগুন ছুঁইয়েই নদীতে ফেলে দিয়েছে। এমন অনেক ফেলা হয়। জলে পচে, কাকে-শকুনে খায়, ডাঙায় ঠেকলে শেয়াল-কুকুরের ভোজ হয়।

চমৎকার।

গন্ধে নিঃশ্বাস আটকে আসছিল। তবু আরো কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল প্রশান্ত।

'এই জল তোমরা খাও ?'

'জী। এখানে আর পানি কোথায় পাব ?'

'হুঁ।'

সাইকেলে উঠে পড়ল প্রশান্ত। মেটে পথ, আকন্দ আর ভাঁটফুলের ঝোপের ভেতর দিয়েও ওই গন্ধটা যেন তার পিছে পিছে তাড়া করে আসতে লাগল।

হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, বেলা এখনো একটা বাজে নি। অর্থাৎ যতটা দেরি হবে ভেবেছিল তা হয় নি। একবার দারোগার সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার মতো যথেষ্ট সময় হাতে আছে তার।

দুপুরের খাওয়া সেরে দারোগা তখন বাইরের ইজিচেয়ারে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ ডাক্তারকে দেখে তটস্থ হয়ে উঠলেন।

'আরে, কী ব্যাপার ? মেঘ না চাইতেই জল ?'

'একটু দরকারী কথা ছিল।'

'বসুন—বসুন।'—উঠে প্রশান্তকে নিজেই একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে দারোগা বললেন, 'এখনো তো চান-খাওয়া হয় নি মনে হচ্ছে।'

'একটা কলে গিয়েছিলুম। আচ্ছা দারোগাসাহেব—'

'বলুন।'

'বন্দরের এই গাংসই ব্যাপারটা বন্ধ করতে পারেন না ?'

'গাংসই ?' —দারোগা মুখ বাঁকালেন : 'ওটা একটা পজিটিভ নুইসেন্স। নদীতে মড়া দেখে এলেন বোধ হয় ?'

'পচে গন্ধ ছাড়ছে জলে। এপিডেমিক হবে যে।'

'হবে না।'—দারোগা হাসলেন ঃ 'ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে।'

শেষ কথাটার উত্তর দিতে প্রবৃত্তি হল না প্রশান্তর। বললে, 'কিন্তু আপনি এ-সব বন্ধ করে দিন।'

'খেপেছেন মশাই! আমি বন্ধ করবার কে। বন্দরের মহাজনরা মারতে আসবে যে।'

'বন্দরের মহাজনদের ডিক্টেশনেই চলবে নাকি সব ? আইন বলে কিছু নেই ?' —প্রশান্তর গলা ঝাঁজিয়ে উঠল।

'আরে, আইনের কথাই তো বলছি। গাংসই নাকি হিন্দুধর্মের ব্যাপার। ও-সবে বাধা দিয়ে একটা কম্যুনাল গোলমাল পাকিয়ে তুলব নাকি ? শেষে চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ুক আমার।'

'কিন্তু তাই বলে—'

দারোগা হাসলেন।

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন প্রশান্তবাবু, এ-সব এদের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। কোনো অসুবিধে হয় না। বন্দরে কারো স্মল-পক্স হলে তার প্রথম ট্রিটমেন্ট কিভাবে হয় সেটা জানেন আপনি ? গায়ে চর্বিওলা কোনো মোটা রুগীকে জড়িয়ে শুয়ে থাকে—তার চর্বির উত্তাপে নাকি বসন্ত ভালো হয়ে যাবে। লড়তে পারবেন এ-সবের বিরুদ্ধে ? আপনারা ডাক্তারখানা করেছেন করুন, কিন্তু শীতলা আছে, পীরের থান আছে, ঝাড়ফুঁক আছে, চোদ্দ-পুরুষের সংস্কার আছে, তা থেকে কিছুতেই এদের টেনে বের করতে পারবেন না। আপনি আপনার মতো থাকুন, এদের এদের মতোই থাকতে দিন। খামোকা ঝামেলা বাড়াবেন না মশাই, কোনো লাভ হবে না।'

'তা হলে গাংসই বন্ধ করা যাবে না ?'

'না।'

প্রশান্ত উঠে পড়ল। দারোগা বেরিয়ে এলেন সঙ্গে সঙ্গে।

'একটা কথা বলব প্রশান্তবাবু ?'

'বলুন।'

'একটু মানিয়ে চলুন সকলের সঙ্গে।'—দারোগা একটু কাশলেন ঃ 'আইডিয়ালিজম্ ভালোই, কিন্তু কখনো কখনো একটু কম্প্রোমাইজ করে নিতে হয়। মানে, ইউ শুড বি মোর রিয়্যালিস্টিক।'

দারোগার চোখের দিকে একবার চেয়ে দেখল প্রশান্ত। ইদ্রিস চৌধুরী, শ্যামরতন, রামরতন, কম্পাউন্ডার—অনেক-কিছুর ইঙ্গিত একসঙ্গে ছিল সেখানে।

'চেষ্টা করব।'

প্রশান্ত চলে এল, দারোগা দাঁড়িয়ে রইলেন।

স্নান করে খেতে খেতে আড়াইটে বাজল। চন্দনার আসবার সময়। সমস্ত বিরক্তি আর বিতৃষ্ণার ভেতরে এই সময়টুকু এক অপরূপ স্নিগ্ধতা বয়ে আনে তার কাছে। কবে, কোথায় দেখা একটা পুরোনো দীঘির ঘন সবুজ, স্নিগ্ধ-নিবিড় একরাশ পদ্মপাতা যেন কেউ তার শরীরে মনে মেলে দেয়, চন্দনার চোখে জলের শীতলতা ছলছল করে। ভূপাল বাগচীর আর-একটু ভালো লোক হতে ক্ষতি কী ছিল?

দুপুরের ঝিম-ধরা রোদে আবিষ্ট হয়ে প্রশান্ত যখন চন্দনার জন্যে অপেক্ষা করছিল, তখন চন্দনা এল না, এল মথুর। এক টুকরো ছোট চিরকুট তার হাতে।

'আজ পড়তে আসা হবে না, বাড়িতে লোক এসেছে। আমার খুব খারাপ লাগছে।'

প্রশান্তর নিঃশ্বাস পড়ল। দুপুরের রোদ ছুরির মতো ধারালো, শুকনো গলায় একটা কাক ডাকছে। তবু ওই কাঁচা অক্ষরগুলোও একটা শীতল স্বাদ বিন্দু বিন্দু ঢেলে দিচ্ছিল মনের ওপর, জল ঝরছিল পদ্মপাতা থেকে।

দুপুরবেলায় আজো প্রতীক্ষায় চকিত হয়ে বসে ছিল ডাক্তার। যথাসময়ে বাইরে সেই চেনা হালকা পায়ের শব্দটা এল। চুড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল, স্নানের গন্ধটা দূর থেকেই খবর দিল : 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।'

'আসব?'

'আসবে বইকি।'

চন্দনা এসে দাঁড়ালো। কিন্তু হাতে খাতা-বই ছিল না।

'কী হল? পড়াশুনোর মতলব নেই নাকি?'

চন্দনাকে বিষণ্ণ দেখালো একটু।

'আজ পড়া হবে না। কালও না।'

'হঠাৎ?'—প্রশান্ত একটু আঘাত পেল : 'একেবারে তিন দিনের অনধ্যায় কেন? কী এত গুরুতর কাজ?'

চন্দনা ম্লান মুখ তুলে বললে, 'গোরুর গাড়ি এসেছে, আমার মাসতুতো ভাই অমলদা এসেছে। আমরা এখুনি চলে যাব রাজনগরে। পরশু সকালে আসব।'

'রাজনগর? সে কোথায়?'

'চোদ্দ-পনেরো মাইল এখান থেকে। সেখানে মেসোমশাই ব্যবসা করেন। মহিষমর্দিনীর মন্দির আছে—খুব জাগ্রত দেবতা। মা সেই মন্দিরে পুজো দিতে যাবে মানতের।'

'মানত কেন?'

'আমার জন্যেই। গত বছর টাইফয়েড হয়েছিল খুব, বাঁচবার আশাই ছিল না। তাই—'।

প্রশান্ত স্নিগ্ধ চোখ বুলিয়ে নিলে চন্দনার ওপর। বললে, 'তা হলে যাও, নিশ্চয় যাওয়া উচিত। এই দুটো দিন যদিও আমার খুব খারাপ লাগবে, তবু—' একটু চুপ করে থেকে বললে, 'তোমার বাবাও তা হলে যাবেন নিশ্চয়। কিন্তু আমাকে কিছুই বলেন নি এখনো।'

'বাবার অনেক কাজ—যেতে পারবেন না। আমি আর মা যাব অমলদার সঙ্গে। কিন্তু—' চন্দনার দৃষ্টি ছলছল করে উঠল: 'আমার একেবারে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'না—ঘুরে এসো। তুমি ভালো করে পুজো দিয়ো, আর আমি দু-দিন ধরে তোমার কথা ভাবব, শুধু তোমার কথাই ভাবব।'

চন্দনা আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর বললে, 'একটা প্রণাম—'

প্রশান্ত নেমে দাঁড়ালো। প্রণাম সেরে উঠল চন্দনা। আর যথারীতি কয়েকটা তপ্ত মুহূর্ত মূর্ছিত হয়ে রইল শরীরের নিবিড়তায়। চন্দনাকে দু-হাতের মধ্যে জড়িয়ে রেখে প্রশান্ত বললে, 'আমার জন্যে কিছু প্রার্থনা করবে না মহিষমর্দিনীর কাছে।'

'সেইজন্যেই তো যাচ্ছি।'—চন্দনা ফিসফিস করে বললে।

'আমি তো নাস্তিক।'

'তা হোক।'—চন্দনা হাসল।

'কিন্তু কী প্রার্থনা করবে?'

'ও মেয়েদের কথা। তোমাদের শুনতে নেই।'

তোমাদের! কথাটা গান হয়ে বেজে উঠল বুকের মধ্যে। কিন্তু আর দাঁড়ালো না চন্দনা। বললে, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে, মা ডাকবে এখুনি।'

একটু পরে দুখানা গোরুর গাড়ি চলে যাওয়ার আওয়াজ পেল প্রশান্ত। গলা বাড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে হল একবার, কিন্তু লোভটা সামলে নিলে। 'তোমাদের' শব্দটায় মন ভরে নিয়ে মাতাল মৌমাছির মতো মগ্ন হয়ে রইল সে, ভাবতে লাগল—আর দেরি নয়, এবার যে-কোনো একদিন সময়-সুযোগ বুঝে কথাটা কম্পাউন্ডারবাবুকে বলা দরকার।

কিন্তু—কিন্তু—আপত্তি করে বসবেন না তো? এই নির্বোধ গোঁয়ার ডাক্তারকে পাত্র হিসেবে তাঁর পছন্দ হবে?

কথাটা ভাবতেই তার হাসি পেল। কম্পাউন্ডারকে সে চিনেছে। তার মতো পাত্রকে হাতছাড়া করবেন, এমন কাঁচা লোক তিনি নন। কম্পাউন্ডারের কথা মনে হতে একটু সংকুচিত হল সে—মানুষ হিসেবে ভূপালচন্দ্র বাগচীকে আর একটু—

কিন্তু তাঁর স্ত্রী। তাঁর স্নেহভরা মুখখানাকে সে দেখেছে। আর চন্দনা। না—কম্পাউন্ডারকে ক্ষমা করা চলে।

ডিসপেনসারির স্টকগুলো একবার মিলিয়ে নেওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু এখন থাক, সব বেসুরো হয়ে যাবে।

পরদিন বিকেলে এক বোতল কার্বলিক অ্যাসিড এনে বাড়ির চারদিকে পিচকিরি দিয়ে ছড়াচ্ছিল মথুর। প্রশান্ত জিগ্যেস করল : 'কেন রে ?'

'বৃষ্টি নামলে এদিকে ভারি সাপের উৎপাত হয় বাবু। কাল রাতে মনে হল, ওই ঘাসবনটার ভেতরে গোখরো সাপের মতো মস্ত কী-একটা ঢুকল। লাঠি নিয়ে আমি খুঁজলাম, পেলাম না। গত বছর বর্ষায় এই ডিসপেনসারির এদিকে-ওদিকে আমরা তিন-চারটে বড়ো বড়ো সাপ মেরেছি—বাবু। এই জল পড়তে শুরু হয়েছে, এখন একটু সাবধান থাকবেন। রাত্তির বেলা আলো না নিয়ে বেরোবেন না।'

'আচ্ছা।'

মথুর চলে গেলে প্রশান্ত উঠল। ভাবল, একবার দারোগার ওখানেই যাবে। কালও তিনি হাঁক দিয়ে গেছেন এক ফাঁকে : 'কী মশাই, আমাদের যে আর মনেই পড়ে না!'

কিন্তু বেরুনো হল না। ঘোড়ার পায়ের শব্দ। নুরুদ্দীন।

আজ আর বারান্দায় বসল না। সোজা চলে এল ঘরে। শব্দ করে টেনে নিলে চেয়ারটা। বিনা ভূমিকায় বললে, 'ডাক্তার, আমি জানতুম। কেলেঙ্কারি বাধিয়ে তো ছাড়লে ?'

'কী করতে তুমি বলো দোস্ত ?'—নুরুদ্দীনের মুখোমুখি বিছানাটার কোণায় বসে পড়ল প্রশান্ত। সেও সোজাসুজি চলে এল আলোচনার ভেতরে : 'যে পেশেন্টকে আমাকে দেখতে পর্যন্ত দেওয়া হল না, যাকে ডেলিভারিও আমি করাবো না—কেন যাব তার কাছে ? ডাক্তারের কাজ রোগীকে অ্যাটেন্ড করা—বড়োলোকের বাড়িতে সাক্ষীগোপাল হয়ে বসে থাকা নয়।'

'ডাক্তার, এরা যুক্তি বোঝে না। এরা বড়োলোক, এদের টাকা আছে।'

'টাকাটাই দুনিয়ায় সব নয়।'

'এখন তাই বলছ, বয়েস বাড়লে অন্যরকম বুঝবে। তোমাদের কম্পাউণ্ডার-বাবু তা বুঝে নিয়েছেন।'

'কিন্তু একটা লোক মরে যাবে, আর আমি—'

'কে মরবে, একজন চাষা তো ? ওরা অমন মরে। যখন কলেরা-টলেরা লাগে, তখন সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা গিয়ে পৌঁছুবার আগে আধখানা গ্রাম সাফ হয়ে যায়। কুকুর-বেড়ালের মতো কাবার হয়ে যাওয়ার জন্যেই খোদা ওদের পাঠিয়ে দেন।'

রুক্ষ স্বরে প্রশান্ত বললে, 'খোদা ওদের কেন পাঠান সে আমার জানবার কথা নয়। ডাক্তারী শাস্ত্রে প্রত্যেক মানুষের জীবনের দাম এক—সে রাজা-মহারাজাই হোক আর পথের ভিখারীই হোক।'

নুরুদ্দীন আস্তে আস্তে বললে, 'ডাক্তার, এখানে তুমি টিকতে পারবে না।'

'সে জানি। টেকবার জন্যে আসি নি। সুপারনিউমারিতে এসেছি—হয়তো আর এক মাসের মেয়াদ।'

নুরুদ্দীন বললে, 'তা হোক। কিন্তু তাই যদি, তা হলে কেন এদের সঙ্গে

মানিয়ে চললে না ? কেন গোলমাল পাকিয়ে তুললে ? জানো, তোমার নামে চিঠি যাচ্ছে সিভিল সার্জনের কাছে ?'

'কী মর্মে ? মুমূর্ষু রোগী ফেলে বড়োলোকের বৈঠকখানায় চা খেতে যাই নি, সেইজন্যে ।'

'না ।'—নুরুদ্দীন আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল : 'না । তোমার বিরুদ্ধে চার্জ নানা রকম । তুমি অভদ্র, তুমি দুর্মুখ । লোক্যাল রেসপেকটেবল ম্যানদের সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার । ডিসপেনসারি বোর্ডের মেম্বার রামরতন প্রসাদকে পর্যন্ত তুমি অপমান করো । হসপিট্যালের ওষুধ নিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিসে ব্যবহার করো—মরণাপন্ন রোগীর জন্য ডাকতে এলে তুমি গালাগাল করে তাড়িয়ে দাও ।'

শুনতে শুনতে প্রশান্তর দম আটকে এল ।

'দোস্ত—এ-সব মিথ্যে, সব মিথ্যে কথা । বরং এরাই আমাকে—'

'আমি জানি । মদ খাই, বয়ে গেছি, কিন্তু ডাক্তার, আমি খাঁটি মানুষ চিনি । নইলে দোস্তি পাতাতুম না তোমার সঙ্গে । কিন্তু আমার চাচা হাজী, রামরতন প্রসাদ শিবমন্দির তৈরি করেছেন, দু-বেলা বন্দরের ষাঁড়গুলোকে চাল-কলা খেতে দেন । এঁরাই তো সত্যবাদী—পা থেকে মাথা পর্যন্ত পাঁক ! এঁরা ত্রিশ-চল্লিশ জন মিলে তোমার বিরুদ্ধে দরখাস্তে সই দিচ্ছেন, কাল তা রেজিস্ট্রি হবে ।'

দাঁতে দাঁত ঘষল প্রশান্ত ।

'আমি কালই যাব শহরে । সব বলব গিয়ে সিভিল সার্জনকে ।'

'ফল কী হবে ? তোমাকে সরিয়ে নেবে, অন্য ডাক্তার পাঠাবে । আগের বুড়ো ডাক্তার মুকুন্দ ঘোষ তো এদের সঙ্গে মানিয়ে চলল অনেক কাল, শেষে কম্পাউন্ডারের কতগুলো চুরির ব্যাপারে—'

'কী বললে !'

'আরে হ্যাঁ-হ্যাঁ । কম্পাউন্ডারের এত পশার কেন বোঝো না ? ওষুধ-পত্তর চুরি করে নিজে তা দিয়ে প্র্যাকটিস চালায়—আলাদা করে দাম আদায় করে । মুকুন্দ ঘোষ একটু তড়পেছিল তাই নিয়ে, বলেছিল, ভূপাল বাগচীর চাকরি খেয়ে দেবে ।'—একটু দম নিলে নুরুদ্দীন : 'আরে বাগচীকে ঘাঁটানো মানেই রামরতনের ল্যাজে পা দেওয়া, তিনদীঘির চৌধুরীদের সঙ্গে গোল বাধানো । শেষে বুড়ো পালাবার পথ পেল না । তোমার দশাও ঠিক তাই । চলে এমনিতেই যেতে, মাঝখান থেকে—'

নিথর হয়ে বসে রইল প্রশান্ত । আসবার দিন গাড়োয়ান ওয়াহেদ বকসের কথাগুলো বাজতে লাগল কানে—সব-কিছুর একটা অর্থ এইবার স্পষ্ট হয়ে গেল ।

নুরুদ্দীনও চুপ করে রইল কিছুক্ষণ । তারপর বললে, 'আর-একটা কথা বলব ?'

প্রশান্ত নিঃশব্দ আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো ।

'রাত-বিরেতে একা বেরিয়ো না, দূরের কল-টল এলে বুঝে যেয়ো। চৌধুরীদের পোষা সব পাঠান খুনে আছে, তারা হুকুম পেলে—'

আবার দাঁতে দাঁত ঘষে প্রশান্ত বললে, 'আচ্ছা।'

খানিক বাদে নুরুদ্দীন চলে গেল, আবার সাবধান করে দিলে, বললে, 'অসুবিধে বুঝলে আমাকে খবর দিয়ো।'

কিন্তু প্রশান্ত আর বিশেষ করে নুরুদ্দীনের কথা ভাবছিল না। মথুর চারদিকে কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল, সেই গন্ধে তার মনে হতে লাগল—সাপ শুধু দুটো-চারটে নয়, চারদিকে কিলবিল করছে এখানে। কোথাও বুঝি পা ফেলবারও জায়গা নেই।

আর চন্দনা। চন্দনাও তো কম্পাউন্ডারের মেয়ে। কে জানে, সবটাই সাজানো কিনা। কে জানে, তার মতো গর্দভকে ফাঁদে ফেলবার জন্য নিজের মেয়েকে তিনি লোভানি হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন কিনা।

গর্জন করে প্রশান্ত ডাকল: 'মথুর!'

গলার স্বরে আশ্চর্য হয়ে মথুর ছুটে এল।

'কম্পাউন্ডারবাবুকে ডাক তো একবার। ওষুধের ছোট আলমারিটা একবার দেখতে হবে।'

মথুর বললে, 'এজ্ঞে, তিনি নেই।'

'কোথায় গেছেন?'

'বন্দরে কী কেস আছে, ব্যস্ত হয়ে চলে গেছেন একটু আগে। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বললেন, ফিরতে রাত হবে।'

কেস—কম্পাউন্ডারের কেস! হিংস্র বিদ্বেষে প্রশান্তর মাথার শিরাগুলো যেন ফেটে যেতে চাইল। ডাক্তারীর 'ক' পর্যন্ত যার জানা নেই, সে ছোট ডাক্তার সেজে মানুষের জীবন-মরণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, হাসপাতালের দামী ওষুধ চুরি করে তার অপব্যবহার করে, পয়সা রোজগার করে! ক্রিমিন্যাল। এইসব লোকের জেল হওয়া উচিত।

কঠোর গলায় প্রশান্ত বললে, 'তুই ডিসপেনসারি খোল। আমি আলমারি দেখব।'

মথুর নড়ল না, দাঁড়িয়ে রইল।

'কী হল, যাচ্ছিস না?'

'একটা কথা বলব বাবু? আপনি দু-দিনের জন্যে এসেছেন, এমনিতেই গোলমাল হচ্ছে, এখন আর এ-সব নিয়ে না ঘাঁটিয়ে—'

তা হলে এ-ও সব জানে! চারদিক ঘিরে একটা চমৎকার নির্ভেজাল চক্রান্ত! বজ্রের মতো গর্জন করে উঠল প্রশান্ত।

'ডিসপেনসারির সুইপার তুই, এত কথায় তোর কী দরকার? যা—চাবি নিয়ে আয়।'

বিষণ্ণ হতাশ স্বরে মথুর বললে, 'আচ্ছা বাবু।'

॥ বারো ॥

রাত দেড়টার মতো—প্রায় কণ্টকশয্যায় শুয়ে ছিল প্রশান্ত, সব ওষুধপত্র মেলানো সম্ভব ছিল না, সে গোটা দিনের কাজ, কম্পাউণ্ডারবাবু না থাকলে তা সম্ভবও নয়। কিন্তু কন্ট্রোল্ড মেডিসিন্‌স্‌ আর ইন্‌স্ট্রুমেণ্টসের আলমারি পরীক্ষা করতে গিয়েই দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে গেল সব।

কয়েক মাস আগেও বেশ কিছু নতুন ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট এসেছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই পাত্তা নেই। যা আছে পুরোনো, মর্চে-ধরা ; অন্তত আট-আনা ওষুধের সন্ধান মিলল না।

ইন্‌স্‌পেক্‌শন হয় না ? নিশ্চয় হয়। কিন্তু ছ'টা রেল স্টেশন পেরিয়ে, তারপর গোরুর গাড়িতে আটাশ মাইল এসে কালেভদ্রে যে-ইন্‌স্‌পেক্‌শন হয় তার প্রহসনের কথা না ভাবলেও চলে। চোখ বুজে সই করে গেলেই হয়, আর রামরতন প্রসাদেরা তো আছেনই।

এমন একটা বীভৎস ডিসপেনসারি এর আগে সে দেখে নি। হয়তো সেগুলো শহরের কাছাকাছি বলেই বেপরোয়া মাৎস্যন্যায় চলে না সে-সব জায়গায়, এমন করে—

'ডাগদরবাবু—ডাগদরবাবু—'

দরজা খুলে বেরিয়ে এল প্রশান্ত। একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান।

'কী হয়েছে এত রাতে ?'

হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে যা বলল, তার অর্থ হচ্ছে মহাবীরপ্রসাদজী এত্তেলা দিয়েছেন। তাঁর বাড়িতে খুব 'বিমার'—'একঠো আউরত' বাঁচে কিনা সন্দেহ। এক্ষুনি যেতে হবে।

বন্দরের নাম শুনেই প্রশান্ত তেতে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আরো মনে পড়ল নুরুদ্দীনের কথা : 'রাত-বিরেতে কল-টল এলে একটু সাবধানে—'

প্রশান্ত বললে, 'আমি যাব না।'

'কেয়া বোলতে হেঁ ?'

'আমি যাব না।'

'জী— বহুৎ বিমার—'

প্রশান্ত চেঁচিয়ে উঠল : 'আমিও মানুষ, আমারও বিমার হতে পারে। যাব না আমি—যাও। আমার নামে বাবুদের শহরে দরখাস্ত করতে বলে দিয়ো।'

দড়াম করে দরজাটা সে বন্ধ করে দিলে।

আবার এসে শুয়ে পড়ল বিছানায়। কম্পাউণ্ডার—বন্দর—তিনদীঘি। একটা আগুনের চাকা সমানে ঘুরে চলেছে মাথার ভেতরে। এর মধ্যে চন্দনাকেই ঠিক কোনো জায়গায় সে বসাতে পারছে না। এত যে বিশ্রী ব্যাপারগুলো ক্রমাগত ঘটে যাচ্ছে, চন্দনা কি তার কিছুই জানে না ? না কি সব জানে, আর বাপের হুকুমমতো সেই চক্রান্তের শরিক হয়ে চমৎকার একটা স্বর্গীয় সরলতার অভিনয় করে যাচ্ছে ?

হৃৎপিণ্ডটা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, এমনি মনে হল।

'ডাক্তার—ও ডাক্তার—'

প্রশান্ত চিৎকার করে উঠতে চাইল: 'ক্লিয়ার আউট—' কিন্তু ডাকটা চেনা। দারোগার গলা। এত রাত্রে দারোগা!

সন্দেহে সংকীর্ণ হয়ে বেরিয়ে এল প্রশান্ত। হাসতে চেষ্টা করল প্রাণপণে।

'আদাব দারোগাসাহেব, আপনি?'

'কী করি, বলুন!'—দারোগা হাসলেন: 'মহাবীরপ্রসাদের লোককে তো আপনি হাঁকিয়ে দিলেন। জানি, আপনার শরীর খারাপ হতে পারে, আর বন্দর সম্বন্ধে—! সে যাক, কিন্তু একবার যেতেই হচ্ছে ভাই। আমার পার্সোন্যাল রিকোয়েস্ট। কেসটা খুবই সিরিয়াস। আমি জানি।'

'কী কেস?'

'গেলেই দেখতে পাবেন। ভয় নেই, সঙ্গে আমিও যাচ্ছি। মহাবীর আমার ফ্রেন্ড, তার বিপদ আমারও বিপদ বলে মনে করি। কষ্ট করে একটু রেডি হয়ে নিন।'

প্রশান্ত দেখল, দারোগার পেছনে দারোয়ানটা দাঁড়িয়ে। তার কাছে সুবিধে না পেয়ে খোদ বড়োবাবুকে ডেকে এনেছে। দারোগা সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছেন, যাওয়ার জন্যে তিনিও তৈরি। বন্ধুর জন্যে কী আশ্চর্য সহানুভূতি!

দারোগা আবার মিনতি করে বললেন, 'চলুন ভাই, চলুন। কিছু ভাবনা নেই, আমি সঙ্গে আছি।'

না—এক্ষেত্রে ভাববার কিছু নেই। অনিচ্ছুক শরীরটাকে সজাগ করে তুলল প্রশান্ত। মথুরকে ডেকে, দরজা বন্ধ করে বেরোল সাইকেল নিয়ে। সে আর দারোগা চলল পাশাপাশি, দারোয়ানটা টর্চ নিয়ে হেঁটে আসতে লাগল পেছনে পেছনে।

চাঁদ ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। অন্ধকারে থমথমে পথ দিয়ে, জলকাদার দুর্গম ঠেলে, ঘুমন্ত বন্দরের কুকুরগুলোকে জাগিয়ে দিয়ে পৌঁছোনো গেল মহাবীরপ্রসাদের বাড়িতে। মহাবীর একটা লন্ঠন হাতে বাড়ির বারান্দায় ভূতের মতো দাঁড়িয়ে। প্রশান্ত দেখল, লোকটার মুখ বিবর্ণ, তার দশাসই গোঁফজোড়া মুখের দু-পাশ দিয়ে অসহায়ভাবে ঝুলে পড়েছে।

দারোগা বললেন, 'খবর?'

কান্না-ভরা স্বরে মহাবীর বললেন, 'রামচন্দ্রজী ভরসা এখন। ডাগদর-বাবু, জলদি আইয়ে—'

মেয়েটির বয়েস বেশি নয়—সতেরো-আঠারো বড়ো জোর। সুশ্রী, সুকুমার। থুতনিতে একটা ছোট উলকি মুখখানাকে আর-একটু বিশিষ্ট করে তুলেছে, নাকে জ্বলজ্বল করছে একটি সোনার ফুল। মেয়েটি ঘুমুচ্ছিল।

ঘুমুচ্ছিল, কিন্তু সে আর জাগবে না। মেয়েটি মারা গেছে।

'দারোগাসাহেব, একি!'

দারোগা একটু কাশলেন: 'দেখতেই পাচ্ছেন।'

আরো কিছু দেখতে হল প্রশান্তকে। ঘরে তখনো হত্যা, মৃত্যু, রক্তের গন্ধ স্থির হয়ে আছে। প্রথমটা মাথা ঘুরে গেল, তারপর বমি আসতে চাইল গা গুলিয়ে।

'এই মেয়েটি আপনার কে হয় মহাবীরপ্রসাদবাবু?'

'আমার ওয়াইফের ডিসট্যান্ট বহিন লাগে—শালী।'

'কিন্তু আমাকে ডাকলেন কেন?'—প্রশান্ত শীতল দৃষ্টিতে মহাবীরের দিকে তাকালো: 'এ মরে গেছে!'

'মরে গেছে! হায় রাম—' মহাবীর ডুকরে উঠলেন: 'নন্দা মরে গেছে? হামার বিশোয়াস হয় না ডাগদরবাবু। নন্দা—নন্দা নিদ যাচ্ছে ডাগদরবাবু—'

আরো জোরে কেঁদে উঠতে যাচ্ছিলেন, প্রচণ্ড গলায় ধমক দিলে ডাক্তার।

'ও-সব কান্নাটান্না পরে হবে। এখন সোজা জবাব দিন। অ্যাবরশন করাতে গিয়েছিলেন?'

দারোগা একটা চেয়ারে চুপ করে বসে ছিলেন, নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগলেন। তাঁর চোখ দুটো স্থির হয়ে রইল প্রশান্তর দিকে।

'অ্যাবর—' একটা খাবি খেয়ে থেমে গেলেন মহাবীরপ্রসাদ। গলার মধ্যে যেন একটা ব্যাঙ ম্যাক্ করে উঠল তাঁর।

'হ্যাঁ, অ্যাবরশন।'—পাথুরে মুখে প্রশান্ত বললে, 'এর বিয়ে হয়েছিল?'

'নেহি। কুঁয়ারী।'

'তাই গর্ভপাত করাতে গিয়েছিলেন?'

একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁ করে চেয়ে রইলেন মহাবীরপ্রসাদ। যেন জাপানী ভাষা শুনছেন, যেন কথাটার কোনো মানেই তিনি বুঝতে পারছেন না।

'জবাব দিন। কাকে দিয়ে করিয়েছেন এই কাণ্ড? এই খুনেটা কে?'

ঘর নিস্তব্ধ হয়ে রইল। বাইরে প্যাঁচার ডাক আর প্রশান্তর দ্রুত নিঃশ্বাস ছাড়া একটা শব্দও শোনা যাচ্ছিল না কোথাও। দারোগার সিগারেটের ধোঁয়া কুয়াশার মতো ঘন হতে লাগল ঘরের ভেতর।

প্রশান্ত প্রশ্ন করল, কিন্তু উত্তরের দরকার ছিল না। ডাক্তারী অস্ত্রের অপটু প্রয়োগ পরিষ্কার চিনিয়ে দিচ্ছিল খুনীকে।

'কম্পাউণ্ডারবাবু?' প্রশান্তর স্বর আবার ঝনঝন করে বেজে উঠল। মহাবীরপ্রসাদ এবারও জবাব দিলেন না। কপাল বেয়ে তাঁর বড়ো বড়ো ফোঁটায় ঘাম নামতে লাগল।

দারোগা একটু কাশলেন।

'যেতে দিন ভাই, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন—'

'এখন—' প্রশান্ত বিদ্যুৎবেগে ফিরে দাঁড়ালো: 'এখন অ্যারেস্ট করুন মহাবীরকে, কম্পাউণ্ডারকে, অন্য অ্যাকমপ্লিস থাকলে, তাদের। আর লাশ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, আমি রিপোর্ট দেব।'

'নিশ্চয়।'—বি-এ পাস দারোগা ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন : 'লিগ্যালি তাই করা উচিত। কিন্তু ভাই—এ-সব বড়ো-ঘরের ব্যাপার, মহাবীর আমার বন্ধু, আপনি আমার জেলার লোক। এটা একটু চেপেই যেতে হবে, কী আর করা যাবে! আমি ইনটারেস্ট নিয়েছি। আপনি ম্যালেরিয়াল ডেথ বলে একটা সার্টিফিকেট—'

'আপনি এই কথা বলছেন!'—গলা চিরে আওয়াজ বেরুল প্রশান্তর : 'পুলিসের দারোগা হয়ে মার্ডারারদের আপনি শেল্‌টার দেবেন!'

'আহা, ডেলিবারেট মার্ডার তো নয়, একটা ফ্যামিলি প্রেসটিজ বাঁচাতে গিয়ে—'

'ক্রিমিন্যালের প্রেসটিজ! এ মার্ডারের চাইতেও জঘন্য—দু-দুটো হত্যাকাণ্ড। আপনি এদের অ্যারেস্ট করুন।'

দারোগা একটু হাসলেন।

'বলছি তো, আমি ইন্টারেস্টেড প্রশান্তবাবু, একটু সোবার হোন। এ-রকম কেস হামেশা ঘটেই থাকে, চাপাও পড়ে। আপনি একটা ন্যাচারাল ডেথ-সার্টিফিকেট লিখে দিন।'

মহাবীরপ্রসাদ একতাড়া নোট গুঁজে দিলেন প্রশান্তর হাতে। প্রশান্ত চেয়েও দেখল না—হাত ঝেড়ে ফেলে দিলে। নোটগুলো ছড়িয়ে গেল ঘরময়, একটা উড়ে গিয়ে মরা মেয়েটির করুণ মুখের ওপর পড়ল—বীভৎস দেখাতে লাগল।

শীতল স্বরে দারোগা বললেন, 'ডেথ-সার্টিফিকেট না হলেও ক্ষতি ছিল না, আমিই আজ রাতে লাশ জ্বালিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতুম। কিন্তু মহাবীরের শত্রুরা আছে, তারা আঁচ পেয়েছে, ব্যাপারটা বহুদূর পর্যন্ত গড়াতে পারে। তাই ইন্‌সিস্‌ট করা হচ্ছে আপনাকে। প্রশান্তবাবু, ওটা করে দিন, আপনার ভালোই হবে।'

'আমার ভালো!' তীব্র স্বরে প্রশান্ত বললে, 'ভয় দেখাচ্ছেন?'

'না। সাবধান হতে বলছি।'

বিস্ফোরক জ্বলে গেল মস্তিষ্কের ভেতরে। প্রশান্ত উদ্ধত তীব্র স্বরে বললে, 'জেনে রাখলুম। কিন্তু এইসব খুনীকে আমি ছেড়ে দেব না। কালই আমি টেলিগ্রাম করব শহরে, এস-পি'কে, ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেটকে। তারপর যা হওয়ার হোক।'

দারোগা উঠে দাঁড়ালেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'ডাক্তার, এখনো সময় আছে।'

'না—সময় নেই।'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল প্রশান্ত। মৃত্যু, হত্যা, রক্ত আর মিথ্যার চক্রান্ত কেটে প্রাণপণে ছুটে পালাতে চাইল ঘুমন্ত বন্দরের ভেতর দিয়ে। তারস্বরে কুকুরগুলো চিৎকার করতে লাগল পেছনে।

কিন্তু ফাঁদ পাতাই ছিল। বলাই ছিল, এমনি করে প্রশান্ত ছুটে পালালে কী করতে হবে তার জন্যে।

বন্দর ছাড়িয়ে মাত্র খানিক দূরে এগিয়েছিল সে। কিছু কিছু গরিব হিন্দুস্থানীর আড্ডা এখানে। ছোট ছোট খুপরি জাতের ঘর এদিক-ওদিক।

অশ্বের মতো ছুটছিল প্রশান্ত। হঠাৎ সামনে একটা লোক পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে গেল।

'ডাগদারবাবু হ্যায় না?'

এমনভাবে দাঁড়িয়েছে যে, পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না। সক্রোধে প্রশান্ত বললে, 'হ্যাঁ, আমি ডাক্তার। কী চাও?'

লোকটা কান্নাভরা গলায় বললে, 'আমার জরুর বহুৎ বোখার, বাবু—জেরা দেখ্‌কে জাইয়ে। সব কোই বোলে, আপ তো গরিবোঁ কো—'

'এখন আমার সময় নেই।'—পৃথিবীর সব বিরক্তি গলা থেকে উগরে দিয়ে প্রশান্ত বললে, 'কাল দাওয়াখানায় যেয়ো।'

'এক মিনট বাবু—ঘর হিয়াঁই হ্যায়। বহুৎ বোখার বাবু, বহুৎ বোখার। ভগোয়ান আপ্‌কো ভেজ দিয়া। এক মিনটকে লিয়ে—' ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল লোকটা।

জয়নন্দীকে মনে পড়ল প্রশান্তর। নিজের সব উত্তেজনা আর বিকৃতিকে প্রাণপণে দমন করে সে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। বললে, 'আঃ, তোমাদের জ্বালায়—আচ্ছা চলো।'

কয়েক গজ দূরেই ছোট্ট একটা খোড়ো ঘর। দরজা খোলা। ভেতরে একটা লণ্ঠন মিটমিট করছিল। চারপাইতে বুক পর্যন্ত চাদর ঢেকে আর একটি অল্পবয়েসী মেয়ে।

এও একটা অ্যাবরশন কেস? ধ্বক করে উঠল প্রশান্তর বুক। এগিয়ে গেল চারপাইয়ের দিকে। বললে, 'দেখি, তুমারা বেয়া হুয়া?'

স্বামী নামে লোকটি সেই মুহূর্তে চট করে দরজার শেকল টেনে দিলে বাইরে থেকে। আর চারপাই থেকে প্রায় অর্ধনগ্ন একটি স্ত্রীলোক হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। তারপর তারস্বর চিৎকার: 'বাঁচাও—বাঁচাও—হামারা ইজ্জত লেনে আয়া—'

মুহূর্তে বীভৎস নাটকটা বুঝতে পারল প্রশান্ত। আতঙ্কে, লজ্জায় মাথার চুল দাঁড়িয়ে গেল চক্ষের পলকে। ছুটে গেল দরজার দিকে। দরজা খুলল না—শিকল আটকানো।

'বাঁচাও—ইজ্জত বাঁচাও হামারা।'—মেয়েটা দানবীর মতো চিৎকার করতে লাগল।

কয়েকটা মিনিট নয়, যুগ-যুগান্ত। দরজা খুলল। দারোগা, সঙ্গে আরো কিছু লোক। সেই স্বামীটিও।

লোহার মতন শক্ত গলায় দারোগা বললেন, 'সাইকেলে করে বন্দর থেকে ফিরছিলুম। এখানে চিৎকার শুনে নামতে হল। ব্যাপার কী ডাক্তার—

হঠাৎ রাত দুটোর পরে এর ঘরে এসে ঢুকেছেন কেন ?'

প্রশান্ত ঘরের বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। একটা কথাও সে বলতে পারল না।

মেয়েটা অম্লান মুখে বলে চলল—তার স্বামী ভিন গাঁয়ে গিয়েছিল, ফিরতে রাত হচ্ছে বলে দরজা খুলে সে বসে ছিল, ঝিমুনিও এসেছিল একটু। হঠাৎ ডাক্তার এসে ঢুকে পড়ে, সে কিছু বোঝবার আগেই তাকে জাপটে ধরতে যায়, তার কাপড়া—

কানে আঙুল দিল প্রশান্ত। আর শোনা চলে না। মেয়েটার সেই স্বামীটি উত্তেজিতভাবে কী-একটা গল্প শুরু করেছিল, তাও সে শুনতে পেল না। কিন্তু চমক ভাঙল দারোগার ঠাণ্ডা মিষ্টি হাসিতে।

'ডাক্তার, তা হলে এইবার আপনাকেই অ্যারেস্ট করতে হয়। অ্যাটেম্‌প্‌ট টু—'

প্রশান্তর ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

'সাক্ষীর অভাব হবে না, এরা সবাই রয়েছে, আমি রয়েছি। বাধ্য হয়েই আপনাকে হাজতে নিয়ে যেতে হবে আমাকে। পুলিসের ডিউটি—কী করা যাবে ?'

দারোগা আবার হাসলেন : 'এইরকম একটা নোংরা কেসে হাজতে যাওয়া, জেল-খাটার চাইতে একটা ডেথ-সার্টিফিকেট লেখা অনেক সহজ—না ডাক্তার ?'

।। তেরো ।।

মার্তিনির বোতল সরিয়ে রেখে মাথা তুললেন ডাক্তার লাহিড়ী। অনেক রাত। দেওয়ালের ঘড়িতে প্রায় আড়াইটে। সেই আড়াইটে। ত্রিশ বৎসর আগেকার। হ্যাঁ, ডেথ-সার্টিফিকেট লিখতে হয়েছিল বইকি। দারোগার কথা কি ফেলা চলে ? তার জেলার লোক।

চলে আসবার আগের মুহূর্তে এসেছিল চন্দনা। তখন বাইরে বিস্তর মানুষ। নুরুন্দীন, জয়নন্দী, আরো অনেকে। তারা চোখের জল ফেলতে এসেছিল। আর ছিল ওয়াহেদ বক্‌সের গাড়ি, তাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

ডাক্তারের মাথায় তখন প্রলয় চলছিল। শুকনো গলায় বলেছিল, 'কী চাও ?'

'মহিষমর্দিনীর নির্মাল্য।'

নির্মাল্য ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল ডাক্তার। পৈশাচিক স্বরে বলেছিল, 'আমি ইডিয়ট, আমি অন্ধ। যদি প্রথম এসে ভালো করে সব চার্জ বুঝে নিতুম, যদি স্টক মেলাতুম, তা হলে অনেক আগেই সব আমার কাছে ধরা পড়ে যেত। কিন্তু তোমার ওই চোখ—ওই সরল পবিত্র চোখ দিয়ে সব আমার ভুলিয়ে দিলে তুমি। আমার সর্বনাশ করলে—আমাকে চুরমার করে দিলে। এই বয়েসেই তুমি আশ্চর্য অভিনেত্রী চন্দনা—ওই চোখ দিয়ে তুমি আরো

কতজনকে রসাতলে পাঠাবে তাই ভাবছি।'

চন্দনা কথা বলে নি। ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কেবল। আর—আর ত্রিশ বৎসর পরে ডাক্তারের স্পষ্ট মনে পড়ল, সেই টেবিলটার ওপর কার্বলিক অ্যাসিডের বোতলটা রেখে দিয়েছিল মথুর। চন্দনার বাঁ হাতটা ঠিক সেই বোতলটার পাশেই থরথর করে কাঁপছিল।

কতদিন—কতদিন পার হয়ে গেল। পদ্মপাতার দিনগুলো নিজের হাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে চলে এসেছিল সে। ক'টি জলের বিন্দু তা থেকে ঝরে পড়েছিল, তা সে জানতেও চায়নি। ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের চাকরি ছেড়ে মা-র বাছাই-করা মেয়েটিকেই বিয়ে করল সে, যার চোখ পিঙ্গল ছিল, যেখানে হরিণের দৃষ্টি কোথাও ছিল না। তারপর বিলেত গেল, আই-স্পেশালিস্ট হল, তারপর—

তারপর আর নেই। খুব নেশা হয়েছে, ঘুম নেমেছে, টলমলে পায়ে ডাক্তার এগিয়ে চললেন বিছানাটার দিকে। নরম গদির মধ্যে শরীর এলিয়ে দিলেন, হাত বাড়িয়ে ঘরের বড়ো বাতিটা নিভিয়ে জিরো পাওয়ারের ব্লু-লাইট জ্বাললেন—একটা সমুদ্র-রঙা আলোর ভেতর সমুদ্রগভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে থাকলেন তিনি।

শুধু শেষবার, আচ্ছন্ন চেতনার ওপর একটা বুদ্বুদের মতো জেগে উঠল : নাটকের শেষ অংশে যেখানে তিনি আর কোথাও ছিলেন না—আজ সেই অদেখা অংশটুকুও জানা হয়ে গেল। কার্বলিক অ্যাসিড ঢেলে তার হরিণ-চোখ দুটি বুঝি নিবিয়ে দিতে চেয়েছিল চন্দনা। একটা পেরেছিল, আর-একটা—

কিন্তু আর-একটার কথা আজ নয়। দু-মাস পরে। চন্দনার ভালো-মানুষ স্কুল-মাস্টার স্বামীটি যখন আবার স্ত্রীর চোখ দেখাতে নিয়ে আসবেন—সেই তখন।

ট্রফি

কবি গোবিন্দ চক্রবর্তী
প্রীতিভাজনেষু

বিক্রমজিৎকে প্রথম আমরা আবিষ্কার করি কলেজের মাঠে। ইণ্টারক্লাস ক্রিকেট টুর্ণামেণ্টে।

তখন আমাদের থার্ড ইয়ার। সেকেণ্ড ইয়ারের সঙ্গে ফাইন্যাল খেলা সেদিন। কলেজের মাঠে পৌঁছে দেখি, আমাদের ক্যাপ্টেন ব্যানার্জি বসে পড়েছে মাথায় হাত দিয়ে—প্লেয়ারদের মুখ ছাইয়ের মতো বিবর্ণ। ওদিকে সেকেণ্ড ইয়ারের দলটাতে চলেছে একটা উল্লসিত জটলা।

—ব্যাপার কী বানার্জি, কী হল? সমস্বরে জানতে চাইলাম আমরা।

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ব্যানার্জি, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

—সর্বনাশ! সে কি!

কালো মুখখানাকে আরো কালো করে ব্যানার্জি বললে, অখিল সেন ডুবিয়েছে আমাদের।

অখিল সেন! বলে কী! আমাদের ক্লাসের চৌকোস খেলোয়াড় সে। মারাত্মক ফাস্ট বোলার, তেম্‌নি দুর্দান্ত ব্যাটসম্যান—কলেজের ব্র্যাডমানই বলা যায় তাকে। ফার্স্ট ইয়ারের সঙ্গে খেলায় একাই বিরাশী রাণ তুলেছিল অখিল সেন। দুর্দান্ত তার ক্যারিয়ার, প্রতিপক্ষের সে মূর্তিমান আতঙ্ক।

—কী হয়েছে অখিলের?

—একশো চার জ্বর। চোখ টকটকে লাল, ভুল বকছে। এতক্ষণ বসে বসে আইস্‌-ব্যাগ দিচ্ছিলাম, যদি কোনোমতে টেম্পারেচারটা নামিয়ে-টামিয়ে মাঠে এনে হাজির করতে পারি। কিন্তু উঁহু—একেবারে ইম্‌পসিব্‌ল।

এবার ব্যানার্জির পাশে আমরাও বসে পড়লাম। মাঠে নয়, স্রেফ পথে বসলাম।

—উপায়?

—উপায় নেই—কান্নাভরা গলায় ব্যানার্জি বললে, সিয়োর ট্রফিটা সেকেণ্ড ইয়ারই নিয়ে গেল।

একজন মরীয়া হয়ে বলে ফেললে, ছাড়া হবে না অখিলকে। ওই অবস্থাতেই টেনে নিয়ে এসো ফিল্‌ডে।

—তারপর? উকিলের ছেলে ব্যানার্জি নিদারুণ মনোভঙ্গে আর বিরক্তিতে বিশ্রী মুখ করে খিঁচিয়ে উঠল: তারপর মাঠে এসে প্রাণটা দিলে কাল্‌পিব্‌ল হোমিসাইডের ধারায় ফাঁসিতে ঝুলবে কে—তুমি?

ওদিকে আর সময় নেই তখন।

অসহায় ভাবে উঠে দাঁড়ালো ব্যানার্জি। বললে, একজন শর্টই খেলতে হবে দেখছি। কেউ রাজী হচ্ছে না—আর নিচের ক্লাসের ছেলেদের কাছে অপদস্থ হতেও রাজী নয়। আর জানি তো সব কটাকেই—বল পিটতে গিয়ে তো স্রেফ উইকেট উড়িয়ে দেবে।

—তা হলে উপায়?

—ভগবান।—কলেজের ডিবেটে ব্যানার্জি ঈশ্বরকে তুলোধুনো করে উড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু এবার তার গলার সত্যিকারের আধ্যাত্মিকতার সুরে

এসে গেল ঃ তিনি ভরসা।

পাশ দিয়ে সাইকেলে করে যাচ্ছিল সেকেণ্ড ইয়ারের একটা ছাত্র। কথাটা বোধ হয় শুনে ফেলেছে। টিপ্পনী কেটে গেল ঃ এলাহী ভরসা।

ব্যানার্জির চোখ ধ্বক্ করে উঠল ঃ উঃ, কী অপমান! এমন একজন কেউ নেই যে থার্ড ইয়ারের মুখ রাখতে পারে? অসহায়ভাবে চারদিকে তাকাতে তাকাতে ব্যানার্জি হঠাৎ খপ করে বিক্রমজিতের হাত চেপে ধরল ঃ এই যে, তুমিই নেমে পড়ো।

বিক্রমজিৎ এতক্ষণ নীরবে শুনে যাচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে নিঃশেষ করে চলেছিল পুরো একটি ঠোঙা চীনেবাদাম। ব্যানার্জির কথায় হাত থেকে ঠোঙাটা পড়ে গেল তার। বজ্রাহতের মতো থমকে দাঁড়িয়ে গেল সে।

—আমি! বিক্রমজিৎ সভয়ে বললে, আমি!

—হাঁ—হাঁ, তুমি—চলে এসো—

—কিন্তু জীবনে আমি কখনো ক্রিকেট ব্যাট ধরিনি যে—একান্ত অসহায় শোনালো বিক্রমজিতের স্বর।

—কুছ্ পরোয়া নেই। রাণ করবে সে ভরসা রাখি না, তবে একটা জায়াগান্টিক ফিগার তো রয়েছে। ভয় ধরিয়ে দিতে হবে—সেইটেই আসল কথা। এসো নেমে পড়ো—

ব্যানার্জি বিক্রমজিতের হাত ধরে আকর্ষণ করল।

—হারি আপ!

আর ভাববার সময় না দিয়ে একটানে বিক্রমজিৎকে নিয়ে মাঠে নেমে পড়ল ব্যানার্জি। বিক্রমজিৎ ক্ষীণকণ্ঠে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু আমাদের সমবেত জয়ধ্বনিতে তার কথা মুহূর্তে গেল তলিয়ে।

সেদিনকার সে খেলার কথা ভুলব না। মাঠের মাঝখানে কী আশ্চর্য মহিমাতেই যে দাঁড়িয়েছে বিক্রমজিৎ! সমস্ত প্লেয়ারদের সঙ্গে তুলনা করে তাকে মনে হচ্ছে সম্রাটের মতো। টক্‌টকে গায়ের রঙ—লম্বায় পাঁচ হাতের চেয়ে বেশি উঁচু—যেমন স্বাস্থ্যবান, তেমনি সুপুরুষ। খাঁটি রাজপুতের ছেলেই বটে। আবু পাহাড়ের পাথরে পাথরে ছুটন্ত ঘোড়ার দ্রুতগতিতে ওর বর্মচর্মধারী সোয়ার মূর্তিটাই মানায় ভালো, বরিশাল কলেজের এই সবুজ সমতল খেলার মাঠ জায়গা নয় ওর!

কিন্তু মহিমান্বিত চেহারা হলে কী হবে, ফিল্‌ডিং যা করেছিল তা অকথ্য দস্তুরমতো। দুটো সোজা ক্যাচ ফস্-ফস্ করে ফেলে দিলে, লেগেপিটোনো একটা বল ধরতে গিয়ে অতিকায় শরীর নিয়ে অশোভন রকমের ডিগবাজী খেলো একটা। চারদিক থেকে ধিক্কারে ধিক্কারে আমরা ওকে জর্জরিত করে তুললাম, আরো বেশি করে ছাতু খাওয়ার জন্যে অযাচিত উপদেশও বর্ষণ করলাম।

বিক্রমজিৎ নির্বিকার।

ঝাড়া তিন ঘণ্টা পিটিয়ে সেকেণ্ড ইয়ার যখন ব্যাট ছাড়ল, তখন স্কোর-বোর্ডের দিকে তাকিয়ে আমাদের চক্ষুঃস্থির। অখিল সেন থাকলে তবু

ভরসা ছিল, কিন্তু এত রাণ তোলার মতো স্টেডি প্লেয়ার আমাদের একজনও নেই। থার্ড ইয়ার ডুবল।

আশঙ্কা যে সত্যি তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন লাঞ্চের পরে পটাপট উইকেট পড়ে যেতে লাগল আমাদের। আমাদের সাতটা উইকেট যখন নেমে গেছে, তখন রাণ ওদের অর্ধেকের কাছাকাছিও পৌঁছয়নি। শুধু থার্ড উইকেট থেকে ব্যানার্জি কোনোমতে টিকে আছে—যা দু-চারটে রাণ সেই তুলছে। কিন্তু কতক্ষণ আর! জুটি না পেলে নট্‌ আউট থেকেই বা কতটুকু করবে ব্যানার্জি।

এমন সময় প্যাড্‌ পরে মাঠে নামল বিক্রমজিৎ।

আমরা ব্যঙ্গ করে তাকে অভিনন্দন জানালাম, শেয়াল-কুকুর ডাকল সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্ররা। কিন্তু তারপরে যা ঘটল তাকে মির‍্যাকল্‌ বললেও কম বলা হয়।

আনাড়ীর মতোই ব্যাট্‌ ধরেছিল বিক্রমজিৎ—প্রথম বলটা আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আনাড়ীর মতো প্রবল ভাবে হাঁকড়ে দিলে সে। সে কি হিট্‌! আমরা ব্যাপারটা ভালো করে বোঝবার আগেই দেখি নক্ষত্রবেগে বল ওভারবাউণ্ডারীর সীমা ছাড়িয়ে মাটিতে গিয়ে ড্রপ নিয়েছে।

আমরা সমস্বরে চীৎকার করে উঠলাম। ব্যানার্জি ছুটে এসে বিক্রমজিতের পিঠ চাপড়ে দিলে।

তার পরেই হাত খুলল বিক্রমজিতের।

আনাড়ী বলেই হিসেবনিকেশ বাছবিচার করল না, নির্ভয়ে বেপরোয়া হয়ে সে পিটতে লাগল। ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে বল উড়ে যেতে লাগল কামানের গোলার মতো। ক্যাচ ধরতে গিয়ে আর্তনাদ করে বসে পড়ল উইকেট-কীপার—বল ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে বাউণ্ডারী হয়ে।

পাঁচটা ওভারবাউণ্ডারী আর আটটা বাউণ্ডারী করে যখন ক্লিন বোল্‌ড্‌ হয়ে গেল বিক্রমজিৎ, তখন ট্রফি আমাদের হয়ে গেছে। ওদিকে হাত খুলেছে ক্যাপ্টেনেরও—কুড়ি রাণে আমরা এগিয়ে আছি তখন। হাতে দুটো উইকেট তখনো বাকী।

আকাশফাটানো জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে যুদ্ধজেতা রাজপুত বীরের মতোই ফিরে এল বিক্রমজিৎ।

একদল ছেলে তৈরীই ছিল—তাকে কাঁধে করে মাঠের মধ্যে দিয়ে শোভাযাত্রা শুরু করলে।

বিক্রম বললে, আঃ, ছাড়ো ছাড়ো, লাগে—

সেকথা কেউ শুনল না।

কিন্তু ওইখানেই শেষ।

আশ্চর্য লোকটা—আর তাকে নামানোই গেল না ক্রিকেটের মাঠে। হেসে বললে, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, বারে বারে কি আর ধান খায় ঘুঘুতে? আমাকে আর টেনো না ভাই—আমার পোষাবে না। ফাণ্ডামেণ্টালি আমি

স্পোর্টস্‌ম্যান নই।

ব্যানার্জি অনেক সাধাসাধি করে শেষে গাল দিয়ে চলে গেল। বললে, খোট্টার মগজ তো, বুদ্ধি আর কত হবে। অথচ খেললে অল্‌ ইন্ডিয়া রেপুটেশন পেত।

বিক্রমজিৎ শুধু হাসল, জবাব দিলে না।

আর কেউ লক্ষ্য করেছিল কিনা জানি না, কিন্তু প্রথম পরিচয়ের দিনটি থেকেই ওর হাসিটা কেমন বিস্ময় জাগিয়েছিল আমার মনে। খাঁটি রাজপুতের ছেলে—ওর বাবা ছিলেন ডিভিশন্যাল আর্মড ফোর্সের কর্তা। ওর চেহারা দেখলে মনে হত, ও-ও ওইরকম একটা সামরিক চাকরিই বেছে নেবে। কিন্তু আশ্চর্য ছিল বিক্রমজিতের হাসি। অমন কোমল, অত স্নিগ্ধ হাসি আমি দেখিনি।

সে হাসি মেয়েদের মতো। হাসত নিঃশব্দে, অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে। ঠাট্টা করলে মেয়েদের মতোই চোখ নামিয়ে নিত মাটিতে, গাল রাঙা হয়ে উঠত। চার-পাঁচ পুরুষ বাংলা দেশে থেকে রীতিনীতিতে প্রায় বাঙালী হয়ে গেছে—অথচ কোনো বাঙালীর সঙ্গেই মিশত না। শুধু বাঙালী নয়, কারুর সঙ্গেই মিশতে পারত না বললেই সুবিচার করা হয় ওর সম্পর্কে। বিকেলে বেরুত একটা সাইকেল নিয়ে—বেল্‌স পার্কের ঝাউবন আর ভিড় ছাড়িয়ে চলে যেত বহুদূরে—একটা নির্জন কালভার্টের ধারে বসে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত আলো-ডুবে-আসা নদীর দিকে।

ছেলেরা বলত, দাম্ভিক।

কেউ কেউ মন্তব্য করত : বাঙালীর সঙ্গে মিশতে ভয় পায়।

যে যাই বলুক—থার্ড ইয়ার আর্টস্‌ ক্লাসের দেড়শো ছেলের মধ্যে একটা অতিকায় চেহারা ছাড়া আর কোনো বৈশিষ্ট্যই ছিল না বিক্রমজিতের। ক্রিকেটের মাঠে তার অলৌকিক বীরত্বের ব্যাপারটা আরো দশটা নতুন উত্তেজনার মধ্যে ঝিমিয়ে এল ক্রমে ক্রমে—ক্লাসের সেরা মেয়ে মণিকা সেনের দৃষ্টিও তেমন করে আর সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে এসে পড়তে লাগল না বিক্রমের ওপর। খেলার মাঠের সম্রাট কিছুদিনের মধ্যেই অনায়াসে হারিয়ে গেল নগণ্যতার মধ্যে, মিশে গেল তুচ্ছতমদের দলে।

কিন্তু আবার নতুন করে আমাকে চমক দিলে বিক্রমজিৎ।

কলেজ ম্যাগাজিন সম্পাদনার ভারটা আমার ওপরেই ছিল। পদমর্যাদার গৌরব প্রথম প্রথম নেহাৎ খারাপ লাগছিল তা নয়, কিন্তু ক্রমশ জীবন দুঃসহ করে তুলল একেবারে। সম্মান জিনিসটা সুখের হলেও স্বস্তির যে নয়, এই জ্ঞানবৃক্ষের ফলটি আমার খেতে হল সেই উপলক্ষে।

গাদা গাদা এবং খাতা খাতা লেখা নিয়ে ছেলেরা আমায় তাড়া করতে লাগল ; লোহার মুগুর দিয়ে ঠুকলেও যাদের মগজ থেকে বিন্দুমাত্র সাহিত্য-বোধের সাড়া পাওয়া যাবে না, কে জানত তাদের মধ্যে এতগুলো কবি,

প্রাবন্ধিক ও গল্পকার প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে ? রবিবার দিন যখন লেখার স্তূপ সামনে নিয়ে বসে ভাবছি একটা দেশলাইয়ের কাঠি জেলে দিয়ে সংক্ষেপে আপদ মিটিয়ে ফেলব কিনা, এমন সময় বাইরে একটা সাইকেল-বেলের শব্দ শুনতে পেলাম।

বেরিয়ে দেখি, বিক্রমজিৎ।

ক্লাসে এক বেঞ্চিতে বসে বলে একটুখানি হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল আমাদের মধ্যে। তা ছাড়া কেন বলতে পারি না, ওর প্রতি এক ধরণের আকর্ষণও অনুভব করতাম আমি। হয়তো সেটা ওর ওই স্বাস্থ্যবান দীর্ঘ শরীরের জন্যেই। নিজে আমি যেমন রোগা, তেমনি ডিস্‌পেপটিক। তাই হয়তো ওর ওই মস্ত শরীর একটা প্রাকৃতিক মোহই জাগিয়ে তুলত আমার মনে। একজন রসিক অধ্যাপক প্রায়ই পাশাপাশি আমাদের দুজনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতেন : দ্যাখো, গুপ্ত আর সিং যেন লিভিং অ্যাড্‌ভারটাইজ্‌মেন্ট —'জোয়ান বটিকা' সেবনের পূর্বে ও পরে।

সাদরে অভ্যর্থনা করলাম ওকে, ডেকে নিয়ে বসালাম ঘরে। কিছুক্ষণ মেয়েদের মতোই সলজ্জ দৃষ্টিতে এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগল বিক্রমজিৎ। তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘর্মাক্ত কপালটাকে মুছে ফেলল।

বললাম, হঠাৎ কী মনে করে হে ?

বিক্রম জবাব দিতে পারল না। লক্ষ্য করলাম, ওর ফর্সা গালের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে আবীরের গুঁড়োর মতো রক্তের কণা, চোখের দৃষ্টি সীমাহীন সংকোচে যেন এসেছে জড়িয়ে জড়িয়ে।

—ব্যাপার কী ?

বিক্রম একটা ঢোঁক গিলল। ওর দিকে তাকিয়ে মনে হল, লজ্জায় ভয়ে অত বড় দীর্ঘ আর শক্তিমান দেহটা যেন সংকুচিত হয়ে গেছে—নিজেকে যেমন বিব্রত তেমনি অপরাধী বোধ করছেও। বললে, আমার একটা লেখা—

—লেখা !—আমি ভ্রূকুঞ্চিত করলাম : ব্যায়াম সম্বন্ধে ? না অড়হর ডালের উপকারিতার বিষয়ে গবেষণা ?

আরো বিব্রত হয়ে গেল বিক্রম। তোৎলিয়ে বললে, না, না, ওসব কিছু না।—তারপর যেন পালাতে চাইছে, এমনি ভাবে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আচ্ছা আমি চলি।

ওর দিকে তাকিয়ে এবার কেমন করুণা হল আমার—মনে হল, আমার বাড়িতে ও এসেছে অথচ আমি অপমান করছি ওকে ! বাধা দিয়ে বললাম, বোসো, চা খাও।

—না, চা তো আমি খাই না।

—তবে কী খাও ? পেস্তার সরবৎ ? কাঁচা ছোলার হালুয়া ? গাজর আর টোমাটোর রস ?

—না, ওসব কিছুই আমি খাই না।—বিক্রম এবার ব্যথিত আর বিষণ্ন চোখে তাকালো আমার দিকে, আচ্ছা, এ সমস্ত কথা তোমরা কেন ভাবো বলতে

পারো সুকুমার ? তোমরা কি মনে করো, এত বড় শরীরটা আছে বলেই অত্যন্ত ভালগারের মতো তার তোয়াজ করা ছাড়া কোনো কাজই নেই আমার ?

ওর কথার সুরে আমার খোঁচা লাগল। তবু লঘুভাবে বলতে চেষ্টা করলাম: না হলে অমন চেহারা হয় ? অমন করে ওভার-বাউণ্ডারী পিটতে পারে কেউ ?

বিক্রম বললে, না। শরীরকে ঘোষণা করাই রাজপুতের একমাত্র কাজ নয়। তোমরা আমাদের বীরত্বের ইতিহাসই পড়েছো কিন্তু তার মধ্যে আমাদের জাতির সম্পূর্ণ পরিচয় কোথায় ? আমাদের দেশে শুধু চারণই ছিল না, কবিও ছিল। রক্ত দিয়ে মাটি রাঙানোই আমাদের একমাত্র সত্য নয়, রাজপুত আর্টও যে একদিন কত বড় হয়ে উঠেছিল সে খবর তোমরা রাখো না।

আমি বললাম, কী বলছ তুমি ?

বিক্রম বলে চলল: যেটা সত্যি তাই বলছি। টডের রাজস্থান আমাদের ইতিহাসের একটা ভগ্নাংশ মাত্র, তার সম্পূর্ণ রূপ নয়। সে ইতিহাসে ক্ষত্রিয় আছে, ব্রাহ্মণ নেই। তলোয়ার আছে, তুলি নেই। আমাদের রুক্ষ পাহাড়ের চূড়োয় তোমরা ডংকা বাজতেই শুনেছ খালি, কিন্তু শোনোনি তো ভুট্টার ক্ষেতের আড়ালে আড়ালে চাষার মেয়ের গলায় কোন্ গান মুখর হয়ে ওঠে।

আশ্চর্য, মুখের ওপর থেকে সেই লজ্জার রক্তিমাভাটা কেটে গেছে বিক্রমের, চোখ থেকে সরে গেছে সেই সংকোচ আর দ্বিধার আবরণটা। হঠাৎ কোথা থেকে যেন শক্তিসঞ্চয় করে নিয়েছে ও--ওর শরীরে একটা অসংশয়িত প্রবল বলিষ্ঠ পৌরুষ উঠেছে তরঙ্গিত হয়ে।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, কী বলতে চাও তুমি ?

—আমি বলতে চাই—বিক্রম নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল: শারীরিক শক্তিটা মানুষের আদিম গুণ, তার primitive qualification, আজ ওইটে দিয়েই বিচার করতে গেলে তার অসম্মান করা হবে। একটা উদাহরণ দিই। আমাদের বীরত্বের কাহিনী তো অনেক শুনেছো—শুনেছো নির্ভয়ে প্রাণ দেবার অনেক চাঞ্চল্যকর গল্প। কিন্তু শোনোনি কি, মেহেন্দ্রির রাজপুত্র যুদ্ধে হত হবার পরেকার সেই চোখের জলের কথা, সেই রাজবধূর সহমরণ ?—সুরেলা গলায় বিক্রম চমৎকার আবৃত্তি করে গেল:

> "কানে মোতি বলবলা,
> গলে সোনি এ মালা
> আশী কোশ করহ আয়া
> কোঙার মেহেন্দ্রিওয়ালা—

আমি মুগ্ধভাবে চুপ করে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপর জানতে চাইলাম আবার—

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ শক্তির ক্ষেত্রে মানুষ আর পশুর ধর্ম এক—বরং পশুই তার আদর্শ। সিংহের মতো জোয়ান বললে মানুষ গৌরব বোধ করে, নামের শেষে

সিংহ লিখে তার আত্মপ্রসাদের সীমা থাকে না। কিন্তু এ তো এগিয়ে-যাওয়া নয়। যে মানুষ যত বেশি শিল্পসৃষ্টি করে রচনা করে বিজ্ঞান, পশুর সঙ্গে তার ব্যবধান ততই বেশি। আর এই ব্যবধানকে আমরা যতটাই বাড়িয়ে নিতে পারব ততটাই আমাদের গৌরব। বলতে পারো, আমাদের মনুষ্যত্বের পরিচয়।

আমি স্তব্ধ-বিস্ময়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলাম ওর। আমাদের চিরচেনা বিক্রমের গলায় হঠাৎ সরস্বতী ভর করল নাকি, কোনো দেবতার আশীর্বাদে সে লাভ করে বসল কথা বলবার এই অলৌকিক শক্তি?

বিক্রম উত্তেজিত ভাবে বলে চলল, অথচ ওই পশুশক্তির সম্মানটাই তোমরা আমাদের দিয়ে আসছ। কিন্তু আমাদের জন্যে কি শিল্প থাকবে না, আর্ট থাকবে না, থাকবে না র‍্যাশনালিটি? এ অবিচার কেন করছ? জানো, বাঙালীদের ওই রকম হিংস্র শরীর নেই বলেই আজ কালচারের দিক থেকে তারা এত এগিয়ে গেছে? যদি বাঙালী পাঞ্জাবীর মতো লম্বা-চওড়া চৌকোষ হত আর গালে গালপাট্টা রাখত, তাহলে এদেশে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হত না।

—বাঃ, একটা বেশ নতুন ধরণের থীসিস শোনাচ্ছ তো?

—থীসিস্ নয়, এ আমার উপলব্ধি। বিশ্বাস করো সুকুমার, শুধু আজ নয়, অনেকদিন থেকেই কথাটা আমি ভেবে আসছি, বহুদিন থেকেই এ নিয়ে প্রতিবাদ জেগেছে আমার মধ্যে।

চির-নীরব এবং স্বভাব-সংকুচিত বিক্রমের এই উচ্ছ্বসিত বক্তৃতার তোড়ে আমি কিছুক্ষণ রইলাম অভিভূত হয়ে। কথাগুলো যা বলেছে তার কতটা সত্যি এবং তা নিয়ে কতটা তর্ক করা চলে, এটা যাচাই করে নেবার মতো মনের অবস্থা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। শুধু নিঃশব্দে বিস্ময়ে তাকিয়েই রইলাম—বলে কী বিক্রমজিৎ!

হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠল বিক্রম, যেন নিজেকে হঠাৎ প্রকাশ করে ফেলার লজ্জায় মুহূর্তে বিবর্ণ বিমর্ষ হয়ে গেল সে। চট করে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে, না ভাই, আজ আমি যাই—

বললাম, দাঁড়াও দাঁড়াও। তোমার লেখা দিয়ে গেলে না?

—সে থাক—

—থাকবে কেন? এনেছ যখন, দিয়েই যাও আমাকে।

—নাঃ, দরকার নেই—বিক্রম মাথা নত করল।

—লেখা এনেছ তাতে এত লজ্জা পাচ্ছ কেন? কলেজ ম্যাগাজিন তো সকলের লেখার জন্যেই—আমি ওকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করলাম।

—কিন্তু আমি যে গোটাকয়েক কবিতা এনেছিলাম—প্রায় আবছায়া গলায় বললে বিক্রম।

—কবিতা?—আমি আর্তনাদ করে উঠলাম: কী, রাজপুত ভাষায়? 'গলে সোনি এ মালা'?

—না—বিক্রম আবার চোখ তুলল, আবার তীক্ষ্ণ-তীব্র হয়ে উঠল তার দৃষ্টি: বাংলা দেশে থাকি আমি—বাঙালী। রাজপুত ভাষায় লিখতে যাব কেন?

সত্যি কথা বলতে কি, এবার মনে মনে অনুশোচনা বোধ করলাম আমি। ওই চেহারা নিয়ে বিক্রম যা কবিতা লিখেছে, না পড়েও তা অনুমান করা দুরূহ নয়। ভাব, ভাষা, ছন্দ ইত্যাদি নিয়ে সরস্বতীর সঙ্গে দস্তুরমতো গদাযুদ্ধ করেছে নিঃসন্দেহ। নাঃ, ভদ্রতা করে ওকে বাধা দেওয়াটা ঠিক হয়নি—ওকে সসঙ্কোচে এবং সসম্মানে চলে যেতে দেওয়াই উচিত ছিল বোধ হয়।

কিন্তু যা হয়ে গেছে তার কোনো প্রতিষেধক নেই এখন। কান্না-ভরা মুখ করেই আমি বললাম, আচ্ছা, তবে দিয়ে যাও—

কোটের পকেট থেকে একখানা বড় এনভেলপ বের করে আমার হাতে দিলে বিক্রম। তারপরে আর সে মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করলে না। বিদ্যুৎ-গতিতে বেরিয়ে গেল বাইরে, পরক্ষণেই শুনলাম, তার সাইকেলের শব্দটা দ্রুতবেগে রাস্তার মোড়টা পার হয়ে গেল—ভীরুর মতো পালিয়ে গেল পাঁচ হাতের চাইতেও বেশী উঁচু—বীরমূর্তি বিক্রম।

প্রচুর আশঙ্কা নিয়েই এনভেলপটা খুললাম আমি। এবং আশঙ্কা নির্ভুল। চমৎকার নীল রঙের কাগজে, তিনদিকে লাল কালির মার্জিন টেনে একরাশ প্রেমের কবিতা লিখেছে বিক্রম।

লেখাগুলো পড়তে গিয়ে দেখি প্রচুর আকূতি আর আন্তরিকতা প্রতিটি কবিতা থেকে পড়ছে ক্ষরিত হয়ে। কবিমন বিক্রমের আছে, বলতেও চেষ্টা করেছে যথাসাধ্য দরদ দিয়ে। কিন্তু তবু সেগুলো কবিতা হয়নি। প্রতি লাইনে ছন্দোপতন, 'করিল'র সঙ্গে বসিয়েছে 'চঞ্চলের' মিল—আর রবীন্দ্র-নাথকে এমনভাবে অনুকরণ করেছে যে, পংক্তিতে পংক্তিতে একেবারে আক্ষরিক ছাপ পড়ে গেছে তার।

ধানক্ষেত, নদীর জল আর হংসবলাকা,—এই হল ওর অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু। এরই ভেতরে দেখতে চেয়েছে একটা শ্যামলী মেয়েকে—দেখতে চেয়েছে তার কালো চোখ থেকে কী ভাবে ভ্রমরের মতো দৃষ্টি উড়ে যাচ্ছে কোনো ঘন মেঘের উদ্দেশে। ওর কল্পনা নৌকো ভাসিয়েছে বাংলা দেশের কোনো গন্ধ-মাতাল পদ্মবিলের জলে—যেখানে চিত্রগাগরী ভরে জল নিতে এসেছে কোনো এক অনামিকা পত্রলেখা। শিউলি ফোটা কোনো এক শরতের সোনা-গলে-পড়া সকালে হাঁসের পাখার মতো মেঘে মেঘে সঞ্চারিত হয়ে ওর মন চলে গেছে অঞ্জনা নদীর পারে খঞ্জনা গাঁয়ে—সেখানে, যেখানে খোঁপায় শিউলি-মালা জড়িয়ে রঞ্জনা শুনছে বিদেশিয়ার বাঁশির সুর।

লোকটার বাংলা দেশের প্রতি আশ্চর্য রকমের প্রীতি—কোনো সন্দেহ নেই। দুটো চারটে লাইন পড়ে আমারও মন্দ লাগল না ঃ

আমার বাঁশি কুড়িয়ে পেলাম
বংশীবটের শান্ত ছায়ায়—
সুর এল তার মৌ-ঝরানো
প্রাণ-হারানো দখিন হাওয়ায়।

আমার বাঁশির ব্যাকুল গানে—
কোথায় চলি কেই বা জানে,—
প্রজাপতি-মনকে আমার
উধাও পথে আজকে কে পায় ?

কিংবা ঃ

পায়ে তার নূপুরের উন্মন-ছন্দ—
আকুলিত কেশপাশে চম্পার গন্ধ।
উচ্ছল গাগরী
ধীরে চলে নাগরী—
টুটে যায় হৃদয়ের সব কিছু বন্ধ—
মোর বুকে এল একি যৌবনানন্দ !

যৌবনানন্দ এল—তার তাড়ায় কবিতাও লিখে ফেলেছে রাশি রাশি। আকুলি-বিকুলি যথেষ্ট করেছে সন্দেহ নেই, তবু শেষরক্ষা করতে পারেনি। প্রায়ই শেষে গিয়ে এমন হোঁচট্ খেয়েছে যে ওই দু'একটা ভালো ভালো লাইনও একেবারে মাঠে মারা গেছে বিক্রমের। সরস্বতীর বন্দনা করতে গিয়ে যখন তখন দু'চার ঘা লাঠিও বসিয়ে বসে আছে তাঁকে।

ওর কথাগুলো মনের মধ্যে বাজতে লাগল। একটা নতুন কিছু করবার চেষ্টা করছে। বাংলা দেশকে ভালোবাসে, বাঙালীর ওপরে দেখা যাচ্ছে বেশ একটা রোম্যাণ্টিক্ শ্রদ্ধা। তাই শক্তিকে বিসর্জন দিয়ে শিল্পের আরাধনা করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু শক্তি জিনিসটা ওর মজ্জাগত, রূঢ় কাঠিন্যটা ওর জাতিগত উত্তরাধিকার। সে উত্তরাধিকারকে অতিক্রম করে চলে যাবে এমন শক্তি কোথায় বিক্রমের ? তাই বার বার নিজের জালে জড়িয়ে গেছে, ওর সূক্ষ্ম রুচিবোধকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে একটা গদ্যময় কর্কশতা, পংক্তিতে পংক্তিতে অশোভন রসাভাস !

আমি যেন ওর ভেতরকার সেই আশ্চর্য দ্বন্দ্বটাকে বুঝতে পারলাম। এ ওর নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভিযান—স্বধর্মের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা। কিন্তু সে যুদ্ধে ও জয়লাভ করতে পারেনি। ওর নায়িকা যখন অভিসারিণীর বেশে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে কোনো 'বরষণমুখরিত' শ্রাবণ রাত্রে—তখন ওরই ভেতরের সত্তা যেন রাক্ষসের মতো রোমশ কর্কশ একটা মুঠি প্রসারিত করে সে নায়িকার গলা টিপে ধরেছে !

বাস্তবিক, নিষ্ঠুর একটা ট্র্যাজেডিই বটে !

একটু কষ্ট হল, হাসিও পেল সঙ্গে সঙ্গে। আরে বাপু, তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁছা কি আর সম্ভব। অগত্যা কবিতাগুলোকে আমি সরিয়ে রাখলাম রাশি রাশি অমনোনীত বাজে লেখার গাদায়। হাজার বন্ধুত্বের খাতিরেও এর কোনো একটি রচনাকে ম্যাগাজিনে স্থান দেওয়া যাবে না।

পরদিন কলেজে দেখা হতেই আমি কথাটা তাকে জানালাম। এবং জানালাম যথোচিত ক্ষোভ আর কুণ্ঠার সঙ্গে। চকিতে বিক্রমের মুখ বেদনায়

বিমর্ষ হয়ে গেল : কিছুতেই চলবে না ?

—না ভাই।

—ওঃ।

আমি সান্ত্বনা-ভরা উপদেশ দিয়ে বললাম, আমার মনে হয়, কবিতার লাইন তোমার নয়। তার চাইতে যদি ব্যায়ামের পূর্বে কতটা ভিজে ছোলা খাওয়া উচিত এ সম্বন্ধে কিছু লিখে দাও—

—ঠাট্টা করছ ?—বিক্রমের আয়ত কালো চোখ দুটো উঠল ধ্বক-ধ্বক করে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেই। তার পরেই সামনে থেকে গট-গট করে সরে গেল সে।

পেছনে থেকে সকৌতুকে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসলাম আমি। কালকে ওর দীর্ঘ বক্তৃতার শোধ নিয়েছি, নিয়েছি একটা নোব্‌ল রিভেনজ্‌!

সেই থেকে আরো নিরাসক্ত আর নির্বিকার হয়ে গেল বিক্রম। আগে আমার সঙ্গে যা-হোক দুটো-চারটে কথা সে বলত, তাও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে এল এর পর থেকে। কলেজে এসে একেবারে লাস্ট বেঞ্চিতে বসত, সমস্ত পিরিয়ড কটা কেমন তাকিয়ে থাকত স্বপ্নাতুর আচ্ছন্ন চোখ মেলে। মনে হত, প্রোফেসারের দিকে তাকিয়ে থাকলেও তার চোখ দুটো অনেক দূরে ছাড়িয়ে চলে গেছে—চলে গেছে এই কলেজের লাল বাড়িটা ছাড়িয়ে, এই শহর ছাড়িয়ে, নদী পার হয়ে—কোনো একটা অপরিচিত আর অপূর্ব জগতের স্বপ্নে একান্ত ভাবেই নিমগ্ন হয়ে আছে সে।

কিছুদিনের মধ্যেই দেখলাম, বাঙালীর মতো করে ধুতি-চাদর পরতে শুরু করেছে সে। তারও পরে আসতে লাগল একটার পর একটা কৌতুক এবং কৌতূহলজনক সংবাদ।

বিক্রম বাড়িতে বসে ছবি আঁকা শিখছে। অবশ্য অরিয়েন্টাল, অক্‌সিডেন্টাল, না হনোলুলুয়ান—তা জানা যায়নি।

কাল চৌধুরী কোম্পানীর দোকান থেকে একটা সেতার কিনে নিয়ে গেছে সে। আশা করা যায়, 'সারেগামা' রপ্ত হবার আগেই অন্তত দশটা লাউয়ের খোলা ফাটবে।

সম্প্রতি বাড়িতে রবীন্দ্র-সংগীতের চর্চা হচ্ছে তার। মতান্তরে রবীন্দ্রনাথের চচ্চড়ি হচ্ছে বলাও যায়।

প্রতিবেশী ফণী একটা রসালো টিপ্পনী সহযোগে খবরটা পরিবেশন করলে : ফলে ওদের পাড়ার সমস্ত কুকুরগুলো পালিয়ে গেছে। একটা আচমকা মারাও গেছে শোনা যায়!

বলা বাহুল্য, খবরগুলো শুনে খুব হাসাহাসি করেছিলাম আমরা। সত্যি বলতে কি, বিক্রম সম্বন্ধে এক ধরণের সমবেদনা তখনো ছিল আমার। কিন্তু আমাদের সহপাঠী বন্ধু সুরসিক ফণী সমস্ত ব্যাপারগুলোর এমন বিচিত্র ও সরস ব্যাখ্যা করত যে কৌতুকের প্রবল বন্যায় সমস্ত সমবেদনা যেত তলিয়ে।

ওই কণ্ঠ আর চেহারা নিয়ে রবীন্দ্র-সংগীত গাইছে বিক্রম। ব্যাপারটা কল্পনাও করা যায় না!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন একটা ঘটনা ঘটল যে হাসি বন্ধ হয়ে গেল আমাদের।

প্রথমে আমারই চোখে পড়েছিল যে মেয়েদের 'কমন রুমের' সম্মুখের প্যাসেজ্‌টাতে দাঁড়িয়ে রূপেগুণে ক্লাসের সেরা ছাত্রী মণিকার সঙ্গে কী কথা কইছে বিক্রম। একে ভালো ছাত্রী, তাতে অত্যন্ত রাশভারী, আমরা কেউ কোনো দিন আমলই পাইনি মণিকার কাছে। কিন্তু বিক্রম তার সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ আলাপের সুযোগ জুটিয়ে নিলে কেমন করে—কী উপায়ে?

একদিনের ব্যাপার হলে কথা ছিল না, কিন্তু দেখলাম, আস্তে আস্তে জিনিসটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। প্যাসেজে আলাপের সময়টা দীর্ঘায়িত হচ্ছে ক্রমশ, কথার সঙ্গে সঙ্গে মিলছে হাসির ঝিলিক। সে ঝিলিক সন্দেহজনক, আপত্তিকর এবং একটা বিপজ্জনক আগামী পরিণতির দ্যোতক।

ঈর্ষায় আমাদের বুকের ভিতরে জ্বালা করে উঠল। বড় বেশি এগিয়ে যাচ্ছে বিক্রম—আমাদের ছাড়িয়ে ঘোড়া ডিঙিয়ে যেন ঘাস খেতে চাইছে সে। আমরা সব এতগুলো ভালো ভালো ছেলে ঘোল খেয়ে গেলাম—এ তো দিব্যি জমিয়ে ফেলল দেখা যাচ্ছে!

তারপরে ফণীই আরো খবর সংগ্রহ করে আনল। লোকটার গোয়েন্দাগিরি করবার আশ্চর্য ক্ষমতা, যেন ভবিষ্যৎ জীবনে সুনিশ্চিত আই-বি হওয়ার ঐশ্বরিক প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে ফণী।

বললে, বৃথাই ভালো ছাত্রত্বের গর্ব করো হে সুকুমার। ওই ছাতুটাই কাজ গুছিয়ে নিলে।

কলেজের রেস্তোরাঁয় চা খাচ্ছিলাম, খানিক গরম চা ছলকে পড়ল আমার আদ্দির পাঞ্জাবিটায়। বললাম, মানে?

ফণী মুখ টিপে হিংসেয়-পোড়া হাসি হেসে বললে, তুমি পয়সা খরচ করে কলেজ-রেস্তোরাঁর পাঁচন গিলে মরছ, ওদিকে মহিষাসুর যে অমৃত-ভাণ্ড সাবাড় করে দিলে।

অধৈর্য হয়ে বললাম, রূপক রাখো ফণী। ব্যাপারটা একবার খোলসা করে বলো তো?

—ব্যাপারটা আবার কী? কাল মণিকা সেনগুপ্তর লনে বসে বসে চা খাচ্ছিল বিক্রম। মণিকা সার্ভ করছিল—নিজের চোখেই দেখলাম। সে কি হাসি আর গল্প! বুঝলে, something is going to happen!

এইবারে আমার স্পষ্ট মনে হল, নীরব উপেক্ষার সময় চলে গেছে। একটা কিছু করা দরকার—করা দরকার এর একটা অনিবার্য প্রতীকার। আমাদের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে বিক্রম শেষ পর্যন্ত ট্রফিটা জিতে নিয়ে যাবে, এ অপমান কিছুতেই বরদাস্ত করব না আমরা।

চায়ের পেয়ালাটা রেখে আমি উঠে পড়লাম। বললাম, আসছি।

খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত বিক্রমকে পেলাম লাইব্রেরীতে। দেখি, অত্যন্ত অভিনিবেশ-সহকারে দাগ দিয়ে দিয়ে কী একটা বই পড়ে চলেছে সে। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম, 'কল্পনা'। বিড় বিড় করে পড়তে পড়তে সযত্নে দাগ দিয়ে যাচ্ছে :

"কী কথা ওঠে মর্মরিয়া বকুল-তরু-পল্লবে
ভ্রমর ওঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা,
ঊর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে—"

অকারণে পা থেকে মাথা অবধি জ্বল উঠল আমার। ডাকলাম, বিক্রম ?

বিক্রম চমকে উঠল, হাতের পেন্সিলটা কেঁপে উঠে একটা এলোমেলো রেখা ফেলে দিলে বইটার ওপর। বললে, কে, সুকুমার ?

—হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

বিক্রম পাশের ডেস্কটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, বেশ, বোসো।

আমি বসলাম। কিন্তু চুপ করেই নেহাৎ বসে রইলাম খানিকক্ষণ। মনের মধ্যে তীব্র আগুনের মতো কী একটা জ্বলে যাচ্ছে আমার। ঠিক কোন্খান দিয়ে যে কথা আরম্ভ করব ভেবে পাচ্ছি না।

বিক্রম বই বন্ধ করে বললে, কী কথা ?

বুকের ভেতর ফুলে ওঠা উত্তেজনাটাকে সংযত করে নিয়ে আমি বললাম, একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করতে চাই। আশা করি উত্তরটা তুমি দেবে।

—স্বচ্ছন্দে।—বিক্রম প্রসন্ন অথচ কোমল লজ্জিত হাসি হাসল। বললে, অমন করে আই-বির মতো ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করছ কেন ? কী বলতে চাও বলো না।

স্পষ্ট বোঝাপড়া করতেই যখন এসেছি, তখন 'হিউমার'কে মেনে নেওয়ার মতো মনের অবস্থা আমার নয়। তবু চট্ করে কথাটা পাড়বার আগে একটু দ্বিধা করলাম আমি : তুমি আজকাল মণিকা সেনের সঙ্গে খুব মেশামিশি করো দেখতে পাই।

—তা মিশি বটে—তেমনি সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসিতে বিক্রম উত্তর দিলে।

—এত ঘনিষ্ঠতা হল কী করে জানতে পারি ?—আমার স্বরের আপত্তিকর ভঙ্গিটা আমার নিজেরই কানে ঠেকল।

ভেবেছিলাম, বিক্রম আমার প্রশ্ন করবার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করবে ; কিন্তু করল না। বরং তেমনি স্বাভাবিক ভাবে বললে, আমিই করে নিয়েছি।

—কেন ?—উত্তেজনায় আমার কান দিয়ে আগুন ছুটতে লাগল।

—ওঁর কাছে রবীন্দ্র-কাব্য পড়ি আমি।

—ওঃ—ব্যঙ্গভরে আমি বললাম, তাই 'কল্পনা' থেকে বুঝি ইম্পর্ট্যান্ট্ এক্সপ্ল্যানেশনগুলো দাগিয়ে নিচ্ছ ?

—অনেকটা তাই—বিক্রম হাসল। তেমনি প্রশান্ত মুখেই। বললে, এক্সপ্ল্যানেটরী পিস্ হিসেবে 'কল্পনা'র কবিতাগুলো নেহাৎ মন্দ জিনিস নয়। তোমার আপত্তি আছে কিছু ?

—একটু আছে বই কি। রবীন্দ্র-কাব্য পড়াবার আর কি লোক তুমি খুঁজে পেলে না ?

—কই আর পেলাম !—বিক্রমের মুখে হাসির সঙ্গে সঙ্গে বেদনারও ছায়া পড়ল একটা ঃ তোমাদের কাছে তো আমলই পাই না—আমার শরীর আর ব্রেনকে তোমরা সমান স্থূল ঠাউরে নিয়ে বসে আছো। দেখলাম, উইথ্ হার ফেমিনিন ইন্‌স্‌টিংকট—উনি তোমাদের এই অব্‌সেসন থেকে মুক্ত। আই য়্যাম্ রিয়ালি গ্রেট্‌ফুল টু হার। তা ছাড়া উনি ইণ্টারমিডিয়েটে বাংলায় ফার্স্ট হয়েছিলেন ইউনিভার্সিটিতে। সেটাও ভেবে দেখেছি।

—হুঁ !—মণিকা সম্পর্কে বিক্রমের সস্নেহ বলার ভঙ্গিতে অসহ্য ক্রোধে খানিকক্ষণ কথাই বেরুল না আমার ঃ কিন্তু ভালো হচ্ছে কি কাজটা ?

—কেন, অন্যায়টা কোথায় ?

—এ জাতীয় মেলামেশা কি খুব ভালো ? বিশেষ করে একজন লেডী-ক্লাসফ্রেণ্ডের সঙ্গে ?

প্রশান্ত হাসিতে বিক্রম বলল, অবশ্য ইচ্ছে করলে নোংরা ব্যাখ্যাও করতে পারো তোমরা। আর সুবিধে পেলেই সে সুযোগ নিতে তোমরা ছাড়বে না, তাও আমার জানা আছে।

—কী বললে ?

—সত্যি কথাই বললাম—বিক্রমের চোখে দীপ্তি ঝিলিক দিয়ে উঠল ঃ সহপাঠিনীদের সঙ্গে মিশলে তোমাদের মন ছোট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমার হয় না। এর মধ্যেই ফণী এ নিয়ে কতগুলো বিশ্রী কথা বলে বেড়িয়েছে, সে আমি জানি। সে যাক—হঠাৎ পাঁচ হাতের চাইতেও বেশি লম্বা রাজপুত মেরুদণ্ড টান করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো ঃ একটা কথা ওকে বলে দিয়ো সুকুমার। ক্যারাভান যখন যায় তখন যতই কুকুর ডাকুক, কিছুই আসে যায় না তার। লাভের মধ্যে কুকুরেরই খানিকটা এনার্জি নষ্ট হয়—যেটা সে অন্য সৎকাজে খরচ করতে পারত।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে পিছিয়ে গেলাম। এ সে বিক্রম নয় যে চোরের মতো চুপিচুপি আমার কাছে কবিতা দিতে এসেছিল। এ বিক্রম চোখের সামনে ওভার-বাউণ্ডারী করে গট-গট করে লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে চলে গেল—আমি একটা কথা বলতে পারলাম না আর। তাকিয়ে দেখলাম, স্কোর বোর্ডে একটা অবিশ্বাস্য অঙ্কপাত হয়েছে, যার কাছেও আমি কোনো দিন যেতে পারব না।

শুধু আমার দুটো চোখ অন্ধ বিদ্বেষে অগ্নিবর্ষণ করতে লাগল।

কিন্তু তবু আনাড়ীর ব্যাটিং। আমরা যারা পাকা ফিল্ডস্‌ম্যান, আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম উপযুক্ত অবকাশের। এখন স্পষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের মধ্যে। এ অসহ্য—এ অবিশ্বাস্য। ক্লাসে আমাদের মতো দুর্দান্ত সব ছাত্র থাকতে কলেজের সেরা মেয়েকে এম্‌নি করে বশীভূত করে নেবে একটা মাথামোটা অবাঙালী ! এ আমাদের সকলের অপমান—এ জাতীয়

অপমান। ফণী সত্যেন দত্ত আবৃত্তি করে বললে :

এক হাতে মোরা মগেরে রুখিছি,
মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-কেদারের প্রতাপে হটিতে
হয়েছে দিল্লীনাথে।

এবার সিগারেটের অগ্নিশিখা জ্বেলেই সোজা রাজপুতকেও একেবারে বিধ্বস্ত করে ফেলব! হুঁ-হুঁ, চালাকি নয়।

দূর থেকে চোখা চোখা বাক্যবাণ ছুঁড়তে শুরু করলাম আমরা, কাব্যচর্চা চলতে লাগল ব্ল্যাক-বোর্ডে। কিন্তু আশ্চর্য নিরাসক্ত বিক্রম—অদ্ভুত রকম নির্বিকার। ক্যারাভান সত্যি সত্যিই এগিয়ে যাচ্ছে, হাজার চেষ্টা করেও আমরা তার গতিরোধ করতে পারছি না। বাস্তবিক, আমাদেরই এনার্জির অহেতুক অপব্যবহার হচ্ছে দিনের পর দিন।

আর ফণী আনছে একটার পর একটা মর্মঘাতী খবর।

—পরশু ওরা আবার চা খেয়েছে।

—কাল বিক্রম ওদের লনে টেনিস খেলছিল।

—আজ সন্ধ্যার পরে বেল্‌স-পার্কে দুজনে পাশাপাশি বেড়াচ্ছিল। সে কী ইন্টিমেট্ ভঙ্গি। বুঝলে সুকুমার, **something is happening**!

উঃ, অসহ্য করে তুলল।

ইচ্ছে করে, মণিকার কাছে যাই, সমবেত ভাবে বাঙালী জাতির তরফ থেকে তার সুমতি ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করি আমরা। কিন্তু সাহস হয় না। অত্যন্ত রাশভারী মেয়ে, মুখের উপর যা-তা বলে দিলে অপমান রাখবার জায়গা থাকবে না। আর তারপরে একটিমাত্র পার্লামেন্টারি রাস্তা খোলা থাকবে, সে হল আত্মহত্যা। নাঃ, ও রিস্‌ক নেওয়া যায় না।

কিন্তু কী করা যায়? দল বেঁধে বসে আমরা সিগারেটের পর সিগারেট ওড়াতে লাগলাম, আর প্রোগ্রাম করতে লাগলাম—কী করা যায়! সমস্ত বাঙালী জাতির মুখ যে কলঙ্কিত হয়ে গেল! আবার বুঝি বিক্রমজিতের ছদ্মবেশ ধরে মুহম্মদ বিন্ কাশিমের আবির্ভাব হয়েছে বাঙালীর ইতিহাসে!

অবশেষে এল সুযোগ। শুধু সুযোগ নয়, ক্লিন্ বোল্‌ড-আউট করে দিলাম বিক্রমকে, উড়িয়ে দিলাম তার উইকেট।

ব্যাপারটা ঘটল কলেজ সোস্যালের সময়।

পর পর তিনখানা গান গেয়ে আমি যখন মাইক ছাড়লাম তখন সমস্ত হলটা প্রচণ্ড হাততালিতে মুখরিত হচ্ছে। সমস্বরে কয়েকজন চিৎকার করে উঠল, 'এন্‌কোর, এন্‌কোর'—কিন্তু আর গাইলাম না আমি। খাঁটি শিল্পীর মতোই হাত জোড় করে একটা প্রসন্ন নমস্কার জানিয়ে নেমে গেলাম 'ডায়াস' থেকে।

তখন চারদিকে ছেলে-মেয়ে এবং অধ্যাপকদের দৃষ্টি আমার ওপরেই নিবদ্ধ হয়ে আছে। গর্ব করব না, কিন্তু এ কথা সত্যি গানটা ভালোই গাই

আমি। আজ আরো প্রাণ ঢেলেই গেয়েছি। গাইতে গাইতে এও লক্ষ্য করেছি, মুগ্ধ বিস্ময়ে মণিকা সেন আমার মুখের দিকে আগাগোড়াই তাকিয়ে ছিল। আজ আমার নতুন একটা পরিচয় আবিষ্কার করেছে সে। আজ তার কাছে আমিই 'হিরো'।

সমস্ত হলটাতে রচনা করে দিয়েছিলাম সুরের ইন্দ্রজাল। তখনো চারদিকে তার রেশ কাঁপছে রিন্-রিন্ করে—তখনো তার আবেশ ছড়িয়ে আছে সকলের বিমুগ্ধ চেতনার ওপরে। অসীম আত্মপ্রসাদে মণিকার দিকে তাকালাম আমি—দৃষ্টি মিলতেই সসংকোচে চোখ নামিয়ে নিলে সে।

এই সময় ফণী হঠাৎ মাইকে দাঁড়িয়ে উঠল। সোস্যাল সেক্রেটারী সে।

ফণী বললে, যদিও প্রোগ্রামে নেই, তবু আজ আপনাদের একটা নতুন 'ফিচার' উপহার দেব আমরা। আপনারা জানেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙালীরই নিজস্ব সম্পদ নন—তিনি সমস্ত ভারতবর্ষের অন্তরের ধন। 'পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা' সবাই তাঁকে লাভ করে ধন্য। তারই প্রমাণ স্বরূপ আমাদের অবাঙালী বন্ধু বিক্রমজিৎ সিংহ আপনাদের দু'-একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনে তৃপ্তিদান করবেন।

ক্রিকেট ম্যাচের স্মৃতি ছাত্রদের মনের কাছে তখনো পুরোনো হয়নি। একটা নতুন সকৌতুক বিস্ময়ের প্রত্যাশায় আবার প্রচণ্ড হাততালিতে হল কাঁপতে লাগল।

বিক্রম সামনের একখানা চেয়ারেই বসে ছিল। তৃপ্ত চোখে আমরা দেখলাম, মুহূর্তে তার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বিনা ভূমিকম্পেই যেন তার মাথার ওপরে ভেঙে পড়েছে ছাতটা।

ফণী ডাক দিলে, এসো বিক্রম—

বিক্রম দাঁড়িয়ে উঠে সভয়ে বলতে চেষ্টা করল ঃ না-না—

ফণী তাকে শেষ করতে দিলে না। আবার উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করলে ঃ আমাদের বন্ধুটি নীরব সাধক। তিনি আত্মপ্রকাশে লজ্জা পাচ্ছেন। কিন্তু আমরা জানি, তিনি সত্যিকারের গুণী—একেবারে আদর্শ নীরব কর্মী। তিনি ধরা দেন না, তাঁকে আবিষ্কার করে নিতে হয়। ক্রিকেটের মাঠে একদিন তাঁর বিস্ময়কর আবির্ভাবের কথা হয়তো এর মধ্যেই আপনারা ভুলে যাননি। আমি জোর করে বলতে পারি, আজ তাঁর প্রতিভার আরো একটা আশ্চর্য দিক আপনাদের কাছে উদ্ঘাটিত হবে। এসো বিক্রম—পরম আদরে ফণী হাত বাড়িয়ে দিলে।

প্রবল জয়ধ্বনি উঠল।

বিক্রম পালাতে চাইছিল, কিন্তু পারল না। ক্যাপটেন ব্যানার্জি পাশেই দাঁড়িয়েছিল—যেমন করে তাকে খেলার মাঠে টেনে নামিয়েছিল, ঠিক তেমনি করেই টেনে তুলল ডায়াসের ওপরে। বললে, চিয়ার আপ্—

জলে-ডোবা মানুষের মতো একবার চারদিকে তাকালো বিক্রম।

আমরা সমস্বরে বললাম, না, না, লজ্জা করলে চলবে না।

বিক্রম তখন থর-থর করে কাঁপছে। যখন টানাটানি করে তাকে হার্মোনিয়ামের সামনে বসিয়ে দেওয়া হল, তখন তার মুখের চেহারাটা শুধু যে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে তাই নয়, একটা অবর্ণনীয় পাণ্ডুরতায় যেন শবের মতোই দেখাচ্ছে তাকে। যেন কশাইখানার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বধ্যপশুকে।

পরক্ষণেই চোখ বুজে বল পিটানোর মতো মরীয়া হয়ে হার্মোনিয়াম ধরলে বিক্রম।

কিন্তু গান আর ক্রিকেটের বল এক নয়। কর্কশ বেসুরো গলায় দু-একটা লাইন ধরতে না ধরতেই হাস্য এবং হাততালির বন্যা ডেকে গেল। পেছন থেকে উঠল একদল শেয়ালকুকুরের সম্মিলিত ঐকতান। আগের থেকেই বন্দোবস্ত ছিল ফণীর, নক্ষত্রবেগে দু-তিনটে ডিম আর পচা টোম্যাটো এসে পড়ল বিক্রমের গায়ে।

ঘরময় হিংস্র আর নিষ্ঠুর হাসির প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। গানটা শেষ করে নয়, একটা আর্তনাদ করে যেন উঠে দাঁড়ালো বিক্রম। আর কোনো দিকে তার লক্ষ্য পড়ল না, আর কোনো অপমান যেন তাকে স্পর্শও করল না। আকুল চোখ মেলে সে মণিকা সেনকেই খুঁজতে লাগল। এবং যথানিয়মে তাকিয়ে দেখল. মুখে রঙিন রুমাল চেপে হাসির আবেগে যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে মণিকা সেন।

আর কেউ দেখল না, কিন্তু আমি দেখলাম। দেখলাম, বিক্রমের দু চোখের কোণায় বজ্র আর বৃষ্টি একসঙ্গে চক-চক করছে। কিন্তু মনের মধ্যে নাচছে প্রতিহিংসার জল্লাদ, সহানুভূতি জোড় বাঁধল না। অনেকটা চেষ্টা করেই আমি ঘরভরা পৈশাচিক অট্টহাসিতে যোগ দিলাম।

ডায়াস থেকে নেমে পড়ল বিক্রম। আর একটা পচা টোম্যাটো এসে ঠিকরে পড়ল ওর মুখে, বীভৎস ভাবে রাঙিয়ে দিলে ওকে। হাসি এবং জন্তুর ডাকে যেন প্রলয় চলতে লাগল চারদিকে। একটা আদিম বন্যতা সমস্ত শৃঙ্খল আর শৃঙ্খলার বাঁধন থেকে মুক্তি পেল, যেন আফ্রিকার অরণ্যের একদল নরখাদক তাদের শিকারকে ঘিরে ধরে শুরু করেছে দানবীয় কোলাহল।

হঠাৎ বিক্রম চেঁচিয়ে উঠল : কাউয়ার্ডস্!—কিন্তু কান্নাভরা গলায় হুঙ্কার ওর ফুটল না, অসহায় আকুলতায় হারিয়ে গেল।

দরজা দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল বিক্রম। মণিকা সেনের মুখে তখনো রুমাল চাপা, উচ্ছ্বসিত প্রচণ্ড হাসিটা কোনোমতেই রোধ করতে পারছে না সে।

হলের গণ্ডগোল থামাবার জন্যে আমাকেই আবার গিয়ে মাইকে বসতে হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গানের যাদুমন্ত্র বিস্তার করে চারদিক নিস্তব্ধ করে দিলাম আমি। আহত একটা কুকুরের মতো যখন নিজের কোনো একটা নিভৃত কন্দরে লুকিয়ে ক্ষত লেহন করছে বিক্রম, সেই অবসরে মণিকার দৃষ্টির প্রসাদ আমার ওপর এসে পড়ল বরমাল্যের মতো। আজ আমারই জয়জয়কার!

একটা স্লিপ পেলাম সোস্যাল শেষ হওয়ার পরেই।

মণিকা সেনের স্লিপ। এক টুকরো সুগন্ধি কাগজে মুক্তোর মতো লেখা।

"কাল যদি দয়া করে আমাদের বাড়িতে চা খান, খুশি হবো। বিকেল পাঁচটায় আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করব আমরা।"

স্লিপটা ভাঁজ করে বুক-পকেটে রাখলাম আমি, রাখলাম বুকের কাছাকাছি। বিক্রমের অভিনয় শেষ হল, এবার রঙ্গমঞ্চে আমি প্রবেশ করলাম নায়করূপে।

* * *

বছর ছয়েক পরের কথা।

এম-এ পাস করে অধ্যাপনা নিয়েছি পশ্চিমের কোনো বড় শহরে। বাসা পেয়েছি কলেজের কাছাকাছি—বেশ খোলামেলা জায়গায়। সস্ত্রীক আছি—অল্প আয়েও দুজনের মোটামুটি সচ্ছল ভাবেই চলে যায়—গুছিয়ে নেবার ক্ষমতা আছে গৃহিণীর।

সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাইরে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, কলেজ থেকে ফিরে আর বেরুইনি আমি। অনার্স ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা তৃষ্ণার্ত চাতকের মতো আকুল হয়ে আছে, তাদের জন্যে কিছু নোট তৈরী করা প্রয়োজন। মোটা মোটা একরাশ বই খুলে নিয়ে লিখে চলেছি আমি, আর মধ্যে মধ্যে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখছি বৃষ্টির ঝর্ণায় ঝাপসা হয়ে আসা ইলেকট্রিকের আলোয় বাইরের ঝাউবীথি কী অশান্তভাবে মাতামাতি করে চলেছে।

খট। কল্যাণী ঘরে ঢুকল। ওদিকের টিপয়ের ওপরে রাখা রেডিয়োটাকে খুলে দিয়েছে। কাঁটা ঘুরিয়ে কলকাতা স্টেশন ধরল। গান বেজে উঠল ঃ

"বহু যুগের ও-পার হতে আষাঢ় এল আমার মনে—"

কলম নামিয়ে রেখে আমি হাসলাম ঃ দিলে তো লেখাটা মাটি করে?

কল্যাণী পাশে এসে বলল ঃ রাখো ও-সব লেখা। যা তোমার ছাত্র-ছাত্রীদের নমুনা—নোট দিলেও ফেল করবে, না দিলেও করবে। মিথ্যে পণ্ডশ্রম করে মরছ তুমি।

—কিন্তু তুমিও তো আমারই অনার্সের ছাত্রী ছিলে।

—তাই জন্যেই তো শেষ পর্যন্ত পাস করবার জন্যে তোমাকে বিয়ে করতে হল।—কল্যাণী হাসল।

—না, লক্ষ্মীটি! দুষ্টুমি করে না এখন, লিখতে দাও।—আমি বললাম, অনার্সের ব্যাপার। ওরা ফেল করলে কি আর মান থাকবে!

বললাম বটে, কিন্তু লেখায় আর মন বসল না। কত দিনের পুরোনো গান—কত পরিচিত। এককালে কত বর্ষার সন্ধ্যায় এই গান গেয়ে আসরে ছড়িয়ে দিয়েছি মালবিকার স্বপ্ন। বরিশাল কলেজের সেই দিনগুলো স্মৃতির মধ্যে হঠাৎ গুঞ্জন করে উঠল। 'শকুন্তলা'-র সেই শ্লোকটা মনে পড়ল ঃ 'ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি'।

কিন্তু হঠাৎ ভেঙে গেল আবেশটা। সজোরে কড়া নড়ে উঠল বাইরের

দরজায়।

কল্যাণী বিরক্ত হয়ে বললে, এখন আবার কে জ্বালাতে এল?

—আবার কে! নিশ্চয় রতনপ্রসাদ, ব্রীজ খেলার জন্যে ডাকতে এসেছে।—হাঁক দিয়ে বললাম, এসো এসো পান্ডে, দরজা খোলাই রয়েছে।

কল্যাণী তেমনি বিরক্ত স্বরে বললে, না—না, এই বৃষ্টির মধ্যে আর যেতে হবে না তাসের আড্ডায়। ভিজে অসুখ করবে শেষে।

কিন্তু তার কথা শেষ হওয়ার আগেই শোনা গেল ভারী পায়ের শব্দ। দরজা খুলে গেল, আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল কল্যাণী।

কাঁধে ভিজে বর্ষাতি—মিলিটারি ইউনিফর্ম পরা দীর্ঘদেহ পুরুষ। অতিকায় চেহারা, দেখলে আতঙ্ক জাগে। বাহুতে আর-আই-এ-এফ-এর চিহ্ন পদমর্যাদা দ্যোতনা করছে। দাঁড়ালো এসে একেবারে মূর্তিমান যমদূতের মতো।

যুদ্ধের সময়। মিলিটারদের সম্পর্কে সমস্ত আতঙ্ককর জনশ্রুতিগুলো বিদ্যুৎবেগে ভেসে গেল স্মৃতির ওপর দিয়ে। সভয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম আমি, বললাম, কী চাও?

লোকটা নিঃশব্দে হাসল, জবাব দিলে না।

কোনো কুমতলব নেই তো? আমি প্রায় চীৎকার করে উঠলাম: কী চাও তুমি, কেন ঢুকেছ বাড়ির মধ্যে?

সে তবু দাঁড়িয়েই রইল।

—প্লিজ, বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে। নইলে পুলিসে ফোন করব আমি—আতঙ্কিত উত্তেজনায় আমার গলা কাঁপতে লাগল থর-থর করে।

লোকটা এবারে কথা বললে। বললে পরিষ্কার বাংলায়, শান্ত কোমল একটা মৃদু হাসির সঙ্গে: আমি কি এতই বদলে গেছি গুপ্ত? আমায় চিনতে পারছ না?

আমি চিনলাম। চিনলাম অত-বড় বিরাট পুরুষের অমনি একটা স্নিগ্ধ মেয়েলী হাসি দেখে। বলে ফেললাম, বিক্রমজিৎ!

বিক্রম এগিয়ে এল। দুটো প্রকাণ্ড ভিজে হাতে আমার ডান হাতটা তুলে নিয়ে প্রবল বেগে ঝাঁকুনি দিলে, উচ্ছ্বসিত স্বরে বললে, সুকুমার!

কল্যাণী দাঁড়িয়েছিল বিবর্ণ মুখে, তখনো সম্পূর্ণ কেটে যায়নি তার বিহ্বলতাটা। তার দিকে ফিরে বিক্রম বললে, আগে চটপট এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করুন মিসেস গুপ্ত, তারপরে পরিচয় হবে। দেরি করবেন না—**I am awfully tired**!

হাসবার চেষ্টা করল কিন্তু তখনো হাসতে পারল না কল্যাণী। নিজের অপ্রতিভ অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাবার জন্যই বোধ হয় বেরিয়ে গেল পরদা ঠেলে।

ঝুপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বিক্রম বললে, এখানকার এক বাঙালী পুলিস অফিসারের কাছে তোমার খবর পেলাম। বেশ ভালোই আছো দেখছি।

—চলে যাচ্ছে এক রকম করে। কিন্তু তুমি হঠাৎ এভাবে এলে কোত্থেকে ?

—সে সব কি আর এক কথায়ই বলা যায় ? বিক্রম পাউচ থেকে তামাক নিয়ে পাইপে ভরতে লাগল : অনেক সময় লাগবে, অনেক কথা আছে। তার আগে একটু চা খেয়ে নিই—বড় ক্লান্ত আপাতত।

* * *

চা আর খাবার গোগ্রাসে শেষ করে বিক্রম বললে, মনে আছে বোধ হয় সেই সোস্যালের পরেই আমি কলেজ ছাড়ি—ট্রান্সফার নিয়ে চলে আসি কলকাতায়।

সসংকোচে বললাম, ও-কথা মনে করিয়ে আর লজ্জা দিয়ো না ভাই।

বিক্রম হেসে উঠল : আরে ছি ছি, এতদিন পরেও কি তুমি জিনিসটাকে সিরিয়াস্‌লি নিচ্ছ নাকি ! ওটা যৌবনের ধর্ম, তার জীবন। অস্বীকার করব না, সেদিন খুব শক্‌ড্ হয়েছিলাম। কিন্তু আজ মনে পড়লেও হাসি পায়। তা ছাড়া যুদ্ধে গিয়ে—I have seen life through and through ! সেন্টিমেন্টালিজম্ আর নেই।

পাইপটাকে খুলে অ্যাশ-ট্রের ওপরে ঝাড়তে ঝাড়তে বিক্রম বললে, কিন্তু একটা সেন্টিমেন্টালিজম আমার তখনো ছিল, আজো রয়েছে ; অথবা তাকে সেন্টিমেন্ট বলব না—বলব ইন্‌স্পিরেশন। সে হল বাংলা দেশ সম্পর্কে আমার একটা অসীম অনুরাগ, সীমাহীন প্রীতি। আজ আর্ অবশ্য সেজন্যে আমার মণিকা সেনকে দরকার হয় না—রবীন্দ্র-কাব্য পাঠের মূল সূত্রটি নিজের মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি।

তবু আমার ভুল হয়েছিল। আমি নিজেকে ঠিক চিনতে পারিনি। ভুল হয়েছিল এই জন্যে যে স্বধর্ম হারিয়েছিলাম আমি। এককালে লোকে ভাবত কোট-প্যান্ট না পরলে ইংরেজি শেখা যায় না, আমি ভেবেছিলাম, বাংলা কাব্য পড়তে বাঙালী হওয়া দরকার। আমি জানতাম না, কবিতার 'কালচার' কোনো বিশেষ দেশের পটভূমিতে আবদ্ধ নয়, তা ফর অল প্লেসেস্ অ্যান্ড অল টাইমস্ !

ওই ভুলের জন্যেই আমি ঘা খেলাম—দুঃখ পেলাম জীবনে। রাজপুত আর্টের দিক্‌টা দেখতে গিয়ে হারাতে চেষ্টা করলাম রাজপুত জীবনকে। ফল যা হল তা অত্যন্ত বিয়োগান্ত। আমার একূল গেল, ওকূলও আমি খুঁজে পেলাম না।

আজ আর বলতে সংকোচ নেই—একটি বাঙালীর মেয়েকে বিয়ে করবার স্বপ্ন আমার ছিল। ঘাগ্‌রা-পরা বলিষ্ঠদেহ কোনো মরুভূমির মেয়ে নয়, আমি চেয়েছিলাম ময়নাপাড়ার মাঠের কৃষ্ণকলিকে। কিন্তু দেখলাম তা হবার নয়। বাঙালী মেয়েরা শ্রদ্ধা করল আমার শক্তিকে, আমার রাজপুত পৌরুষকে, আমার কবি মনকে নয়। অর্থাৎ চাইল আমার অবাঙালী সত্তাকে, আমার বাঙালীত্বকে অসীম কৌতুকে উড়িয়ে দিলে তারা। সোস্যালের দিনে মণিকা সেনের সেই তীব্র ভয়ঙ্কর হাসি আমার ভোলবার নয়।

কলকাতায় পড়তে আসার কিছুদিন পরের কথা।

বাবার এক বাঙালী বন্ধুর দৌলতে তাঁর অফিসে আমার একটা চাকরি জুটে গেল। শ'খানেক টাকা মাইনে। মনে হল, জীবনে চরম পাওয়া আমি পেয়ে গেছি—এর বেশি আর কিছু চাইবার নেই আমার। এমন কি মণিকা সেনের স্মৃতি পর্যন্ত মন থেকে মুছে আসছিল একথা বললে অন্যায় হয় না।

তবু স্বপ্ন ছিল চোখে। তবু ভুলতে পারিনি শ্যামল মাটির শ্যামলা বাঙালী মেয়ের কথা। কিন্তু তারা শুধু ছোঁয়াই বুলিয়ে গেছে—ধরা দেয়নি কোনোদিন। নানাভাবে দোলা দিয়ে গেছে, জাগিয়ে গেছে নেশা। বাধা এসেছে শেষ পর্যন্ত। কখনো বাইরে থেকে, আবার কখনো নিজের মনের মধ্যেই তা সঞ্চারিত হয়ে উঠেছে আপনা থেকে।

একটা ছোট ঘটনার কথাই বলি।

জানোই তো, রাজপুত হলেও আমরা পুরোপুরি বাঙালী-ঘেঁষা। সত্যি কথা বলতে কি, আমি যে বাঙালী নয় একথা প্রায়ই আমার মনে থাকত না। তার জন্যে কলকাতায়ও আমার বাঙালী পরিচিতের অভাব ছিল না। দু একজনের সঙ্গে মোটামুটি বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়েছিল বললেও অন্যায় হয় না।

বলেছি তো একশো টাকা মাইনেতে চাকরি করতাম। সুখেই ছিলাম।

অতএব আর কিছুই করবার নেই। নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন। বাঁধা সড়কে, বাঁধা নিয়মে পা ফেলে এগিয়ে চলা—ব্যতিক্রম নেই কোথাও, ব্যত্যয় নেই কোনো কিছুর। নটা-পাঁচটার ঘড়ির কাঁটায় ঘুরছে নিয়ন্ত্রিত নির্ভুল দিন; অফিস যেতাম, নিয়মিত কলম পিষতাম, ছুটি-ছাটার দিন আড্ডা মারতেও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম ক্রমশ। বরিশালে আমার যে নিঃসঙ্গতা দেখেছিলে, সেটাও কেটে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে।

বেশ ছিল।

কিন্তু এক-একটা দিন আসে। এক-একটা আশ্চর্য দিন। জীবনচক্রের সঙ্গে রুটিনে মেলানো বাঁধা ছুটি নয়, একটা আকস্মিক ব্যাঙ্ক হলিডে। রেসের মাঠে পাঁচ টাকার বাজী জেতবার মতো কিংবা ক্রস্‌ওয়ার্ড পাজ্‌লে হঠাৎ পেয়ে যাওয়া তিন টাকা সাড়ে ন আনার মতো একটা ছুটি—ছেলেমানুষের মতো খুশি করে তোলে মনকে। অকারণে নিজেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ বলে মনে হতে থাকে, মনে হয় অপ্রত্যাশিত একটা সম্পদ এসে পড়েছে মুঠোর মধ্যে: কী ভাবে তাকে ব্যয় করা যাবে, কী উপায়ে সার্থক করে তোলা যাবে তাকে, ভেবে যেন দিশে পাওয়া যায় না।

এমনি একটা দিন আমার বাঁধা পথটাকে অকারণে বাঁকিয়ে দিলে একটু; বেলা নটায় ডালহাউসি স্কোয়ারে যাওয়ার পথে হঠাৎ ট্রাম থেমে নেমে একটা অচেনা গলিতে ঢুকে পড়বার মতো।

সকালে ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়েছিল জানলা দিয়ে আজকে দেখা যাচ্ছে নতুন একটা অপরিচিত আকাশকে, বৃষ্টি-ধোয়া অপরূপ একটা

পরিচ্ছন্নতা, একটা আশ্চর্য নীলিমা ; মেঘের ছোট ছোট টুকরাগুলো যেন ছুটির অহেতুক আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে। ফুটপাথের ওপর তারের জালে শিশু শিশু-গাছটার পাতাগুলো অতিরিক্ত সতেজ আর সবুজ, তাদের ওপর দিয়ে পিছলে পিছলে পড়ছে সোনালি রোদ। পাশের বাড়ির কার্নিশে তিন-চারটে পায়রা, চোখ বুজে পরম তৃপ্তির সঙ্গে সকালের রোদে নিমগ্ন হয়ে গেছে। ওদিকের ছাতে একটি কিশোরী মেয়ের একখানা টুকটুকে মুখ আর একরাশি এলোচুল যেন এই প্রসন্ন উজ্জ্বল সকালটির সঙ্গে এক তারে আর এক সুরে বাঁধা।

ভারী খুশিমনে বিছানা ছেড়ে উঠলাম আমি। চা খেলাম, দাড়ি কামালাম, তারপর কড়া ইস্ত্রির শার্ট আর ঘামে মলিন কলারওয়ালা কোটটাকে সরিয়ে রেখে পরলাম একটা সিল্কের পাঞ্জাবি আর পায়জামা, গুন্‌গুন্‌ করে গান গাইতে গাইতে নেমে এলাম রাস্তায়।

বাগবাজার স্ট্রীট দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে হাঁটতে চলেছি চৌমাথার দিকে। একবার বেলগাছিয়ায় পূর্ণর ওখানে গিয়ে তাস খেলে আসা চলে, আড্ডা জমানো চলে হাতীবাগানের ফোটোআর্টিস্ট 'কমন' মামার স্টুডিয়োতে। কোথায় যাওয়া যেতে পারে এবং কোথায় গেলে এই উপরি-পাওনার দিনটিকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যাবে এটা নিশ্চিতভাবে স্থির করবার আগে মনে পড়ল কাঁটাপুকুরে একবার ভবানীর খোঁজ করলে মন্দ হয় না। এত কাছাকাছি থাকে অথচ বছরখানেকের মধ্যে দেখাই হয়নি ভবানীর সঙ্গে।

কথাটা মনে পড়তেই ভারী ভালো লাগল আমার। বড় ভালোমানুষ ভবানী। মেয়েদের ব্যাপারে ও আমার চাইতেও বেশি বিব্রত হয়ে ওঠে। কলেজ-জীবনে কো-এডুকেশন ক্লাসে ও আমার মতোই নিষ্ঠুর ঘা খেয়েছিল একটা। তাই আমার সঙ্গে ভারী মত মেলে ওর। বন্ধুত্বও বেশ জমেছিল একসময়—এই একটি মনস্তত্ত্বকেই উপলক্ষ্য করে।

দরজার কড়া নাড়লাম।

দরজা খুলে দিলে ভবানীর বোন পূর্ণিমা। আর সঙ্গে সঙ্গেই যেন নতুন কিছু একটা আবিষ্কার করলাম আমি। সেদিনকার ছোট মেয়েটি এক বছরের ভেতরে দস্তুরমতো একটি তরুণী হয়ে উঠেছে—ভারী আশ্চর্য তো!

পূর্ণিমা ওরফে নিমু কেমন চমকে উঠল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। বললে, ওঃ, আপনি!

নিমুর চমকটা লক্ষ্য করে আমি হেসে উঠলাম ঃ কেন, আমাকে আর কিছু ঠাউরেছিলে নাকি? অনেকদিন আসতে পারিনি—বড্ড ব্যস্ত ছিলাম। তা ভবানী কোথায়?

—দাদা?—নিমুর মুখের রঙটা বদলে কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল ঃ দাদা তো নেই বাড়িতে।

—বাড়িতে নেই!—মনটা নিরুৎসাহ হয়ে গেল ঃ বেরিয়েছে বুঝি!

নিমু কথা বললে না। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। একটা বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিমুর মুখের ওপরে বুলিয়ে নিয়ে অগত্যা বললাম,

তবে আর কী হবে, যাই। ভবানী এলে বোলো, আমি এসেছিলাম।

নিমু এবারেও জবাব দিলে না, কেমন বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইল। ঠোঁট দুটো একটুখানি শিউরে উঠেই থেমে গেল, যেন কী একটা বলতে গিয়ে সামলে নিলে নিজেকে। তারপরে আবার আস্তে আস্তে তেমনি ভাবেই নাড়ল মাথাটা।

কেমন খটকা লাগল আমার, কেমন যেন মনে হল ঘুম-ভাঙা চোখ মেলে জানলা দিয়ে যে নীল নির্মল উজ্জ্বল দিনটি দেখেছিলাম, তার সঙ্গে এর সুর মিলছে না। একবার জিজ্ঞাসা করতে চাইলাম ব্যাপার কী, কিন্তু পরক্ষণেই মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, আচ্ছা, আসি আজ।

মাত্র কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় পেছন থেকে ডাক এল, শুনুন?

থেমে দাঁড়িয়ে গেলাম। নিমু ডাকছে।

বিষন্ন ম্লান স্বরে নিমু বললে, মা আপনার সঙ্গে কথা কইতে চান।

এটা অপ্রত্যাশিত। জিজ্ঞাসায় কপাল কুঁচকে বললাম, আমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ, আপনার সঙ্গেই।

বেশ নতুন রকমের লাগল। ভবানীর সঙ্গে যথেষ্ট বন্ধুত্ব থাকলেও হয়তো বিদেশী বলেই ওদের অন্তঃপুরে ঢোকবার সুযোগ পাইনি কখনো। আর দাবীও করিনি সেটা। কিন্তু আজ হঠাৎ এই নিমন্ত্রণ—কেমন অদ্ভুত বোধ হল।

জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েই নিমু বললে, ভেতরে আসুন।

কিন্তু ভেতরে পা দিতেই তীব্র একটা অস্বস্তি শরীরের ভেতর দিয়ে চমকে গেল। অভাব আর অস্বাস্থ্য যেন শ্বাসরোধকারী খানিকটা গ্যাসের মতো পাক খাচ্ছে সমস্ত বাড়িটাতে। ভবানীদের অবস্থা ভালো নয় এটা জানতাম, কিন্তু সে যে এত খারাপ তা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি। বাইরের ঘরের মধ্যবিত্ত রূপটা নিম্নবিত্ত অন্তঃপুরকে কী বিভ্রান্তিকর একটা প্রচ্ছদপট দিয়ে ঢেকে রেখেছিল, ভাবতেও লোমকূপগুলো একসঙ্গে শিরশির করে শিউরে উঠল আমার।

যে ঘরে নিমু আমাকে নিয়ে এল সে ঘরটির এই আলোয় ভরা প্রসন্ন উজ্জ্বল সকালটিও সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্নতায় স্তিমিত হয়ে আছে। উপরি-পাওয়া ছুটির দিনটি এখানে এসে রূপায়িত হয়েছে মৃত্যুবিবর্ণ শোকদিবসে। চুন বালির আস্তর-খসা নানা রঙে চিহ্নিত নোংরা দেওয়ালগুলোর দিকে তাকানো চলে না। একটা পচা চিমসে গন্ধ সমস্ত নাকমুখকে বিস্বাদ করে দিচ্ছে—ইঁদুর মরে পচতে শুরু করেছে কোথাও। ঘরের একটিমাত্র জানালা—ওদিকের বাড়ির নোনাধরা একটা দেওয়ালে অবরুদ্ধ; জানালা আর দেওয়ালের মাঝামাঝি জায়গাটুকু আকীর্ণ হয়ে আছে পাহাড়প্রমাণ ছাইয়েআর আবর্জনায়, সম্ভবত ওখানেই স্বর্গীয় হয়েছে ইঁদুরটা। ঘরে তক্তপোশ নেই; মেজেতে ময়লা বিছানা, দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে রঙচটা গোটাকয়েক ট্রাঙ্ক, লক্ষ্মীর আসন, নিম্নবিত্তের গৃহস্থালীর সরঞ্জাম।

গরমে আর দুর্গন্ধে যেন দম আটকে আসতে লাগল, সর্বাঙ্গে দরদর করে

ঘামের স্রোত নামতে লাগল ময়লা বিছানাটার দিকে তাকিয়ে। একটা ছেঁড়া শাল বুক পর্যন্ত টেনে ভবানীর মা শুয়ে আছেন। ব্যাধি। এই ঘরের সঙ্গে এমনি একটা অসুস্থতা না থাকলে সমস্ত জিনিসটাই যেন অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এবং আমার অবচেতন মন আশা করতে লাগল ব্যাধিটা যক্ষ্মা হওয়াই উচিত।

কিন্তু হাঁপানি। কামারশালার ইঁদুর-কাটা পুরানো হাপরের মতো শব্দ করতে করতে ফ্যাসফেসে গলায় ভবানীর মা বললেন, এসো, বোসো বাবা।

এদিক-ওদিকে বিপন্নের মতো তাকালাম আমি—বসবার একটা জায়গাই খুঁজতে লাগলাম কিছুক্ষণ। তারপর ধপ করে মরীয়া হয়ে মেজের ওপরেই বসে পড়লাম।

মা বললেন, আহা-হা, মেজেতে বসলে কেন? এই বিছানায় উঠে বসো।

—দরকার নেই, বেশ বসেছি এখানে।

পচা ইঁদুরের গন্ধ নাকের ভেতরে টানতে লাগলাম। এই অন্ধকার অবরুদ্ধ ঘরে লক্ষ কোটি ব্যাক্‌টিরিয়ার অনিবার্য সঞ্চার কল্পনা করে গায়ের চামড়াগুলো কুঁকড়ে কুঁকড়ে আসতে লাগল আমার। কিন্তু চোখ বুজে একটা ভাঙা কুয়োর ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়বার মতো এখন বেপরোয়া হয়ে গেছি আমি—যা হওয়ার তাই হোক।

তারপর সেই ভাবে বসে বসে আমাকে শুনতে হল ভবানীর মার দুঃখের কাহিনী। বক্তব্যের আসল তাৎপর্য—আজ আট মাস থেকে ভবানী নিরুদ্দেশ।

হাঁপানির ফ্যাস্‌ফেসে আওয়াজের সঙ্গে গোঙানি মিশিয়ে ভবানীর মা বলে যেতে লাগলেনঃ কলেজ থেকে বেরুবার পর চাকরিবাকরি তো জোটাতে পারল না ভবানী। দু'তিনটে টিউশনি করত, তাও তো কোনো বাঁধা আয়পত্তর কিছু নেই। বোঝোই তো বাবা, অভাবের সংসার—দুটো চারটে কথা কাটাকাটি হয়েই থাকে। তাই বলে বাড়ি থেকে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবি! দুটো পয়সা পাঠানো তো দূরের কথা, একটা খবরও কি দিতে নেই! এদিকে আমি রুগী মানুষ, জাহাজের মতো এতবড় সংসারটাকে চালাই কী করে? আঠারো-উনিশ বছরের ওই ছোট ভাইটা, পঞ্চাশটি টাকা মাইনে পায়, তাতে এক হপ্তা চলে না। এতবড় আইবুড়ো বোন—সবসুদ্ধ কি আমি গলায় দড়ি দেব, না গঙ্গার জলে ডুবে মরব?

কথার শেষে ভবানীর মা কাঁদতে শুরু করলেন, দুটো জলের রেখা কালিপড়া চোখের কোল বেয়ে চোয়াল ভাঙা পাণ্ডুর গালের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল ময়লা বালিশে। আমার সিনিসিজম্‌ ক্ষমা কোরো সুকুমার। সহানুভূতিতে মন ভরে উঠল না আমার, বেদনায় প্রাণটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল না—শুধু মনে হতে লাগল পচা ইঁদুরের গন্ধটার মতো অস্বস্তিকর নারকীয়তার অনুভূতিটাই আবিষ্ট করে রেখেছে আমাকে। পেছন থেকেও যেন চাপা কান্নার একটা আওয়াজ আসছে, মুখ না ফিরিয়েও বুঝতে পারছি প্রায়ান্ধকারে ছায়ার মতো নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বসে আছে কিশোরী মেয়ে নিমু

—যার ভাল নাম পূর্ণিমা।

উপসংহারে ভবানীর মা বললেন, তুমি তো তার বন্ধু বাবা—যেখান থেকে পারো ভবানীর একটা খবর এনে দাও।

—চেষ্টা করব, আপনি ভাববেন না। উঠে পড়লাম।

দরজার বাইরে যখন পা দিলাম, তখন চোখে পড়ল কপাট ধরে দাঁড়িয়ে আছে নিমু। তার বিষণ্ণনির্বাক মুখের ডৌলটিতে, তার চোখ থেকে অশ্রুর কণার মতো মিনতি যেন আছড়ে পড়ছে আমার সর্বাঙ্গে। চকিতের মধ্যে আমার চাপা পড়া কল্পনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। যেন বর্ষার জল পড়ে হঠাৎ পাথুরে মাটির আড়াল থেকে মাথা তুলল এক ট শ্যামল অংকুর। মনে পড়ল ঃ বাংলা দেশের কোনো বেণু-বন-ছায়া-ঘন-সন্ধ্যায় ওই মেয়েটিকেই আমি দেখেছি গাগরী ভরতে, মনে পড়ল ওকেই আমি দেখেছি কালো চুলে কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী পরে নাগকেশর বনের মধ্য দিয়ে পথ চলতে। আচমকা, একটা আকস্মিক মুহূর্তে যেমন হয়—নিমুকে অত্যন্ত ভালো লাগল আমার, মনের ভেতরে গুনগুন করে কে বলে উঠল, ওর নাম পূর্ণিমা।

কিন্তু আর দাঁড়ালাম না আমি।

হাসছ সুকুমার? কিন্তু জানো তো, কী রোমান্টিক ছিলাম আমি একদিন। সেই অমনোনীত কবিতাগুলোর কথা মনে আছে তো? বিক্রমও হাসল।

বললাম, মনে আছে।—কিন্তু আমি হাসতে পারলাম না, গোপন মনের অপরাধবোধটা আমাকে আঘাত করল।

বিক্রম পাইপটা নামিয়ে রেখে বলল, সেই রোমান্সের আলোয় মন আমার তখনো রঙিন। আর একবার তারই মূল্য দিলাম।

বৃষ্টি-ধোয়া একটা চমৎকার সকাল, ক্রস্‌ওয়ার্ড পাজ্‌লে তিন টাকা সাড়ে ন আনা পেয়ে যাওয়ার মতো একটা ছুটির দিন। এই অপরূপ সকালটিকে হারিয়ে ফেলে একটা অন্ধকূপে আত্মহত্যা করতে বসেছিলাম নাকি। মাথার ওপরে খোলা আকাশ, রোদে ঝলমলিয়ে ওঠা শিশুগাছটার কচি-কোমল পাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে বুকভরে একটা নিঃশ্বাস টেনে নিলাম।

অত্যন্ত দ্রুতবেগে পালিয়ে যেতে চাইছিলাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম কাঁটাপুকুর লেনের এই অন্ধকার একতলা বাড়িটার কথা। পচা ইঁদুরের গন্ধটা এখনো যেন স্নায়ুগুলোর উপরে চেপে বসে আছে। বাইরে এত বিস্তীর্ণ—এমন একটা পরিপূর্ণ জীবন থাকতে কেমন করে আমি ওই অন্ধকার মৃত্যুর গর্তটার ভেতরে ঢুকে পড়েছিলাম?

জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করেছি এতক্ষণে। এবেলা আর বেলগাছিয়ায় পূর্ণের ওখানে যাওয়া যাবে না, তবে হাতীবাগানে মামার স্টুডিওতে আড্ডা জমানো যেতে পারে এখনো।

আর ঠিক সেই সময় এমনি অঘটনটা ঘটে গেল।

হঠাৎ পাওয়া একটি ছুটির দিন। পুজো-পার্বণ নয়, তবু ছুটি। কলটা

বাজে, তবু কড়া ইস্ত্রীর শার্টের ওপরে কোট চাপিয়ে অফিসের দিকে ছুটতে হচ্ছে না আমাকে, ঝুলতে হচ্ছে না ডালহাউসি স্কোয়ারের ট্রামে। বাগবাজার স্ট্রীট দিয়ে নির্বিকার ভাবে লক্ষ্যহীনের মতো পথ চলেছি আমি। সবকিছু ব্যতিক্রম—সবকিছু আলাদা। আর ব্যতিক্রমের দিন বলেই কি মনের ভেতরেও এই ব্যতিক্রমটা ঘটল আমারও ?

জানো সুকুমার, আশ্চর্য, চলার বেগটা আমার কমে আসতে লাগল আস্তে আস্তে। তারও পরে একসময় ঠোঁটে আঙুল দিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি।

মন্দ কী। মন বললে, মন্দ কী, এই তো বেশ। আজকের এই আশ্চর্য নতুন সকাল একটা নতুন কিছুর দিকেই আমাকে টেনে নিয়ে যাক না। পূর্ণর ওখানে গিয়ে ব্রীজ খেলা—সে তো আছেই, যে কোনো একটা ছুটির দিনের সঙ্গেই তো সেটা অঙ্গাঙ্গী। মামার আড্ডায় গিয়ে জমে বসবার ভেতরেও কোনো বৈচিত্র্য নেই—প্রতিদিনের বাঁধা অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সেটা একাকার হয়ে গেছে। আজ একটা ভালো কিছু করব আমি—বৃহৎ একটা কিছু, মহৎ কোনো একটা প্রয়াস। হঠাৎ অতিরিক্ত সবুজ হয়ে ওঠা শিশুগাছের পাতাগুলোর মতো আকস্মিকতার রঙ লাগিয়ে নিজেকে নতুন করে তুলব।

—হ্যালো, সিং!

পাড়ার চেনা চায়ের দোকান। জমে যাই মাঝে মাঝে। সেখান থেকেই ডাক দিয়ে নেমে এল গণেশ।

—আজ অফিস নেই বুঝি ?

সংক্ষিপ্ত ছোট্ট জবাব দিলাম : নাঃ।

—দিব্যি আছেন।—গণেশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। ভাবটা যেন আমি রোজই এই ধরনের ছুটি পাচ্ছি আর বাপের পয়সায় সিনেমা দেখে আর রেস্ খেলে বেড়ানো গণেশের খাটতে খাটতে একেবারে প্রাণান্ত হয়ে গেল।

সংক্ষেপে বললাম, হুঁ।

—আজ একটা ভালো বই আছে "শ্রী"তে—যাবেন ? র‍্যান্ডম্ হারভেস্ট্। রোনাল্ড্ কোলম্যান যা একখানা প্লে করেছে—একেবারে চেটে খাওয়ার মতো। চলুন না।

—না।

—না কেন ? খাসা ছুটির দিনটে আছে—

—আমার সময় হবে না—গণেশকে এড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলাম।

মন্দ কী—এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা!

চলতে চলতে মনে হতে লাগল, বাস্তবিক এর কোনো অর্থ হয় না। তুমি বেশ আছো, নিশ্চিন্তে বেঁচে আছো তুমি। অফিসে চাকরি, ব্যাঙ্কে কিছু টাকা, স্বাস্থ্য আর উৎসাহ—পরিতৃপ্ত সচ্ছল জীবনযাত্রা। কিন্তু ওইখানেই তো সব নয়! এতবড় পৃথিবী, এত মানুষ, এত দুঃখ। সকলের দুঃখ তুমি ঘোচাতে পারো না, দায়িত্ব নিতে পারো না পৃথিবীর সমস্ত মানুষের অভাব-

অভিযোগ মিটিয়ে দেবার। কিন্তু যতটুকু পারো ততটুকু কেন করবে না? কেন সাধ্যমতো তোমার দাক্ষিণ্যকে বিস্তীর্ণ করে দেবে না দু'হাতে?

তা ছাড়া—তা ছাড়া ভবানী আমার বন্ধু। একেবারে অন্তরঙ্গ না হোক, সহপাঠী তো বটে। এক ধরনের হৃদ্যতাও তো ছিল। আজ এই অপূর্ব ছুটির দিনে—আশ্চর্যভাবে একটা বন্ধুকৃত্য করবার সুযোগ এসেছে আমার। মন্দ কী!

কেমন সুন্দর দৃষ্টিতে নিমু তাকিয়েছিল আমার মুখের দিকে। হঠাৎ অত্যন্ত ভালো লেগেছিল, হঠাৎ যেন চোখ পড়ে গিয়েছিল আসন্ন সন্ধ্যার ধূপছায়া-রঙ-আকাশের প্রথম নক্ষত্রটিব দিকে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবার গুঞ্জরিত হল মনের মধ্যে। হঠাৎ যেন কে পদসঞ্চার করল আমার প্রাণের গভীরে। মনে হল ঃ

"শুনেছিনু যেন মৃদু রিনিরিনি
ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিঙ্কিণী
পেয়েছিনু যেন ছায়াপথে যেতে
তব নিঃশ্বাস পরিমল—"

পূর্ণিমা নামটি ওর সার্থক—কিন্তু বর্ষার পূর্ণিমা। জলভরা মেঘের টুকরোতে যখন থেকে থেকে চাঁদের মুখ আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

অতি প্রখর, অতি প্রগল্ভ জ্যোৎস্নার চাইতে বর্ষার পূর্ণিমাই ভালো।

চৌমাথায় এসে বড় একটা ফলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম দুটো দশ টাকার, তিনটে এক টাকার নোট আব কয়েক আনা খুচরো পয়সা। এতেই বেশ কুলিয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

—আঙুরের সের কত করে?

—চার টাকা।

—বেদানা?

—তিন টাকা।

—খেজুর?

—আড়াই টাকা।

কপালটা চুলকে নিলাম, মনে মনে একবার হিসেব করে নিয়েছি টাকার পরিমাণটা। আর সঙ্গে সঙ্গেই চোখ চলে গেল আকাশের দিকে। জানালা দিয়ে যেমনটি দেখেছিলাম, ঠিক সেই রকম নীলিমোজ্জ্বল আকাশ; চৌমাথার নানামুখী ট্রামগুলোতে ঢং ঢং করে বাজছে ছুটির ঘণ্টা। রবীন্দ্রনাথের লাইন ঃ

'নদী কূলে কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে সখি ডেকে'—

আজ আর পকেটের হিসেব করলে চলবে না।

—সবগুলো দাও আধসের করে।

পেছন থেকে কে ঘাড়ে হাত দিলে। চকিতে মুখ ফেরালাম।

পূর্ণ। সারামুখ ভর্তি করে একসঙ্গে বোধ হয় গোটাতিনেক পান খেয়েছে, পানের রস নিচের ঠোঁট থেকে গড়িয়ে নেমে পড়েছে চিবুক পর্যন্ত ; এদিকে ঠোঁটের কোণে চুনের দাগ লেগে আছে। সবসুদ্ধ মিলিয়ে মস্তবড় একটা হাঁ করে হাসল পূর্ণ। ওর হাসিটা ওই রকম, একেবারে আলজিভটা পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ণকে একপলকে দেখেই অত্যন্ত বিশ্রী লাগল, ভারী ভালগার বোধ হল যেন।

পূর্ণ বললে, তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম।

—ওঃ!—নিরুৎসাহিত গলায় জবাব দিলাম।

—ভেবেছিলাম তোমাকে পাকড়াও করে নিয়ে একেবারে দক্ষিণেশ্বরে চলে যাব। দেখছি এখানে তোমার সঙ্গে দেখা না হলে বাড়ি গিয়েও তোমাকে পাওয়া যেত না। তা ব্যাপার কী? এত ফল কিনছ কী জন্যে? কারো অসুখ নাকি?

—হুঁ।

—কার অসুখ?—পূর্ণ উদ্বিগ্ন হতে চেষ্টা করল।

মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলাম। সব জিনিস কেন এমন করে খুঁটিয়ে জানতে চায় পূর্ণ, কিসের জন্যে ওর এই অহেতুক কৌতূহল? আর দুর্ভাগ্যটা এমনি যে, ঠিক সময় বুঝেই যেন মস্তবড় একটা হাঁ করে হতভাগা তার সামনে এসে দর্শন দিলে।

পূর্ণ আবার জিজ্ঞাসা করলে, কার অসুখ?

বিরক্তিতে মন ভরে গেছে। খানিকটা দ্বিধাও বোধ হল। তারপর পরিচ্ছন্ন গলায়, মন স্থির করে নেওয়ার নিশ্চিন্ত প্রত্যয়ে পরিষ্কার বললাম : কালীঘাটে আমার এক কাকা থাকেন, তাঁর। ফলের ঠোঙাটা আর দোকানীর দেওয়া ভাঙানিগুলো তুলে নিয়ে বললাম, খুব বেশি অসুখ। এসব ফল তাঁরই জন্যে।

পূর্ণর কৌতূহল তবু থামে না। যে মানুষগুলো মোটা হয়, বুদ্ধিও দিনের পর দিন তাদের ভোঁতা হয়ে আসে নাকি? গলার স্বরে আরো খানিকটা দুশ্চিন্তার খাদ মেশাতে চেষ্টা করলে পূর্ণ : তাই নাকি! তবে তো ভারী বিপদের কথা। অসুখটা কি হে?

ততক্ষণে একটা দ্রুতগ্রামী সরীসৃপের মতো আমি পিছলে পড়েছি সেখান থেকে। পূর্ণকে আর একটা কথাও বলবার সুযোগ না দিয়ে ধরে ফেলেছি চলতি ট্রামের হাতল। পাদানীতে উঠতে উঠতে পেছন ফিরে বললাম, চললাম ভাই, আজ আর কথা কইবার সময় নেই।

পূর্ণ জিজ্ঞাসু একটা কাকের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ঢন্ ঢন্ ঢন্। ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম চলেছে। প্রায় খালি ট্রামটার একেবারে সামনের সীটটাতে গিয়ে বসলাম। ভালো লাগছে—বড় বেশি ভালো লাগছে। কর্মহীন এই নিশ্চিন্ত দিনটাতে কী আশ্চর্য ভাবে কাজ জুটে গেল আমার। ওই একতলার অন্ধকার ঘর, পচা ইঁদুরের গন্ধ—মাঝখানে

একটি দুঃস্থ পরিবার। মুহূর্তের মধ্যে একটা নতুন মূল্যে মূল্যবান হয়ে উঠেছি আমি, একটা আশ্চর্য কর্তৃত্ব, অপূর্ব একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে হাতের মধ্যে। এই পরিবারটির আমি উপকার করতে পারি, সাধ্যমতো তাদের অভাব মোচন করতে পারি, এই মুহূর্তে আমিই তো তাদের অভিভাবক। তুমি বলো সুকুমার, এমন একটা ছুটির সকালে এই কর্তৃত্বের লোভটা ছাড়তে পারি কি আমি, হারাতে পারি হঠাৎ পাওয়া ছুটির মতো হঠাৎ পাওয়া এই অধিকারকে ?

মন্দ কী—মন্দ কী! নিজে বার বার কথাটাকে আওড়াতে লাগলাম। আমি সাধারণ, কত সাধারণ! ক্রিকেটের মাঠের সেই অসাধারণত্ব কবে মিলিয়ে গেছে সোস্যালের দিনে মণিকা সেনের সেই হাসিতে! বহুর ভেতর মিশে গিয়ে আলাদা কোনো রূপ ছিল না আমার, নিজের কোনো রঙ ছিল না। আজ একটা বড় কিছু করবার উৎসাহে, মহৎ কোনো কিছুর অনুপ্রাণনায় স্বতন্ত্র হয়ে গেছি, অনন্য—একক হয়ে গেছি। আজকের দিনটি নিজের বাঁধা গণ্ডীটার বাইরে টেনে এনেছে আমাকে। বহুদিন পরে আবার চেতনার গভীরে বরিশালের স্মৃতি জেগে উঠল সুকুমার। একে হারাতে পারবো না আজ। নিজের ভেতরে যেন স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।

হেদোর সামনে এসে নামলাম ট্রাম থেকে।

শুনেছি এলোপ্যাথিতে হাঁপানি সারে না, কবিরাজীই তার সবচাইতে ভালো চিকিৎসা।

এখানে বড় এক কবিরাজ আছেন—পুরোনো রোগ সারাতে তিনি নাকি সিদ্ধহস্ত। একবার তাঁর পরামর্শ নিলে মন্দ হয় না।

কবিরাজ বললেন, বলুন, কী চাই ?

—ভালো হাঁপানির ওষুধ দিতে পারেন ?—উৎসাহের আকুলতায় রুদ্ধস্বরে আমি বললাম, টাকার জন্যে ভাববেন না, আমার ভালো ওষুধ দরকার।

এরপরে কাহিনীর সমাপ্তিটি অদ্ভুত। কিন্তু মোটেই নাটকীয় নয়। শুনে তুমি বরং নিরাশই হবে সুকুমার।

কাঁটাপুকুর লেনে যখন পা দিলাম, বেলা তখন বারোটার ওপারে গড়িয়ে গেছে।

একহাতে ফলের ভারি ঠোঙাটা, আর একহাতে কবিরাজী ওষুধ। উজ্জ্বল নির্মল সকাল দুপুরের ঝাঁঝালো রোদ হয়ে জ্বলে যাচ্ছে কলকাতার ওপরে। শিশুগাছের বৃষ্টিধোয়া সবুজ পাতাগুলোর ওপরে চলতি গাড়ির ধুলো উড়ে পড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে একটা বিবর্ণ আস্তরণ।

ক্লান্ত পা ফেলে এগোচ্ছি। কিন্তু সমস্ত ক্লান্তি মনের ভেতর যেন কোথায় একটা উজ্জ্বল আনন্দের ভেতরে হারিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ পাওয়া ছুটির দিনটি এমন হঠাৎ যে আমাকে এভাবে তাকে পরিপূর্ণ করে দেবে এ কি জানতাম সুকুমার ?

আজ অধিকার পেয়েছি, সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছি একটা স্বাতন্ত্র্যে আর একাকিত্বে, একটা আশ্চর্য অনন্যতায়, যেমন একদিন হয়েছিলাম ক্রিকেটের মাঠে। এখন মনে পড়ছে ঘুম থেকে উঠে দেখেছি ওদিকের ছাতে একটি কিশোরী মেয়ের একখানি সদ্যফোটা মুখ, একরাশ ভিজে চুল পিঠ বেয়ে ভেঙে পড়েছে তার। প্রথম আলোয় উজ্জ্বল সে মুখখানি খুশিতে ভরা সকালটাতে একটু-খানি সোনার রঙ্ ছুঁইয়ে দিয়েছিল—কিন্তু তখন কি জানতাম, ওই মুখখানার ভেতরে ব্যতিক্রম করা নতুন আলোর মতো আরো একটা ব্যতিক্রমের সংকেত রয়েছে ?

সমস্ত পথটা নিজের ভেতরে বুনেছিলাম স্বপ্ন আর চিন্তার জাল। কী থেকে কী হয়ে যেতে পারে, কোথা থেকে কোথায় চলে যেতে পারি আমি। অভিভাবক হওয়ার সহজ আর সাবলীল এই দাবীটা শুধু কি ওইখানেই থেমে যাবে আমার ? শুধু কিছু ফল, কিছু ওষুধ কিনে দিয়ে, কিছু পরিমাণে দানের দাক্ষিণ্য দেখিয়ে ?

বিদ্যুৎচমকের মতো মনে হয়েছে, বেশ বড় হয়ে উঠেছে নিমু—যার ভালো নাম পূর্ণিমা। ভিজে ভিজে মেঘের আড়ালে আচ্ছন্ন বর্ষার পূর্ণিমা। হয়তো রূপ যথেষ্ট নেই পূর্ণিমার, কিন্তু লাবণ্য আছে, মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার অপরূপ স্নিগ্ধতা। আইবুড়ো মেয়ে—ভবানীর মা কাতরোক্তি করেছিলেন। স্বচ্ছন্দে, অত্যন্ত অবলীলাক্রমে পূর্ণিমাকে বিয়ে করতে পারি আমি। বিদেশী কিন্তু যোগ্যতা তো আমার প্রচুর। আমি নিশ্চিত জানি, আমার দাবীকে ওরা সহজে ফিরিয়ে দিতে পারবে না—ভবানী তো খুশিই হবে। তাছাড়া যারা এত বিপন্ন, তারা কি অত বাছবে আর। দরিদ্র সংসারটির ভারমোচন করতে পারি, পারি বড় একটা কিছু—একটা কিছু মহৎ—

মন্দ কী—মন বললে, এই ভালো।

উত্তেজিত আনন্দে কাঁপা হাতে দরজার কড়া নাড়লাম। বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটা অস্থির ভাবে দুলতে লাগল, পূর্ণিমা এসে এখনি দরজা খুলে দেবে।

কিন্তু পরক্ষণেই ভূত দেখার মতো তিন পা পিছিয়ে গেলাম। দরজা খুলে দিয়েছে ভবানী।

উজ্জ্বল হাসিতে ভবানী বললে, এসো, এসো। তুমি আজই খবর নিয়েছিলে ওদের কাছে শুনলাম। এলাহাবাদে চলে গিয়েছিলাম ভাই—শ'তিনেক টাকার একটা বড় চাকরি জুটিয়েছি ওখানে। তিন দিনের ছুটি পাওয়া গেল, তাই দশটার ট্রেনে এসে নেমেছি। এসো এসো, ভেতরে এসো—

আকাশ থেকে যেন হঠাৎ মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লাম।

দাঁতে দাঁত চেপে শুকনো গলায় বললাম, নাঃ, থাক। আজ আর ভেতরে যাবো না, কাল পরশু এসে দেখা করব।

ফলের ঠোঙা আর ওষুধের বোতলটা কঠিন নির্দয় মুঠিতে আঁকড়ে ধরে দ্রুতগতিতে সরে পড়তে চাইলাম সেখান থেকে। ক্ষিদে, তেষ্টা আর ক্লান্তিতে

সমস্ত শরীরটা আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। আজই, আজই কেন ফিরে এল ভবানী? কেন অন্তত একটা দিন সে আমাকে সময় দিল না, কেন এমন করে ছুটির এই আশ্চর্য সকালটাকে সে এভাবে হত্যা করল?

সে আশ্চর্য সকালটা আর নেই। ছুরির শানানো ফলার মতো ঝলসাচ্ছে রোদ। তবু এখনো 'শ্রী'-তে গেলে হয়তো "র‍্যানডম্ হারভেস্ট্"-এর টিকেট পাওয়া যাবে, অথবা পূর্ণকে যোগাড় করে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার প্রোগ্রামটাও হয়তো অসম্ভব নয়।

কিন্তু—

বিক্রম থামল।

বাইরে বৃষ্টি আরো বেড়েছে। একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, কিন্তু এখানেও শেষ নয়। আরো আছে তারপর। আর একটা নতুন অধ্যায়।

—বলে যাও।

—তাহলে আর একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে হবে মিসেস গুপ্ত।

আমি বললাম, কেন, থেকে যাও এখানে আজ। রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা এখানেই হবে না হয়। বিক্রম হাতঘড়িটা দেখে বললে, না ভাই, সে উপায় নেই। একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট্ রয়েছে, এক কাপ চা হলেই চলবে শুধু।

—দেখছি—ভেতরে চলে গেল কল্যাণী।

বাইরে বৃষ্টির ছাট্ লেগে ঝাপসা হয়ে আসা ইলেকট্রিকের আলোগুলোর দিকে তাকিয়ে বিক্রম বললে, আর আমি যাইনি ভবানীর বাড়ি। আমাকে নিছক রোম্যাণ্টিক ভেবো না সুকুমার। আমি জানি এর পরে কী ঘটত। যে দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ওদের কাছে আমি পৌঁছুতে পারতাম সে পথ আমার বন্ধ হয়ে গেছে—বড় চাকরি পেয়েছে ভবানী। তারপর আমি কোথায়?

চা-টা শেষ করে স্বপ্নালু ভঙ্গিতে আবার শুরু করল বিক্রম: কিন্তু এর পরে সত্যিসত্যিই আমার জীবনে এল একজন।

অর্চনা মিত্র।

এল চাঞ্চল্যের মতো। শুধু আমার নয়, সারা অফিসে প্রক্ষেপের মতো একটি মহিলা-কেরানী। অফিসের মধুচক্রে তার আবির্ভাব হল একেশ্বরী রূপে।

অত্যন্ত গম্ভীর মুখ। দেখতেশুনতে মোটামুটি চেহারা—বেশ ছিমছাম মসৃণতায় উজ্জ্বল। গাম্ভীর্যটা যে নিতান্তই ধার করা, একান্তই আত্মরক্ষার বর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়, তারও পরিচয় পাওয়া গেল কিছুদিনের মধ্যে।

যোগাযোগটা ঘটল অদ্ভুত।

শনিবারের দিনে সিনেমার টিকিট যখন করেছিলাম, তখন কি জানতাম ঠিক আমার পাশের সীট্‌টিতেই বসবে অর্চনা মিত্র? আমার একান্ত

সান্নিধ্যেই এগিয়ে আসবে অফিসসুদ্ধ সমস্ত কেরানীদের স্বপ্নচারিণী ?

অফিসে বহুর মধ্যে আমিও অন্যতম, কিন্তু সিনেমা হাউসে আমিই একতম। মুখ-চেনাটা এই দুঘণ্টার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল পরিচয়ে। আর সেই পরিচয়ের পেছনে অনেকখানিই প্রভাব ছিল সম্মুখের রুপালি পর্দার—সে পর্দায় তখন 'মালা অব্ দ্য সেভেন সীজ্' রক্তের মধ্যে উত্তাপ সঞ্চার করছে নেশার মতো।

তারপরের ঘটনা বিস্তৃত করব না।

অনেক জল গড়িয়ে গেল এর মধ্যে।. অফিসে পদোন্নতি হল আমার। বাংলার বাইরেও কোম্পানীর কিছু কিছু অফিস ছিল, যাতায়াত শুরু করলাম নানা জায়গায়।

এই সময়ে জীবনে আমি প্রথম পাপ করলাম সুকুমার, হত্যার চেয়েও নিষ্ঠুরভাবে শোধ নিলাম পৃথিবীর ওপর, জীবনের ওপর।

—পাপ ?

—হ্যাঁ, পাপ। আর আমি অন্যরকম হয়ে গেছি—হৃদয়ের বালাই আমার নেই বললেও চলে। দেখেই তা বুঝতে পারছ। কিন্তু সেদিনের একটা ক্ষ্যাপামির ধাক্কায় যা করে ফেলেছিলাম, আজও তার প্রায়শ্চিত্তের পথ খুঁজে পাই না।

ক্ষমা কোরো সুকুমার। আনাড়ী ব্যাট্স্ম্যান। খেলায় আউট হয়ে গিয়ে যদি নিরীহ কাউকে অকারণে আক্রমণ করে থাকি, তবে সে অপরাধ আমার অমার্জনীয় মনে কোরো না তুমি। জেনো মানুষ মানষুই—সে দেবতা নয়।

টুরে বেরিয়েছি তখন। এসেছি আলিগড়ে। একটা হোটেলে আশ্রয় নিয়েছি। এমন সময় বুকে এসে আর একবার বিঁধল মণিকা সেনের হাসির তীর—আর একবার বোল্ড আউট হয়ে গেলাম আমি।

আর কিছুই নয়, একখানা চিঠি। প্রচণ্ড আঘাত আর একটি। বাইরের দিকে চোখ মেলে দিয়ে বিক্রম বললে, শোনো ঃ

* * *

অনেক ঘুরে ঘুরে চিঠিটা এসে পৌঁছুল আলিগড় শহরের বিশ্রী পুরোনো হোটেলটায়। একবার ঠিকানা কাটা হয়েছে ফতেপুরে, আর একবার দিল্লীতে। কেমন নরম আর তেলতেলে হয়ে গেছে পোস্টকার্ডটা, দুমড়ে দুমড়ে গেছে কোণাগুলো, ভাঁজ পড়েছে মাঝখানটায়। আর একবার ঠিকানা কাটলেই চিঠি আর এসে পৌঁছোত না, পথেই গয়াপ্রাপ্তি হয়ে যেত বোধ হয়।

তবু চিঠিটা পৌঁছেছে। এবং না পৌঁছলেই হত ভালো। আর মাত্র চোদ্দ ঘণ্টা দেরি হলেই হয়তো চিঠিটার আঘাত থেকে মুক্তি পেতাম আমি। তারপর অনেক—অনেকদিন পরে, সময়ের প্রভাবে ফিকে, বর্ণহীন হয়ে যখন আমার কাছে আসত সংবাদটা, তখন হয়তো—

কিন্তু আমার প্রয়োজনের পরিমাণে পৃথিবীকে পাওয়া যায় না। তার রীতি আছে নিজস্ব। তার ধর্ম আছে স্বতন্ত্র। তাই বড় অসময়ে, বড় নিষ্ঠুর ভাবে আঘাতটা এসে বেজেছে। রাশগুলোতেও নানা বিপর্যয়—কোনোটাই সামলাতে পারছি না আমি। এভাবে আরো কিছুদিন চললে চাকরি থাকবে না। দিনকয়েক আগে কানপুর স্টেশনে জানালা গলিয়ে ট্রেনে উঠতে গিয়ে ডানহাতে সাংঘাতিক চোট লেগেছে একটা—এখনো যন্ত্রণা টনটন করে ওঠে সেখানে। শরীর মন কোনোটাই প্রস্তুত ছিল না।

পুরোনো ব্যাপার, পুরোনো খবর। অর্চনা মিত্র অর্চনা দত্ত হয়েছে গত দশই ফাল্গুন তারিখে। কী তিথি ছিল সেদিন? চতুর্দশী অথবা পূর্ণিমা? ছুটির দিনে একবার ওদের বাড়ি থেকে আমি বেড়িয়ে এসেছিলাম। উলুবেড়ে শহরে নিশ্চয় জ্যোৎস্নার জোয়ার নেমেছিল সেদিন, নিশ্চয় বাতাসে আসছিল আমের বন থেকে মৌ-ঝরানির গন্ধ, কোকিলের ডাকের নিশ্চয় বিরাম ছিল না, আর লক্‌গেটের পাশে নিশ্চয় গঙ্গার জল ফুলে ফুলে উঠেছিল জোয়ারের আবেগে। সানাই নিশ্চয়ই বাজছিল, বাঙালীর বিয়েতে তো রেওয়াজ আছেই। আর চেলির অন্তরালে অর্চনার মুখে লজ্জার একটা পেলব আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন তাকে দেখে কে বলতে পারত অফিসের মধুচক্রের মাঝখানে কঠোর-মুখ একটি মেয়ে, যার কোনো রসকষের বালাই আছে বলে মনে করবার হেতু নেই। অথবা বিলিতী সিনেমা হাউসে যার পাশে বসে 'মালা অব্‌ দ্য সেভেন্‌ সীজ'-কে উপলব্ধি করা যেত, এ সেই মেয়ে!

আর সেই রাত্রি—সেই তিথি। মনে আছে বই কি। কানপুর স্টেশন। জানালা দিয়ে দিল্লী এক্সপ্রেসে ওঠা। বাইরে থেকে কে একটা দেড়মণী সুটকেস ছুঁড়ে দিলে, কাঁধ বরাবর এসে পড়ল সেটা, মনে হল হাতখানা যেন ছিঁড়ে শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছে আমার। ইণ্টার ক্লাস কামরাটার ভেতরে দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই—অসহ্য ভিড় আর অসহ্য গরম। বাঙ্কের ওপর থেকে মাড়োয়ারীর একখানা জুতোসুদ্ধ ঝুলন্ত পা গাড়ির ঝাঁকুনির তালে পেণ্ডুলামের মতো নিয়মিত ছন্দে ঠকাস্‌ ঠকাস্‌ করে এসে লাগছে আমার কপালে। বাইরে কি জ্যোৎস্না ছিল? কে জানে! কিন্তু মাথার ওপরকার ইলেকট্রিক আলো থেকে অজস্র পোকা এসে ছড়িয়ে পড়ছিল চোখেমুখে। কোকিল ডাকছিল কি? জানা নেই, কারণ তখন কামরার ভেতর উত্তাল হয়ে উঠেছিল রাজনীতি, সঙ্গীত আর নাসিকাগর্জনের একটা মিশ্র রাগিণী। আমের মুকুলের গন্ধ আসছিল না—রাশীকৃত মালের চাপে হাট-করে-খোলা ল্যাভেটরীর দরজা থেকে বিষাক্ত বীভৎস গন্ধের উচ্ছ্বাস এসে সমস্ত শরীরকে যেন বিষিয়ে দিচ্ছিল।

সেই রাত্রে—ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো সন্ধ্যা আটটা থেকে ভোর ছটায় দিল্লী পৌঁছানো পর্যন্ত দুর্বিষহ যন্ত্রণার অবকাশে আটশো মাইল দূরে অর্চনা মিত্রের বিয়ে হয়ে গেছে।

পুরোনো ব্যাপার—পুরোনো আঘাত। প্রতিশ্রুতি রাখেনি অর্চনা,

সাধারণ বাঙালী ঘরের কজন সাধারণ মেয়ের পক্ষেই বা সেটা রাখা সম্ভব? কিন্তু বড় অসময়ে এসেছে খবরটা—বড় অপ্রস্তুত মুহূর্তে। এই দারুণ দুঃসময়ে অন্ততঃ আমার মনের কাছে প্রলেপের মতো হয়ে থাকা উচিত ছিল কৃষ্ণকলির মায়া, খঞ্জনা নদীর ধারে অঞ্জনার রূপকথা। কিন্তু সমস্ত রূপকথা আমার আগুনে জ্বলে ছাই হয়ে গেল।

ঠাট্টা কোরো না সুকুমার, জীবনে এই প্রথমবার যেন নিষ্ঠুর পরাজয়ের যন্ত্রণা বোধ করেছিলাম। এসেছিল আত্মহত্যা করার দুর্বলতা—সেই প্রথম আর সেই শেষ। চিঠি পাবার পর মনে হচ্ছিল শুধু আত্মহত্যাই করা চলে এখন। অত্যন্ত সহজেই করা চলে। এই তেতলার জানালা দিয়ে নিচের বাঁধানো উঠোনটার ওপর একটা ঝাঁপ দিলেই হয়—চক্ষের নিমেষে মাথাটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে একটা মাটির পাত্রের মতো। অথবা ড্রেসিং টেবিলটার ওপরে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছন্দেই কড়িকাঠের হুকের সঙ্গে ফাঁস দিয়ে নেওয়া চলে হোল্ড-অলের শক্ত স্ট্র্যাপটার—এখনো নতুন আছে—বেশ সইবে আমার এতবড় শরীরটার ভার। তা ছাড়া সুটকেসে ক্ষুরটা তো আছেই—একেবারে আয়নার মতো ঝকঝক করছে, আজই সেটাকে শান দিয়ে এনেছি আমি, গলার নলীতে বসিয়ে একখানা ইট তুলে জোরে ঘা লাগালেই চলবে—বেশি পরিশ্রম করবার দরকারই হবে না কোনো।

যেমন করা উচিত, ঠিক তেমনি ভাবেই ঘরের মধ্যে অসংলগ্ন পায়ে ঘুরে বেড়ালাম আমি, ঘুরে বেড়ালাম সেই বিকেল পাঁচটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত। তারপর যখন পা দুটোকে অত্যন্ত বেশি ভারী বলে মনে হল, অনেকক্ষণ ধরে দাঁতে দাঁত চেপে রাখবার ফলে মাড়িদুটো টনটন করে উঠল যখন, তখন জানালার ধারে এসে বসলাম বাইরের দিকে জ্বলন্ত চোখের ক্ষুব্ধ আর ক্ষিপ্ত দৃষ্টি মেলে দিয়ে।

পেটা ঘড়িতে সশব্দে বারোটা বাজল কোথাও; নিস্তব্ধ হয়ে আসা রাত্রির বুকে তরঙ্গ জাগিয়ে দূরের লাইন বেয়ে বেরিয়ে গেল টুন্ডলা যাত্রী প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা। হঠাৎ যেন ঘোর ভাঙল আমার। সরে এলাম জানালার ধার থেকে, মেঝে থেকে সুটকেসটা তুললাম খাটের ওপর, ডালা খুলে ফেলে সেটার ভেতরটা হাটকাতে লাগলাম আমি।

কী ভাবছ সুকুমার? না, না, ক্ষুর বার করিনি। বার করলাম অর্চনার ফোটোখানা। বুকের ওপর দিয়ে দুটি কালো সাপের মতো দুটি বেণী দুলিয়ে দিয়েছে অর্চনা, কপালে পরেছে টিপ, হাসিতে মুখ আলো হয়ে আছে। কত কাছে চলে এসেছে, আমার উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের স্পর্শে অল্প অল্প কাঁপছে ছবিটা। মনে হচ্ছে ইচ্ছে করলেই এই মুহূর্তে তাকে বুকে টেনে নেওয়া চলে, একটা প্রবল আর পৈশাচিক চাপে পাঁজরাগুলো মটমট করে ভেঙে দেওয়া যায় তার। কিন্তু কিছুই করা যায় না। দশই ফাল্গুন রাত্রিতে এখান থেকে আটশো মাইল দূরে অর্চনা সেনের বিয়ে হয়ে গেছে।

ছবিটাকে উলটে ধরলাম আমি। পেছনের সাদা দিকটায় মেয়েলি নিটোল

হাতের লেখা—"আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।" বেশ বেছে বেছে লাইনটা লিখেছিল অর্চনা। অথবা অর্চনা শুধু একাই নয়—ওটা হয়তো প্রত্যেক মেয়েরই কবচকুণ্ডলের মতো সহজাত। মনে আছে যে সন্ধ্যায় ছবিটা আমাকে দিয়েছিল সে—সেদিন মনে হয়েছিল সত্যিসত্যিই বুঝি বাংলা দেশের বংশীবটের নিচে আমি তার পাতার ভেঁপু কুড়িয়ে পেলাম।

এখন শ্রীযুক্ত দত্তকে এই ফটোটা পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?

কল্পিত প্রতিহিংসার একটা হিংস্র আনন্দে উল্লসিত হয় আমার মন। আবার উঠে পড়লাম, অর্চনার ফোটোটাকে মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরে ঘরময় ঘুরে বেড়ালাম অনেকক্ষণ। আলোটাকে তখন আর সইতে পারছিলাম না। চোখের ভেতর দিয়ে ঢুকে সেটা কেমন লঙ্কার ঝাঁঝের মতো একটা জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। তাই খট্ করে একসময় ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিলাম। অন্ধকারে নিজেকেই যখন আর দেখতে পেলাম না, তখন ঘরের অবরুদ্ধ তামস স্তব্ধতার ভেতরে একটা নিশাচর জন্তুর মতো শিথিল সতর্ক পায়ে সারারাত চলে ফিরলাম আমি।

কিন্তু বেদনা বিলাসের সময় কই। কাজ—অফুরন্ত কাজ।

বিরহী ব্যর্থ মানুষের মতো দু'দণ্ড উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যে থাকব তারও অবকাশ নেই আর। ভোরের আলো ফুটে ওঠবার আগেই জিনিসপত্র প্যাক করে নিতে হল, দাড়ি কামাতে হল, স্নান করেও নিতে হল। রাত্রি জাগরণের একটা আড়ষ্ট ক্লান্তি, মস্তিষ্কের মধ্যে সব কিছু ফাঁপা হয়ে যাওয়ার মতো একটা অনুভূতি—সব কিছু ভুলে যেতে হল আমাকে। কাজ—কাজ। আজ দুপুরের আগেই আগ্রা পৌঁছুতে হবে আমাকে। পুরো দুটো দিন কেটে যাবে ওখানকার অফিসের কাগজপত্রগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে। তারপর আবার দিল্লী। এন্‌গেজমেন্ট প্যাডের প্রত্যেকটি পাতা লাল কালির আঁচড়ে চিহ্নিত—একটা দিনও এমন হাতে নেই তার যা এই নিভৃত বেদনাকে নিশ্চিন্তে রোমন্থন করবার মতো সময় দিতে পারে আমাকে।

সুতরাং ঘড়িতে যেই কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটা বাজল, তখনি একটা টাঙ্গা ডেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাসের উদ্দেশ্যে।

আলিগড় টু আগ্রা, আলিগড় টু মথুরা। ইউ.পি গভর্ণমেন্ট-এর সারি সারি বাস অপেক্ষা করছে। টিকেট কিনে বাসে উঠে বসলাম। পরিষ্কার ঝকঝকে গাড়ি। চমৎকার গদীআঁটা সিট্‌গুলো—ঠিক যে কটি সিট্ তার একজন বেশি নেবার উপায় নেই। বাংলা দেশের খোয়া-ওঠা অথবা হাঁটু পর্যন্ত ধুলো সঞ্চিত ভাঙাচুরো পথ দিয়ে যেসব শ্রীহীন বিবর্ণ বাস সর্বাঙ্গে বাদুড়ের মতো যাত্রী ঝুলিয়ে যাতায়াত করে, তাদের সঙ্গে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

কিন্তু সেই রকম একখানা বাস হলেই হত। সেই রকম ভাঙাচুরো একখানা গাড়ীই বয়ে আনত বাংলা দেশের পরিচয়, বাংলা দেশের সান্নিধ্য। যে বাংলা দেশকে আমি ভালোবেসেছি, যেখানকার শ্যামলা মেয়েরা বারে বারে পথ

ভুলিয়ে আমাকে নিয়ে যেত যেন মরীচিকার মধ্যে। তাহলে গাড়ির ঝাঁকুনি খেতে খেতে আরও বেশি করে মনে পড়ত অর্চনার কথা। অতি পরিচিত মাঠ ঘাট জলা জঙ্গল আর বড় বেশি সবুজ পল্লীশ্রীর দিকে তাকিয়ে ব্যথায় বিকল হয়ে যেত মন, সহযাত্রিণী কোনো চেলি-পরা নববধূর অবগুণ্ঠনের দিকে তাকিয়ে হু-হু করে উঠত বুকের ভেতরে। কিন্তু এই অতি পরিচ্ছন্ন বাস, আশেপাশের এই অপরিচিত মানুষের দল—বাইরে মেঘবর্ণ অড়হর ক্ষেতের দিগন্তবিস্তার—এর ভেতরে মন যেন কোথাও আশ্রয় পাচ্ছে না, খুঁজে পাচ্ছে না কোনো ভীরু আর পলাতক জন্তুর মতো নিভৃত কন্দরে লুকিয়ে নিজের ক্ষতলেহনের সুযোগ।

নিরুপায় ভাবে একখানা হিন্দী দৈনিকপত্র কিনে নিয়ে তার পাতায় মনোযোগ দিলাম আমি।

পঞ্চাশ মাইলের ওপরে রাস্তা—তিন ঘণ্টার বেশি সময় নেবে। সেকেলে ভাঙা বাড়ি, কেল্লার ধরণে তৈরি করা জমিদারের সাবেকী প্রাসাদ, পশ্চিমের স্বভাবসিগ্ধ ঘননিবিষ্ট গ্রাম আর আদিগন্ত অড়হরের ক্ষেত পাশে পাশে রেখে কংক্রীট করা পথের ওপর দিয়ে বাস উড়ে চলেছে আলিগড় টু আগ্রা। আর তিন ঘণ্টার মধ্যেই গিয়ে পৌঁছুবে। এবং তিন ঘণ্টা পরে কাগজপত্রের স্তূপের মধ্যে একেবারে তলিয়ে থাকবো আমি—অর্চনার ফোটোটা যে বুকপকেটেই আছে, সে কথা তখন মনেও থাকবে না আর।

কিন্তু মিনিট দশেকও কাটল না। হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম।

অন্যমনস্ক ছিলাম বলেই লক্ষ্য করিনি এতক্ষণ। এই বাসে যে দুজন বাঙালী যাত্রী আছে এবং তারা বসেছে ঠিক তার সামনের সীটেই। কানে যেন তীরের মত কথাটা এসে বিঁধল।

—আজকের দিনটা একটা আশ্চর্য দিন মিনু। জীবনে একে ভুলতে পারব না।

পাশের মেয়েটির স্নিগ্ধ কোমল গলায় চাপা শাসন শুনতে পাওয়া গেল: আস্তে। আশেপাশে আরো কতগুলো লোক যে রয়েছে সে খেয়াল নেই বুঝি?

—কিছু ভয় নেই মিনু। সব নির্ভেজাল পশ্চিমা, কেউ কিছু বুঝতে পারবে না।

সব নির্ভেজাল পশ্চিমা? চমকাতে গিয়েও আমি চমকালাম না। মনে পড়ল আমি বাঙালী নই, এ কথাটা আমার মনে না থাকলেও পৃথিবীতে আর কারো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া আমার পরনে পাজামা, পাঞ্জাবির ওপরে চাপানো তসরের জহরকোট। মাথায় শেঠজী মার্কা কালো গুজরাটী টুপি, হাতে হিন্দী খবরের কাগজ। না—আমাকে সন্দেহ করবার প্রশ্নই ওঠে না।

একটি ছেলে, একটি কুমারী মেয়ে। কথার স্বরে আর সুরে সম্পর্কটা অনুমান করে নিতে সময় লাগে না। নিজের যন্ত্রণার জন্যেই যেন বিশ্রী

লাগল ওদের। অসীম বিরক্তিতে ভ্রূকুটি করে আবার কাগজে নিবিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করলাম।

কিন্তু গাড়িতে কেউই ওদের রসালাপ বুঝতে পারবে না এটা অনুমান করে স্বচ্ছন্দেই প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছে দুজনে। মানুষে প্রেমে পড়লে আশেপাশের পৃথিবীতে আরো যারা আছে তাদের সম্পর্কে কি ভোঁতা হয়ে যায় নাকি অনুভূতি? চোখ বন্ধ করে ভাবে জগতে কেউ তাদের দেখতে পাচ্ছে না?

—আমার ভয় করছে সুধীরদা। বাবা হয়তো রাজী হবেন না।

—রাজী না হলে তো উপায় নেই শান্তা। আর তোমাকে না হলে আমার যে একটা দিনও চলবে না সে তো তুমিই সব চেয়ে ভালো করে জানো। বেঁচে থাকার কোনো মূল্যই থাকবে না আমার কাছে।

খবরের কাগজের আড়ালে একটা বিকৃত হাসি দেখা দিল আমার মুখে। আর কতকাল চলবে এই মিথ্যে কথার জের টেনে চলা, ওই পুরোনো প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি? কোনো মূল্য থাকবে না জীবনের? কী করবে সুধীরদা? আত্মহত্যা? আত্মহত্যা—কাল রাত্রে এ কথা আমিও ভেবেছিলাম। জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারতাম নিচের বাঁধানো উঠোনটায়, হোল্‌ড্‌-অলের স্ট্র্যাপ্‌টা কড়িকাঠের সঙ্গে ফাঁস দিয়ে ঝুলে পড়তে পারতাম, গলায় বসিয়ে দিতে পারতাম চকচকে শান দেওয়া ঝক্‌ঝকে ক্ষুরখানাকে। কিন্তু পারিনি।

—সত্যি, তোমার সঙ্গে ক'দিনের বা আলাপ? অথচ মনে হয়—মেয়েটির গলায় সেই অর্চনা মিত্র সাড়া দিয়ে উঠল: মনে হয় সারাজীবন তুমি আমার পাশাপাশি রয়েছ।

—অথচ মাত্র দেড়মাস। কুতুব থেকে দিল্লীতে ফেরবার পথে তোমাদের টাঙ্গার ঘোড়াটা পা ভেঙে বসে পড়ল—মনে আছে? সবুজ সিল্‌কের শাড়ী পরে একটা গাছের নিচে বিব্রতমুখে তুমি দাঁড়িয়েছিলে—

তীব্রভাবে একটা ধমক দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল আমার—চুপ করো! আশ্চর্য, ওই এক কথা—একই ধরণের কথা আওড়াতে কখনো কি ক্লান্তি আসবে না মানুষের, আসবে না বিতৃষ্ণা? একটা নতুন কিছু বলুক, ওই ধোঁয়াটে ঝাপসা কথার জাল না বুনে সহজ হওয়ার চেষ্টা করুক—স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। সবুজ সিল্‌কের শাড়ী পরে বিব্রতমুখে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল শান্তা; কিন্তু টাঙ্গার যে ঘোড়াটা পা ভেঙে পড়েছিল পথের ওপর (কল্পনার দৃষ্টিতে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি), যার রোঁয়া-ওঠা বিবর্ণ পিঠটার ওপরে টাঙ্গাওয়ালার চাবুকের দাগ রক্তাক্ত হয়ে ফুটেছিল—রক্তচিহ্নে ভন্‌ভন্‌ করছিল ডাঁশ, আর যার মুখের কষে কষে তুষারকণার মতো সাদা ফেনার রেখা দেখা দিয়েছিল সেই ঘোড়াটাকে কেন এত সহজেই ভুলে যাচ্ছে সুধীরদা? ক্ষমা কোরো সুকুমার। সে সময়ে আমি সিনিক্‌ হয়ে উঠেছিলুম। তোমাকে তো বলেছি, অমন দুর্বল মুহূর্ত আমার জীবনে আর কখনো আসেনি।

—আমরা মোটর থামালুম। আমি বললুম, যদি কিছু মনে না করেন, আমার গাড়িতে তো জায়গা রয়েছে, আপনাদের নিউ দিল্লীতে পৌঁছে দিতে পারি। সেই মুহূর্তে দুটি চোখে যেন আলো জেবলে তুমি আমার দিকে তাকালে—

নাঃ, অসম্ভব! খবরের কাগজের পাতায় পুরো দু কলম জোড়া হিমালয়-ফেরত যোগীর ওষুধের বর্ণনাতেও মনকে নিবিষ্ট করা যাচ্ছে না। জানালার বাইরে মাথা গলিয়ে দিলাম।

কংক্রীটের পথের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বাস্—আলিগড় টু আগ্রা। রোদে পোড়া তামাটে মাটি—গাছের পাতাগুলোতেও যেন পশ্চিমের উত্তাপ লাগা ধূসরতা। আচক্রবাল অড়হরের ক্ষেতে যেন রাশি রাশি আকাশের মেঘ নেমে এসে থমথমে করে রেখেছে। বাংলার সবুজ সরসতা কোথাও নেই—চোখ জুড়িয়ে যায় না, হারিয়ে যেতে চায় না কোথাও। একটা শুষ্ক ঔদাসীন্যে চেতনাকে কঠোর করে আনে, অশ্রুকরুণতায় নিজেকে আবিল করে আনে না।

তাই নিরাসক্ত ভাবে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। অড়হর ক্ষেতের মাঝে মাঝে উঁচু বেদীর মতো জায়গায় জায়গায় উঠেছে কাঁচা ইঁদারা, রহট্টা তার মাথায়। মাঠের বুকের ভেতর দিয়ে শূন্যতার শৃঙ্খল গাঁথতে গাঁথতে এগিয়ে চলেছে গ্যাঞ্জেস্ ক্যানালের হাইড্রো-ইলেকট্রিকের তার। বাংলা দেশের মতো নীল বনচ্ছায়ার কোনো রেখা দিগন্তকে সীমান্বিত করেনি এখানে—মেঘবর্ণের ক্ষেত ক্রমশ আকাশের সঙ্গে রং মেশাতে মেশাতে শেষে একেবারে একাকার হয়ে গেছে। কত তফাৎ বাংলার প্রান্তরের সঙ্গে। তার তালবনের ইসারা-দেওয়া সীমান্তের দিকে তাকালেই যেন মনে হয় ওখানে ঘর আছে, আশ্রয় আছে; ওখানে খড়ের চালে শালিক-নাচা কোনো বাড়ির দাওয়ায়, লেবু-ফুলের গন্ধে ভরা কোনো ছায়াগভীর অবসরে একটি মেয়ে প্রতীক্ষা করে বসে আছে। কিন্তু এখানকার দিগন্ত সে আশ্বাস দেয় না—সে স্বপ্নও আনে না, শুধু একটা শূন্য অর্থহীন আর শ্রান্ত যাত্রার দিকে কঙ্কালের মতো আঙুল বাড়িয়ে দেয়। আর নিঃসঙ্গতাকে গেঁথে চলা ওই হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিকের তার বারে বারে মনে পড়িয়ে দেয় ওর একটা প্রান্ত গিয়ে পৌঁছেছে আগ্রা শহরে—যেখানে কাজ, অফুরন্ত কাজ। যেখানে কাগজপত্রের স্তূপের মধ্যে একবার তলিয়ে গেলে নিঃশ্বাস ফেলবার আর সময় থাকবে না আমার।

কিন্তু তালবন—বাংলা দেশ। সত্যিই কি সেখানে ঘর আছে? কই, সে ঘরের সন্ধান তো আমি পেলাম না, আমার তো জায়গা জুটল না সেখানে। আমি বাঙালী নই বলেই কি আমার কাছে বন্ধ হয়ে রইল বাংলার দরজা? মণিকা হল নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ, পূর্ণিমা হল এক মুহূর্তের মোহভঙ্গ, আর অর্চনা হল নিষ্ঠুরতম আঘাত?

একটা ছোট শহরের বাড়ি-ঘর ক্রমশ ঘন হতে হতে নিঃসীম শূন্যতাকে

আড়াল করে দিলে, বাসের গতি মন্থর হয়ে এল, থেমে দাঁড়ালো বাস্। হাথ্-রাস্। ভাবনাও আমার বিশ্রাম পেল একটু।

দুজন যাত্রী নামল, দুজন যাত্রী উঠল। গাড়ির ড্রাইভার আর কন্ডাক্টার নেমে গেল বিড়ি টানতে। একটা বারো বছরের ছেলে বই বিক্রি করতে এসে সিনেমার সুরে গান ধরলে। দু আনা করে বইয়ের দাম—যারা কিনছে তারাও সুর ধরে পড়তে শুরু করেছে সঙ্গে সঙ্গে। দহিবড়া, গোলগপ্পা, ঘুগ্নিওয়ালারা এসে বাস্‌কে ছেঁকে ধরেছে।

সব মিলিয়ে অন্যমনস্ক হওয়ার চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই সম্ভব নয় আর। আবার সেই দুঃসহ কল-কাকলী শুরু হয়ে গেছে।

—কী জায়গা এটা?

—হাথ্‌রাস্। এখান থেকে ট্রেনে করে মথুরা-বৃন্দাবন যায় লোকে। যাবে নাকি বৃন্দাবনে?

—একবার দেখতে ইচ্ছা করে—শান্তা জবাব দিলে।

—তীর্থ করার দিন এখনো আমাদের আসেনি শান্তা, তার এখনো অনেক দেরি। এখন আমাদের সামনে রয়েছে নীল যমুনার ধারে তাজমহলের মর্মর স্বপ্ন। পৃথিবীর সবচাইতে মহৎ প্রেম যেখানে কালকে জয় করে দাঁড়িয়ে আছে, অপেক্ষা করে আছে তোমার আমার মতো আরো—

উঃ, কী সাজিয়ে কথা বলছে! গলার সুরে এনে ফেলেছে একটা নাটকীয় রসাবিষ্টতা। সব নির্বোধের জীবনেই একদিন আসে এমনি করে কথা বলবার প্রেরণা, লক্‌গেটের ওপর দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নার দোলা লাগা জলের দিকে তাকিয়ে এমনি ভাবেই কী যেন বলছিলাম অর্চনাকে! বলেছিলাম, এই রাত, এই জ্যোৎস্না, এই ঝলমলে জল। কতকাল ধরে এরা কত মানুষের ভালো-বাসার নীরব সাক্ষী হয়ে আছে!

আচ্ছন্ন সুরে শান্তা বলছে, তাজমহল, কবির স্বপ্ন—

তাজমহল—কবির স্বপ্ন! হিংস্রভাবে নিচের ঠোঁটে বোধ হয় দাঁতের চাপ দিয়েছিলাম সুকুমার, ঠোঁট কেটে গেলে খানিকটা। মৃদু জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে নোনতা স্বাদ অনুভব করতে করতে ভাবতে লাগলাম: কত কোটি টাকা খরচ হয়েছিল ওই কবির স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে? ওর একটা অতি সামান্য ভগ্নাংশ পেলেও হয়তো মণিকার মতো অনেক মেয়ে সেধে মালা দিত আমাকে, আর হয়তো—হয়তো অর্চনা মিত্র আজকে দত্ত না হয়ে—কবির স্বপ্ন! একটা ব্যক্তিগত শোককে ঘোষণা করবার জন্যে সম্রাটের রাজকীয় আড়ম্বর। ওর একটা অতি সামান্য ভগ্নাংশ যেখানে মানুষকে বাঁচাতে পারত, দিতে পারত তাকে জীবনের নিঃসংশয় সহজ অধিকার—সেখানে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে ওই মৃত্যুবিলাস শুধু পঙ্গু কল্পনা আর সস্তা ভাবালুতাকেই সুড়সুড়ি দিয়ে চলেছে।

সারা মনটা জ্বলতে লাগল। তাজমহল! কতই তো ভূমিকম্প হয়, ওটাকে কেউ কি গুঁড়িয়ে দিতে পারে না চিরকালের মতো?

ভোঁপ—ভোঁপ। ভেঁপু বাজল। গাড়ি নড়ে উঠেছে। আবার শহরের রেখা ছাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই ছায়াহীন আশাহীন মেঘবর্ণ দিগন্তের বুকে। দশটা বেজে গেছে ঘড়িতে—পশ্চিমের পাথুরে মাটিতে প্রখর হয়ে উঠেছে সূর্য, পরিকীর্ণ হয়ে পড়েছে রিক্ত ঔদাসীন্যের মতো ধূসরতা। মনকে অশ্রুতে আবিষ্ট করে আনে না, একটা তিক্ত অনাসক্তিতে উদাস করে তোলে। আর হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিকের তার হাতছানি দিয়ে ক্রমাগত বলতে থাকে, সময় নেই, সময় নেই। কাজ—অফুরন্ত কাজ!

বিক্রম থামল। হাতঘড়িটার দিকে তাকালো একবার। তারপর: অবিশ্রান্ত কাজ—অফুরান কাজ। এই কাজের তাগিদ আছে বলেই বোধ হয় কাল রাত্রে অনেক সুবিধেজনক পরিকল্পনা সত্ত্বেও আত্মহত্যা করতে পারিনি। বনচ্ছায়ার স্বপ্ন মিলিয়ে যেতেই এসেছে নিরানন্দ বিবর্ণ দিগন্তের হাতছানি। একদিন ওই সীমাহীন ধূসরতায় অর্চনাও হয়তো মিলিয়ে যেত একটা ছায়াবাজীর মতো, একটা অশরীরী সত্তার মতো, যেমন অড়হরের ঘন সমুদ্র ফিকে হতে হতে হারিয়ে গেছে আকাশের পাণ্ডুরতায়—সেও তেমনি একাকার হয়ে বিদেহী হয়ে হারিয়ে যেত। শুধু সত্য হয়ে থাকত ওই ইলেক্‌ট্রিকের কালো তারের রেখা—যা মাঠ-ঘাট-বন-বনান্তরকে একটা অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলে বেঁধে চলেছে।

কিন্তু হারিয়ে ফেলতে চাইলেও হারাতে দিচ্ছে কই এরা? ভুলতে দিচ্ছে কই সামনের সীট্ থেকে ওই অবিচ্ছিন্ন কলগুঞ্জন? ইতিমধ্যেই তো আমার ঘরের সামনে জেগে উঠেছিল মোটা মোটা হিসেবের খাতা, তার কালো কালো হরফ, ডেবিট-ক্রেডিট, লাভ-লোকসান, আয়-ব্যয়ের অরণ্যময়তা। কিন্তু ওরাই বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছে তার পাঞ্জাবির বুকপকেটে রয়েছে অর্চনা মিত্রের ছবি, কুমারী অর্চনা মিত্র। বুকের ওপর ললিত ছন্দে দুটি বেণী দিয়েছে দুলিয়ে, পাতলা ঠোঁটে কুহক মন্ত্রের মতো ফুটে আছে অপরূপ একটা হাসির রেখা। কিন্তু দশই ফাল্গুন রাত্রিতে, এখান থেকে আটশো মাইল দূরে—

—নাঃ—

একটা অসহ্য বিরক্তিতে সিগারেটটা ছুঁড়ে দিলাম বাইরে।

—জ্যোৎস্নায় তাজ দেখেছ কখনো?

—না।

—দ্যাখোনি শান্তা? সে একটা আশ্চর্য রূপ। দিনের চেনা তাজমহল জ্যোৎস্নার আলোয় একেবারে বদলে যায়। মনে হয় যেন পৃথিবীর যত ব্যথা, যত কামনা ওই পাষাণ স্তূপে রজনীগন্ধার মতো ফুটে উঠেছে। মর্মরের ওপর সেই রাত্রির মায়ায় মনে হয় যেন কার অশ্রুভরা চোখ চাঁদের আলোয় টলটল করে উঠেছে—

আবার খবরের কাগজটা তুলে নিলাম হাতে। লক্ষ্ণৌ শহরে দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়েছে একটা—ছোরা দেখিয়ে ডাকাতি করেছে দিনদুপুরে। বুলন্দশহরে একটা গ্রামে আগুন লেগে ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে অনেকগুলো।

অমুক মন্ত্রী গতকাল এলাহাবাদের এক বিরাট জনসভায় বিশাল এক বক্তৃতা দিয়ে বলেছেন, আর ভাবনা নেই, এবার আর দেশে খাদ্যাভাব ঘটবে না।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। কথাগুলো ভেসে আসছে নিয়মিত ভাবে, ভেসে আসছে অসহ্য বিরক্তির মতো, দুর্বিষহ একটা যন্ত্রণার মতো।

—একদিন সন্ধ্যার কথা আমি ভুলব না শান্তা। মার্বেলের বেদীটার ওপর বসে সামনে তাজের দিকে তাকিয়ে আছি। বেলা ডুবে এল। যমুনার দিক থেকে আচমকা এল একটা বাতাস। ঝাউগাছগুলোকে দুলিয়ে দিলে, একটা মর্মর শব্দ বেজে উঠল চারিদিকে। কালো-হয়ে-আসা আকাশের নিচে ছায়া-মাখানো তাজের দিকে তাকিয়ে মনে হল যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে—

আবার বাইরে মাথা গলিয়ে দিলাম। কোথাও ছায়া নেই, দীর্ঘশ্বাসও নেই। মেঘবর্ণ ক্ষেতে খররৌদ্রের ধারালো ঝলক। বেলা এগারোটা বেজে গেছে। আর কত দেরি পৌঁছুতে?

—সেই তাজমহলের চত্বরে বসে, যমুনার নীল জলের দিকে তাকিয়ে আমরা নতুন প্রেমের দীক্ষা নেব শান্তা—

আমি তাকিয়েই রইলাম বাইরের দিকে। রাস্তার পাশে একটা কুকুর পড়ে আছে চ্যাপটা হয়ে, ধড় থেকে প্রায় আলাদা হয়ে গেছে তার মাথাটা—শুধু কতগুলো কালো কালো নাড়ির সংযোগ রয়েছে মাত্র। আলকাতরার মতো চাপ বেঁধে আছে খানিকটা রক্ত—ভনভন করে মাছি উড়ছে তার ওপর। এর আগে কোনো বাস কুকুরটাকে চাপা দিয়ে গেছে। পলকের জন্য দেখা দিয়েই দৃশ্যটা মিলিয়ে গেল আবার।

এক ঝাপটা ধুলো এসে পড়ল চোখে, গলাটাকে আবার গাড়ির মধ্যে টেনে নিলাম।

গুন্ গুন করে গানের সুর আসছে। গাইছে শান্তা—চেনা গান:

'দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে
কী জানি কী মহা-লগনে—'

—ওই যে, ওই দেখো শান্তা। ওই যে তাজের চূড়ো দেখা যাচ্ছে।

—কই, দেখি দেখি—শান্তা উত্তেজিত ভাবে গলা বাড়ালো।

দাঁতে দাঁত চেপে পাথর হয়ে বসে আছি। শেষ হয়ে এসেছে, শেষ হয়ে এসেছে এই দুঃসহ ক্লান্তিকর পথ চলা। দুঃসহতর দশই ফাল্গুন রাত্রিতে দিল্লী এক্সপ্রেসের সেই মারাত্মক ভিড়ের চাইতেও, আরো অসহ্য সেই দুঃস্বপ্নের মতো রাত্রির চাইতেও—যে রাত্রে উলুবেড়েতে অর্চনা মিত্রের বিয়ে হয়ে গেছে।

বাস উড়ে চলেছে। শহর আসছে এগিয়ে, আসছে ইটের ভাঁটা, দুটি একটি করে নতুন আর পুরোনো বাড়ি। ধুলোয় ভরা সংকীর্ণ অপরিচ্ছন্ন আগ্রা সহর। তারই শ্বাসরোধী পরিবেশের মধ্যে, একটা পুরোনো বাড়ির তেতলায় ভাঙা চেয়ারে বসে কোম্পানীর লাভ-ক্ষতির হিসেব কষতে হবে আমাকে, প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে এই ডুবন্ত ব্যবসাকে আবার কি করে ডাঙায়

তোলা যায়। আর সেই সময়, অশোক আর কৃচিফুল ফোটা ছায়াঘেরা পথ দিয়ে, শান্ত নির্জনতার মধ্য দিয়ে সুধীর আর শান্তার টাঙ্গা এগিয়ে চলবে তাজের মর্মর স্বপ্নের উদ্দেশ্যে। নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন, নির্বোধ প্রেমের স্বপ্ন-বিলাসে।

—এসে গেছি—সুধীরের কণ্ঠ।

—উঃ, কতদিন পরে তাজমহল দেখব—শান্তার স্বরে সোচ্ছ্বাস আকুলতা।

—এবারের তাজ আর একটা নতুন রূপ নিয়ে দেখা দেবে আমাদের কাছে—

যমুনার ব্রীজ পার হয়ে এসেছে বাস্, শহরের সংকীর্ণ পথ দিয়ে এবার হেলতে দুলতে চলেছে আগ্রা ফোর্টের নিচে তার টার্মিনাসে। সাড়ে এগারোটা —যাত্রা শেষ। জহরকোটের বোতামগুলো ভালো করে এঁটে নেবার আগেই চোখে পড়ল পাঞ্জাবির বুকপকেট থেকে অর্চনার ফোটোটা অনেকখানি বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

আগ্রা ফোর্টএ বাস থামল। কুলি, টাঙ্গা আর একাওয়ালারা চারদিক থেকে এসে দাঁড়িয়েছে।

আর সেই সময়! ক্ষমা কোরো সুকুমার, অকপট স্বীকারোক্তিই করছি আমি। জীবনে সব চাইতে বড় অপরাধের মুহূর্ত আমার সেদিন, তখন আমি খুন করতে পারতাম।

ওদের টাঙ্গাটা সামান্য কয়েক পা এগিয়েছে, পেছন থেকে বিশুদ্ধ উর্দুতে ডাক দিলাম।—ও বাঙালি বাবু, শুনছেন?

আশ্চর্য হয়ে মুখ বাড়ালো সুধীর। ভাঙা হিন্দিতে প্রশ্ন করল, আমাকে ডাকছেন?

—হাঁ, একটা জিনিস আপনি ফেলে গেছেন। কুলিকে পয়সা দেবার সময় পকেট থেকে পড়ে গেছে আপনার।

—এই টাঙ্গা, দাঁড়াও—দাঁড়াও—সুধীর গাড়ি থামালো।

—এটা আপনার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল—অর্চনার ফোটোটা বাড়িয়ে দিলাম। চমকে উঠলে সুকুমার? কিন্তু কী করবো বলো। আজ তো আর ও ছবিতে প্রয়োজন আমার নেই। তাজের স্বপ্নের সঙ্গে ওর মিল ঘটতে পারে, কিন্তু ছিপিটোলার সে পুরোনো তেতলার বাড়িটার সঙ্গে ও ছবি কোনোখানে মিলবে না।

ছবিটা নিয়ে হতবাক্ হয়ে গেল সুধীর।

—না, না—এ ছবি আমার নয়—

—আপনার পকেট থেকেই পড়েছে বাবুসাহেব, আমি কুড়িয়ে নিলাম—আবার চোস্ত উর্দুতে বললাম। হাসলাম বিগলিত বিনীত হাসি।

—কী বলছেন আপনি?—সুধীর প্রায় তেড়ে এল।

—ঠিকই বলছেন উনি—বজ্রগর্ভ মেঘের মতো কথাটা বললে শান্তা, তারপর সুধীরের হাত থেকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিলে ছবিটা।

—ও মশাই শুনছেন, শুনছেন মশাই ?—পেছন থেকে ডাক আসতে লাগল সুধীরের। কিন্তু ততক্ষণে একটা একায় উঠে পড়েছি। বললাম, চালাও ছিপিটোলা—

সামনে দিগন্ত। ধূসর বর্ণহীন, হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিকের তারে বাঁধা। কাজ, কাজ আর কাজ। অর্চনাকে আর মনে রাখলে চলবে না, তাকে যথাস্থানে পেঁাছে দিয়েছি, পেঁাছে দিয়েছি নীল যমুনা আর তাজের মর্মর স্বপ্নের কাছে।

—আরো জোরে হাঁকাও—

নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত সুরে বললাম তখন। বোঝা নেমে গেছে, এইবারে আরাম করে একটা সিগারেট ধরাতে হবে।

কল্যাণী চমকে উঠল ঃ কী সর্বনাশ !

—খুব shocking লাগছে, না ? কিন্তু—বিক্রম কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো কল্যাণীর দিকে ঃ আমার কি কোনো প্রতিবাদ ছিল না ? যা পাবো তাই মেনে নেবো ?

আমি বললাম, কিন্তু এরা তো তোমার কাছে কোনো দোষ করেনি।

—তা করেনি বটে। কিন্তু একটা হিংস্র বিদ্বেষ যখন বিস্ফোরকের মতো ফেটে পড়তে চায়, তখন তো সে calculate করতে পারে না সুকুমার। তা ছাড়া সমস্ত পৃথিবীকেই তখন নিজের প্রতিপক্ষ বলে মনে হয়। সামনে যাকে পাওয়া যায় তাকেই নিষ্ঠুর হাতে আঘাত করতে ইচ্ছে করে।

ঘরের ঘড়িটা ঢং ঢং করে উঠল। আহতের মতো আর্তনাদ করে উঠল যেন। রাত এগারোটা।

বিক্রমের কেমন ঘোর ভাঙল। পাইপে তামাক ভরে নিলে আর একবার।

—অনেকক্ষণ ধরে বকে যাচ্ছি মিসেস্‌ গুপ্ত। ধৈর্যচ্যুতিও হয়তো হচ্ছে আপনাদের। কিন্তু কী করব, এই কথাগুলো কাউকে আমার বলবার দরকার ছিল। যেন কতকাল ধরে কাঁধের ওপর কী একটা বোঝা আমি বয়ে বেড়াচ্ছিলাম—সে বোঝা না নামানো পর্যন্ত তৃপ্তি কোথায় আমার।

সে যাক, গল্প বেড়ে যাচ্ছে, কাজেই কিছু খুঁটিনাটি এড়িয়ে যাচ্ছি। তুমি জানো না সুকুমার, কী অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা আমাকে এতকাল চাবুক মারছিল—যেন একটা অদৃশ্য সোয়ারের মতো আমার বুনো ঘোড়ার মনকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কোনো একটা অদ্ভুত প্রেতসত্তা !

হ্যাঁ—এইবারে ভাবলাম, আর ভুল করবো না। আমি রাজপুত। বাংলা দেশের বংশীবটের ছায়ায় পথ ভুললে তো আমার চলবে না। আবু পাহাড়ের চূড়ো থেকে ডঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে আমার ডাক আসে। আলেয়ার পেছনে আর নয়। আমি বিয়ে করব, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করব।

বাঙালীর মেয়েকে ? না।

হয়তো জানো, আমাদের একদল পূর্বপুরুষ এখন ভারতবর্ষের নানা

জায়গায় ছড়িয়ে গেছে, বিশেষ করে ইউ. পি-তে। আমাদের সম্পর্ক এখন খাঁটি মেবারী-চিতোরীদের সঙ্গে নয়, আমরা যারা প্রবাসী রাজপুত—একটা আলাদা সম্প্রদায় গড়ে নিয়েছি। আমাদের যা-কিছু ক্রিয়া-কর্ম এই বিশেষ গণ্ডিটার ভেতরেই সীমাবদ্ধ এখন।

বিয়ে ঠিক হল ফিরোজাবাদের কাছাকাছি একটা গ্রামে।

অনেক দিন বাংলা দেশে থেকে প্রায় কস্‌মোপলিটান হয়ে গেছি আমরা—কিন্তু এদেশের এরা এদের রাজপুত ঐতিহ্য হারায়নি এখনো। মাথায় উষ্ণীষ পরে বীরবেশে ট্রেন থেকে নামতেই দেখি সামনে এক প্রকাণ্ড তেজী ঘোড়া। যেমন বিরাট, তেমনি বন্য। ঘাড়ের ওপর থরে থরে ফুলে উঠেছে সিংহের মতো কেশরগুচ্ছ, মাটিতে পা ঠুকছে অশ্রান্ত আর অশান্ত ভাবে। রোদে তার শরীরের মসৃণ রোমগুলি সিল্‌কের মতো চকচক করছে—যেন একটা ইস্পাতী দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে তার থেকে।

ঘোড়ার চেহারা দেখেই রোমাঞ্চ হল আমার। শারীরিক শক্তির বর্বরতাকে অশ্রদ্ধাই করে এসেছি চিরকাল, ভালো করে অশ্বারোহণটা আয়ত্ত ছিল না। তাও দু' একটা বাংলা দেশের বেঁড়ে টাট্টুতেই চড়া অভ্যেস, এই অতিকায় প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে ভয়ে আমার শ্বাসরোধ হয়ে এল।

ওরা তাড়া দিচ্ছিল। তাড়াতাড়ি করা দরকার, নইলে রোদ খুব চড়ে যাবে—ভারী তক্‌লিফ্‌ হবে।

কী করব ভাবছি, হঠাৎ কন্যাযাত্রীরা ঠাট্টা করে উঠল।

—ভয় করছে নাকি দুল্‌হার?

আর একজন সরস করে বললে, এই বরকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নেওয়া যাবে না, ডুলি চাই এর জন্যে।

সশব্দে হেসে উঠল একজন: দুল্‌হা না দুল্‌হিন?

হাসির হর্‌রা পড়ে গেল চারদিকে। ওরা কন্যাযাত্রী, উপলক্ষ্যটাও বিয়ে, সুতরাং উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাসবার অধিকার ওদের নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ওদের ওই নির্দোষ কৌতুক আমাদের কানে খুব মধুর হয়ে বাজল না।

তাকিয়ে দেখি অপমানে রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে বাবার মুখ। একে মেজর সাহেব, সব সময়ে মিলিটারি কেতা-দুরস্ত, তার ওপর আমার মতো জাত হারিয়ে বসেননি তিনি। তাঁর চোখ দুটো দিয়ে উত্তাপ ঠিকরে বেরুল। প্রকাণ্ড গোঁফজোড়ায় মস্ত একটা তা দিয়ে হাঁকলেন: বেটা!

সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রের মতো সাড়া দিলাম আমি: জী!

—কী বলছে ওরা, শুনতে পাচ্ছ?

—জী।

—জল্‌দি করো বেটা—বাবা মেঘমন্দ্র স্বরে হুঙ্কার ছাড়লেন।

পিতৃরক্ত শিউরে গেল আমার শরীরের ভেতর দিয়ে। আর বিলম্ব করলাম না, এক লাফে চড়ে বসলাম ঘোড়ায়। সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়া আর অপেক্ষা করল না, ছুটতে শুরু করল তীব্রবেগে। যেন ধনুক থেকে একটা

তীর ছিটকে বেরিয়ে গেল দিগন্তের অভিমুখে।

প্রথম কিছুক্ষণ আর অস্বস্তির সীমা ছিল না, কী কষ্টে যে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে আত্মরক্ষা করেছি সে আমিই জানি। শরীরের সমস্ত পেশীগুলোকে সংযত করে আটকে রইলাম জিনের ওপর। উদ্দাম গতিবেগের তাড়নায় মনে হতে লাগল, যে কোনো মুহূর্তে ঘোড়ার ওপর থেকে আমি উড়ে বেরিয়ে যেতে পারি। এক-একটা ঝাঁকানিতে যেন কোমরের তলার দিকটা খসে খসে পড়তে চাইছিল—আমি চোখের পাতা দুটোকে শক্ত করে চেপে ধরে ঝুঁকে রইলাম ঘোড়ার পিঠের ওপর।

কিন্তু আস্তে আস্তে সহজ হয়ে এল তারপর। তাকিয়ে দেখলাম, এ বাংলা দেশ নয়। মনে পড়ল সেই আগ্রা থেকে আলিগড়ের স্মৃতি; লাল মাটির রুক্ষ কঠিন বিস্তার তরঙ্গিত হয়ে গেছে সংখ্যাসীমাহীন রাশি রাশি টিলায় টিলায়। এখানকার ধাত্রী ধরিত্রী আরো কঠিন, আরো নীরস। অড়হরের ফিকে ছোপও ক্বচিৎ কখনো চোখে পড়ে। বাবলা ছাড়া কোথাও কোনো গাছ নেই আর। আজ এদের সব কিছুর আর একটা নতুন তাৎপর্য ধরা পড়ল আমার কাছে। অর্চনার স্মৃতি একটা আগুনের হলকার মতো একদিন এই রৌদ্রবিদ্ধ পৃথিবীর সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। আজ সেই পৃথিবীই আমার মনের মধ্যে সঞ্চার করল নতুন গৌরব, নতুন পৌরুষ। নিজের মধ্যে একটা অভিনব আত্মদর্শন হল এই মুহূর্তে। রাজপুতানা কখনো আমি দেখিনি, কিন্তু অনুভব করলাম—এই সেই রাজপুতানার মরুপ্রান্তর—সেই সূর্যবংশীদের দেশ।

সে কী অদ্ভুত আনন্দ; রবীন্দ্রনাথের কবিতার ললিত সুরই খুঁজেছি, এবার আর একটা নতুন সুর ঝঙ্কৃত হতে লাগল কানের কাছে। বুকের মধ্যে তালে তালে রক্ত বলতে লাগল ঃ

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন,
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।
ছুটছে ঘোড়া, উড়ছে বালি,
জীবন স্রোত আকাশে ঢালি,
হৃদয়-তলে বহ্নি জ্বালি
চলেছি নিশিদিন—

ঘোড়া ছুটতে লাগল। মনে হতে লাগল আমার বুকে বর্ম, কোমরে তলোয়ার, এক হাতে উদ্যত বর্শা। মরুভূমির পর মরুভূমি ছাড়িয়ে, আরাবল্লীর গিরিসঙ্কটের মধ্যে লাফে লাফে পাহাড়ী খাদ পেরিয়ে ছুটে চলেছি আমি। বাংলা দেশের শ্যামলতা নেই এখানে, নেই ময়নাপাড়ার মাঠ, নেই চোখ-ভুলোনো মন-ভুলোনো কোনো শাল-পিয়ালের উৎসব। এখানে রুক্ষ মাঠে সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে, এখানে গরম বাতাসে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে

যাচ্ছে কুঁকড়ে মরে যাওয়া বাবলার পাতা! ক্রমশ এই রোদ প্রবেশ করল আমার রক্তে, আমার নেশা ধরিয়ে দিলে। আমেরিকার নিগ্রোরা যেমন কোনো এক-একটা ঝড়ের রাত্রে স্তব্ধ অরণ্য থেকে পিতৃভূমি কালো আফ্রিকার ডাক শুনতে পায়, তেমনি আমিও শুনলাম আমার আদিম পিতৃভূমির ইশারা, নিজেকে পূর্ণ করে নিলাম আমাদের বিস্মৃত অতীতের উগ্র আগ্নেয় নির্যাসে। ইচ্ছে করতে লাগল—সমস্ত শরীরের শক্তি দিয়ে প্রচণ্ড বলে একটার পর একটা বর্শা দিগন্তের বুকে ছুঁড়ে দিই আমি। জ্বলন্ত শিসা দিয়ে গড়া আকাশটা দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাক, আঘাতে আঘাতে উচ্ছলিত রক্তের মতো তরল আগুন গলে গলে পড়ুক। আজ মনে হয়, সেই সময় আমার মুখ দেখলে তোমরা ভয়ে শিউরে উঠতে। আমার ভেতর থেকে যেন একটা নতুন মূর্তি বেরিয়ে এসেছিল, বেরিয়ে এসেছিল অতীতের কবর ফুঁড়ে একটা প্রেতসত্তা।

ঘোড়া যেখানে গিয়ে থামল দেখি সেটা একটা দস্তুরমতো কেল্লা। যদিও মাটির, তবু দুর্গের মতো প্রকাণ্ড উঁচু; তেমনি বিশাল প্রাচীর, সামনে তেমনি পরিখা, তেমনি ফটকের পর ফটক পেরিয়ে তবে তার অন্তঃপুর। আমার শ্বশুর এদিককার বনেদী জমিদার। কিন্তু বাংলা দেশের জমিদারের মতো দোল-দুর্গোৎসব আর মামলা করা জমিদার নয় এঁরা। এখনো দরকার হলে আদালতে যাওয়ার আগে এরা খণ্ডযুদ্ধ করে নেয়—সুযোগ পেলেই দু'দশটা মানুষের কাঁচা মাথা নামিয়ে দেয় তৃষ্ণার্ত শুকনো মাটিতে।

বাড়িগুলো গড়বার পেছনেও এই ইতিহাস। ইংরাজ আসবার পরেও বহুদিন জোর যার মুল্লুক তার নীতি চালিয়ে গেছে এরা। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ও উপযুক্ত সক্রিয় ভূমিকা এরা গ্রহণ করেছিল—এদের রণ-হুঙ্কারে কাঁপিয়ে দিয়েছিল ইংরেজের নতুন সাম্রাজ্যের বনিয়াদ। কিন্তু সেইখানেই এদের অপমৃত্যুও ঘটে। অযোধ্যার নবাব, ঝাঁসির রাণী, কুমার সিংহের সঙ্গে এদেরও সমস্ত স্বাধীনতার অবসান।

বিয়েও হল পুরোনো পদ্ধতিতে—বরকে করা হল বীরবরণ। স্বপ্ন দেখলাম যেন রাজপুতানার কোনো গিরিদুর্গে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছি কোনো রাজকুমার। বিয়ের এই লগ্নটুকুই আমার যা কিছু অবকাশ, তারপরেই মরণের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে গিয়ে। শত্রুসৈন্য গিরি-সংকটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছে, তাদের বাধা দিয়ে ফেরাতে হবে, নইলে প্রাণ দিতে হবে। আমাকে ডাকছে আমাদের সমস্ত ইতিহাস। বাপ্পা, হামীর, জয়মল্ল, পত্ত, সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ। আমার কানের কাছে ক্ষুধার্ত গর্জন শুনছি ঃ ম্যয় ভুখা হুঁ। শুধু মাঝখানে এই কয়টি মুহূর্ত। দেশ নেই, কাল নেই—সময় নেই। সীমাবদ্ধ সময়ের আশেপাশে কক্ষ-পরিক্রমা করতে করতে একটা আকস্মিক শূন্য শান্ত অবকাশে এসে আমি দাঁড়িয়েছি।

শ্বশুর এসে যৌতুক দিলেন একখানা ধারালো তলোয়ার—যেমন দীর্ঘ, তেমনি উজ্জ্বল। হাতে ধরতে গা ছমছম করতে লাগল, মনে হতে লাগল

এ নিয়ে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো লোককে হত্যা করতে পারি আমি। আর সেই তলোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে তুলে দিলেন তেমনি দীপ্তিমতী একটি কন্যাকে। ঘোমটার আড়ালে তার মুখ দেখলাম, যেন একটা মশালের শিখা স্তব্ধ হয়ে আছে!

বিয়ের আসরে বাঈনাচের রেওয়াজ আছে ওদেশে। ঘুরে ঘুরে বাঈজী এসে বরকে গান শোনালো। কী সে গান!

বিচিত্র সে গানের বিষয়বস্তু। সে মনে করিয়ে দিলে, সৈনিক, তোমাকে তো বসে থাকলে চলবে না। যুদ্ধের দামামা বেজেছে, ঘোড়ার ক্ষুর চঞ্চল হয়েছে, তোমার তলোয়ারে ঝঙ্কনা জেগেছে। হে কুমার, তুমি কি এখনো শীসমহলে বসে হাজারো আয়নায় তোমার মুখ দেখবে? কিংবা হাওয়া-মহলের বাতায়নে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে টেনে নেবে যুঁই-চামেলী-গোলাবের প্রাণকাড়া গন্ধ? রাজপুত, তুমি কি জানো না, স্বাধীনতার জন্যেই তোমার জন্ম, স্বাধীনতার জন্যেই তোমার মৃত্যু? যদি না জানো, তোমার প্রিয়াকে প্রশ্ন করো। দেখবে কখন তোমার বুক থেকে মালা খুলে নিয়ে তোমায় সে বর্ম পরিয়ে দিয়েছে। রাজা যশোবন্তের মহিষীর মতো সে বলছে: আমার স্বামী যুদ্ধে জয়লাভ করতে জানে, অথবা প্রাণ দিতে জানে। সে তো কখনো পালিয়ে আসতে শেখেনি! কুমার, নিজেকে তুমি ভুলো না!

ভাবলাম, না, কোনো মতেই আর ভুলব না। তারপর বৌকে নিয়ে কলকাতায় ফিরলাম আমি।

কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম, ফিরোজাবাদের মাটি আর কলকাতা একেবারেই আলাদা। এখানে সে রোদ ওঠে না তেমন করে—বিচ্ছিন্ন পাতাঝরা ন্যাড়া ন্যাড়া বাবলা গাছ আর ঢেউ-তোলা কাঁকুর মাটির পরিবেশে তা মদের মতো সঞ্চারিত হয়ে যায় না রক্তের ভেতরে। সম্ভ্রম জাগায় না দুর্গের মতো সেই প্রকাণ্ড পুরোনো বাড়িটা—ঝাড়বাতির ঝলমলে আলোয় ঝকঝক করে ওঠে না শাণানো একখানা জ্বলন্ত সুদীর্ঘ তলোয়ার। মনে পড়ে না সেই বাঈজীর গানের রাজকুমারকে, যার বুকের রক্তের রঙ মেখেই আরাবল্লীর পাহাড়ে সূর্য ওঠে আর অস্ত যায়! এখানে আমি কেরানী, এখানে বর্ম ফেলে অফিসের পোষাক পরে আমাকে ট্রামে উঠতে হয়!

বৌ রূপবতী, কিন্তু রূপের নেশা কাটতে খুব বেশি সময় লাগলো না আমার। রাজপুত-কন্যা যে এত সাধারণ, এত গ্রাম্য এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। বন্ধুরা পরিচয় করতে এসে হাসে ব্যঙ্গের হাসি, ঠাট্টা করলে ডাগর ডাগর সুন্দর চোখ দুটিকে নির্বুদ্ধিতায় কুৎসিত করে বৌ তাকিয়ে থাকে হাবার মতো। মনে পড়ে নিমুকে—যার ভালো নাম পূর্ণিমা। যাকে হয়তো আমি পেলেও পেতে পারতাম সেদিন!

বাঙালীর বিরুদ্ধে অভিযান করে বীর নারী বিয়ে করে আনলাম, কিন্তু এ কী রকমের বীরাঙ্গনা! বীরত্বের মধ্যে আপাতত দেখছি অক্লান্তভাবে খাটতে পারে, বাড়িতে একগণ্ডা চাকর-বাকর থাকতেও নিজের হাতেই ভারী

ভারী ফার্নিচারগুলো টেনেটুনে সরিয়ে দিতে পারে এদিক-ওদিক। অসহ্য করে তুলল তো। চটে গিয়ে ভাবতে লাগলাম, এ আবার কী জ্বালাতন। যদি মোট বইবার জন্যই বিয়ে করবার দরকার ছিল, তা হলে একটা গাধা বিয়ে করলেই তো চুকে যেত ল্যাঠা। অত কষ্ট করে তবে আর গেলাম কেন ফিরোজাবাদে!

এবার এল আত্মপ্রবঞ্চনার পালা।

তুমি কি সেণ্টিমেণ্টটা বুঝতে পারছ সুকুমার? ধন্যবাদ। আমার যে কী বিশ্রী অনুতাপ চাড়া দিয়ে উঠল, ভাষায় তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বউকে গলদঘর্ম হয়ে খাটতে দেখে গা নিস্‌পিস্ করতে লাগল—দেখলাম জোয়ালে বাঁধা গোরুর সীমাহীন নির্বুদ্ধিতা ওর চোখেমুখে নির্ভুলভাবে আঁকা!

আমি চেষ্টা শুরু করলাম। প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম নিজেকে ভোলাবার জন্যে। মনে আনতে চাইলাম সেই বিবাহ-উৎসবের স্মৃতি—সেই তেজী মস্ত ঘোড়াটায় চড়ে ছোটবার সময় রক্তের মধ্যে দুর্গম বন্ধুর আরাবল্লীর ডাক। সেই বল্লম ছুঁড়ে দিয়ে দিগন্তের বুক দীর্ণ-বিদীর্ণ করে ফেলা! ভাবতে চেষ্টা করলাম, বিয়ের বাসরে মস্ত একখানা ধারালো তরোয়াল থেকে একটা উগ্র প্রখর দ্যুতি এসে ছড়িয়ে পড়েছে আমার বধূর মুখে—আমাদের ঐতিহাসিক বীরাঙ্গনাদের মতো জ্যোতির্ময়ী করে তুলেছে তাকে। আর সেই বাঈজীর গানঃ হে কুমার, তোমার বধূর দিকে তাকাও, দেখো, সে তোমার বুক থেকে মালা খুলে নিয়ে তোমায় বর্ম পরিয়ে দিয়েছে!

কিন্তু উপায়ই নেই। ইস্পাতে মরচে ধরে গেছে বাংলা দেশের নোনা জলো হাওয়ায়। যাকে আগুন ভেবেছিলাম, দেখছি তা একটা স্যাঁৎসেঁতে ভিজে ন্যাকড়ার চাইতে বেশি নয়। তা ছাড়া এ জীবনও খাপ খাচ্ছে না তার। তার মন চাইছে সেই ফিরোজাবাদের গ্রামে ফিরে গিয়ে প্রাণপণে জলচক্র ঘোরাতে, ঘটর ঘটর ঘরঘর করে জাঁতা পিষতে। বীরত্ব বলতে ওইটুকুই—একটা ভারবাহী জন্তুর খানিক কায়িক শ্রমশক্তি—তার অদম্য কর্মপ্রেরণা। বেশ বুঝলাম, রাজপুতগৌরব শুধু একটা খোলস মাত্র, তরোয়ালটা শুধুই সাজিয়ে রাখবার জিনিষ। তাতে ধার তো নেই-ই, ভারও আছে কিনা গভীর সন্দেহ জাগল সে বিষয়ে।

ফিরোজাবাদের নেশা কাটবার সঙ্গে সঙ্গে মনে চরম প্রতিক্রিয়া এল একটা। বুঝলাম, এখানেও ভুল করে ফেলেছি। সারাজীবন এই অসহ্য বোঝাটা এখন নিতান্ত অসহায় ভাবে বয়ে বেড়াতে হবে। অথচ ঠিক সেই সময়েই দেখেছি পথ দিয়ে চলেছে বাঙালীর মেয়েরা, রবীন্দ্রনাথের কবিতা কথা কয়ে উঠছে তাদের চলার তালে তালে। মণিকা, পূর্ণিমা আর অর্চনাদের সেই শোভাযাত্রা দেখে মধ্যে মধ্যে নিজের হাত কামড়ে খেতে ইচ্ছে করেছে যেন। অর্থ আছে আমার, বিদ্যা আছে, রূপও যে নেই তা নয়। তা ছাড়া আধুনিক শিক্ষিত বাঙালী-সমাজে ইণ্টার-প্রোভিন্‌শিয়াল ম্যারেজও আজ নতুন কথা

নয়। কেন একটা রোম্যান্টিক্ বোকামিতে ওভাবে আমি পূর্ণিমাকে ছেড়ে এলাম ? ভবানী কি সত্যিই অকৃতজ্ঞ হতো অতটা ? এতই কি দুঃসহ ছিল অর্চনার সেই বিট্রেয়াল ? কিছুদিন ধৈর্য ধরে চেষ্টা করলে কি আমিও— ?

মনে হল ভয়ানক ঠকানো হয়েছে আমাকে। ইচ্ছে করেই যেন আমাকে সম্মোহিত করবার উদ্দেশ্যে ওই পরিবেশটা রচনা করা হয়েছিল—ওই মাঠ, ওই রৌদ্র, ওই তলোয়ার। এ যেন আমাকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে একটা কুহক সৃষ্টি—একটা কুটিল ক্রূর চক্রান্ত।

কে অমন করে সেদিন চারদিকের পৃথিবীকে সাজিয়ে রেখেছিল ? আমার ওপর ভর করেছিল কোন্ প্রেত—দুপুরের দীর্ঘশ্বাসের মতো বাতাসে বয়ে যেতে যেতে হঠাৎ খানিক কৌতুক করে গিয়েছিল আমাকে নিয়ে ? তাই মরুভূমিতে ছুটতে ছুটতে নতুন মরীচিকা দেখলাম একটা—দেখতে পেলাম একটা অবাস্তব মরূদ্যান। ছুটন্ত ঘোড়সওয়ার আছড়ে পড়ল সাহারার অগ্নিশয্যায়, হাতের শাণিতাগ্র বল্লমটা বালিতে বিঁধে হয়ে আকাশে মুখ তুলে রইল শেষ প্রতিবাদের মতো। তারপর দিগন্তে দিগন্তে মরু দেবতার মারণ-দণ্ডের মতো রুদ্র ঝংকার জাগিয়ে ছুটে এল প্রচণ্ড সাইমুম। তার গতিবেগে বালির স্তূপ এসে আমার অস্থি-কংকালকে হারিয়ে দিলে, আমি মরে গেলাম, আমি ফুরিয়ে গেলাম !

মরে গেলাম !

ক্রমে ক্ষেপে উঠবার উপক্রম হল আমার। শেল্‌ফে সাজানো রবীন্দ্রনাথের বইগুলো যেন ব্যঙ্গ করতে লাগল আমাকে। যখন তখন কানের কাছে মণিকা সেনের হাসিটা ভেঙে পড়তে লাগল তীব্র বিদ্যুতের মতো—তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর চাবুকের ঘায়ের মতো। রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনতে লাগলাম, বিয়ের আসরের সেই বাঈজীর গান আমার কানে কামানের গর্জনের মতো বাজছে।

এ আর সহ্য হয় না। তোমার কাছে একটা অকপট স্বীকারোক্তি করি—মাপ কোরো সুকুমার। শেষে একদিন ধৈর্যের বাঁধটা ভেঙে উড়ে গেল বন্যার মুখে। ধাঁ করে অবশেষে একটা লাথিই কষিয়ে দিলাম প্রেমকুমারীকে, অর্থাৎ স্ত্রীকে।

তীরের মতো সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো প্রেমকুমারী। অদ্ভুত আশায় আর উত্তেজনায় আমার বুক দোলা খেয়ে উঠল—জাগল একটা হিংস্র আনন্দ। মনে হল, এবার সে বিদ্রোহ করবে, খানিকটা তীব্র কলহ করবে—হয়ে যাবে একচোট শক্তির পরীক্ষা। বেঁচে যাব আমি। প্রাণভরে প্রকাণ্ড নিঃশ্বাস টেনে নিতে পারব একটা।

কিন্তু আশ্চর্য, কিছুই করল না। নিঃশব্দে চলে গেল ঘর থেকে।

বিশ্বাস করো সুকুমার, হাতের কাছে একটা রিভলভার থাকলে তক্ষুনি ওকে গুলি করতাম আমি। চীৎকার করে ডাক দিয়ে বললাম, কোথায় যাচ্ছো ?

স্থির শান্ত গলায় উত্তর এল ঃ আমার এখন অনেক কাজ।

অসহ্য ঘৃণায় ইচ্ছে করতে লাগল, নিজের গলা নিজের হাতেই শক্ত করে

টিপে ধরি। এ আমি করেছি কী! কার প্রতিশোধ কার ওপর নিলাম! শান্তা আর সুধীরদার ফাটল এতদিনে নিশ্চিহ্নভাবেই জুড়ে গেছে—মাঝখান থেকে আমারই সবচেয়ে হার হল—আমিই বোল্ড্ আউট হয়ে গেলাম।

ভুল হয়েছিল সুকুমার, আগাগোড়াই ভুল। এখন বুঝতে পারছি, লাথিটাকে ও অপমান বলে মনে করেনি। বরং ওতে করে পৌরুষের পরিচয়ই পেয়েছে আমার—পেয়েছে নিষ্ঠুর কঠিন একটা শক্তির পরিচয়। ওই লাথিটাতেই আমার মধ্যে দেখেছে ক্ষত্রিয়কে—বুঝেছে আমার ভেতরে জেগে উঠেছে আমার সত্যিকারের রক্ত-গৌরব। এর পর থেকে ও আরো বেশি করে আমার বশ্যতা স্বীকার করবে, থাকবে আরো দীনাতিদীন হয়ে। বীরের সেবা করবার জন্যেই বীরাঙ্গনা তার ধ্যান-জ্ঞান-তপস্যা নিয়োগ করবে—আমার লাথিগুলি হবে ওর প্রতি আমার মহিমময় পতিত্বের সগৌরব স্বীকৃতি।

কিন্তু বীরাঙ্গনা! সেটা হয়তো শত্রু এলে—কোনো সম্মুখ সমরের সময়! কিন্তু আপাতত যখন সে সুযোগ নেই, তখন পাতিব্রত্যই তার একমাত্র আচরণীয়! ভাবতেও আমার দম আটকে আসতে লাগল, মনে হতে লাগল, একদিন কি আত্মহত্যাই করতে হবে আমাকে!

কিন্তু আশ্চর্যভাবে ভার নেমে গেল একদিন। আগের চাকরি ছেড়ে তখন অর্গানাইজার হয়েছি বড় একটা ব্যাঙ্কের। বড় ব্যাঙ্ক—সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তাদের অর্গানাইজেশন। মানসিক অস্বস্তির দিক থেকে বিচার করে চাকরিটাও জুটেছিল ভালো। এও টুরিংয়ের ব্যাপার। আজ দিল্লী, কাল করাচী, পরশু মাদ্রাজ—এই করেই দিনগুলো কাটছিল। মনের চঞ্চলতা রূপ পেয়েছিল কর্মজীবনে—একেবারে মন্দও যে লাগছিল তা নয়। বাইরের গতিবেগে যেন খানিকটা উদ্দাম বাতাস আনছিল আমার ফুসফুসের মধ্যে, খানিকটা সজীব সরসতার সঞ্চার করছিল!

সেদিন দিল্লী যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছি বাড়ি থেকে। পথের মাঝখানে হঠাৎ ট্যাক্সিটা গেল খারাপ হয়ে। বেশ রাত হয়েছে, তার ওপর শীতকাল—জায়গাটাও এমন যে সহজে ট্যাক্সি পাওয়ার জো নেই। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে গাড়িটা যখন ঠিক হল, তখন আর স্টেশনে গিয়ে লাভ নেই। অগত্যা ফিরলাম বাড়ির দিকেই।

নিজের ঘরের দরজায় পা দিয়েই চমকে উঠলাম। একবারের জন্যে সতর্ক মন জানান দিলেঃ ভুল জায়গায় ঢুকে পড়েছি নাকি! না—ঘর ভুল করিনি এটা সত্যি। তবে সময়টা যে ভুল হয়ে গেছে সেটা নিঃসন্দেহ—এখন আমার ফিরে আসাটা উচিত ছিল না!

ভেতর থেকে গানের শব্দ—রবীন্দ্রসঙ্গীত।

দরজাটা ভেজানো ছিল, খুলে ফেললাম নিঃশব্দে। দেখলাম আমার অর্গানে বসে গান গাইছে আমার বাঙালী বন্ধু প্রবোধ মিত্র—তার পাশ ঘেঁষে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে দাঁড়িয়ে প্রেমকুমারী। সেই অতি নির্বোধ মেয়েটা, যাকে আমি একটা ভারবাহী পশুর বেশি কিছুই ভাবতে পারিনি!

খুব 'শক' লাগল ? না—একেবারেই না।

জুতোর সজোর শব্দ করে ঢুকলাম ঘরে। দেখলাম চকিতে ছাইয়ের মতো পাণ্ডুর হয়ে গেছে দুজনের মুখ। এখন মনে নেই ঠিক, খুব সম্ভব হেসে উঠেছিলাম আমি। ধীরে-সুস্থে একটা সোফায় বসে পড়ে অবশেষে বললাম, ভয় নেই প্রবোধ, শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

প্রবোধের আতঙ্কবিহ্বল ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল থরথর করে, জবাব দিলে না।

পকেটে রিভলভারটা লোড্ করাই ছিল, তক্ষুনি দুটো খুন আমি করতে পারতাম। হয়তো করতামও—একবার বোধ হয় হাত দিয়ে চেপেও ধরেছিলাম অস্ত্রটা। কিন্তু কেন কে জানে, হিংসার গতিটা হঠাৎ মোড় ঘুরে গেল; সীমাহীন একটা উদারতায় হয়তো এই হয়। মানসিক স্পীডোমীটারের কাঁটা ঘুরিয়ে দিলে চরম চাওয়ার পরের অঙ্ক চরম বৈরাগ্যে এসে সে নামে বুঝি!

—তুমি প্রেমকে ভালোবাসো ?

মাথা নিচু করে রইল প্রবোধ, উত্তর দিলে না।

—আর প্রেম, তুমি ?

প্রেমের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কথা বললে না সে। আমি জানি, এই মুহূর্তে আমার লাথিটা সে আর প্রত্যাশা করে না।

কিন্তু এই নীরবতা আর ওই চোখের জল—দুইয়ের অর্থই তখন পরিস্ফুট হয়ে গেছে আমার কাছে।

আস্তে আস্তে প্রবোধ বেরিয়ে যাচ্ছিল, আমি প্রবল শব্দে ধমক দিলাম একটা।

—কোথায় যাচ্ছ ?

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে গেল প্রবোধ।

—পালিয়ো না—আমি গর্জন করলাম।

প্রবোধের ঠোঁট দুটো তেমনি নড়তে লাগল। হয়তো নিজের নার্ভাসনেসটা কাটাবার জন্যেই একটা রুমাল নিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগল।

—যদি সাহস থাকে, নিয়ে যাও ওকে। ঘর বাঁধো। ওর ওপর থেকে সমস্ত দাবী আমি ছেড়ে দিলাম। প্রেম, চলে যাও—

হঠাৎ যেন কেমন একটা শক্তি পেল প্রবোধ। ভয় কেটে গেছে, যেন ভর দিয়ে দাঁড়াবার মতো পেয়েছে কোনো একটা শক্ত ডাঙা। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে: **Do you mean it seriously ?**

আমি গর্জন করলাম: **I mean everything seriously.**

—**All right.**

কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল ওরা। বিশ্বাস করো সুকুমার, ওরা চলে গেল। বড়লোকের একমাত্র ছেলে প্রবোধ, সমাজ নেই ওর, ভয়ও নেই বিন্দুমাত্র। প্রেমের কষ্ট হবে না। ওর সামনে এখন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের পৃথিবী, একটা নতুন জীবন, নতুন স্বপ্ন। আর আমার সমস্ত

স্বপ্নের সমাধি—। আমার মৃত দেহপঞ্জরের ওপর মরুঝড় সাইমুম এখন বালির শবাস্তরণ বিছিয়ে দিচ্ছে !

ভুল হয়ে গেছে সুকুমার, এখানেও ভুল। বৈপরীত্যের কথাটা আমার মনে ছিল না। রাজপুতের মেয়ে এনে আমি ভুলতে চেয়েছিলাম বাংলা দেশকে, কিন্তু বাংলা দেশই ভুলিয়ে নিলে রাজপুত-কন্যাকে। যখন দরকার ছিল শক্তির, তখন আমি গান গাইতে চেয়েছিলাম ; যখন এল গানের পালা—তখন শক্তির মোহে বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম আমি।

কাচের শো-কেসের মধ্যে সেই তলোয়ারখানা ঝলমল করছিল—ঝলমল করছিল একটা হিংস্র হাসিতে। ওইটের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নতুন একটা পরিকল্পনা এল মনে। রাজপুত আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য আমি আনতে পারিনি। কিন্তু একটা সমাধান আছে। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলায়, চরম বিধর্মিতায়।

যুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন। দরখাস্ত করলাম 'কমিশনের'। চেহারা ছিল, রেফারেন্স ছিল, বিদ্যা ছিল। পেয়ে গেলাম। এবার সত্যিসত্যিই বেদুয়িনের অভিসার। লক্ষ্যভ্রষ্ট রাজপুতের শূন্যতার সাধনা—ধারালো বল্লম দিয়ে দিগন্তের বুক দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দেওয়া—যেখান থেকে রক্তের মত তরল আগুন গলে পড়বে !

তার পরের জীবনটা ঝড়ের। যুদ্ধের নেশা ধরল, নেশা ধরল রক্তের। বান ডেকে গেল উচ্ছৃঙ্খলতার। মদ ধরলাম, শুরু করলাম চূড়ান্ত বীভৎসতা। একটা পাশবিক হিংস্রতায় গেলাম তলিয়ে। ফ্রন্টের রক্ত আর ক্যাম্পের নারী। মানুষের রক্তের সঙ্গে মদের শোণিত-বর্ণে আর কোনো পার্থক্য দেখতে পেলাম না—জীবিত আর মৃত মানুষের রক্ত এক হয়ে গেল আমার কাছে। রাজপুতের বরযাত্রী রূপান্তর পেল—মরুচর বেদুয়িনের আদিম বুভুক্ষার ভেতর। শুনেছি রাজপুতেরা অনার্য হূণের বংশধর—আমার প্রতিটি শিরা-স্নায়ুতে সাড়া দিলে সেই হূণ—সেই আদিমতম সত্তা।...

...হঠাৎ বিক্রম উঠে দাঁড়ালো।

—আজ এখন চলি সুকুমার, অনেক রাত হয়ে গেছে।—ঘড়ির দিকে তাকালো সে ঃ রাত সাড়ে বারোটা বাজে। অনেকক্ষণ বকে গেলাম। কিন্তু সময় ছিল না আর। দু'দিনের ছুটিতে দানাপুর থেকে এক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলাম, কাল ফিরে যাব। বাই দি বাই, সেই মণিকা সেনের খবর জানো কিছু ?

বললাম, না। বড়লোকের মেয়ে—বেশি খাতির জমতে পায়নি। বি-এ পাশ করেই কলকাতায় চলে আসে, তারপর আর কোনো খোঁজ রাখিনি তার।

বিক্রম মৃদু হাসল। বললে, হ্যাঁ, যে কথাটা বলবার জন্যে আমি এসে-ছিলাম। আবার বিয়ে করব ঠিক করেছি। আমার চাইতেও স্কাউণ্ড্রেল এক ডবলু-এ-সির ক্যাপ্টেনকে। ভেবে দেখেছি, মণি-কাঞ্চন যোগ হবে। যুদ্ধ অনেক কথাই শিখিয়েছে, তার মধ্যে এটাও শিখিয়েছে ঃ **Take it easy,**

Take it easy !

আমি তাকিয়ে রইলাম।

বিক্রম বললে, ভয় নেই, খাঁটি আর্যসমাজী মতে। বিয়ের বাসরে অন্তত কোনো রকম বেয়াড়াপনা ঘটবে না, এ প্রতিশ্রুতি তোমায় আমি দিতে পারি। পারো তো একবার যেয়ো সুকুমার। বাস্তবিক, অত্যন্ত খুশি হবো।

—কোথায় ?

—দানাপুরে। বেশি দূরে নয়। পরশু বিয়ে। কার্ড রইল—সন্ধ্যের মধ্যে ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছুলেই চলবে। আর ঘাবড়াবার সত্যিই কোনো কারণ নেই। মাননীয় অধ্যাপকের মর্য্যালিটি যাতে কোনো রকমে আহত না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।—হেসে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে টেবিলের ওপর ফেলে দিলে বিক্রম। পাউচ থেকে তামাক নিয়ে ধরালে পাইপটা, তারপর বললে, আচ্ছা আসি ভাই। চললাম মিসেস গুপ্ত। এ বিয়েতে অবশ্য আপনাকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে আর অপ্রস্তুত করলাম না। জানি, এ সব বিশ্রী ব্যাপারে আপনি যেতে রাজী হবেন না। **After all, we must be civil with a lady**—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বিশ্রী বেখাপ্পা গলায় হাসল বিক্রম—যেন এতক্ষণের আচ্ছন্ন জড়তাটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতে চাইল ; ছিঁড়ে দিতে চাইল এতক্ষণ ধরে গড়ে তোলা তার কাহিনীর এই বিচিত্র জালটা। কিন্তু সে অট্টহাসিতে আমাদের মোহভঙ্গ হল না—সেটাকে নিছক কৃত্রিম একটা দুর্বল প্রয়াস বলেই বোধ হল। ভিজে বর্ষাতিটা কাঁধে ফেলে তেমনি বেরিয়ে গেল বিক্রম—বেরিয়ে গেল বৃষ্টির মধ্যে। দেখলাম, ঝাপসা হয়ে আসা ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় রহস্যঘন ঝাউবীথির তলা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ওর মিলিটারী ইউনিফর্ম পরা দীর্ঘ দেহটা।

অভিভূত ভাবটা কাটতে খানিকক্ষণ সময় লাগল আমাদের। তারপরে কল্যাণী বললে, অদ্ভুত !

কার্ডটা উলটো ভাবে পড়েছিল টেবিলের ওপর। অন্যমনস্ক ভাবে সেটাকে হাতে তুলে নিয়েই আমার দৃষ্টি স্তম্ভিত হয়ে গেল। কার্ডটার অনুবাদ করলে দাঁড়ায় এই রকম ঃ

"ফ্লাইট অফিসার বিক্রমজিৎ সিংহ ডবলু-এ-সির ক্যাপটেন মিস্ মণিকা সেনের সঙ্গে তাঁর শুভ পরিণয় উপলক্ষে মিস্টার সুকুমার গুপ্তের উপস্থিতির আনন্দ লাভের বাসনা করেন—"

হাত থেকে খসে পড়ল কার্ডটা। এলোপাথাড়ি হিট্ করতে করতে শেষ পর্যন্ত ট্রফিটা জিতেই নিয়েছে বিক্রম !

ঢং করে সাড়ে বারোটা বাজবার শব্দটা রাত্রির বুকের ওপর হাতুড়ির ঘায়ের মতো এসে পড়ল ॥

একত্রিংশ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেরম্ব চক্রবর্তী
পরম পূজনীয়েষু

আসল নাম বলব না—আপনারা কেউ কেউ হয়তো চিনে ফেলবেন। ধরে নিন ইন্দু।

অনেক কাল আগে এক মেসেই আমরা থাকতুম। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ; আর ইন্দু কলকাতার উত্তরে দক্ষিণে গানের টিউশন করে বেড়াত—মধ্যে মধ্যে দুটো একটা প্রোগ্রাম পেত রেডিয়োতে। আমার সঙ্গে হৃদ্যতার প্রধান কারণ আমি তখন ওর জন্যে গান লিখে দিতুম—ও সেগুলি রেডিয়োতে গেয়ে আসত।

তারপরে পাস করে আমি একটা মফঃস্বল কলেজে চাকরি নিয়ে এলুম। দু-চারবার কলকাতায় এলে দেখাশুনা হয়েছে, তারপর আর যোগাযোগ রইল না। তবে দূর থেকেও বুঝতে পারতুম ইন্দুর এখন নাম হচ্ছে। দু-চারখানা রেকর্ড বেরুল—একবার তো একটা পুজোর প্যান্ডালে তিনদিনে বার পঞ্চাশেক ওর একটা গান বাজল। ও যে জনপ্রিয় হয়েছে তারই নিরিখ। রেডিও খুললে প্রায়ই কানে আসত ঃ এখন আপনাদের আধুনিক গান গেয়ে শোনাচ্ছেন ইন্দুভূষণ।

উঠতি ইন্দু কী করে ধীরে ধীরে অস্তে নামল সে আমি খেয়াল করিনি। অনেক নাম আর অনেক কাজের ভিড়ে ও যে কখন কোথায় হারিয়ে গেছে তা লক্ষ্য করবারও সময় পাইনি। রেকর্ড-রেডিয়োতে ইন্দুর অনুপস্থিতি এমন কিছু মারাত্মক শূন্যতা বলেও বোধ হয় নি কোনদিন।

এমন কি আজকেও, এই আচমকা আকাশ-ভাঙা বৃষ্টিতে যদি শ্যামবাজারের এই মনোহারী দোকানটার সিঁড়িতে উঠে না দাঁড়াতুম, তা হলে ইন্দুকে নিয়ে এই লেখাটা লেখবার কোনো দরকার হত না।

শ্যামবাজারের 'পঞ্চমুন্ডী' তীরধার বৃষ্টিতে প্রায় অন্ধকার। ছত্রহীন অবস্থায় বেকুবের মত দাঁড়িয়ে আছি আর ভাবছি, এ কান্ড যদি আর আধঘন্টা চলে তাহলে ঠনঠনের মোড়ে নেমে গন্তব্যস্থলের দিকে আমায় সাঁতার কাটতে হবে। এমন সময়ে কে বললে, সুকুমার না ?

তাকিয়ে দেখলুম, দোকানদার।

আশ্চর্য হয়ে বলতে যাচ্ছি, আপনাকে তো ঠিক—কিন্তু কথাটা শুরু করবার আগেই দোকানদার বললে, আমায় চিনতে পারছ না ? আমি ইন্দু।

কয়েকজন চেনা ইন্দু ভাঙাচুরো কয়েকটা জলের ঢেউয়ের মতো চোখের সামনে কাঁপল কিছুক্ষণ। তারপর ভাঙা রেখাগুলো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্পষ্ট রূপ নিলে একটা। আর স্মৃতি এসে সমস্ত জিনিসটাকে সম্পূর্ণ করে দিলে।

বললুম, আরে, আমাদের গাইয়ে ইন্দু যে !

—এতক্ষণ পরে মনে পড়ল ? আমি তো দেখেই চিনতে পেরেছিলুম।

বললুম, অনেকদিন তো দেখাশুনো নেই, তাই প্রথমটা—

—হ্যাঁ, অনেক দিন। তেতাল্লিশ সালে শেষ দেখা তোমার সঙ্গে। ষোল বছর হয়ে গেল।

ষোল বছর! তাই বটে। তাকিয়ে দেখলুম ওর দিকে। দুজনেই চল্লিশ পার হয়ে চলে এসেছি। যৌবন ছাড়িয়ে পা দিয়েছি প্রৌঢ়ত্বের ধাপে। সে দিনগুলো আর কোথাও নেই যখন ছাদে বসে একটার পর একটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমি আবৃত্তি করে যেতুম আর ও আমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান গেয়ে শোনাতো।

ইন্দু কাউণ্টারের একধার থেকে একটা ভাঁজকরা তক্তা তুলে বললে, এসো সুকুমার—ভেতরে এসো। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

ভেতরে ঢুকে এলুম। সাবান, তেল, সেণ্ট, টফি, বিস্কুটের পরিবেশ, সেই বিচিত্র মিষ্টি গন্ধের আবহাওয়া। ইন্দু নিজের লোহার চেয়ারটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে একটা টুল টেনে নিলে।

আবার খানিকক্ষণ মুখোমুখি চেয়ে রইলুম নিঃশব্দে। আমি দেখলুম, ইন্দুর চোয়াল দুটো ভেঙে নেমেছে, রগের চুল সাদা। ডান হাতের আঙুলে রূপোর ওপর পলা বসানো আংটি—তার মানে গ্রহ-শান্তিতে ওর বিশ্বাস জন্মেছে। আর ইন্দু আস্তে আস্তে বললে, তোমার সেই শার্প চেহারা আর নেই, কেমন বুড়োটে গোলগাল হয়ে গেছ। অমন চমৎকার কোঁকড়া চুলগুলোই বা গেল কোথায়—মাথার অর্ধেক জুড়ে যে টাক পড়িয়ে বসে আছো!

হেসে বললুম, তুমিও যে খুব আদি-অকৃত্রিম আছো তা নয়। দুজনেই এখন ভাঁটার পথ ধরেছি—যা নিয়ম। সে যাক, কাজের খবর বলো। এ দোকান তোমার নাকি?

—কী আর করা। বাঁচতে হবে তো?

—তা ভালোই। বাণিজ্যে লক্ষ্মীলাভ। লক্ষ্মী-সরস্বতীর সাধনা করছ একসঙ্গে। ব্যবসাও চলেছে, গানও গাইছ।

ইন্দু তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে না। প্রবল ধারায় বৃষ্টি পড়ছে বাইরে। ভিজতে ভিজতে চলেছে কাচ-তোলা গাড়ীগুলো, রাস্তার ওপর দিয়ে ফেনিয়ে চলছে ঘোলা জল। সেদিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি মেলে রেখে বললে, গান ছেড়ে দিয়েছি ভাই। সরস্বতীকে একেবারে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছি।

—সে কি হে! গান ছাড়লে কেন?

—তস্মিন্ তুষ্টে।

—সংস্কৃত ছাড়ো। তোমার তো বেশ নাম হচ্ছিল। রেকর্ড বেরুচ্ছিল, পপুলার হচ্ছিলে—

—হ্যাঁ, চালিয়ে গেলে একটা চলনসই গাইয়ে বলে লোকে মনে রাখত অন্তত। কিন্তু ছাড়তেই হল। ওই যে বললুম, তস্মিন্ তুষ্টে।

—মানে?

—আমার স্ত্রীর জন্যে।

স্ত্রীর জন্যে। আমি যেন বিষম খেলুম একটা। মেয়েরা গান পছন্দ করে না—এরকম কথা এই প্রথম শুনলুম। জলের ওপর আলোর ঝলকানির মতো গান আর মেয়েরা একাকার—দেহের ওপর লাবণ্য। আমার মতো বেসুরো কেউ রাসভকণ্ঠে গানের চর্চা করলে 'ললিতকলাবিধো'রা নিশ্চয়ই সঙ্গতভাবে আপত্তি করতে পারে, কিন্তু ইন্দু সম্বন্ধে তা তো কোনমতেই বলা যায় না।

আমি বললুম, তোমার স্ত্রী কি ও রসে একেবারে বঞ্চিত নাকি?

ইন্দু অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে। বললে, না। একসময়ে ও বেশ ভালোই গাইত—রেডিয়োতেই আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল—একটু থেমে বললে, এবং প্রেম!

—নিজে ভালো গাইতে পারেন, অথচ—

আমার বিস্ময়টাকে সম্পূর্ণ শেষ করতে দিলে না ইন্দু। বললে, একটু দাঁড়াও—চা বলে আসি।

—এই বৃষ্টির ভেতরে যাবে কোথায়?

—পাশেই চায়ের দোকান। আসছি।—একটা ছাতা টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইলুম। একটানা বৃষ্টি চলেছে—ভরা ভাদর। মনে পড়ল, এমনি দিনে মেসের ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দিতুম আমরা—ঘরে ছড়িয়ে পড়ত একটা ঠাণ্ডা নীলচে ছায়া, বাইরে বর্ষার মল্লার বাজত আর হার্মোনিয়ম টেনে নিয়ে ইন্দু গেয়ে চলত চোখ বুজে ঃ 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে, গগনে গগনে ডাকে দেয়া—'

আশ্চর্য, আজ আর ইন্দু গান গায় না। চোখে পড়ল, টেবিলের ওপর এক চিলতে কাগজ—আমি দোকানে ঢোকবার আগে, ছায়া-ঘনানো ঘরে ইলেকট্রিকের আলো জেলে ও সাবান-বিস্কুটের হিসেব লিখছিল। তার প্রথম লাইনে ঃ স্নাফ ওয়ান ডজেন।

ইন্দু ফিরে এল। পেছনে চায়ের দোকানের বেয়ারা এল কেট্‌লি হাতে। হলদে কাগজের ওপর রাখল চারখানা বিস্কুট, দুটো কাপে চা ঢেলে দিয়ে গেল।

ইন্দু বললে, নাও হে—চা খাও। খুব এখন তাড়া নেই তো?

—না, সেরকম কিছু নয়। আর বৃষ্টি না ছাড়লে বেরোতেও পারব না।

কিছুক্ষণ চা-বিস্কুটের পালা চলল। ড্রয়ার থেকে সিগারেট বের করে ইন্দু আমাকে একটা দিলে, নিজে বিড়ি ধরালো। বুঝলুম, বিড়িই খায়—সিগারেটের প্যাকেট রাখে খাতিরের খরিদ্দারের জন্যে। অর্থাৎ নির্ভেজাল ব্যবসায়ী হয়ে গেছে।

তারপর বিড়িতে একটা লম্বা টান দিয়ে, একমুখ ধোঁয়া বাইরের বৃষ্টির কুয়াশার মধ্যে ছড়িয়ে নিভন্ত চোখে বললে, গানটা ছেড়েই দিতে হল ভাই, উপায় ছিল না।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, এইবার ও নিজের কথা বলতে আরম্ভ করবে। আমি নির্বাক শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করলুম।

—তোমাকে বলেছিলুম, রেডিয়োতে আমাদের পরিচয়, তারপর প্রেম। ও অংশটার ছেলেমানুষি আজকেও আর নতুন করে বলবার দরকার নেই। মানে—একসঙ্গে বেড়ানো, সিনেমায় যাওয়া, চা খাওয়া, গান গাওয়া আর স্বপ্ন দেখা।

শিখা বলত, আমরা শিল্পী। দুজনে মিলে আমাদের জীবনকে শিল্প করে তুলব।

আমি বলতুম, আমার গানে তুমি সুর দেবে— তোমার গানে আমি।

শিখা বলত, বিয়ের পরে আমরা একটা ডুয়েট গাইব।

আমি হেসে বলতুম, সিম্বলিক্। আমাদের জীবনে দ্বৈত-সঙ্গীত।

সুর আর প্রেম—এই দুয়ে মিলে আমাদের আকাশ ভরে উঠল স্বপ্নে। তারপর যথানিয়মে বিয়ে। দুজনেই কায়েত, দুজনেই মধ্যবিত্ত এবং আরো বড় যোগাযোগ—বহুকাল দেশ ছাড়া হলেও দুজনেরই আদি বাড়ী বরিশালে। কোনো পক্ষ থেকেই আপত্তির কোনো কারণ ঘটল না। বরং সবাই খুশি হয়ে বললেন, রাজযোটক।

শিখাকে নিয়ে বাসা বাঁধলুম। তখন প্রচুর-গানের টিউশন করি—ভালো আয়। রেকর্ড থেকে কিছু রয়্যাল্‌টি আসছে—রেডিয়োতে নিয়মিত প্রোগ্রাম—দু-একটা ছবিতে প্লে-ব্যাকও করছি। খাটুনি ছিল, অবসরও ছিল। আর সেই অবসরটুকু আমাদের সত্যি সত্যিই সুরে আর স্বপ্নে ভরে উঠত।

কিন্তু প্রথম ঘা লাগল স্বপ্নে। গ্রামোফোন কোম্পানীর কাছ থেকে।

শিখা মোটের ওপর মন্দ গাইত না—অভাব যা ছিল শিক্ষার। আধুনিক গানের ক'টা আর্টিস্ট্ই বা তেমন করে সাধনা করে আজকাল? ডুয়েটের প্রস্তাব নিয়ে যেতেই গ্রামোফোন কোম্পানী আপত্তি তুলল।

আমার কোনো রেকর্ড তারা খুশি হয়েই করতে রাজী আছে। কিন্তু শিখা চলবে না। ওর কোনো নাম নেই, এবং দ্বিতীয়ত—খুব ভদ্র ভাষাতেই বললে, আমি কিছুটা জনপ্রিয় হলেও এমন কিছু পঙ্কজ মল্লিক নই যে নামের জোরেই শিখাকে টেনে নিয়ে যেতে পারব গাধাবোটের মতো। তবে ডুয়েট যদি গাইতে চাই, তা হলে শ্রীমতী অমুক বা শ্রীমতী অমুকের সঙ্গে—

নলিন সরকার স্ট্রীট থেকে যখন বেরিয়ে এলুম, তখন শিখার মুখের দিকে আমি চাইতে পারছিলুম না। ট্রামে উঠে আস্তে আস্তে বললুম, ভয়ঙ্কর ডাঁট হয়েছে ওদের। চলো, একবার মেগাফোন আর হিন্দুস্থান হয়ে—

বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে ছিল শিখা। বললে, না।

—না কেন? সবাই ওদের মতো নয়। আমি তোমায় বলছি—

মুখ না ফিরিয়েই শিখা বললে, মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছ কেন? সত্যিই তো—তোমার নাম আছে বলে ওরা আমাকে নেবে কেন?

—কিন্তু তুমিও তো রেডিও আর্টিস্ট্।

—রেডিও তো সবাইকেই চান্স্ দেয়। ওদের দরজা সকলের জন্যই খোলা।

আত্মদর্শন নয়—ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু কিভাবে যে এর প্রতিকার সম্ভব ভেবে পেলুম না। আমাদের পারিবারিক জীবনে এই প্রথম মেঘের ছায়া নামল।

পরদিন থেকে শিখা বসল তানপুরা নিয়ে। রেওয়াজ চালালো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু একটা সত্যি কথা বলি তোমাকে। আমি বুঝতে পারলুম, ওর যতখানি সাধ আছে ততটা সাধ্য নেই। ন্যাক্ আছে, কিন্তু ট্যালেন্ট্ নেই। অর্থাৎ ও চিরকাল কোনোমতে চালাতে পারবে কিন্তু সুপ্রীতি ঘোষের মুন্সীয়ানা কিংবা কণিকা দেবীর মাধুর্য কোনোদিন ওর গলায় আসবে না।

শিখা প্রায়ই বলে, অনেক ইম্প্রুভ করেছি—না ?

আমি বলি, অনেক।

কিন্তু মনে মনে জানি, শিখা যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক সেই জাতের গাছের মতো—যা খানিকটা বাড়বার পরে আর কিছুতেই বড়ো হতে চায় না।

নিজের বিদ্যে যথাসাধ্য দিতে চেষ্টা করলুম। একজন বড়ো ওস্তাদের কাছেও নাড়া বাঁধল বছর দুই। গলাটা একটু মাজা হল, তাল-মানের কান ভালো হল আরো, কিন্তু গাঁদা গাছের ডালে গোলাপ ফুটল না।

একদিন বললুম চলো, আর একবার গ্রামোফোনে যাই।

শিখা বললে, না। ওদের দয়া আমি চাইতে যাব না। যেচে ওরা আমার কাছে আসবে—দেখে নিয়ো।

সেই শুভদিনটা যে কবে আসবে আমি ঠিক অনুমান করতে পারলুম না। নিজে সামান্য যেটুকু গান বুঝতে পারি, তাতে অতখানি আশাবাদী হওয়া আমার পক্ষে শক্ত।

চায়ের দোকানের বেয়ারা এল কাপ নিতে। ইন্দু তাকে পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আর একটা বিড়ি ধরালো—আমার দিকে এগিয়ে দিলে সিগারেটের প্যাকেট। বেয়ারাটা বেরিয়ে গেলে আবার বলতে আরম্ভ করল।

শিখার কথা থেকে বুঝতে পারছ, এবার একটা আত্মপ্রত্যয় আসছিল ওর মনে। এরপর থেকে একটা নতুন কম্প্লিকেসি আরম্ভ হয়ে গেল।

নানা জায়গা থেকে আমার ডাক আসে। সরস্বতী পুজোর আসরে, অফিস-কলেজের সোস্যালে, নানান জলসায়। তখন আমার খান-দুই রেকর্ড বাজারেও খুব ভালো চলেছিল। আমার চাহিদা জমে উঠছিল ক্রমে।

একদিন একটা পার্টির সঙ্গে কথা বলে ভেতরে আসতে দেখি, শিখা চুপ করে বসে আছে। মুখের চেহারা থমথমে।

—কী হল তোমার ?

—ভাবছিলুম, পুরুষ জাতটা কী স্বার্থপর !

মন্তব্যটা নারীমাত্রেরই সাধারণ সিদ্ধান্ত হলেও এই মুহূর্তে যে ওটা

একাঘ্নী বাণ, এই সাধারণ সত্যটুকুকে বোঝবার মত বুদ্ধি আমার ছিল। অকারণ আক্রমণে চমকে উঠে বললুম, কেন ?

—তুমি তো ইচ্ছে করলেই আমার কথাটাও ওদের বলতে পারতে।

—ওরা নিজে থেকে না বললে—

—ওদের হয়তো খেয়াল হয়নি। হয়তো ওরা জানেই না আমিও এ বাড়ীতে থাকি। কিন্তু তুমিই তো সেটা ওদের মনে করিয়ে দিতে পারতে।

আমি চুপ করে রইলুম। আর হঠাৎ ঝকঝক করে উঠল শিখার চোখ দুটো।

—তার মানে তুমিই চাও না যে লোকে আমাকে জানুক। তুমি ভাবো রেডিও আমাকে নিছক দয়া করে প্রোগ্রাম দেয়। আর গানের আসরে আসবেন অমুক দেবী, তমুক শ্রীমতী—তাদের মাঝখানে আমাকে নিয়ে গেলে তোমার রসালাপেও তো কিছু অসুবিধে হবে!

মুহূর্তের মধ্যে আবহাওয়াটা যেমন ঘোলাটে, তেমনি কদর্য হয়ে গেল। যদিও জানি শেষ ইঙ্গিতটা নিছক একটা বাড়্তি খোঁচা দেবার জন্যেই বলা—তবু আমি মরমে মরে গেলুম।

লজ্জায় আকুল হয়ে বললুম, আচ্ছা—আচ্ছা—আমি এখুনি ওদের টেলিফোন করছি।

—থাক, অনুগ্রহে দরকার নেই আর।—শিখা উঠে গেল সামনে থেকে।

কিন্তু যে কুৎসিত একটা আবর্ত সৃষ্টি করে গেল, আমার মনটা অনেকক্ষণ ধরে পাক খেলো তার ভেতরে। বেশ বুঝতে পারলুম, আমাদের পারিবারিক দ্বৈত-সঙ্গীত এতদিনে সত্যিই বেসুরো বাজতে আরম্ভ হয়েছে।

তারপর থেকে আমাকে এক করুণ প্রহসনে ভূমিকা নিতে হল। কোনো দল এলেই সুযোগ বুঝে কথা পাড়তে চেষ্টা করি: যদি চান তো আমার স্ত্রীও—

যারা বিনি-পয়সায় আসে, তারা খুশি হয়ে রাজী হয়। শিখা চালিয়ে যায় একরকম—কোথাও কোথাও এনকোরও পায়। কোনো কোনো বড় পার্টি নিরুৎসাহভাবে বলে, 'আচ্ছা, তবে উনিও চলুন।' আর কেউ কেউ সরাসরিই বলে, 'দেখুন—আমাদের সব এ-ক্লাস আর্টিস্ট্—তার ভেতরে ওঁকে অ্যাকোমোডেট্ করা—'

যাই হোক, সাধ্যমত নানা জায়গায় আমি নিয়ে যাই শিখাকে। একদিন শিখা বললে, কই, আমাকে তো টাকা দিলে না।

আমি চমকে উঠলুম। তারপর অভিনয়ের ওপর রং চড়াতে হল আর এক দফা। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে ব্যাগ বের করলুম পকেট থেকে। বললুম, এই নাও পঁচিশ টাকা। পার্টির পয়সা নেই, তাই আমাকে ত্রিশ আর তোমাকে পঁচিশ দিয়েছে।

স্বচ্ছন্দ মনে হেসে উঠল শিখা।

—তাই বলো। এমনি করে আমার টাকা মেরে দিচ্ছ তুমি!—তারপর

গালে একটা আদর করে টোকা দিয়ে বললে, চোর!

বললুম, রাখো টাকাটা।

শিখা বললে, তোমার সংসারের টাকা—তুমি রাখো। আমি ওর কী জানি!—বলে সেই চলন্ত ট্যাক্সিতেই আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। দেখলুম, অনেকদিন পরে ও আবার আগের মতো খুশি আর সহজ হয়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখে, সহানুভূতিতে আর লজ্জায় মনের ভেতরটা আমার পুড়ে যেতে লাগল।

এরপর এ প্রায় বাঁধা নিয়ম হয়ে দাঁড়াল। কখনো ওকে ত্রিশ দিই—কখনো পঞ্চাশ। অর্থাৎ টাকাটা ওকে দেখালেই চলে। টাকার ওপর ওর কোনো আকর্ষণ নেই—আর দশজন সাধারণ মেয়ের মতো নিজের শাড়ী গয়নার কথা ও কখনো ভাবতে চায় না। নিজের সাধনা নিয়ে থাকতে চায়—আর আর্টিস্ট্ হিসেবে স্বীকৃতিটুকু পেলেই ওর খুশির অন্ত নেই।

কিন্তু সুকুমার, মিথ্যেকে বেশিদিন টিঁকিয়ে রাখা যায় না। একদিন দারুণভাবে সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

একটা বড় জলসার পরে দুজনে গাড়ীতে উঠেছি—আমি পঞ্চাশটা টাকা গুঁজে দিচ্ছি শিখার হাতে। এমন সময় শব্দভেদী বাণ এল।

—পয়সা দিয়ে এসব শিখা-ফিখাকে কেন যে আনে—

—পাগল? কে পয়সা দিয়েছে শিখাকে? ইন্দুবাবুকে আনতে গেলে ওই এক জ্বালা। কেবল ইন্‌সিস্ট্ করেন স্ত্রীর জন্যে—বলেন, কিছু দিতে হবে না—শুধু দু-একটা গান—

গাড়ী চলতে শুরু করেছিল—বাকিটা শোনা গেল না। কিন্তু যেটুকু শোনা গিয়েছিল তা-ই যথেষ্ট। বিবর্ণ মৃত দৃষ্টি তুলে একবার মাত্র শিখা তাকালো আমার দিকে। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, প্রায় নিঃশব্দ স্বরে বললে, কেন বলোনি আমাকে? কেন বলোনি এতদিন?

তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে কান্না জীবনের সবচেয়ে বড় লজ্জার—সব চাইতে বড় পরাজয়ের। সে কান্নাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার ছিল না।

সেইদিন, তখনই আমি মনঃস্থির করলুম সুকুমার। আর গান গাইব না। আবিষ্কার করলুম, আমার গানের চাইতে শিখাকেই আমি বেশি ভালবাসি। গান এসে মাঝখানে প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে—আমাদের দুজনকে বিচ্ছিন্ন আর বিশ্লিষ্ট করে দেবে, এ আমি কিছুতেই সইব না।

সেই মাস থেকেই দোকান করলুম। হার্মোনিয়াম, তানপুরা, বাঁয়া-তবলা সব বিক্রী আর বিলি করে দিয়েছি। এখন দোকানদার। ব্যবসা খুব খারাপ চলছে না। আর শিখা—শিখা এখন কর্পোরেশনের স্কুলে মাস্টারী করে। না—গানের টীচার নয়।

ইন্দু থামল।

বাইরে বৃষ্টিও থেমেছে। ইন্দু আর কখনো গাইবে না: 'এসো এসো

শ্যামছায়াঘন দিন'। আমি ওর দোকান থেকে নেমে গেলে আবার পেন্‌সিলটা তুলে নিয়ে হিসেব লিখবে ঃ স্নাফ্‌—ওয়ান ডজেন।

আমি উঠে দাঁড়ালুম।

মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু

স্যার,

আমার এই খাতা শেষ পর্যন্ত আপনি পড়বেন কিনা জানি না। কারণ আপনি দেখেছেন যে আমি একটি প্রশ্নেরও উত্তর লিখিনি, আগাগোড়া এই চিঠিটাই লিখেছি আপনাকে। আপনি হয়তো লাইন কয়েক পড়েই ভ্রূকুটি করবেন, একটা জিরো বসিয়ে দেবেন, তারপর নন্‌সেন্স রাইটিঙের জন্য আমার নামে ইউনিভার্সিটিতে একটা রিপোর্ট পাঠাবেন। জিরো দিন, রিপোর্ট করুন, সেজন্যে ভাবছি না। হয়তো বা ধৈর্য ধরে লেখাটা আপনি পড়েও ফেলতে পারেন, এই আশাতেই আপনার কাছে এই নিবেদন পেশ করছি।

দু-একটা প্রশ্নের জবাব হয়তো দিতে পারতাম। কিন্তু তাতে পাস মার্ক পাওয়া দূরে থাক, কুড়ির ঘরেও পৌঁছুত না। তাই ও চেষ্টা আর করব না। তা ছাড়া আজ সন্ধ্যার পরেই তো আমি পাস-ফেলের বাইরে চলে যাব। কলকাতার আশপাশ দিয়ে যে অসংখ্য ট্রেন আসে যায়, তাদেরই কারো চাকার তলায় শেষ হিসেব মিটিয়ে দেবো আমার। এই খাতা যখন আপনি দেখবেন, তখন ট্রেনে কাটা পড়ে অপরিচিত যুবকের মৃত্যুর ছোট্ট আর পুরোনো সংবাদটুকু আপনার স্মৃতি থেকেও মুছে গেছে।

আপনার অধ্যাপক-বিবেক এইখানে এসে একবার থমকে দাঁড়াবে। বলবেন, ছিঃ—ছিঃ, পরীক্ষায় পাস না করতে পেরে আত্মহত্যা! এর চাইতে অধম কাপুরুষতা কি কল্পনাও করা চলে? দেশের তরুণদের যদি এইটুকুও নৈতিক বল না থাকে—তাহলে বাঙালী কোথায় দাঁড়াবে—জাতির ভবিষ্যৎ কী!

বিশ্বাস করুন স্যার, এ সব কথাই আমি জানি। আরো বিশ্বাস করুন, আমিও বাঁচতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, আমার জন্যে সারা দেশ দু-হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করে আছে; আমারই হাতের ছোঁয়ায় সাঁওতাল পরগণায় বান-ডাকানো খ্যাপা পাহাড়ী নদী বিশাল ক্যাচ্‌মেন্ট্‌ এরিয়ার মধ্যে থমকে দাঁড়াবে, আমি সুইচ্‌ টিপলে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিকের হাজার হাজার আলোয় ঝলমল করে উঠবে বিহার পশ্চিমবাংলার সেরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্‌ট্‌—ব্লাস্ট্‌ ফার্নেসের রক্তিম আভায় আমিই গলিত ইস্পাতে আগামী ভারতবর্ষের ভিত্তি

রচনা করে দেব। স্যার, আত্মহত্যা আমি করতে চাইনি।

আমার চারিদিকে ছেলেরা দ্রুতবেগে পরীক্ষার খাতা লিখে চলেছে। তাদের অনেকেই আমার মতো এখনো স্বপ্ন দেখছে এবং কিছুদিন পরে রুশ্-লিস্টে অনেকেরই সে স্বপ্ন খান খান হয়ে যাবে। তবু ওদের মধ্যেও কেউ কেউ হয়তো জীবনে কৃতী হবে—ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের আশার মশাল জ্বালিয়ে হাতে নেবে। ওরা ভাগ্যবান—এগিয়ে চলুক। আমার মতো যে অসংখ্যেরা এমনি করে হারিয়ে যাবে, কিংবা বেঁচেও বেঁচে থাকবে না, তাদের কথা কোনো পঞ্চবার্ষিকী সাফল্যের খতিয়ানে লেখা থাকবে না। আমি আপনাকে চিনি না, কখনো দেখিনি, কোনোদিন দেখব না, কিন্তু এটুকু জানি, আপনি অধ্যাপক। ছাত্রদের কাছাকাছি আপনাকে থাকতে হয়, তাদের জীবনের ঢেউ আপনাকে ছোঁয়, হয়তো তাদের আপনি ভালোও বাসেন। তাই শেষ পর্যন্ত আপনি পড়ুন বা না-ই পড়ুন, আমাদের কথা আপনাকে ছাড়া আর কাকে বলব।

স্যার, স্বপ্ন যখন দেখেছিলাম তখন এই কথাটাই ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি মেদিনীপুরের এক অখ্যাত গ্রামের চাষীর ছেলে। কিন্তু আমার বাবা চাষা হলেও দিল্লী-আলো-করা নেতাদের কারুর চাইতে তাঁর দেশপ্রেম এতটুকুও কম ছিল না। আমার জন্ম হয়েছিল উনিশশো বেয়াল্লিশের সেপ্টেম্বরের মাঝ-রাতে এক জঙ্গলের ভেতর। কারণ তখন মিলিটারিরা আমাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছিল আর জাতীয় পতাকা আঁকড়ে ধরে বুলেট্‌বেঁধা বুক নিয়ে আমার বাবা লুটিয়ে পড়ে ছিলেন এক ধানক্ষেতের ভেতর।

বাবার ইচ্ছে ছিল, ছেলে হলে তার নাম রাখবেন স্বাধীন কুমার। সেই আগুনজ্বলা প্রলয়ের রাতে, বাবার রক্তের আশীর্বাদ নিয়ে স্বাধীন আকাশের তলাতেই আমি জন্মেছিলাম। কারণ মিলিটারির সমস্ত তাণ্ডব সত্ত্বেও দেশের একটি মানুষের মনও সেদিন পরাধীন ছিল না।

কিন্তু এ-সব ইতিহাস থাক স্যার। আপনি যদি এতক্ষণ পর্যন্ত পড়ে থাকেন, তা হলে এবার আপনার নিশ্চয় ধৈর্যচ্যুতি হবে—আমার বংশ-পরিচয় শোনবার কী মাথাব্যথা আছে আপনার। তাছাড়া এমনিতেও আমি তো তিন ঘণ্টার বেশি সময় পাব না—এসে খাতা কেড়ে নেবে। তাই সংক্ষেপেই বলতে চেষ্টা করি।

চাষীর ছেলে, চাষবাস ক'রে কোনোমতে বাঁচতে পারতাম, কিংবা অকাল এলে অনেকে যেমন না খেয়ে বা অখাদ্য খেয়ে মরে, তেমনি করে মরে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার বরাত খারাপ—কাকা আমাকে গ্রামের মাইনার স্কুলে ভর্তি করে দিলেন আর—আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, আমি একটা স্কলারশিপও পেয়ে গেলাম।

স্যার, সেই স্কলারশিপই আমার কাল হল। আমি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। মা আমাকে বুকে টেনে নিয়ে চোখের জলে ভাসিয়ে দিলেন, বাবার জন্যে মা-কে কাঁদতে দেখলাম সেই প্রথমবার। তারপর দু-চোখ ভরা আলো

নিয়ে কাকার সঙ্গে রওনা হলাম আট মাইল দূরের বড় গঞ্জের হাই স্কুলে ভর্তি হতে।

হস্টেলে থাকবার পয়সা ছিল না। জায়গা পেলাম ধান-চালের আড়তদার সামন্তদের বাড়ীতে। সামন্তরা দূর-সম্পর্কে আমাদের আত্মীয় হত—কিন্তু গরীব চাষীর সঙ্গে সে আত্মীয়তা তারা স্বীকার করত না। আসল সম্পর্ক ছিল জোতদার আর প্রজার, মহাজন আর খাতকের। কাকাই হাতে পায়ে ধরে ওদের ওখানে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন, হাই স্কুলে ভর্তি হলাম, ফ্রীও পেলাম।

স্যার, সামন্তদের ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা। দুটো লরী, তিনটে মোকাম। কিন্তু ব্যবসা যারা করে, তারা কোনোদিন পাইপয়সাও বাজে খরচ হতে দেয় না। পাঁচশো টাকা দান করে পঁচিশ হাজার টাকার আখের গুছিয়ে নেয়। আমাকেও খেতে থাকতে দিত বটে, কিন্তু তার দামও আদায় করে নিত।

এই খাতা দেখেই বুঝতে পারছেন আমার হাতের লেখা খারাপ নয়; তার ওপরে অঙ্কে আমার মাথা ছিল, মাইনার পরীক্ষায় অঙ্কে একশোর ভেতর একশো পেয়েছিলাম। ওরাও সুযোগ ছাড়ল না। প্রথম প্রথম আমাকে দিয়ে চিঠিপত্র লেখাত, তারপর খাতা লেখাত, তারও পরে হিসেব কষাত। সকালে দু ঘণ্টা এ আমার বাঁধা কাজ দাঁড়িয়ে গেল।

পড়বার সময় পেতাম রাত আটটার পরে।

তা-ও কি ভালো করে পড়ার যো ছিল!

আড়তের লাগাও একখানা ছোট ঘরে আমি থাকতাম আর থাকত ওদের এক মুহুরী। মুহুরীর বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। শুকনো চামচিকের মতো চেহারা—দুটো অদ্ভুত বড় বড় জ্বলজ্বলে চোখ। আমি পড়তে বসলেই সে হুঁকো ধরিয়ে গল্প আরম্ভ করত।

আমার তখন বয়স কত আর? বারোর বেশি নয়। তামাক টানতে টানতে, জ্বলজ্বলে চোখদুটোকে আরো জ্বালিয়ে তুলে বিশ্রী ফ্যাঁসফেঁসে গলায় যে-সব গল্প সে শোনাত, সে-সবের মানে তখন আমি ভালো করে বুঝিনি, পরে বুঝেছিলাম। অকথ্য, অশ্লীল সমস্ত ব্যাপার। কত ভাবে, কত মেয়ের সর্বনাশ সে করেছে তারই বিবরণ।

আমার ভালোমন্দ কিছুই বোধগম্য হত না। ভারী বিরক্তি লাগত।

—চুপ করুন, আমায় একটু পড়তে দিন।

—আরে থাম্, বাপু, থাম্! চাষার ছেলে বিদ্যেসাগর হবে—হেঁঃ! তার চেয়ে হুঁকোটা ধর—তামাক খাওয়াটা শিখে নে!

মুহুরী যদি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল তো দপ করে লণ্ঠনটা গেল নিবে। সামন্তদের বাড়ী থেকে যেটুকু কেরোসিন তেল বরাদ্দ হত তাতে রাত ন'টার পরে আর আলো জ্বলবার কথা নয়। স্কলারশিপের যে সামান্য ক'টা টাকা পেতাম, তাতে নানা টুকটাক খরচ চালিয়ে আর তেল কেনবার পয়সা জুটত না।

তবু এর মধ্যেও ফার্স্ট সেকেন্ড হয়ে ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠেছিলাম। তারপরেই দেখা দিল বইয়ের সমস্যা। দেখলাম স্কুল ফাইন্যালের বই কেনা প্রায় সত্তর-আশী টাকার ধাক্কা। কাকা খোরাকীর ধান বেচে ক'টা টাকা পাঠালেন, সামন্তেরা দশ টাকা সাহায্য করল, হেড্ মাস্টার দয়া করে তিনখানা স্কুল কপি দিলেন। তবু অর্ধেক বইও হল না।

আর সামন্তদের দশ টাকার ঋণ শুধতে হল খাতার পর খাতা লিখে।

স্যার, মাইনারে স্কলারশিপ পেয়েছিলাম, ভেবেছিলাম আমি তুচ্ছ সাধারণ ছাত্রদের দলে নই, আমার মধ্যে শক্তি আছে, তারই জোরে—আমি স্বাধীন কুমার—স্বাধীন গৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াব। যে ভারতবর্ষের জন্যে আমার বাবা বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন, সেই ভারতবর্ষে আমি আমার সত্যিকারের কাজের জায়গা খুঁজে পাব। কিন্তু না পারলাম ঠিকমতো পড়াশুনো করতে, না হল ভালোভাবে পরীক্ষা দেওয়া। রেজাল্ট্ বেরুলে দেখা গেল, থার্ড ডিভিশনে পাস করেছি।

হেড্মাস্টার থেকে আরম্ভ করে সবাই একবাক্যে ছি-ছি করতে লাগলেন। সামন্তদের যে ছেলেটা তিনবার বি-এ ফেল করে এখন হলদী নদীর ধারে ধারে বন্দুক কাঁধে কাদা-খোঁচা শিকার করে বেড়ায়, সে বললে, পাস করেছে এই ওর ভাগ্যি! কত ব্রিলিয়াণ্ট্ ছেলে স্কুল-ফাইন্যালে হিমশিম খেয়ে যায়।

দুদিন ঘরে মুখ লুকিয়ে পড়ে রইলাম। উঠলাম না, খেলাম না। আর তারই ভেতর মা-র চোখের জল টপটপ করে পড়তে লাগল আমার কপালে।

—ওঠ্ বাবা ওঠ্। আবার মন দিয়ে লেখাপড়া কর—তুই জীবনে ঠিকই বড় হতে পারবি। তোর মতো কত দুঃখী ছেলে একেবারেই পাস করতে পারেনি—তাদের কথাও ভেবে দেখিস।

স্যার, আবার বুক বাঁধলাম। এবার চলে এলাম কলকাতায়।

কী করব, ওই সামন্তদের কাছ থেকেই চিঠি নিয়ে এলাম। সরকারেরা সামন্তদের কুটুম—বড়বাজারে তারা তামাকের ব্যবসা করে। সেইখানেই জায়গা হল।

ওই এক কাজ। দোকানের ব্যাপারে সাহায্য করতে হবে, দরকার হলে তাগাদায় বেরুতে হবে। তবু মনে হল, কলকাতা—কলকাতা। কত বড় জীবন এখানে—কত সুযোগ। বড় বড় কলেজ, নামজাদা সব দিকপাল অধ্যাপক। সেই সব কলেজে একবার পা দিলে, নামকরা প্রোফেসারদের জ্ঞানের একটুখানি ছোঁয়া পেলেই আমার মনের ভেতর হাজার আলো ঝলমল করে উঠবে। সারা পৃথিবীর প্রাণের ঢেউ এই কলকাতায় এসে ভেঙে পড়ছে —তার সঙ্গে একবার প্রাণ মেলাতে পারলে আমি রাতারাতি খোলা আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াব—প্রথম বর্ষার জল পেয়ে মরা চারাগাছ যেমন নতুন পাতা নিয়ে বেড়ে ওঠে।

গেলাম কলেজে—সঙ্গে আবার ক'টা খোরাকির ধান বেচা টাকা। জানি এর জন্যে সংসারের সবাইকে হয়তো বেশ কদিন আধপেটা খেতে হবে, হয়তো

উপোস দিতে হবে। কিন্তু যদি ভালো করতে পারি পরীক্ষায়, যদি মানুষ হতে পারি, যদি—

বিরাট বাড়ী কলেজের—তাতে রথের মেলার ভিড়। সেই ভিড় ঠেলে যদি বা অফিসে পৌঁছুতে পারলাম, শুনলাম, থার্ড ডিভিশন? আই, এস-সি-তে সীট? হবে না।

একটা দুটো নয় স্যার, ছ'টা কলেজ থেকে ফেরত দিলে। শেষে ওরই মধ্যে একটু অকুলীন একটা কলেজে জায়গা হল। ভাইস-প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। যদি কিছু কন্‌সেশন পাই।

—কন্‌সেশন?—ভাইস-প্রিন্সিপালের চোখ আকাশে উঠল: থার্ড ডিভিশন?

—স্যার—

—আই এস-সি-তে এম্‌নিই আমরা কন্‌সেশন দিই না, তার ওপরে থার্ড ডিভিশন।

—স্যার, গরিবের ছেলে—

—সব বাঙালীর ছেলেই গরিব। সেভাবে দেখতে গেলে কলেজসুদ্ধ ছাত্রকেই ফ্রী স্টুডেন্ট্‌শিপ দিতে হয়!

—স্যার, একেবারে চাষীর ঘরের ছেলে আমি—

ভাইস-প্রিন্সিপাল দারুণ বিরক্ত হলেন: তা হলে কলেজে পড়তে এলে কেন? চাষবাস দেখলেই পারতে। হায়ার এডুকেশন তোমাদের জন্যে নয়। গো—গো—ডোন্ট্‌ ডিস্‌টার্ব মী—

কনসেশন হল না। পথে ফিরে আসতে আসতে সামন্তদের সেই মুহুরীর কথা মনে পড়তে লাগল: চাষার ছেলে বিদ্যেসাগর হবে—হেঃ।

স্যার, তখনি হয়তো আমার দেশে ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। এক মাঠ রোদের ভেতর, আগুন-পোড়া মাটিতে যেখানে একমুঠো মুড়ি খেয়ে কাকা লাঙল দিচ্ছেন, তাঁর কপাল বেয়ে টপটপ করে ঘামের ফোঁটা পড়ছে—সেইখানে নিজের জায়গায় গেলেই আমার ভালো হত, শহরের এই অপমানের চাবুক এমন করে আমার গায়ে পড়ত না। কিন্তু স্যার, আশা আমি ছাড়তে পারলাম না। কেমন জেদ চেপে গেল, মনে হল, এর শেষ দেখে ছাড়ব!

সরকারদের তামাকের দোকানের একধারে থাকি। সামন্তদের সঙ্গে কত তফাৎ। সেখানে ছোট একটা আটচালার ঘরে থাকতে হত বটে, কিন্তু বাইরে আকাশ ছিল, আলো ছিল, স্নানের জন্যে মস্ত একটা দীঘির কালো গহীন জল ছিল—বাতাসে ধুতরো-ভাঁটি চাঁপা-বকুলের গন্ধ ছিল। কিন্তু এখানে বড়বাজারের গলি। বেলা বারোটায় সারি সারি দোকানে ইলেক্‌ট্রিকের আলো জ্বলছে—তিনহাত রাস্তার দুধার দিয়ে আকাশছোঁয়া স্যাঁতালাগা বাড়ী—বাতাস নেই, গায়ে ধাক্কা দিয়ে হাজারো লোকের রাত একটা-দেড়টা পর্যন্ত আসা-যাওয়া, গুমোট গরম, লাইন বাঁধা দোকান থেকে তামাক আর গুড়ের গন্ধ—আর কান-ফাটানো কোলাহল।

এরই মধ্যে এক কোণায় একটা তক্তোপোশে থাকি। সারারাত ইঁদুর চরে, দিনেদুপুরে আরশোলার উৎপাত। সরকারেরা কলেজের মাইনেটা চালাত —আর দিত পাঁচ টাকা হাতখরচ। তার বদলে সকালে-বিকালে কাজে বেরুতে হত—তাগাদায় যেতে হত। যোগাড়-যন্তর করে একটা টিউশন জুটিয়ে নেব তারও জো ছিল না! বই? আই. এস-সির সব বই কিনতে কত টাকা লাগে সে আমি আজও জানি না। স্যার, আপনিও বোধ হয় জানেন না। আপনাদের সময় যে বই আপনারা পাঁচ টাকায় পেতেন এখন তা বারো টাকার নিচে নয়। দু-একখানা পুরোনো এডিশন ফুটপাথ থেকে কিনেছিলাম—তাতে সিলেবাসের অর্ধেকও পাওয়া যেত না।

পড়াশুনো? খেতে যেতে হত সরকারদের বৌবাজারের বাড়ীতে। সেখান থেকে খেয়ে ফিরতে দশটার আগে নয়। তারপর একটা হলুদে ঘোলাটে বাল্ব জেলে যখন পড়তে বসতাম, তখন দু-চোখ যেন ছিঁড়ে পড়ত, খাতার নোটগুলিকে একরাশ দুর্বোধ্য হিজিবিজি বলে মনে হত। কখন ঘুমিয়ে পড়তাম জানি না—সারারাত গায়ের ওপর দিয়ে ইঁদুর আর আরশোলারা দৌড়ে বেড়াত।

আর কলেজে? ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়। এক-একটা বেঞ্চে সাত-আটজনকে ঠাসাঠাসি করে বসতে হয়, যেখানে পাঁচজনের বসবার জায়গা হওয়া উচিত। নোট নিতে হলে খাতা রাখবার জায়গা মেলে না, ল্যাবোরেটরির অবস্থা আরো চমৎকার। পনেরো জনের মতো ছেলে যেখানে কাজ করতে পারে—সেখানে পঞ্চাশ জনকে কাজ করতে দেওয়া হয়।

ভাবী বৈজ্ঞানিক! স্বাধীন ভারতের ইতিহাস যারা গড়বে—এই তাদের লেখাপড়া শেখানোর চেহারা!

তবু স্যার, চেষ্টার ত্রুটি করিনি। দু চারজনের কথা বলছি না—আমাদের মতো তুচ্ছ সাধারণ ছাত্র কলেজে লেখাপড়া শিখতেই এসেছিল। কেন তারা পারে না, কেন যে তারা ফেল করে—

একটা ঘটনা বলি, স্যার! আজ এ অবস্থাতেও আমার হাসি পায় কথাটা ভাবলে।

কলেজের ফাউণ্ডেশন ডে। ঘটা করে সভা, পতাকা উত্তোলন, বক্তৃতা। সব চেয়ে ভালো বক্তৃতা দিয়েছিলেন ভাইস-প্রিন্সিপাল। বলতে বলতে তাঁর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

—আমরা একটা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে দেখেছি—কলেজের টেন্ পার্সেন্ট ছেলে মোটামুটি সব বই কিনতে পারে, টুয়েন্টি পার্সেন্ট কিছু কিছু কিনতে পারে, বাকী সেভেন্টি পার্সেন্ট একখানা বইও কিনতে পারে না! এ অবস্থায় কী শিক্ষা আমরা দেব—কাদেরই বা দেব! এর যদি প্রতীকার না করা যায়, তা হলে শেষ পর্যন্ত দেশ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে!

প্রতীকার অবশ্য ভাইস-প্রিন্সিপাল ভেবেই রেখেছিলেন। বলে দিয়েছিলেন, কলেজ-এডুকেশন গরিব ছাত্রদের জন্যে নয়!

স্যার, সেকেণ্ড্ আওয়ারের বেল পড়ল। আর বেশিক্ষণ আমি লিখতে পারব না। আপনি যদি এতক্ষণ পর্যন্ত পড়ে থাকেন, তা হলে আপনার উদারতার উপরও আর উৎপাত করা চলে না। সংক্ষেপেই আমার কথাগুলো এবার শেষ করি।

আমার মা লেখাপড়া জানেন না। আঁকাবাঁকা হরফে তাঁর জবানিতে কাকা চিঠি লিখতেন।

'তুমি বড়ো হও বাবা—দেশের দশের একজন হও। তোমার বাবা যে নাম রেখে গেছেন সে নামের সম্মান রেখো তুমি। স্বাধীন ভারতের কর্মী হতে হবে তোমায়—সে কথা তুমি ভুলো না।'

ভুলিনি—একদিনের জন্যেও না। কিন্তু স্বাধীন ভারত তো আমার দায়িত্ব তুলে নিলে না—আমার শিক্ষার পথ খুলে দিলে না। সেই তামাকের দোকানে চাকরি করে—ক্লাসের নামে সেই অর্থহীন হট্টগোলের ভেতরে, ভ্যাপ্সা গরম আর কোলাহলে-ভরা বড়বাজারের গলির সেই ঘরটিতে, হলদে ইলেকট্রিকের আলোয় আমার চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে যেত—মাথার মধ্যে এক-একটা রক্তের ঢেউ ফেটে পড়ত থেকে থেকে। মনে হত এখান থেকে ছুটে পালাই, ঝাঁপিয়ে পড়ি কোনো পুরোনো দীঘির গহীন কালো জলের ভেতর, বুক ভরে টেনে নিই চাঁপা ভাঁটফুল নাগকেশরের গন্ধ, কোনো বর্ষার কাজ্‌লা মেঘকে হাত বাড়িয়ে ডাক আর বলি: আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে—

কিন্তু কলকাতায় দীঘির সেই কালো ঠাণ্ডা জল কোথাও নেই, নেই নাগকেশর সোঁদাল ফুলের গন্ধ, আমাদের দেশের বাড়ীতে ভরপেট খোরাকির ধান নেই, মানুষের আগুনজ্বলা বুকের ভেতর কোনোখানে এক পশলা বৃষ্টি নেই।

কোথায় যাব—কোথায় পালাব।

আশা ছাড়ব না। আমি বাঁচব, আমি বড় হবো। আমি নইলে নতুন ব্লাস্ট্ ফার্নেসে আগুন জ্বলবে না, হাইড্রো-ইলেকট্রিকের বিদ্যুৎ ছুটবে না, অ্যাটমিক রিসার্চের কাজ বাকী পড়ে থাকবে, রিফাইনারির পেট্রোলিয়াম-পেট্রোল-কেরোসিন-ব্লু অয়েল্-প্যারাফিনে নব নব রূপ লাভ করবে না। সেই ময়দানবের মন্ত্র আমায় জোর করে কেড়ে নিতেই হবে। আমি যে স্বাধীন ভারতের বৈজ্ঞানিক।

স্যার, সবই স্বপ্ন। বাংলা দেশের কলেজে কলেজে আমার মতো অসংখ্য ছাত্র স্বপ্ন নিয়েই বেঁচে আছে—স্বপ্নের ঘোরেই চলে বেড়াচ্ছে। তারপর একদিন স্বপ্ন ভাঙে—দেখতে পায়—

স্যার, পড়াশুনো কিছুই হল না। কখন পড়ব, কোথায় বই পাব? সামান্য বই কিংবা নোট যোগাড় করতে পারি, হলদে বাল্বটার ঘোলাটে আলোয় তাদের কোনো অর্থই থাকে না, একসার পোকার মতো তারা চোখের সামনে কিলবিল করে নড়তে থাকে। তারপর কখন স্নায়ুগুলো ভেঙে

পড়ে—সব চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তামাক, চিটেগুড় আর ইঁদুর-আরশোলা-ড্যাম্পের গন্ধভরা ঘরে ভোরের আলোয় যখন জেগে উঠি, তখন যেন মাথায় বিশ মণ ভার চেপে আছে। তারপর আটটা না বাজতেই হিসেবের খাতা!

অ্যানুয়ালের খাতা দেখা হয় না, মাইনে দেওয়া থাকলেই ঝাঁক ধরে প্রমোশন। প্রি-টেস্ট্ দিলাম না—কী পড়ে দেব? তারপর এগিয়ে এল টেস্ট্।

স্যার, এইখানে নিজের অপরাধের কথা কবুল করি। টেস্ট্ যখন কাছিয়ে এল, তখন মনের মধ্যে সারাক্ষণ একটা অনিশ্চিত চিতা যেন জ্বলতে লাগল আমার। বই—মাত্র কয়েকটা বই যদি আমার থাকত! তা হলে ফার্স্ট ডিভিশন না পাই—অন্তত সেকেণ্ড্ ডিভিশন আমি পেতামই, আর ম্যাথ্মেটিক্সে একটা লেটার!

রাগ করবেন না স্যার, আমার মনের অবস্থা বুঝে দেখুন। আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম! তারপর—

তারপর—আমি কলেজ থেকে ক্লাসমেটদের বই চুরি করতে আরম্ভ করলাম!

আপনি কী ভাবছেন আমার সম্বন্ধে? ভাবুন। আমিই কি একথা বিশ্বাস করতে পারি যে শেষ পর্যন্ত আমি চোর হয়ে গেলাম? আমার বাবা রক্ত দিয়ে দেশের স্বাধীনতা এনেছেন, তাঁর ছেলে হয়ে শেষকালে চুরি শুরু করলাম আমি?

স্যার, যদি পারেন—বিচার করবার আগে একবার ভেবে দেখবেন, কেন ছেলেরা বই চুরি করে, কেন পরীক্ষার পাতায় নকল করে, কেন প্রশ্ন কঠিন মনে হলে অমন হিংস্র অশোভন ভাবে পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে আসে? এগুলো অন্যায়—অত্যন্ত অন্যায়। এ জিনিস কখনো হওয়া উচিত নয়—কেউ এ সব সমর্থনও করবে না। তবে কেন হয়? কেন ছেলেরা এমন করে ভুলের বিকৃত পথে পা বাড়ায়? একটা পাশ ফেলের ওপর তাদের কতখানি আসে যায়, কখনো কি তা চিন্তা করেছেন?

চুরি করা বই নিয়ে কোনোমতে হিঁচড়ে টেস্টে তরে গেলাম। মাইনে দেওয়া ছিল, টেস্ট না দিলেও অ্যালাউ করে দিত। কিন্তু তারপর? ফী দিতে হবে পরীক্ষার। এবং অনেক টাকা।

দেশের অবস্থা খারাপ—কাকার চিঠিতে জানলাম, এর মধ্যেই পেটভাতের ভাবনা দেখা দিয়েছে—নতুন ধান উঠতে না উঠতেই! মা'র লক্ষ্মীর ঝাঁপির সিঁদুরমাখা শেষ টাকাটা পর্যন্ত গেছে—হয়তো গরু বিক্রী করে সামান্য কিছু পাঠানো যাবে।

লিখে দিলাম গরু বেচতে হবে না, আমিই যেমন করে পারি যোগাড় করব।

কিন্তু কোথায় যোগাড় করব? স্টুডেন্ট্স্ এইড্ ফাণ্ড থেকে পনেরো

টাকা সাহায্য দিলে। তারপর ?

সরকার-কর্তা আমায় ডেকে পাঠালে। বললে, পরীক্ষার ফীয়ের জন্যে ভাবনা কি—আমিই পঞ্চাশ টাকা দেব তোমায়।

এত দয়া !

স্যার, এতদিনে বুঝেছি, দয়া শুধু দয়াই নয় ; ওর পেছনে আর একটা ভয়ঙ্কর দাবি থাকে। পৃথিবীতে দয়ার দাম দিতে হয় সাংঘাতিক ভাবে।

ফী দেওয়া হয়ে গেল। তারপর—তারপর এই দু-মাস ধরে দয়ার ঋণ শোধ করেছি।

বিশ্বাস করবেন স্যার ? অঙ্ক-ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি-বাংলা-ইংরাজি কিছু পড়তে পারিনি। পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে রাত জেগে জেগে, ছিঁড়ে পড়া চোখ আর মাথায় বিশ মণ পাথরের ভার নিয়ে আমি সরকার-কর্তার খাতা তৈরি করেছি।

কিসের খাতা ? ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার খাতা। গোপন খাতা। পঞ্চাশ টাকার দায় প্রত্যেকটি স্নায়ু দিয়ে, প্রতি বিন্দু রক্ত দিয়ে আমার মেটাতে হয়েছে। এর পরেও পড়ব ? আমি তো অতি-মানুষ নই !

তবু পরীক্ষা দিতে এসেছিলাম। তবু আশা ছাড়িনি। ভেবেছিলাম একটা মির‍্যাক্‌ল ঘটে যাবে ; বই চুরি করে হাত পাকিয়েছি, নকল করবার জন্যে বইয়ের পাতাও ছিঁড়ে এনেছিলাম, কিন্তু মির‍্যাক্‌ল তো ঘটল না ! জামার তলা থেকে কিছুতেই এক টুকরো কাগজ আমি বার করতে পারলাম না। ফার্স্ট পেপার, সেকেন্ড্ পেপার, থার্ড পেপার—আমার চোখের সামনে সব নেচে বেড়াতে লাগল। শুধু সরকার কোম্পানির জাল হিসাবের খাতা ঘুরপাক খেতে লাগল মাথার ভেতর, প্রত্যেক ছাত্র আর ইন্‌ভিজিলেটারের মুখ এক-একটা জমা-খরচের পাতার মতো দেখালো।

এই বাংলার খাতা। আমার শেষ খাতা।

স্যার, ওয়ার্নিং পড়ল। আর পাঁচ মিনিট পরেই খাতা কেড়ে নেবে। আমার কথাও শেষ হয়ে এল। আজ সন্ধ্যের পরেই যে-কোনো একটা ট্রেনের চাকার তলায় আমার সব মনের ভার নামিয়ে দেব।

আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম স্যার—আমি স্বাধীনকুমার, স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্যে বাঁচতে চেয়েছিলাম ; কেন আমি বাঁচতে পারলাম না, আমার মতো হাজার হাজার ছাত্রের পক্ষ থেকে সেই প্রশ্ন আপনার কাছে রেখে গেলাম। জবাবটা আপনি ভেবে দেখবেন।

কাপুরুষের মতো আত্মহত্যা করছি ? না স্যার—না। এ আমার পরাজয় নয়—আমার প্রতিবাদ। বেয়াল্লিশের সেপ্টেম্বরে এক প্রলয়ের রাত্রে আমার বাবা দেশের মাটিতে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। আমার রক্তও দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে তেমনি একটা ইতিহাসের সূচনা রেখে যাবে। সে ইতিহাস কবে গড়ে উঠবে আমি জানি না। আপনি জানেন স্যার, আপনি বলতে পারেন ? প্রণাম।

কাণ্ডারী

জীপটা চালাচ্ছিল অখিল ঘোষ নিজেই। আজকে গাড়িটা তার নিজেরই চালাবার দরকার ছিল।

পাহাড়ের এই পথটুকু বেশী নয়—সব মিলিয়ে হয়তো মাইল কুড়িক হবে। কিন্তু এই বিশ মাইল পথের প্রতিটি ইঞ্চিতে সতর্ক থাকতে হয় ড্রাইভারকে। একশো দেড়শো গজ দূর দূরেই ইংরেজী 'জেড্' হরফের মত এক-একটা ভয়ংকর বাঁক। সে বাঁকের মুখে সামান্য অসাবধান হলেই মৃত্যু। অবধারিত মৃত্যু।

এক দিকে রুক্ষ জংলা পাহাড়—তার বুক চিরে লক্ষ্মীছাড়া ঝরনা। সে সব ঝরনার অধিকাংশেরই জল অস্বাস্থ্যকর—এক অঞ্জলি খেলেই হিল-ডাইরিয়া। পাহাড়ের গা বেয়ে বুনো কলার ঝাড় আর ফার্নের ঝোপ। রাস্তার আর এক দিকে চার-পাঁচ-ছ'শো ফুট সোজা খাদ—কলাবনের ভেতর দিয়ে অনেক নীচে নদীর সাদা জল থেকে থেকে চিকচিক করে উঠছে।

অখিল ঘোষ ভাবছিল, যা করবার সে এখনই করতে পারে। এই মুহূর্তে।

কী আর হবে? একখানা জীপ গাড়ি পাথরে পাথরে গোটা কয়েক ডিগবাজি খেয়ে পাঁচশো ফুট নীচে আছড়ে পড়বে। ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকবে তিনটে মৃতদেহ—তিনটে রক্তাক্ত অবয়বহীন মাংসের পিণ্ড। হয়তো দুর্গম পাহাড়ী জঙ্গলের ভেতরে সে অপঘাতের খবর লোকে জানতেও পারবে না। শুধু টের পাবে তারা, যাদের চোখের দূরবীক্ষণী দৃষ্টিতে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম শবও এড়িয়ে যায় না। শেষকৃত্য করবার দায়িত্ব নেবে তারাই। শকুনেরা।

অখিল ঘোষ জানে, তার স্ত্রী অলকা তাকে কোনোদিন ভালবাসেনি। আটচল্লিশ বছর বয়সে তেইশ বছরের অলকাকে বিয়ে করবার সময়েই এ কথা তার ভাবা উচিত ছিল। আরও ভাবা উচিত ছিল, উজ্জ্বল সুশ্রী সঞ্চারিণী লতার মত অলকার পাশে সে কী বীভৎস রকমের রসাভাস! আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে সুপুরুষ ভাববার মত মোহগ্রস্ত হওয়ার জন্যেও যে সামান্য উপকরণটুকু দরকার—অখিল ঘোষ তা থেকেও নির্মমভাবে বঞ্চিত। গায়ের রঙ নিগ্রোর মত কালো, চ্যাপটা ঠোঁট, চোখ দুটো সাদা মার্বেলের মতো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে—তাদের ওপর লাল লাল কয়েকটা শিরা। এককালে ভালো ফুটবল খেলত—এখন পেটে চর্বি জমে সারা শরীরটাই ফুটবলের মতো গোল হয়ে গেছে। আই. এ. ক্লাসে তিনবার ফেল করে সে সরস্বতীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল। অলকা মদ খাওয়াটাকে ঘৃণা করে; অথচ সপ্তাহে অন্তত তিন দিন ক্লাব থেকে মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরে অখিল ঘোষ।

অলকা তাকে ভালোবাসে নি। ভালোবাসে না। কোন কারণ নেই

ভালবাসার।

তবে বিয়ে করেছিল কেন? নিজে করে নি—তার গরিব বাপ বিয়ে দিয়েছিল। আড়াই বছর আগেকার সব কিছু মনে আছে অখিল ঘোষের—এতটুকু ভোলে নি। মনে আছে: শুভদৃষ্টির সময়ে অলকা প্রথম দেখেছিল তাকে, আর সঙ্গে সঙ্গেই আতঙ্কে চোখ বুজে কাঠ হয়ে বসেছিল। ফুলশয্যার রাতেও চোখ আর সে খোলে নি। আদরে সোহাগে একটুকরো কাঠের ভেতরে প্রাণসঞ্চার করবার পণ্ডশ্রম করেছিল অখিল ঘোষ।

সেই দিন থেকেই অখিল ঘোষ সব জানত। দুইয়ের পরে তিন। তিনের পর চার। সমস্ত পর পর সাজানো। ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ নেই।

কী আছে তার? টাকা। কাঠের ব্যবসা, চায়ের ব্রোকারি। বাড়ি, গাড়ি। দিলদরিয়া খরচ। সেদিনও অলকাকে একটা হীরের আংটি এনে দিয়েছে কলকাতা থেকে—তার দাম চার হাজার টাকা।

দিতে হয়, তাই দেওয়া। হয়তো একটা ক্ষীণ আশাও থাকে: অলকা খুশী হবে, তার কুৎসিত মুখটা হয়তো কিছুক্ষণের জন্যেও তত আর বীভৎস বোধ হবে না অলকার। কিন্তু তার পরেই মনে হয়, এ অপব্যয়ের কোন দরকার ছিল না। টাকা দিয়ে পেশাদারী প্রেম কিনতে পাওয়া যায়; হয়তো কুরূপ কুশ্রীতা সত্ত্বেও সুন্দরী পরস্ত্রীর অনুগ্রহদৃষ্টি লাভ করা চলে, কিন্তু নিজের স্ত্রীকে জয় করা যায় না।

সংসারে নিজের স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়া বোধ হয় সব চাইতে কঠিন। অভ্যাসের মধ্য দিয়ে পরস্পরকে স্বীকার করে নেওয়া যায়—চুক্তি করা চলে। কিন্তু সেই আশ্চর্য জিনিস? যা আলোর মতো—স্পষ্ট কোন রূপ নেই অথচ যার জ্যোতির্ময় ব্যাপ্তি; যা শান্ত অন্ধকারের মতো—যার শীতল বিশ্রামের ভেতরে সমস্ত স্নায়ুগুলো গভীর শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তে চায়? অনিচ্ছুক দাম্পত্য জীবনের ভেতরে তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?

অখিল ঘোষ আর একটা বিপজ্জনক 'জেড্' পার হল। কাল রাত্রে জোরালো বৃষ্টি হয়েছে একপসলা—সামনের উঁচু পাহাড়টার নীল কাজল চুড়োর ওপরে বকের ছেঁড়া ছেঁড়া পালকের মতো কয়েক টুকরো মেঘ থমকে আছে এখনও। কয়েকটা মরা ঝরনা সেই বৃষ্টিতে প্রাণ পেয়েছে—ফার্নের ঝোপের ভেতর দিয়ে দু-একটা জলের ধারা পথটার ওপরে আছড়ে পড়েছে। চাকার তলা থেকে দু ধারে তীরের মত জল ঠিকরে গেল একরাশ।

পেছন থেকে প্রতাপের গলা শোনা গেল: আর কতটা রাস্তা অখিলদা?

—আরও পাঁচ মাইল।—অখিল ঘোষ সংক্ষেপে জবাব দিল।

—একটা সিগারেট দেব?

—দে।

প্রতাপ সিগারেট এগিয়ে দিল, পেছনে বাঁ হাত বাড়িয়ে সেটা এনে ঠোঁটে লাগাল অখিল। গাড়ি আস্তে আস্তেই চলছিল, স্পীড্ আরও কমে এল।

সীট্ ছেড়ে উঠে সামনে ঝুঁকে পড়ে প্রতাপ লাইটার জেবলে ধরল অখিলের মুখের সামনে। গাড়ি চলল।

বাইরের কুয়াশা-মেশানো হাওয়ায় সিগারেটের ধোঁয়া ছড়িয়ে দিতে দিতে অখিল ঘোষ ভাবতে লাগল, অনেকদিন আগে সে একটা গোয়েন্দা উপন্যাস পড়েছিল। তাতে খুনী একটা সিগারেট খেতে দিয়েছিল তার বন্ধুকে। সেই সিগারেটের তামাকের মধ্যে কী যেন বিষাক্ত জিনিস মেশানো ছিল—দুটো টান দিয়েই হার্ট ফেল করেছিল লোকটা। প্রতাপও যদি তাই করে? যদি এই নির্জন পাহাড়ী রাস্তায় এমনই করে পথের কাঁটা সরিয়ে দেয়?

কিন্তু প্রতাপ তা করবে না। এই পথের ওপর, হঠাৎ যদি স্টিয়ারিং ছেড়ে দিয়ে অখিল ঘোষ এলিয়ে পড়ে—তারপর গাড়ির অবস্থা কী হবে সেটা অনুমান করা কষ্ট নয়। পাঁচশো বা ছ'শো ফুট নীচে তিনটে পিন্ডাকার মাংসপিন্ড। তাদের খবর কেউ জানবে না হয়তো—হয়তো বহুদিন পরে অনেক খুঁজে ভাঙা মোটরটার ধ্বংসশেষ আবিষ্কার করবে কেউ। আর তাদের শেষকৃত্য করবে—আকাশের অনেক ওপরে কয়েকটা কালো কালো রেখার মতো যাদের ডানাগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে, শকুনের পাল। অখিল ঘোষের মৃত্যু হয়তো কামনা করতে পারে প্রতাপ। কিন্তু নিজের নয়। আরও বিশেষ করে অলকা যখন তারই পাশে বসে আছে। এখন পৃথিবীটাকে বেশী ভালো লাগছে প্রতাপের। এই শ্রীহীন রুক্ষ পাহাড়কে, বুনো কলার জঙ্গলকে, হলদে-হয়ে-আসা ডোরাদার বাঘের মতো দেখতে কুয়াশা-মাখানো ফার্নের ঝোপকে, কতকগুলো সাদা সাদা সাপের মতো আঁকাবাঁকা ঝরনার রেখাকে, আর কলাবনের ফাঁকে ফাঁকে নীচে নদীর চকিত রুপোলী ঝলককে। আপাততঃ প্রতাপের কাছে পৃথিবীটা দেখবার জন্যে, খুশী হওয়ার জন্যে আর বেঁচে থাকবার জন্যে।

কিন্তু মিথ্যে কেন সে এমনভাবে সন্দেহ করছে প্রতাপকে? অখিল ঘোষ জানে, প্রতাপের মন নির্মল, নিষ্কলঙ্ক। দূর-সম্পর্কের জ্ঞাতিভাই সে—বি. এ. পাস করে বেকার ঘুরছিল কলকাতায়, অখিলই তাকে ডেকে এনে নিজের কাঠের কারখানার ভার দিয়েছে। সুস্থ, স্বাভাবিক, চরিত্রবান ছেলে। অলকার সম্পর্কে কোনও অন্যায় চিন্তা তার মনের কোথাও নেই। প্রতাপের উজ্জ্বল স্বচ্ছ দৃষ্টিতেই তার ভেতরের চেহারা ধরা পড়ে—তাকে চিনতে সময় লাগে না।

তবে কি অলকা?

না, তাও নয়। অলকা অখিল ঘোষকে ভালোবাসে না, কিন্তু তার আত্মমর্যাদা আছে। রুচি আছে, শালীনতা আছে, কর্তব্যের বোধ আছে। প্রতাপের মনে যদি কোথাও পাপ থাকত, তা হলে অলকাই সব চাইতে আগে তাকে বাড়ি থেকে বিদায় করে দিত—অখিল ঘোষের কিছুই করবার দরকার হত না। অখিলকে যে চোখেই দেখুক, বাঙালী মেয়ের সংস্কার সম্পূর্ণ মেনে চলে অলকা।

তা হলে ?

তা হলে ? আজকে পাঁচ-ছ মাস ধরে নিজের কাছেই তো এর জবাব খুঁজছে অখিল ঘোষ। বাইরে কোথাও কিছু ঘটছে না—সন্দেহের একটা বুদ্বুদও ফুটে উঠছে না কোথাও। প্রতাপ দেখতে ভালো, বয়েস ত্রিশের নীচে, মিষ্টি গানের গলা আর চমৎকার টেনিস খেলতে পারে। তার অপরাধের সীমা ওই পর্যন্ত। অখিলকে সে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, অখিলের ওপর তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। আর অলকা ? দেবরকে যতটুকু স্নেহ আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে, ঠিক ততটুকুই দেয়, এক কণা—এক বিন্দু কিছু বেশী দেয় না তার চাইতে।

সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা সেখানেই। সন্দেহ করতে পারলে আত্মদহন ছিল, আত্মতৃপ্তিও ছিল সেই সঙ্গে। একটা তুচ্ছতম উপলক্ষ পেলেও নিজেকে ভয়ংকর মূর্তিতে সে প্রকাশ করতে পারত—এক মুহূর্তে অলকার কাছে প্রমাণ করতে পারত, আর কিছু না থাকলেও তার একটা পৌরুষ আছে, যা আদিম, যা অবিশ্বাস্য রকমের নিষ্ঠুর।

কিন্তু কোন উপায় নেই। অলকার কাছে নিজেকে কোন মহিমান্বিতরূপে উপস্থিত করবার উপায় নেই তার। হেরে যাচ্ছে সে। মিনিটে মিনিটে, ঘণ্টায় ঘণ্টায়, দিনের পর দিন। প্রতাপকে অলকা কখনও ভালোবাসবে না—কিন্তু প্রতাপের পাশে পাশে নিজের অজ্ঞাতেই সে তিলে তিলে মিলিয়ে নিচ্ছে অখিলকে। চেহারায়, কালচারে, বয়সের তারতম্যে। অলকা তাকে এতদিন ভালোবাসে নি, কিন্তু এইবারে ঘৃণা করতে শুরু করছে।

কী করে টের পেল ? বাইরের ব্যবহারে ? না। অলকার কোনো চাল-চলনে ? না। তবু টের পেয়েছে অখিল ঘোষ—একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সে খবর তার মনের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছে। যেমন করে একটা আশ্চর্য মানসিক শক্তিতে সে শেয়ারের বাজারের তেজী-মন্দীর পূর্বাভাস বুঝতে পারে, যেমনভাবে জঙ্গলে শিকারে গিয়ে গন্ধ পাওয়ার আগেই জানতে পারে কাছা-কাছি কোথাও বাঘ আছে।

আজকে বেড়াতে বেরুনোটা উপলক্ষ মাত্র। কাল ক্লাবে সে বেয়াড়া পরিমাণে হুইস্কি খেয়েছিল, ফিরেছিল রাত এগারোটায়। আবছা আবছা মনে আছে, অলকা তাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল শোবার ঘরে। অলকার ছোঁয়াটা কাল রাত্রে তার সর্বাঙ্গে কেমন যেন শীতলতার স্রোত বইয়ে দিয়েছিল। নেশার ঘোরে সারা রাত সে খেয়াল রেখেছিল, অলকা নয়—একটা কঙ্কাল তার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

যন্ত্রণা। কী অর্থহীন অথচ কী অসহ্য যন্ত্রণা! শুধু কালকের রাত নয়—সারাটা জীবন এমনিভাবে একটা কঙ্কালের ঠাণ্ডা আঙুল আঁকড়ে ধরে সে এগিয়ে চলবে। মাংস নয়, রক্ত নয়, প্রাণের উত্তাপ নয়—একটা শীতল হাড়ের পাঁজা ছাড়া আর কিছুই পাবে না অখিল ঘোষ।

কিছুই না।

একটা কাজ করা যায় এক্ষুনি। গাড়িটাকে এক পাশে একটু সরিয়ে দিলেই হয়। তারপর শকুনের দূরবীক্ষণে তিনটে বিকৃত পিণ্ডাকার শরীর। পৃথিবীর সমাপ্তি। চিরকালের অন্ধকার। হয়তো খেয়ালের ঝোঁকে গাড়ি নিয়ে বেরুবার সময় এই সাংঘাতিক কল্পনাটাই মনের তলায় তার বইছিল অন্তঃশীলা হয়ে।

কিন্তু ভালো ড্রাইভার অখিল ঘোষ তা পারে না। ইচ্ছে করলেও পারে না। তার নিপুণ অভ্যস্ত হাত মনের শাসন মানবে না। গাড়িটাকে নীচে আছড়ে ফেলবার চেষ্টা সত্ত্বেও সে পরক্ষণেই সেটাকে নিখুঁত শিল্পীর মতো সামলে নেবে। সেখানে আর একজন অখিল ঘোষ এসে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেবে তাকে, দখল করে নেবে স্টিয়ারিং—সেই অখিল ঘোষ এসে তার জায়গা দখল করে বসবে, পঁচিশ বছর গাড়ি চালিয়ে যে কোনোদিন একটাও অ্যাক্সিডেণ্ট্ ঘটায় নি।

খাড়া দেওয়ালের মতো পাশেই বিশাল একশিলা গ্রানিট্। তার গা বেয়ে বসুধারার মতো একটা বড় ঝরনার অসংখ্য ধারা নামছে। গাড়িটা থামাল অখিল ঘোষ।

—কী হল দাদা?—প্রতাপের প্রশ্ন।

—জল নিতে হবে। গাড়ি গরম হয়ে গেছে।

অখিল নেমে পড়ল। খালি একটা মবিলের টিন বের করে নিলে গাড়ি থেকে।

প্রতাপও নেমে এসেছিল। সিগারেট-কেস আর লাইটার এগিয়ে দিলে অখিলকে।

—তুমি একটা সিগারেট টানো ততক্ষণ। আমি জল দিচ্ছি এঞ্জিনে।

টিনটা তুলে নিয়ে প্রতাপ এগিয়ে গেল ঝরনার দিকে।

এতক্ষণ পরে গাড়ি থেকে অলকাও নেমে এসেছে। যেন কয়েক শতাব্দী পরে তার গলার আওয়াজ শুনতে পেল অখিল।

—উঃ কী ভয়ানক পথ! বুকে কাঁপুনি ধরে যায় বাপু।

—শুধু ভয়ানকটাই দেখলে?—অখিল অলকার মুখের দিকে সকালের পর এই প্রথম চোখ তুলে তাকাল: এর রূপটা দেখতে পেলে না?

—সে প্রথম প্রথম এক রকম লাগত। এখন ভারি অস্বস্তি হয়। একটু এদিক-ওদিক হলেই আর দেখতে হবে না। সোজা নীচে।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে কপাল কোঁচকাল অখিল।

—বেশী কী আর হবে? সবাই মিলে চমৎকার মরতে পারব একসঙ্গে।

—কী কথার শ্রী! খামোকা মরতে যাব কেন বেঘোরে?

সিগারেটের ধোঁয়া একটা ধাক্কা মারল অখিল ঘোষের গলায়। খক খক করে বিশ্রী কাশি এল খানিকটা। কাশি সামলে নিয়ে অখিল বলল, মরতে তোমার ইচ্ছে করে না?

—একেবারেই না। ওসব বাজে রোমান্স আমার নেই।

—রোমান্স ? অখিল ঘোষের কপালটা আবার কুঁচকে এল ঃ মরে যাওয়ার মতো কোনও গভীর দুঃখ কখনও অনুভব করো না তুমি ? কোনদিনই না ?

তুলির টানে আঁকার মতো নিখুঁত সুন্দর ভুরু দুটোকে একসঙ্গে জুড়ল অলকা ঃ ব্যাপার কী বল তো ? কালকের নেশার ঘোর তোমার এখনও কাটে নি নাকি ? ক্লাবে থিয়েটারের পার্ট নিয়েছ ?

অখিল থমকে গেল। অনেকগুলো কথা মুখে এসেছিল, হঠাৎ কেমন বাধা পড়ল তার ওপর। অদ্ভুত রকমের শুভ্র মনে হল অলকাকে—যার ওপরে কালির একটা আঁচড় টেনে দিতেও সাহস হয় না।

টিনে জল ভরে ফিরে এল প্রতাপ। অলকার কথার শেষ টুকরোটা কানে গিয়েছিল।

—ব্যাপার কী বউদি ? ঝগড়া বাধিয়েছ নাকি অখিলদার সঙ্গে ?

মনের ভেতরে চাপা যন্ত্রণাটাকে লেহন করতে করতে অস্বচ্ছ হাসি হাসল অখিল। গাড়ির বনেট্‌টা খুলতে খুলতে বলল, ঝগড়া নয় ব্রাদার। তরুণী ভার্যার সঙ্গে বৃদ্ধ স্বামীর রসালাপ চলছিল!

অলকা মুখভঙ্গি করল।

—আহা-হা, কী রসিকতা! সত্যযুগের হিউমার!

প্রতাপ কলকণ্ঠে হেসে উঠল। বলল, তোমাকে কে বুড়ো বলে দাদা ? পঞ্চাশে পা দিয়েও তুমি মিস্টার এভারগ্রীন।

—কিংবা এভারব্ল্যাক।—অলকা জুড়ে দিল।

এভারব্ল্যাক। একটা পিনের খোঁচা এসে লাগল। এ রসিকতাটা সত্যযুগের নয়, কিন্তু একেবারে নির্দোষ। তবু নিজের কথা মনে পড়ে গেল অখিল ঘোষের। তার গায়ের রঙ কালো—নিগ্রোর মতো কালো। আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজের সম্পর্কে এতটুকু মোহগ্রস্ত হওয়ারও কারণ ঘটে না।

তৃষ্ণার্ত এঞ্জিনে জল ঢালা শেষ করে প্রতাপ কথাটার মোড় ঘুরিয়ে দিল। বলল, এভারব্ল্যাকই বটে। আশী বছর বয়সেও দাদার মাথার একটা চুলও পাকবে না, তুমি দেখে নিয়ো বউদি।

বনেট্‌ বন্ধ করে অখিল গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল, প্রতাপ বাধা দিল।

—তুমি একটু জিরোও অখিলদা। আর মাইল তিনেক তো ? আমি চালাচ্ছি।

অলকা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

—তুমি পারবে ঠাকুরপো ? এই রাস্তায় ?

—দাদার শিষ্য আমি—পাকা ট্রেনিং আমার। কোনও ভয় নেই বউদি। বিদ্যেটা যাচাই হয়ে যাক একবার।

গাড়ি চলল।

প্রতাপই চালাচ্ছে। পেছনের সীটে পাশাপাশি চুপ করে বসে আছে অখিল আর অলকা। অলকার মৃদু প্রসাধনের গন্ধ পাচ্ছে অখিল, নিজের কালো রোমশ হাতটার পাশে অলকার নিটোল সাদা আঙুলগুলোকে কেমন অবিশ্বাস্য

রকমের অপরিচিত আর সুন্দর বলে মনে হচ্ছে। কালকের নেশার ঘোরটা এখনও যেন ভালো করে কাটে নি। চন্দ্রবোড়া সাপের মন্থর বিষক্রিয়ার মতো একটা চাপা যন্ত্রণা তার রক্তের ভেতর সঞ্চারিত হয়ে ফিরছে, অলকার সাদা আঙুলগুলোকে কঙ্কালের আঙুলের মতো দেখাচ্ছে। অখিল ঘোষ চমকে উঠল। মুখের দিকে সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে প্রায় ঠোঁট পর্যন্ত এসে ছুঁয়েছে তার। সিগারেটটাকে বাইরে ছুঁড়ে দিল, একটা ধনুরেখায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে সেটা পাহাড়ের খাদে কলাবনের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

অলকা তাকিয়ে ছিল বাইরের দিকে। কী দেখছিল, কী ভাবছিল সে-ই জানে। হঠাৎ তার তীক্ষ্ন চিৎকারে কানে তালা ধরে গেল অখিলের। পরক্ষণেই বিশ্রীরকমের ঝাঁকানি দিয়ে জীপ থমকে গেল, কাত হয়ে আটকে গেল ডান দিকের পাহাড়ের গায়ে। বাঁ পাশে থাকলে এই মুহূর্তে সোজা রসাতলে গিয়ে নামত।

সেই ভয়ঙ্কর একটা 'জেডে'র মাঝামাঝি। উল্টো দিক থেকে চায়ের বাক্স বোঝাই প্রকাণ্ড একটা লরি এসে পড়েছে। সেটাও থেমে দাঁড়িয়েছে, তার দৈত্যের মত এঞ্জিনটা যেন হিংস্র ক্রোধে থরথর করে কাঁপছে। লরির নেপালী ড্রাইভার মাতৃভাষায় চিৎকার করে উঠল।

—কেমন গাড়ি চালাচ্ছ বেকুব কোথাকার? আমার হর্ন শোন নি—নিজে একটা হর্ন দিতে পার নি? এখুনি যে ছাতু হয়ে যেতে, সে খেয়াল আছে?

প্রতাপ কাতরভাবে কী বলতে চেষ্টা করল, তার আগেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠল অলকা। গলার স্বরে তখনও মৃত্যুভয় রেশের মতো কাঁপছে।

—তখুনি বলেছিলুম, ও আনাড়ীর হাতে গাড়ি দিয়ো না। খালি টেনিস খেলতে পারলে আর আর গান গাইলেই কি সব পারা যায় সংসারে? ও যার কাজ তার হাতেই দাও ঠাকুরপো।

আজকে সকাল থেকে এই তৃতীয়বার অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল অখিল ঘোষ। আকস্মিক ব্রেক-কষার এই প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে, মৃত্যুর একটা ঝট্‌কা টানে হঠাৎ যেন তার নেশা কেটে গেছে—হঠাৎ চোখের ওপর ছানির মতো কী যেন সরে গেছে তার।

মাথা নীচু করে প্রতাপ নেমে এল স্টিয়ারিং ছেড়ে।

অলকা তার সাদা নরম আঙুলে অখিলের কালো মোটা হাতটা চেপে ধরল।

—তুমি ছাড়া কাউকে আমার ভরসা নেই—কারুকে বিশ্বাস নেই। তুমিই গাড়ি চালাও, তোমার হাতে স্টিয়ারিং থাকলে কোনও পথকেই আমার ভয় করে না।

ছানি-সরে-যাওয়া, নেশা-কেটে-যাওয়া চোখ মেলে এবার অখিল ঘোষ যেন নতুন করে দেখল অলকাকে। এই যন্ত্রণার তিন মাস পরে নয়, পুরো আড়াই বছর পরে। নতুন বিয়ের বাসরে—নতুন শুভদৃষ্টিতে।

মেঘলা পাহাড়ের মাথায় একটুকরো লাল আলো জ্বলে উঠেছে এতক্ষণে,

সূর্য মুখ খুলছে। অলকার হাতে একটা চাপ দিয়ে অখিল ঘোষ বলল, ঠিক কথা। গাড়িটা আমিই চালাব।

একজিবিশন

—'শুনুন, আমার জন্যেও টিকেট কিনবেন একখানা।'

বসন্ত শুনেছিল ঠিকই, কিন্তু কথাটার লক্ষ্য যে সে-ই, সেইটেই অনুমান করতে পারেনি। একে তো এখানে সে এসেছে মাত্র দিন-চারেক, আস্তানা নিয়েছে একটা হোটেলে, তার ওপর নতুন জায়গায় এ পর্যন্ত একটি মানুষের সঙ্গেও তার আলাপ হয়নি। সুতরাং মেয়েলী গলায় পেছন থেকে কেউ তাকে এমনভাবে অনুরোধ জানাতে পারে—বসন্ত তা অনুমানও করেনি।

কিন্তু এবারে আলতো হাতের ছোঁয়া লাগল গায়ে। চমকে মুখ ফেরালো বসন্ত।

কুড়ি থেকে পঁচিশ পর্যন্ত যে-কোনো বয়সের একটি মেয়ে। কাঁধ পর্যন্ত ফাঁপানো রুক্ষ চুল। তুলির সূক্ষ্ম রেখায় আঁকা ভ্রু, মুখে কড়া প্রসাধন। গলায় লাল 'বীডে'র মালা। নাইলনের স্বচ্ছ শাড়ি গায়ের ওপর থেকে পিছলে পড়তে চাইছে।

ভীত মৃদু গলায় মেয়েটি আবার বললে, 'দয়া করে একটা টিকেট নেবেন আমার জন্যেও।'

—'আচ্ছা, নিচ্ছি'—বলেই মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করলে বসন্ত। কিন্তু মেয়েটি হাতব্যাগ খুলল না। একটু বিভ্রান্ত হল বসন্ত, লজ্জিতও। মাত্র চার আনা পয়সার জন্যে—ছিঃ ছিঃ।

দুখানাই টিকেট কিনে কাউন্টার থেকে সরে এসে সে মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে দিলে একখানা। তবুও ব্যাগ খুলল না মেয়েটি, টিকেটও নিলে না। বললে, 'চলুন না, একসঙ্গেই ভেতরে যাই।'

বসন্ত ভালো করে তাকিয়ে দেখল এবার। জিজ্ঞাসা মিটে গেছে। মেয়েটি যেন হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প, শঙ্কিতভাবে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক। ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল বসন্তর ঠোঁটের কোণায়।

—'চলুন না ভেতরে, কী হবে বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে?'—আবার আলগা ছোঁয়া লাগল বসন্তের বাহুতে।

ঠিক এইটেই যেন আশা করেছিল বসন্ত। একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল, নামিয়ে ফেলল ঠোঁট থেকে। তারপর বললে, 'আচ্ছা চলুন।'

গেট পেরুতেই ইলেকট্রিকে আর নিঅন টিউবে ঝলমলে সোডা ফাউন্টেন। তারপরেই গোটাকয়েক গাছের ছায়ার দ্বীপ—চারদিকের অসংখ্য স্টল, অস্বাভাবিক আলো আর অগণ্য মানুষের ভিড়ের মাঝখানে একটুকরো

প্রায়ান্ধকার। ইচ্ছে করেই হয়তো কর্তৃপক্ষ আলো দেয়নি এখানে, লোকে দু-এক মিনিটের জন্যে জ্বালাধরা চোখকে জুড়িয়ে নেবে—চুরুট, প্রসাধন, ভাজা মাংস আর নতুন বার্নিশের গন্ধে জর্জরিত স্নায়ুগুলোকে তৃপ্ত করে নেবে ঠাণ্ডা মাটি আর কচি পাতার সুঘ্রাণে।

এই পর্যন্ত এসে বসন্ত মেয়েটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়েটিও দাঁড়ালো। দশ-বারোজন লোকের একটা মস্ত বড় দল পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার পর, আবছা আলোয় আশ্চর্য শীর্ণ আর সংকুচিত মেয়েটিকে সে পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'পুলিসে তাড়া করেছিল ?'

জবাব এল না। আরো আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি।

—'গেট তো পার করে দিয়েছি। এবার আমাকে ছাড়ো দয়া করে।' বলেই পা বাড়ালো বসন্ত।

—'শুনুন ?'

আবার ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নামিয়ে ফেলে অসীম বিরক্তিতে বসন্ত ঘুরে দাঁড়ালো।

—'কি হয়েছে, জ্বালাচ্ছ কেন ফের ?'—গলার স্বরে একরাশ ঘৃণা মিশিয়ে বললে, 'তুমি ভুল লোককে ধরেছ, আমি তোমার শিকার নই।'

—'এক মিনিট দাঁড়াতেও পারেন না ?'

গলার আওয়াজটা এবার তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট। বসন্ত ভুরু কোঁচকালো।

—'ও, বুঝেছি।'—ব্যাগ খুলে পাঁচ টাকার নোট বের করল একটা। বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'এই নাও—এবার মুক্তি দাও আমাকে।'

—'আমি ভিখিরি ?'—মেয়েটার তুলি আঁকা ভ্রূ বসন্তের চাইতেও সংকুচিত হল, কালি পড়া চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠল একবার। তারপর বললে, 'অনেক উপকার করেছেন আমার, আর দরকার নেই। ধন্যবাদ।'

একটা কুৎসিত গাল দেবার প্রলোভন অনেক কষ্টে সম্বরণ করল বসন্ত। মেয়েটার দিকে একবারও আর না তাকিয়ে সোজা হেঁটে চলল স্টলগুলোর দিকে। আপদের শান্তি হল।

কোথায় যাওয়া যায় ?

যাওয়ার জায়গা অনেক। প্রথমেই সোডা ফাউন্টেনে ঢুকে একটা কোল্ড্ ড্রিঙ্কে ভিজিয়ে নেওয়া যায় গলাটা। কিছুক্ষণ বসে বসে ভাবা যায় কিছু কিনবে কিনা কিংবা কিনবার মতো কিছু আছে কিনা। আর কিছু না হোক, ফেনিল পানীয়ের ভেতর স্ট্রটা দিয়ে পাঁচ দশ মিনিট খেলাও করা যেতে পারে বসে বসে।

তাই করল।

ভিড়, দারুণ ভিড়। ভ্যানিলা, কোকাকোলা, প্রসাধন, হেয়ার-ক্রীম, সিগারের গন্ধ। পুরুষের মোটা গলার হাসি, মেয়েদের জলতরঙ্গ। শাড়ী, সুট, সালোয়ার, চোস্ত-চুড়িদারের সমারোহ।

একটা লেমন স্কোয়াশ সামনে নিয়ে প্রত্যেকের মুখগুলোকে আলাদা আলাদা করে দেখতে চাইল বসন্ত। নিঅনের কড়া সাদা আলোয়, ঝিলিমিলি কাচে, পানীয়-বাহিনী বিদেশিনীর স্থূল ছবিতে চড়া রঙের ওয়ালপেপারে প্রত্যেকটা লোককে তার অস্বাভাবিক বলে মনে হল। একটা বাঁকা আয়নার ভেতরে যেন সকলকে দেখতে পাচ্ছে সে—মেয়েদের রঙীন ঠোঁট চিড়িয়াখানায় দেখা বাঘকে স্মরণ করিয়ে দেয়, পুরুষের ভারী ভারী মুখের পেশীগুলোর নড়াচড়া জাবর-কাটা ষাঁড়ের উপমা মনে আনে। এই ভাবেই ইম্‌প্রেশনিস্টিক হয় নাকি মানুষ?

লেমন স্কোয়াশটা বড্ড বেশি টক লাগছিল, আর একটু সোডা চাইলে হত। কিন্তু সোডা চাইতে গিয়েও অন্যমনস্ক হয়ে গেল। মেয়েদের ঠোঁটগুলোকে বাঘের মতো মনে হওয়ার কারণ আছে। একটু আগেই বাঘিনীর পাল্লায় পড়েছিল। যথাসময়ে সতর্ক না হলে জাবর-কাটা ষাঁড়ের দুর্গতি ছিল তারও অদৃষ্টে।

তবু মুক্তির আনন্দে বসন্ত খুব বেশি আত্মপ্রসাদ পেল না। কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধতে লাগল খচ খচ করে।

সেণ্টিমেণ্ট—ছোট্ট একটুকরো সেণ্টিমেণ্ট। বাংলাদেশ থেকে পাঁচশো মাইল দূরের এই শহরে একটি বাঙালীর মেয়ে বাঁচবার জন্যে বীভৎসতম অপমানের পথ বেছে নিয়েছে, এইটেকে কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না। অহেতুক বাঙালী-প্রীতি বসন্তর নেই—ইহুদী-সদুক্তির মতো বঙ্গসন্তান যে ভারতের লবণ, একথাও সে কোনদিন ভাবে না। পাকিস্তানের হিসেব বাদ দিয়ে আন্দাজ কোটি তিনেক বাঙালীর দায়িত্ব নেবার কথাও সে কল্পনা করে না। তবু বসন্তর মনে হল, একটা ছোট্ট কাঁটা কোনমতেই নামতে চাইছে না। মেয়েটি বাঙালী না হলেই ভালো হত।

লেমন স্কোয়াশের আধখানা ঠেলে রেখে পয়সা মিটিয়ে বসন্ত উঠে পড়ল। সিগারেট ধরিয়ে এলোমেলো ভাবে এগিয়ে চলল একজিবিশনের ভেতর।

ভিড়, অসম্ভব ভিড়। কাপড়ের স্টলে, টয় শপে, চায়না সেটের দোকানে, কিউরিয়োতে, এমন কি বইয়ের দোকানে পর্যন্ত। শুধু একটা ছবির দোকানে দাঁড়াবার জায়গা আছে। একবার চোখ পড়তেই বোঝা গেল কারণটা। কলকাতার ওয়েলেসলির একটি ছোট্ট দোকানকে যেন কে এখানে এনে বসিয়ে দিয়েছে অত্যন্ত বেমানান ভাবে। স্টলটি নিয়েছে কোনো ভক্ত ক্রীশ্চান। মেরীর কোলে জ্যোতির্ময় শিশু খ্রীষ্ট থেকে গোলগোথার ক্রসে বেঁধা যন্ত্রণাজর্জর মানুষটি পর্যন্ত কেউ বাদ নেই।

রক্তাক্ত শরীর, ক্রসের ওপর এলিয়ে পড়া মাথা, আধবোজা চোখ, মুখে শিশুর মৃত্যু-কাতরতা—খ্রীষ্টের ছবিটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বসন্ত। কোনো মাস্টার আর্টিস্টের ছবির নকলের নকল, তারও নকল। তবু যন্ত্রণাটা কী বাস্তব—ছবিটা কী জীবন্ত! আশ্চর্য, খ্রীষ্টের ওই ছবিটা মনের সামনে রেখে কিভাবে নরহত্যা করতে পারে ইয়োরোপের মানুষ!

ছোটখাটো চেহারার মাঝবয়েসী স্টলওয়ালা এগিয়ে এল বসন্তর কাছে। শান্ত গলায়, দক্ষিণী ইংরিজী উচ্চারণে জিজ্ঞাসা করল: নেবেন কোনো ছবি? আরো ভালো ভালো জিনিস আছে আমার কাছে।

—না ধন্যবাদ, এমনি দেখছিলুম।

—বেশ বেশ, দেখুন। নেভার মাইন্ড।

স্টলওয়ালা ফিরে আবার তার কাঠের টুলে গিয়ে বসল, পকেট থেকে কালো চামড়ার বাঁধানো একটা বই বের করে পড়তে আরম্ভ করল একমনে। বসন্ত লক্ষ্য করল, সরু কারের সঙ্গে একটা ছোট্ট রুপোর ক্রস ঝুলছে তার বুকের ওপর।

—এই যে, ছবি দেখছেন?

বসন্ত পেছন ফিরল। সেই মেয়েটি।

খ্রীষ্টের এই ছবি, বাইবেলের মধ্যে ডুবে যাওয়া ওই মানুষটি, ম্যাডোনা-ডেলগ্র্যান্ডুকার অমৃতবর্ষিণী চোখ—সব মিলিয়ে চমৎকার একটা ভাবমণ্ডল তৈরি হচ্ছিল বসন্তর মনে। হঠাৎ যেন সুর কেটে গেল, কেমন অশুচি হয়ে উঠল সমস্ত।

—তুমি এখানে এসেও জুটেছ?—একটু আগেকার সহানুভূতি ভুলে গিয়ে চাপা গলায় প্রশ্ন করল।

—কেন—আসতে নেই? একজিবিশনের স্টল তো সকলের জন্যেই।—অদ্ভুত নির্লজ্জ মেয়েটা!

দোকানদার বাংলা বোঝে না জেনেই বসন্ত বললে, না, সব জায়গা সকলের জন্যে নয়। অন্তত যীশুখ্রীষ্টের কাছে তুমি এসে না দাঁড়ালেই ভালো করতে।

—তাই নাকি?—বাঘিনীর রক্ত-ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসল মেয়েটা: খ্রীষ্ট নিজে বোধ হয় অন্য কথা বলতেন।

বসন্ত চমকে উঠল। ঠিক এমনি একটা জবাব সে আশা করেনি।

—হুঁ, বেশ কথা বলতে পারো দেখা যাচ্ছে।—স্টল থেকে বেরিয়ে এল বসন্ত: লেখাপড়াও বোধ হয় কিছু জানো। এ পথে পা দিলে কেন?

মেয়েটিও এসেছিল পেছনে পেছনে। সামনের দোকান থেকে একঝলক নীল আলো তার মুখে এসে পড়েছে। সে আলোয় বসন্ত বাঘিনীকে দেখতে পেল না—অদ্ভুত সুন্দর আর শান্ত দেখালো মেয়েটার চেহারা। বসন্তর জীবনে প্রথম আর শেষ প্রেম নিয়ে যে এসেছিল, বর্ষার এক-একটা ছায়ামন্থর দিনে এমনি দেখাতো তার মুখ।

মুহূর্তের জন্যে কোমল হতে পারত বসন্তর মন, একবার বলে ফেলতে পারত: এ পথ ছেড়ে দিয়ে তুমি নতুন করে বাঁচতে চেষ্টা করো, আমি তোমাকে সাহায্য করব—কিন্তু সে কথা বলবার সুযোগ সে আর পেলো না। তার আগেই মেয়েটা বললে, তা শুনে আপনার লাভ কী? তার চেয়ে সামনে ওই যে নাগরদোলা ঘুরছে—ওইটেতে কিছুক্ষণ চড়বেন আমার সঙ্গে?

আবার—আবার সেই হিংস্র ইচ্ছেটা চাড়া দিয়ে উঠল বসন্তর মাথার মধ্যে। ইচ্ছে করল সোজা ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয় ওর গালে!

—চুলোয় যাও—

একটা চাপা গর্জন করে এগিয়ে গেল বসন্ত। পেছনে মেয়েটার হাসির আওয়াজ। ঠাট্টা করছে। সেই পাঁচ টাকা দিতে চাওয়ার প্রতিশোধ নিচ্ছে এইভাবে।

—উইচ!—

পা চালিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল সে।

আবার ইতস্ততঃ। কোনো লক্ষ্য নেই—কোনো কাজ নেই। অনেক ঘুরে ঘুরে কিনল একটা শৌখিন লাইটার আর চার টাকা দিয়ে একটা বিলিতি টাব সোপ। সাবানটা কেন কিনল সে নিজেই জানে না। কলকাতার বাড়িতে উঠোনের খোলা কলেই তার চিরদিন স্নান করবার অভ্যাস। হয়তো একটা সাবানের দাম চার টাকা—এইটেই তার কৌতূহল জাগিয়েছিল, কিংবা রঙিন মোড়কটাও ভালো লেগে থাকবে।

এক জায়গায় অ্যামপ্লিফায়ারে রক-এন-রোলের হিন্দী সংস্করণ বাজছে। এমনিতেই বস্তুটা তার কুৎসিত লাগে—তার ওপর ওই বোম্বাই রূপান্তর শুনে গা ঘিন ঘিন করে উঠল। আশপাশের কয়েকজন এরই মধ্যেই পা ঠুকছে—একটু পরেই বোধ হয় নাচতে আরম্ভ করবে। সে দুর্ঘটনা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী হল না বসন্ত। ক্যানাডিয়ান শার্ট রক-এন-রোল, হিন্দী সিনেমার পোস্টার "মাদার ইণ্ডিয়া"। তিনটে মিলিয়ে একটা যোগসূত্র। ইমপ্রেশ্যনিজম!

তার চাইতে সামনের ওই ক্লাউনটাই ভালো।

একটা উঁচু টুলের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে। পরনে কালো ডিনার সুট—অবশ্য জরাজীর্ণ। গলায় চড়া সবুজ রঙের একটা বেমামান টাই। মাথায় আধভাঙা শোলা হ্যাট। চিত্র-বিচিত্র মুখ—হাতে টিনের চোঙা। সেই চোঙার ভেতর দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করে লোক ডাকছে।

'দি গ্রেট অরিয়েণ্টাল সার্কাস : টিকেট টু অ্যানাজ—অনলি টু অ্যানাজ—'

সবটা মিলিয়ে বসন্তের মনে হল, অরিয়েণ্টাল সার্কাসই বটে। একটা নয়—অসংখ্য ক্লাউন। আর লায়ন-টাইগারের বিউটি প্যারেড। আর সেই মেয়েটা!

কী আশ্চর্য, কিছুতেই ভুলতে পারছে না! নিজের ওপরেই তার বিরক্তি বোধ হল। সেই বাঙালী সেণ্টিমেণ্ট। কিন্তু কোনো মানে হয়? আরো বিশেষ করে ওই মেয়েটার সম্পর্কে?

দু আনা খরচ করে ঢুকেই পড়বে কিনা ভাবতে ভাবতে আবার সেই রক্-এন-রোল। এখানেও? অসহ্য।

ঘুরতে ঘুরতে নাগরদোলাটার সামনে। পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল, থমকে দাঁড়াল হঠাৎ।

সেই মেয়েটাই।

দোলনাটা থেমে আসছে আস্তে আস্তে। আর একই দোলায় মেয়েটি বসে আছে বাইশ-তেইশ বছরের কাপ্তান চেহারার একটি ছোকরার সঙ্গে। আর দুজনেই হাসছে। হাসছে অশ্লীল খুশীতে। শিকার ধরেছে বাঘিনী।

চলে যেতে গিয়েও পারল না বসন্ত। কোনো কারণ নেই—তবু তার সারা শরীর জ্বালা করে উঠল।

মেয়েটা যদি বাঙালী না হত—

হিংস্র দৃষ্টি মেলে বসন্ত দাঁড়িয়ে রইল।

দোলনা থেকে নামল দুজনে। ছোকরা কী যেন বললে মেয়েটাকে—মেয়েটা মাথা নাড়ল। অর্থাৎ রাজী হল না। ছোকরা একটা শিস্ দিলে, চোখের কুৎসিত ভঙ্গি করলে একবার, তারপর সরে গেল সেখান থেকে।

বসন্ত এগিয়ে গেল এবার।

—শোনো।

এবারে মেয়েটার চমকাবার পালা।

—আপনি?

বসন্তর গায়ে তখনো জ্বলছিল আগুনটা।

—এসো, কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে?—তুলিতে আঁকা ভ্রূদুটো বিস্ময়ে প্রসারিত হয়ে গেল।

অন্য সময় হলে এ ধরনের ছেলেমানুষি বসন্ত ভাবতেও পারত না। কিন্তু এই খেয়াল-খুশির রাত, একজিবিশনের আলো, এই মানুষ আর গন্ধের ভিড়—ওই ছোকরাটা, সব মিলিয়ে কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। তার মনে হল, মেয়েটার জন্যে এখুনি তার কিছু করা উচিত—এই মুহূর্তেই। একেবারে রসাতলে ডুবে যাওয়ার আগেই তার কিছু কর্তব্য আছে।

—এসো—

স্পষ্ট আদেশের সুর। কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে মেয়েটা তাকিয়ে রইল বসন্তর দিকে। তারপর হাসল মৃদু রেখায়।

—চলুন—

—বোসো এইখানে—আবার আদেশ করল বসন্ত।

আলোয় ঝিল্‌মিল করছে ছোট লেকের জলটা। সেই আলোয় রাত্রির ঘুমন্ত পদ্মগুলো যেন থেকে থেকে চমকে উঠছে। অল্প অল্প হাওয়ায় ঝাউয়ের শুকনো ফল ঝরছে জলের ওপর—শিশির পড়ার মতো আওয়াজ হচ্ছে। এখানেও ভিড় খুব বেশি নয়। স্টলের আলোর নেশা কাটিয়ে এখানে আসতে ইচ্ছে করে না সহজে।

তবু দু'চারজন আছে এদিকে ওদিকে। প্রায়ই জোড়ায় জোড়ায়। সিগারেট জ্বলছে, সিগার জ্বলছে। আলোর ঝলক-লাগা জলে চমকে জেগে-ওঠা পদ্মগুলোও যেন ফিস ফিস করে কথা কইছে।

ঝাউ গাছের নীচে, কর্কশ খানিকটা শীর্ণ ঘাসের ওপর বসে পড়ল দুজনেই। ঠিক পাশাপাশি নয়—অনেকখানিই দূরত্ব রাখল বসন্ত।

—কী নাম তোমার?

—কী করবেন শুনে?—আবছা অন্ধকারে আবার সুদূর হয়ে গেছে মেয়েটা। ঠোঁটের রক্তলেখা, কুটিল তীক্ষ্ণ চোখ—কিছুই দেখা যাচ্ছে না এখন।

—বলতে আপত্তি আছে?

—না, নেই। নাম এক সময় চম্পা ছিল। এখন চাঁপা।

চম্পা থেকে চাঁপা। অর্থটা খুব সহজ। ভদ্র জীবনের চিহ্নও রাখব না। সবই যখন বদলেছে, তখন নামটাও 'ভালগার' করে নেওয়াই ভালো। বসন্ত ঠোঁট কামড়ে ধরল।

—বাড়ি কোথায় ছিল তোমার?

—বুঝতেই পারছেন এক সময়ে বাংলাদেশে ছিল। কিন্তু এখানে সে কথা জিজ্ঞেস করে লাভ কী? ··চাঁপা হাসল: একটা সিগারেট খাওয়াবেন?

নির্লজ্জ, বীভৎস রকমের নির্লজ্জ মেয়েটা। বসন্তের মনে হল পণ্ডশ্রম করছে সে। একে উদ্ধার করবার শক্তি দেবতারও নেই।

—দেবেন একটা সিগারেট?

নিঃশব্দে সিগারেট এগিয়ে দিলে বসন্ত, আর দেশলাই। বারুদের স্বল্পায়ু আগুনে আবার বাঘিনীর মুখ দীপিত হল। ঘৃণায় চোখ ফিরিয়ে নিলে বসন্ত।

—লেখাপড়াও তো কিছু জানো বলে মনে হয়। জীবিকার কোনো ভদ্র পথ আর খুঁজে পেলে না? শেষকালে এই নরকের রাস্তায় নেমে এলে?

একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল চাঁপা। হেসেই উঠল খিলখিলিয়ে। অভ্যস্ত, নিষ্ঠুর, জান্তব হাসি।

—আমার জন্যে এত মাথাব্যথা কেন আপনার? প্রেমে পড়ে গেছেন নাকি?

বসন্তর মুখের ওপর চাবুক পড়ল। উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে।

—রাগ করলেন? নির্বিকারভাবে মেয়েটা আবার সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল: প্রেমে যদি নাই পড়বেন, তা হলে আর একজনের সঙ্গে আমাকে ভাব জমাতে দেখে কেন ডেকে আনলেন এখানে? জেলাসি, কী বলেন?

বসন্ত চলে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু গেল না। একটা দানবিক ইচ্ছায় তার মাথার প্রত্যেকটা কোষ আগ্নেয় হয়ে উঠল।

মেয়েটার গলা টিপে ধরে শেষ করে দিলে কেমন হয়?

সাপের মতো তীব্র একটা চাপা গর্জন করে বসন্ত বললে, তোমাকে পুলিসে দেব।

আশ্চর্য দুঃসাহস মেয়েটার, বসন্তর হাত ধরে টানল। শিউরে উঠে হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইল বসন্ত, পারল না। কৌতুক মেশানো গলায় চাঁপা বললে, পারবেন না, পারলে অনেক আগেই পুলিসে দিতেন। কেন রাগ করছেন

ছেলেমানুষের মতো ? বসুন একটুখানি ।

কেন জানে না, বসন্ত আবার বসে পড়ল । হয়তো চাঁপার স্পর্ধার শেষ পর্যন্ত দেখে নিতে চায়, হয়তো সেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে যখন ওর গলা টিপে খুন ক'রে এই লেকের জলের মধ্যে ফেলে দেবে । উত্তেজনায় সে ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে লাগল, আর চাঁপা সিগারেট টেনে চলল নিঃশব্দে ।

শিশির-ঝরার মতো টুপ টুপ করে ঝরছে শুকনো ঝাউয়ের ফল । লেকের কালো জলে আলোর ঝিলিমিলি । ঘুমন্ত পদ্মবন জেগে উঠে এ ওর সঙ্গে ফিসফিসে গলায় কথা কইছে । অনেক দূর থেকে অ্যাম্‌প্লিফায়ারে ভেসে আসছে রক-এন-রোলের সুর । লেক পেরিয়ে বসন্তের দৃষ্টি চলে গেল দূরের দিকে । দুদিকে বাহু মেলে দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সমুন্নত একটা কালো পাহাড়—যেন আকাশ-জোড়া একটা বিশাল ক্রসে এলিয়ে আছে মরণাহত খ্রীষ্টের মূর্তি । কালপুরুষ নেমে এসেছে তার ওপর—যেন কণ্টক মুকুটের রক্তাক্ত বৃত্তরেখা ।

বসন্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ।

চাঁপাই কথা বলল আবার । তারও দৃষ্টি বোধ হয় রাত্রির আকাশে গিয়ে পৌঁছেছিল । একজিবিশনের এই আলোর সীমা ছাড়িয়ে, কেনা-বেচা-লোভ-লালসা-লঘুতার এই সিগার সিগারেট-ধুলো প্রসাধনের পরিবেশ পার হয়ে, সেও ওই দূরের পাহাড়টার একটা গভীর বিশাল অর্থ খুঁজে পেয়েছিল, ওই কালপুরুষের জ্যোতির্বিন্দুগুলো তারও কাছে কিসের একটা ব্যঞ্জনা বহন করে আনছিল । সিগারেটটাকে জলের মধ্যে ফেলে দিয়ে চাঁপা বললে, আমাকে ক্ষমা করবেন, ভারী রাগ হয়েছিল আপনার অহঙ্কার দেখে ।

—অহঙ্কার কখন করলাম ?

—করেননি ? গেটটা পার করে দিলেন, কৃতজ্ঞতা জানাতে যাচ্ছি, যা-তা বলে চলে গেলেন । আবার ভিক্ষে দিতে চাইলেন তার ওপর । রাগ হয় না ?

এবার গলার স্বর অন্য রকম । অভিমানের রেশ ।

—কেন এলাম এই রাস্তায় ? ইচ্ছে করে কেউ আসে ? কাকার সংসারে থাকতাম । দুবার আই-এ ফেল করবার পরে এমন অবস্থা কাকিমা সৃষ্টি করলেন যে গলায় দড়ি দেবার কথা মনে হল । কিন্তু গলায় দড়ি দেওয়ার চাইতে বাড়ি থেকে পালানো সোজা । রূপ ছিল শুনেছি, ভাবলাম বম্বে গিয়ে ফিল্‌মে নামব । নাগপুরেই দুটি সঙ্গী জুটল—তারা নাকি ফিল্‌মেরই লোক । তারপর—

চাঁপা একবার থামল ।

—তারপর পুরো দেড় বছর কাটিয়েছি তাদের হাতে । ফিল্‌মই বটে । প্রতি রাত্রে মাতাল পশুদের সঙ্গে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছি, আর প্রায় দু' মাস ধরে তারা চাবুক মেরে আমাকে অভিনয়ের মহলা শিখিয়েছে । দুর্গের মতো প্রকাণ্ড বাড়ি, চারদিকে পাহারা, তিন-চারটে কুকুর । দেড় বছর পরে যখন পালাবার সুযোগ এল, তখন দেখলাম, নায়িকার পার্টেই আমি

অভ্যস্ত হয়ে গেছি, আর কিছুই আমার করবার নেই।

বসন্ত আবার তাকালো আকাশের দিকে। ক্রুসে বেঁধা খ্রীষ্টের মূর্তি। কাঁটার মুকুটের মতো রক্তাক্ত কালপুরুষ। দুটো ক্ষীণদীপ্ত আলো কখন জ্বলে উঠল পাহাড়ের ওপর? খ্রীষ্টের দুটি করুণাঘন চোখ কি হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল?

বসন্ত আস্তে আস্তে বললে, এখন কি ফেরা যায় না?

—না।

—চাকরি-বাকরি তো করতে পারো। লেখাপড়া যা জানো, তাতে তো কোনো কাজ জুটিয়ে নেওয়া অসম্ভব নয়।

—হয়তো অসম্ভব নয়। কিন্তু রোজ রোজ মনিব বদলে যার অভ্যেস হয়ে গেছে—বাঁধা মনিবের চাকরি তার পোষাবে না।

বসন্তর কপালে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল। এই মেয়েকে কি বাঁচানো চলে? বাঁচানো সম্ভব?

—কেউ যদি তোমায় বিয়ে করে? ঘরে নিয়ে যায়?

আবার সব সুর কেটে গেল। রক্-এন্-রোলের একটা প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস ভেসে এল হাওয়ায়। সেই তীক্ষ্ণ আদিম হাসিতে ভেঙে পড়ল চম্পা, দু হাতে কান চেপে ধরতে চাইল বসন্ত। খ্রীষ্টের মূর্তিটা হারিয়ে গেল পাথুরে অন্ধকারের মধ্যে।

– সেও বাঁধা মনিবের চাকরি!—চাঁপার হাসি থেকে তিল তিল করে বিষ ঝরে পড়তে লাগল: তবু এক সময় তারই জন্যে ছেলেমানুষের মতো পাগল হয়ে উঠেছিলাম। আপনার আগে আরো—আরো অন্তত তিনজন ঠিক এই কথা আমাকে বলেছে, সুখে আর অনুতাপে, আশায় আর যন্ত্রণায় রাতের পর রাত চোখের জল ফেলেছি আমি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার ওপর থেকে নেশা কেটে গেলে তিনজনের একজনও আর ফিরে আসেনি।

গানের আওয়াজটা আবার ফিকে হয়ে গেল। শিশির পড়ার মতো ঝাউয়ের শুকনো ফল ঝরছে। আলোর চমক-লাগা পদ্মবনে হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস, জলের কান্না। অন্ধকারের আবরণ সরিয়ে করুণা-বিষণ্ণ সেই দুটি চোখ গ্লানি জর্জর পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে।

কারো মুখে কথা নেই।

বসন্ত সিগারেট কেস বের করল: নেবে?

—না, ধন্যবাদ। আর নয়।

এবার নিজেই সিগারেট ধরালো বসন্ত। কী একটা ভাবছে—শক্তি সঞ্চয় করে নিতে চাইছে নিজের ভেতরে।

—চতুর্থ জনকে বিশ্বাস করতে পারো?

—কে? আপনি?

হেসে উঠতে গিয়েও হাসতে পারল না চম্পা। কেঁদে ফেলল হু-হু করে।

বসন্ত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল না। কোনো অর্থ হয় না ভালো কথা

বলবার। চম্পা কেঁদে চলল, বসন্ত পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল দূরের দিকে। আকাশ, রাত্রি, নক্ষত্র, পাহাড়—সব কিছুই যেন অপরিসীম বেদনায় গভীর নির্বাক হয়ে আছে। একরাশ সঞ্চিত কান্নার মতো ছল-ছল করছে লেকের জলটা।

দশ মিনিট, পনেরো মিনিট, কুড়ি মিনিট। চম্পা কেঁদে চলল।

আবার স্টলের সারি। সাত রঙ আলোয় চোখের যন্ত্রণা। ঘূর্ন্ত নাগরদোলা। ভিড়। সিগার-সিগারেট-ধুলো-প্রসাধনের গন্ধ। দি গ্রেট অরিয়েন্টাল সার্কাস। 'টু অ্যানাজ—অনলি টু অ্যানাজ! লায়ন-টাইগার-বিউটি প্যারেড'—

—কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে?—চম্পার স্বর এখনও কান্নায় ভেজা: আপনার বাড়িতে?

—বাড়ি এখানে কোথায়? বসন্ত হাসল: আমি টুরিস্ট—সাতদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি। তোমাকে আমার হোটেলে নিয়ে যাব।

—তারপর?

—তারপর কাল কলকাতায় নিয়ে যাব। সেখানে পৌঁছে পরের দিন যাব রেজিস্ট্রি অফিসে।

চম্পার পা থেমে এল।

—আত্মীয়স্বজন নেই আপনার? সমাজ?

মুহূর্তের জন্যে অন্ধকার হল বসন্তর মুখ। বাবা-মা, ভাইবোন, বন্ধু-বান্ধব। কিন্তু আর ভাবা চলে না। দাম হয়তো কিছু দিতেই হবে। তবু ভয় করবে না বসন্ত। অন্ধকার আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বেদনায় জর্জর, করুণায় বিষণ্ণ একটা বিশাল মূর্তি তাকে আশ্বাস দিয়েছে।

—না, সে ভাবনা আমার নেই।

নিজের অজ্ঞাতেই বসন্ত এবার চম্পার একখানা হাত টেনে নিলে মুঠোর ভেতরে। ভীরু চড়াইপাখির বুকের মতো কাঁপছে হাতখানা, ঘামে ভিজে উঠেছে। বসন্ত ওই ভিড়ের মধ্যেও চম্পার কানের কাছে মাথা নামিয়ে একান্ত হয়ে উঠল: না—আমার সে ভাবনা নেই।

আর ঠিক তখনই সমস্ত সুর, সমস্ত গান, সমস্ত উৎসব একটা ঘূর্ণির মধ্যে হারিয়ে গেল যেন। মুহূর্তে একজিবিশনের হাজার আলোর দীপালি দপ করে নিভে গেল, আছড়ে পড়ল অন্ধকারের আকাশজোড়া ঢেউ আর সেই সঙ্গে মানুষের বিকৃত গলায় অমানুষিক চিৎকার ফেটে পড়ল: ফায়ার—ফায়ার—আগ লাগা হ্যায়—

অকস্মাৎ আলো নিভে যাওয়ার অবিশ্বাস্য অন্ধকারে, প্রাণ বাঁচানোর আদিমতম প্রেরণায়, একজিবিশনের কয়েক হাজার লোক তখন অন্ধের মতো গেটের দিকে ছুটেছে। পেছন থেকে মেয়েদের আর্তনাদ, শিশুর কান্না আর পুরুষের গর্জনের একটা ছুটন্ত অতিকায় দেওয়াল ওদের দুজনের ওপর এসে

পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বসন্তর মুঠি থেকে খুলে গেল চম্পার হাত, স্পষ্ট অনুভব করল মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে চম্পা।

—মা—মাগো—

—চম্পা—

চিৎকার করে চম্পাকে তুলতে গেল বসন্ত—কিন্তু পারল না। পেছনের ভিড় তখন তাকে স্রোতের কুটোর মতো ঠেলে নিয়ে চলেছে। তার উলটো মুখে ঘুরে দাঁড়াতে গেলে হাজার হাজার পায়ের তলায় সে মুহূর্তে পিষে যাবে।

পারল না বসন্ত—কিছুতেই পারল না। ওদিকে কয়েকটা আগুনের শিখা ফণা তুলেছে তখন, মৃদু পিঙ্গল আলোয় আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে সব, মানুষের পালানোর চেষ্টা আরো ক্ষিপ্ত, আরো হিংস্র হয়ে উঠেছে। ছুটতে ছুটতে, পায়ের তলায় মানুষ মাড়াতে মাড়াতে সে নিজেও কখন আদিম প্রেরণার সঙ্গে মিশে গেল। ওই পিঙ্গল আলোটা রুদ্র ভ্রূকুটি করে তাকে বলতে লাগল : পালাও—বাঁচতে হলে এখনো পালাও।

বসন্ত পালাতে লাগল।

গেটের বাইরে যখন এসে দাঁড়াল, তখন গায়ের শার্ট টুকরো টুকরো, পায়ের জুতোর চিহ্ন নেই। চারদিকে ভয়ার্ত মানুষের চিৎকার, আত্মীয়স্বজনের নাম ধরে বুকফাটা ডাকাডাকি, মাটিতে আছড়ে-পড়া একটি মা : মেরী বেটি—মেরী মুন্নি—

ফায়ার ব্রিগেড এসে পড়েছে। আর এক্‌জিবিশনের একটা অংশ হু-হু করে জ্বলছে তখন। পিঙ্গল প্রেতদীপ্তি নয়, রক্ত-আলোর চিতা জ্বলে উঠেছে সারি সারি।

চম্পা!

এমনভাবে ঠোঁট কামড়ে ধরল বসন্ত যে মনে হল মাংসের ভেতরে তার দাঁত বসে যাবে। এর মধ্যে আর কি খোঁজা যায় চম্পাকে? খোঁজবার অর্থ হয় কোনো?

ভালোই হল। হয়তো অবচেতন মনে এমনি একটা কামনাই করেছিল বসন্ত। শেষ পর্যন্ত সত্যিই কি সাহস হত তার? চম্পার জীবনের তিনজন পুরুষের মতো চতুর্থ পুরুষও যে তাকে বঞ্চনা করত না, এ-কথা কি জোর করেই বলতে পারে সে?

টলতে টলতে হোটেলের দিকে এগিয়ে চলল বসন্ত, একটা বিভ্রান্ত মাতালের মতো। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা। পাহাড়টাকে আর দেখা যাচ্ছে না, অতল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আকাশজোড়া মূর্তিটা কোথায় মিলিয়ে গেছে।

আর পেছনের উজ্জ্বলন্ত আগুনে ছবির স্টলটা হয়তো পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে এতক্ষণে, পুড়ে যাচ্ছে ম্যাডোনা-ডেল্‌-গ্র্যাণ্ডুকা থেকে ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্ট পর্যন্ত।

সুখেন্দু বললে, যা খাওয়ালেন বৌদি— ওঃ! লোকেনের বিয়েতে আসতে পারিনি, তার পাঁচগুণ ক্ষতিপূরণ করে দিলেন। এখন আর নড়তে পর্যন্ত ইচ্ছে করছে না।

লোকেনের স্ত্রী মণিকা খুশী হয়ে হেসে বললে, বেশ তো, আজকের রাতটা থেকে যান না এখানেই। কাল সকালে চা খেয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন।

—সর্বনাশ।—মুঠোর ভেতর দুটো পান তুলে নিয়ে সুখেন্দু বললে, তা হলে সারারাত মা-র আর ঘুম হবে না। বুড়ো বাপটাকে লালবাজার আর হাসপাতাল দৌড়োদৌড়ি করিয়ে ছাড়বে। বোন দুটোর বিয়ে হয়ে গিয়ে এই মুশকিল হয়েছে আমার, তিনজনের স্নেহটা একাই বইতে হচ্ছে আমাকে।

লোকেন বললে, ভালোই তো হয়েছে তোর।

—হুঁ। কিন্তু ভালোটা বেশি হলে আবার অত্যাচারে দাঁড়িয়ে যায়।—পান দুটোকে মুখে পুরে দিয়ে জিভের ডগায় খানিকটা চুন ছুঁইয়ে সুখেন্দু বললে, অশেষ ধন্যবাদ বৌদি, আজ আসি তা হলে।

—চল, এগিয়ে দিই তোকে—পায়ে একটা চটি গলিয়ে লোকেন সুখেন্দুর সঙ্গ নিলে।

রাত দশটার কাছাকাছি। পথটা প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। লেকের দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক আসছে—নারকেল গাছগুলোতে খুশীর মর্মর। চলতে চলতে নিজেকে ভালো লাগল লোকেনের, ভালো লাগলো সুখেন্দুকে।

—এবার বল্, কেমন দেখলি আমার বৌকে—পরিতৃপ্ত মৃদু গলায় লোকেন জানতে চাইল।

—চমৎকার।—সুখেন্দু হাসল: কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স্। কিন্তু আমি একটা মজার কথা ভাবছিলুম।

—মজার কথা?

—ঠিক তাই।—একটু নিচু হয়ে, মুখ থেকে খানিকটা পানের পিচ ফেলে দিয়ে সুখেন্দু বললে, বিয়ের আগে তোর স্ত্রী ছিলেন মণিকা মল্লিক, তাই নয়?

লোকেনের ভুরু দুটো কোঁচকালো একবার। মনের নিরংকুশ খুশীটা কোথাও খোঁচা খেলো একটুখানি।

—হুঁ। কী হয়েছে তাতে?

—বলছি। ওঁর বাবা রিজেন্ট পার্কে বাড়ি করেছেন কয়েক বছর হল, এক দাদা পশ্চিমে প্রফেসারী করেন।

—অনেক খবরই তো জানিস দেখছি।—সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে লোকেনের ভুরু দুটো আরো কাছাকাছি এগিয়ে এল: তুই চিনিস নাকি ওঁদের? কিন্তু কই, সেরকম তো মনে হল না দেখে।

—না-না, আমি চিনব কোত্থেকে? দুলালের কাছে শুনেছি সব। ওঁর

ফোটোও সে আমায় দেখিয়েছিল।

ফোটো দেখিয়েছিল—দুলাল !—সঙ্গে সঙ্গে লোকেনের সামনে এই রাত, এই হাওয়া, এতক্ষণের খুশী যেন একটা কবন্ধ অন্ধকারে পরিণত হল : আমাদের দুলাল চৌধুরী ? যে তিনমাস হল মোটর অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছে ?

—সে-ই বটে।

লোকেন দাঁড়িয়ে পড়ল। লোহার মতো একটা শক্ত মুঠোয় এমনভাবে সুখেনের বাঁ হাতটা চেপে ধরল যে ঘড়িটা মটমট করে উঠল। সেই কবন্ধ অন্ধকারের ভেতর থেকে চাপা মেঘের ডাকের মতো বেরিয়ে এল লোকেনের স্বর : কী বলতে চাস সুখেন্দু—কী বলতে চাইছিস তুই ?

একবারের জন্যে থমকে গেল সুখেন্দু, তারপর হেসে উঠল হা-হা করে। গলা ছেড়ে দিয়ে।

—পাগল হলি নাকি লোকেন ? আরে না—না। তুই যা ভাবছিস সে-সব কিছুই নয়। তা যদি হত তা হলে কি আমি এ-সমস্ত কথা বলতে যেতুম তোকে ? বিয়ের এক মাস না হতেই তোর ঘর ভাঙতে চাইব—আমাকে কি এইরকম একটা স্কাউণ্ড্রেল্ মনে করলি তুই ?

অপ্রতিভ হয়ে সুখেন্দুর হাত ছেড়ে দিলে লোকেন।

—না, মানে—ইয়ে, দুলাল মণিকার ফোটো পেলো কী করে ? আত্মীয়তা ছিল ? কিন্তু আত্মীয় হলেও একটা ফোটো নিয়ে—

—তুই একটা র‍্যাবিশ !—সুখেন্দু ধমকে উঠল : কিছু বলতে দিচ্ছিস না —নিজেই স্পেকুলেশন করছিস। আরে দুলালের সঙ্গে মণিকা দেবীর বিয়ের একটা প্রস্তাব এসেছিল। স্রেফ অভিভাবকদের পক্ষ থেকে—তাতে ওদের দুজনের কোনো ভূমিকা ছিল না—চিনতও না কেউ কাউকে। সেই সময়েই দুলাল ছবিটা দেখিয়েছিল আমাকে।

—বিয়ে হল না কেন ?—লোকেন স্বস্তির শ্বাস ফেলল : দরে বনল না বোধ হয় ?

—উঁহু, তা নয়। দরে মিলেছিল, ঠিকুজী কুষ্ঠীর অমিল হয় নি, দু পক্ষেরই আগ্রহ ছিল প্রচুর। কিন্তু দুলালই বেঁকে বসল। বললে—না, কিছুতেই নয়।

—কেন ?—লোকেনের চোখদুটো জ্বলে উঠল এবার : কেন আপত্তি করল দুলাল ?

সুখেন্দু হাসল : কেন আর ? তুই ওঁকে বিয়ে করবি বলে।

—ঠাট্টা নয়, আই অ্যাম সীরিয়াস।—সুখেন্দুর কাঁধে হাত রেখে, সোজা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে, লোকেন জানতে চাইল : মণিকার মতো মেয়েকে দুলাল কেন অপছন্দ করল ? আর কাউকে ভালোবাসত ?

—ভালোবাসলে তো বলতই সেকথা। মেয়ে দেখতেও নিশ্চয়ই যেত না।

—তা হলে ?—লোকেনের মুখের ভেতর দাঁতগুলো হঠাৎ কট্ কট্ করে উঠল : নিজে কী এমন আউটস্ট্যাণ্ডিং ছেলে যে—যার জন্যে মণিকাকেও

তার মনে ধরল না? হোয়াই?

সুখেন্দু বিব্রত বোধ করল। মনে হল, কথাটা তুলেই সে বোকামি করেছে। দেঁতো হেসে বললে, আচ্ছা জ্বালা তো! হোয়াই—সে আমি কেমন করে জানব! হয়তো কোনো মিস্ ইউনিভার্সকে বিয়ে করবার তাল ছিল তার, হয়তো সন্ন্যাসী হওয়ার পাঁয়তারা ভাঁজছিল মনে মনে। কিন্তু আজ আর তার কাছ থেকে কোনো কথা জানবার উপায় নেই—হি ইজ্ ডেড্ অ্যান্ড গন! আমি ভাবছিলুম ইডিয়টটার দুর্ভাগ্য—এমন চমৎকার মেয়েকে হেলায় হারালো। আবার মণিকা দেবীর ভাগ্যটাও দ্যাখ্—বিয়েটা তখন হয়ে গেলে ইন্ দি কোর্স অফ্ এ মান্থ্ ভদ্রমহিলা বিধবা হতেন। এই সবের জন্যেই অদৃষ্ট মানতে হয়—বুঝলি?

লোকেনের উত্তেজিত শিরাগুলো শিথিল হয়ে আসছিল আস্তে আস্তে। লেকের দিক থেকে দক্ষিণের হাওয়া। নিয়নের আলোর সঙ্গে জ্যোৎস্নার রঙ মিশেছে। কখন কয়েক ফোঁটা ঘাম জমে উঠেছিল কপালে, বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে মুছে ফেলল লোকেন।

—যা বলেছিস, অদৃষ্টই বটে।

—দেয়ার আর মোর থিংস—গোছের কিছু বলতে বলতে হাত তুলে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামালো সুখেন্দু। চট্ করে উঠে পড়ে বললে, চলি ভাই—অনেক রাত হয়ে গেল। মা হয়তো জানলা ধরে দাঁড়িয়ে আছে—হয়তো এতক্ষণ বাবাকে রওনা করে দিয়েছে হাসপাতালের দিকে। আচ্ছা—গুড্ নাইট, কন্‌গ্রাচুলেশনস্ এগেন!

ট্যাক্সিটা এগিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল একটা বাঁক ঘুরে।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল লোকেন। দক্ষিণের হাওয়া তার মাথার চুলগুলোকে নিয়ে খেলা করতে লাগল। কী বিশ্রীভাবে সাস্‌পেন্স তৈরি করছিল সুখেন্দু, সমানে পীড়ন করছিল নার্ভগুলোকে। শেষ পর্যন্ত ফিড্‌লস্টিক্। বিয়ের কথা উঠেছিল—দুলাল রাজী হয়নি, ব্যস! কেন হয়নি, সে-কথা দুলাল ছাড়া পৃথিবীর আর কেউই জানে না। বাট হি ইজ্ ডেড্ অ্যান্ড গন!

চুলোয় যাক দুলাল—গর্দভ! মণিকা সুন্দরী, মণিকা গ্রাজুয়েট, মণিকা ভালো গান গাইতে পারে, কথায় ব্যবহারে চমৎকার একটি মেয়ে। বাড়ির সবাই খুশী হয়েছে—বন্ধুরা অভিনন্দন জানিয়েছে। আর দুলাল কিনা—

কী এমন অদ্বিতীয় পুরুষ ছিল দুলাল? একসঙ্গেই তো পড়ত আশুতোষ কলেজে। সাধারণভাবে পাস কোর্সে বি-এ পাশ করেছিল, মামার সুপারিশে শ-তিনেক টাকার একটা চাকরি যোগাড় করেছিল এল-আই-সিতে। গুণের মধ্যে বেশ লম্বাচওড়া ছিল চেহারা, আর ভালো ভলিবল খেলতে পারত। তাতেই নিজেকে সে এমন কি সুপারম্যান বলে ঠাওরালো যে মণিকার মতো মেয়েও তার চোখে ধরল না?

—ট্র্যাশ!

জাহান্নমে যাক দুলাল—অবশ্য তার বলবার আগেই গেছে। নিজের সৌভাগ্যে লোকেন মনে মনে একটা বেলুনের মতো ফুলে উঠতে চাইল। দুলাল মরে গেল বলেই তো তার জীবনে আসতে পারল মণিকা। সামনে একখানা হীরেকে পড়ে থাকতে দেখলেই সবাই সেটা কুড়িয়ে নিতে পারে না। ঠিকই বলেছে সুখেন্দু—অদৃষ্টই মানা উচিত। হঠাৎ কিভাবে মোটর অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেল দুলাল। ঈস্, যদি মণিকার সঙ্গে তার বিয়েটা আগেই হয়ে যেত—

বাই দিস্ টাইম শি উড্ বি সাম রেচেড্ উইডো। কী সর্বনাশ—কল্পনাও করা যায় ব্যাপারটা? মণিকা থান পরেছে, মণিকাকে নিরামিষ খেতে হয়, একাদশী করতে হয়! রুক্ষ বিষণ্ণ চেহারা—দু চোখে চাপা যন্ত্রণা জ্বলছে সব সময়—

অসম্ভব!

লোকেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। মণিকার বৈধব্য কল্পনায় যেন নিজের মৃত্যুটাকে সামনে দেখতে পাচ্ছে, এমনিভাবে দ্রুত পা চালিয়ে দিলে।

সিলি! একেবারেই সিলি!

কিন্তু কী যে আশ্চর্য—রাত্রে লোকেনের ভালো করে ঘুম হল না। ফেনশুভ্র নরম পরিষ্কার বিছানাটিতে ছারপোকা থাকবার কথা নয়—তবু মনে হতে লাগল কী যেন তাকে কামড়াচ্ছে। মাথার বালিশ গরম হয়ে উঠে কানের কাছে জ্বালা করতে লাগল—বার কয়েক উল্টে নিত হল বালিশটাকে। গরম বেশি ছিল না, খোলা জানলা দিয়ে দক্ষিণ-বাতাসের উদ্দাম ঝলক আসছিল—তবু বিছানা ছেড়ে উঠে পাখার রেগুলেটার তিনের ঘর পর্যন্ত ঠেলে দিলে লোকেন।

রাত প্রায় দুটো অবধি ঘুমোবার নিরর্থক চেষ্টা করে বিছানা ছাড়ল শেষ পর্যন্ত। জল খেলো এক গ্লাস, ইজি চেয়ারটাকে টেনে নিলে জানলার ধারে, তারপর একটা সিগারেট ধরালো। চোখের পাতা খচ্ খচ্ করছে—যেন কতগুলো বালির কণা জমে রয়েছে তাদের নিচে। জিভটা বিস্বাদ। সিগারেট ভালো লাগছিল না—তবু খানিকটা কটু ধোঁয়া গিলে চলল বিকৃত মুখে।

বিয়ে হয়েছে দু-মাসের কিছু বেশি হল। কিন্তু মণিকা সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত অভিযোগের একটি কারণ খুঁজে পায়নি লোকেন—একটিও নয়। কেবল রূপসী বিদুষী বলে নয়—স্নেহে, সেবায়, ভালোবাসায় একেবারে ভরে দিয়েছে লোকেনকে। এর বেশি মানুষ আর কী চায়—কী-ই বা চাইতে পারে!

নীল নাইট-ল্যাম্পটা জ্বলছে। একাদশীর জ্যোৎস্নার মতো কোমল স্নিগ্ধতা ঘরময়। ড্রেসিং টেবিল, রেডিয়ো, কাপড়ের আলমারি, তাকের গোটাকয়েক পুতুল, দেওয়ালের গোল ঘড়িটা, দুটো ছবি, একটা ক্যালেন্ডার—সব যেন ঘুমের মধ্যে আবছা। পাখার হাওয়ায় থেকে থেকে ক্যালেন্ডারের পাতায়

আওয়াজ বাজছে—হঠাৎ মনে হয় কেউ ঘুমের ভেতর ফিসফিস করে উঠছে। ঘুম—ঘুম—ঘুম। কিন্তু লোকেন ঘুমুতে পারছে না।

একবার বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখল। মাথার ওপর একখানা হাত রেখে কাত হয়ে ঘুমুচ্ছে মণিকা। হাতের সোনার চুড়ি আর কপালের কাঁচপোকার টিপ ঝিকমিক করছে, নীল মলিন আলোয় মুখখানাকে ভারী বিবর্ণ আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সুন্দর আর করুণ। তাকিয়ে দেখতে দেখতে মমতায় মন ভরে উঠল।

আচ্ছা—দুলাল কেন পচ্ছন্দ করল না এই মেয়েকে?

একেবারে পরমা সুন্দরী হয়তো নয়; কিন্তু সাধারণ বাঙালীর সংসারে হাজারেও এমন একটি মেয়ে পাওয়া যায় না। বিদ্যার সঙ্গে মিলেছে বুদ্ধি—কিন্তু সে বুদ্ধিতে ঔদ্ধত্য নেই, আলোর মতো জ্বলে ওঠে। মিষ্টি গানের গলা—সুন্দর হাতের রান্না—এই তো সন্ধ্যেবেলা সে রান্নার কত তারিফ করে গেল সুখেন্দু। একটা অপরূপ মাধুর্য দিয়ে এই দুটি মাস সে লোকেনকে একেবারে মগ্ন করে রেখেছে।

তা হলে দুলাল—

দুলাল একটা ইডিয়ট্। মণিকার মতো মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল—এ-ই তার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য। কী এমন অসাধারণ পুরুষ ছিল সে? টেনেবুনে পাসকোর্সে পাশ—এক-আধটু টুক্‌লি না করেছিল তা-ও জোর করে বলা যায় না। গুণের মধ্যে চেহারাটা ছিল বেশ লম্বা-চওড়া—আর হ্যাঁ, ভলিবল সে ভালোই খেলত। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কোনো সূক্ষ্ম হিউমার সহজে তার মাথায় ঢুকত না—সকলের হাসি থামবার পর হঠাৎ চমকে দিয়ে হেসে উঠত বেয়াড়া মোটা গলায়। একটুতেই তাকে চটিয়ে দেওয়া যেত আর চটলেই তোতলামি বেরুতে শুরু করত তার মুখ দিয়ে। রেস্তোরাঁয় ঢুকলে গোটাচারেক কাটলেটের কমে তার পেট ভরত না। স্থূল, নীরেট, পেটুকদাস।

হাতের সিগারেট নিবে গিয়েছিল, জানলা দিয়ে বাইরে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে লোকেন। চোখের পাতা জ্বালা করছে—কয়েকটা ধুলোর কণা যেন বিঁধে আছে মনে হয়। শুকনো ঠোঁটে সিগারেটটা আঠার মতো আটকে গিয়েছিল, টেনে খুলতে গিয়ে পাতলা চামড়া বোধ হয় ছিঁড়ে গেছে একটু-খানি—চিন্‌চিনে যন্ত্রণার সঙ্গে রক্তের নোনা আস্বাদ টের পেলো লোকেন। দুলালের ওপর একটা নিরর্থক অন্ধ ক্রোধ তার মনের মধ্যে জমে উঠতে লাগল।

গোটাচারেক কাটলেট একসঙ্গে খেত দুলাল এবং কী কদর্যভাবেই খেত। সবটাই যেন ছিল আদিম। কলেজ-জীবনে সেটা ভালো করে লক্ষ্য করেনি, কিন্তু এই বিনিদ্র বিস্বাদ রাত্রে সমস্তটাই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল—যেন অতিরিক্ত স্পষ্ট আর অর্থবহ হয়ে দেখা দিল লোকেনের কাছে। মাড়ির দুপাশে দুটো ক্যানাইন টীথের মতো দাঁত—তাই দিয়ে টেনে টেনে মাংস ছিঁড়ত কুকুরের

মতো—যখন হাড় চিবুত তখন কড়কড় করে আওয়াজ উঠত, একটা জৈব আনন্দে ঘোলা-ঘোলা হয়ে যেত গোলাটে চোখ। সিগারেট ধরত মুঠো পাকিয়ে—টান লাগাতো গাঁজার কলকের মতো। প্রায়ই একটা রং-জ্বলা নীলচে কোট পরে আসত—নৌকোর মতো একজোড়া বেঢপ্ শু পরে করিডোর কাঁপিয়ে চলাফেরা করত।

সেই দুলাল চৌধুরী। তার সঙ্গে মণিকার বিয়ে! বিউটি অ্যান্ড দি বীস্ট আর কাকে বলে!

আর কী স্পর্ধা—সেই দুলাল মণিকাকে পছন্দ করল না!

না—এতদিন লোকেনের কোনো রাগ ছিল না দুলালের ওপর। আরো দশজন সাধারণ সহপাঠীর মতোই একটা আলগা বন্ধুত্ব—একটু ইয়ার্কি, সামান্য সহানুভূতির সম্পর্ক। কিন্তু আজ রাত্রে—অনিদ্রার জ্বালাধরা চোখে, মাথার ভেতরে ক্রমশ জমাট-হয়ে-ওঠা একরাশ পাষাণভার অনুভব করতে করতে, আর চামড়া ছিঁড়ে যাওয়া ঠোঁটের এক-একটা যন্ত্রণার ঝিলিকে তার দুলালকে যেমন বীভৎস, তেমনি বর্বর মনে হতে লাগল। কোনো অসম্ভব উপায়ে দুলাল এই মুহূর্তে সামনে এসে দাঁড়ালে লোকেন তার কোটের কলার চেপে ধরত, জিজ্ঞাসা করত—

কিন্তু কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করার উপায় রাখেনি দুলাল। গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক রোডে বোঝাই পাটের লরীর সঙ্গে গাড়িটার ধাক্কা লেগেছিল। লোকেন শুনেছিল, স্টিয়ারিঙের চাপে বুকের পাঁজরা ভেঙে বিঁধে গিয়েছিল হৃৎপিন্ডের মধ্যে। একটা হাত প্রায় খসে গিয়েছিল কাঁধ থেকে, টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল পায়ের হাড়। ইট্ ওয়াজ এ হরিবল্ মেস্!

যেমন ইডিয়ট ছিল—তেমনি ইডিয়টের মতো মরেছে—পরিতৃপ্ত-ভাবে এই কথাটা ভাবতে গিয়ে লোকেন লজ্জা পেলো। না—এমন করে ভাবাটা ঠিক হচ্ছে না, দুলালের জন্যে তার সহানুভূতি বোধ করা উচিত। মাত্র চব্বিশ বছর বয়েসে মোটর অ্যাক্সিডেন্টে সে মারা গেল—তার মা-বাপ ভাই-বোন কত আশা করে ছিল তার ওপর। দুলাল বেঁচে থাকলে তাদের লাভ ছিল, কিন্তু লোকেনের কোনো ক্ষতি ছিল না। কেবল যদি মণিকার ব্যাপারটা—

রাবিশ!

আবার বড় করে একটা হাই তুলল লোকেন—একাদশীর নরম জ্যোৎস্নার মতো নীলিম আলোয় দেখতে পেলো, ঘড়ির কাঁটা পৌনে তিনটের কাছাকাছি! উঃ—এইসব আবোল-তাবোল ভেবে সারাটা রাত সে জেগেই কাটিয়ে দিলে নাকি! কপাল দপদপ করছে, ঘাড়ের ওপর একটা প্রচন্ড ভারের চাপে মাথাটা ঝুলে পড়তে চাইছে, চোখের পাতায় এবার বালির কণা নয়—কাঁটা বিঁধছে খচখচ করে। এ কি পাগলামি করছে লোকেন—কোনো মানে হয় এর?

টলতে টলতে এগিয়ে গেল বিছানায়—শরীরটাকে ছেড়ে দিলে। মণিকা ঘুমের ঘোরে কাছে সরে এল, লোকেনের আকর্ষণে তার বুকের মধ্যে জড়িয়ে

গেল। মণিকার চুলের মৃদু গন্ধের নেশায় কখন লোকেনের চেতনা আচ্ছন্ন হল, দুলালের দুঃস্বপ্নটা একাদশীর জ্যোৎস্নার মতো কোমল আলোটির ভেতরে গলে গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে।

—কত ঘুমোবে আর? সাড়ে আটটা বাজল যে।

লোকেন চোখ মেলল। মাথায় মণিকার আঙুলের স্নিগ্ধ ছোঁয়া।

—সাড়ে আটটা?—লোকেন হাই তুলল: কাল রাত্রে ইনসমনিয়া হয়ে—

—হবেই তো ইনসমনিয়া। কাল যখন বসে বসে সুখেন্দুবাবুর সঙ্গে অত সিগারেট খেয়েছ, তখনই বুঝেছি। কেন অনর্থক অমন করে একরাশ ধোঁয়া গেলো বলো দেখি?

সুখেন্দু। মাথার ভেতরে ছুঁচ বিঁধল যেন। আবার মনে পড়ে গেছে। সেই দুলাল চৌধুরী।

মণিকার মুখে কোথাও কি কোনো ত্রুটি আছে? নাকটা কি বড্ড বেশি চাপা—আর একটু টিকোলো হলে ভালো হত? চোখের তারা কি তেমন কালো নয়—একটু কটার দিকেই? মণিকা কি আর একটু মোটা হলে—

—কী দেখছ অমন করে আমার দিকে?

দারুণ লজ্জায় উঠে বসল লোকেন। রবারের চটিটা পায়ে গলিয়ে কলঘরের দিকে যেতে যেতে বললে, শিগগির চা দাও—মুখ ধুয়ে আসছি আমি।

চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা লাগতে অনেকটা স্বাভাবিক হল লোকেন—যেন একটা কুয়াশা সরে গেল মন থেকে। দুলাল চৌধুরী—একটা ইডিয়ট! মণিকাকে সে বিয়ে করতে রাজী হয়নি কেন—এ কথার উত্তর পাওয়াটা এমন আর কী কঠিন! ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স। ভয়ে পিছিয়ে গেছে দুলাল। হ্যাঁ, ভয়েই। বুঝেছে, মণিকার সে যোগ্য নয়। যে দুলাল অমন বিশ্রী জান্তব ভাবে কাটলেট খায়—চটে গেলেই যার তোতলামো বেরিয়ে আসে, প্রকাণ্ড পায়ে বেঢপ এক জোড়া জুতো পরে যে হাতির মতো হাঁটে—তার সাধ্য কি মণিকাকে বিয়ে করতে সাহস পায়! মানে-মানেই সরে গেছে দুলাল—উপযুক্ত পুরুষ লোকেন এগিয়ে এসেছে বীরের মতো।

তোয়ালে দিয়ে নাক-মুখ খুব ভালো করে রগড়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে লোকেন ঘরে ফিরল। নিজের ভেতরে একটা শক্তি—একটা পৌরুষের উত্তাপ অনুভব করছে সে। এ-যুগে স্বয়ম্বর সভার প্রথা নেই, কিন্তু থাকলে—। থাকলে সকলের মাঝখানে মণিকা এগিয়ে আসত তার দিকে, তারই গলায় পরিয়ে দিত বরমাল্য, আর দুলালের দল ম্লান হয়ে লুকিয়ে যেত সভার ভিড়ে।

বীর-গৌরবের এই পুলকটুকু অনুভব করতে করতেই চা খেল লোকেন, গল্প করল মণিকার সঙ্গে, খবরের কাগজ পড়ল, স্নান খাওয়া শেষ করে বেরুল অফিসে। এই সময়টার ভেতরে কোথাও কোনো গোলমাল ছিল না; কাজ করেছে, হাসিঠাট্টা করেছে, চা খেয়েছে, সিগারেট টেনেছে। তারপর ক্যানিং

স্ট্রীট থেকে কিছু মার্কেটিং সেরে ডালহৌসি স্কোয়ারে এসে ট্রামে চাপবার পরেও সে বেশ খুশীই ছিল। কিন্তু ট্রাম যখন এস্‌প্ল্যানেড ছাড়িয়ে ময়দানের পাশ ধরে দক্ষিণমুখো ছুটতে লাগল, যখন রোদ ডুবে গিয়ে শান্ত ছায়া নামতে লাগল চারদিকে, যখন গাছগুলোতে ঘরে ফেরা কাকের দল চেঁচামেচি শুরু করে দিলে, তখন একেবারে সামনের সীটে, পশ্চিমের জানলার ধারে বসেও লোকেন অস্বস্তিতে পীড়িত হয়ে উঠল।

কথাটা ঠিক একবারেই যে মনে এল তা নয়। পাশের মাঠে একটু একটু করে ছায়া নামার মতো প্রথমে খানিকটা ধোঁয়ার মতো কী যেন কোথায় দেখা দিল, যেন একটা ভুলে যাওয়া কথাকে মনে করবার চেষ্টায় একবার ভুরু কোঁচকালো লোকেন, তারপর নিচের গদিটার যেন একটা স্প্রীং উঠে পড়েছে এমনি অনুভূতি হল, তারও পরে ক্লান্ত মস্তিষ্কের মধ্যে সেই ধোঁয়াটা কালো মেঘ হয়ে ঘনিয়ে এল, আর রক্তে বিদ্যুতের মতো চমকে উঠল দুলাল চৌধুরী।

শুধু কম্‌প্লেক্স? কেবল ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্সেই এমন করে পেছিয়ে গেল দুলাল? কোনো পুরুষ কি কখনো মেয়েদের কাছে এমনভাবে পেছিয়ে গেছে কোনোদিন? উল্টোটাই বরং হয়। বরং—

—কী আশ্চর্য!—একটা নিঃশব্দ স্বগতোক্তি করলে লোকেন। মাথা খারাপ হচ্ছে নাকি তার? শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিলে, ফিরে তাকালো পাশের ভদ্রলোকের দিকে। তাঁর হাতে ভাঁজকরা একখানা খবরের কাগজ।

—কাগজটা একটু দেখব মশাই?

—নিশ্চয়, নিন্‌—নিন্‌—

হাতে-হাতে ময়লা হওয়া ভাঁজ পড়ে যাওয়া কাগজ। খবরগুলো সকালেই লোকেনের পড়া হয়ে গেছে। তবু এলোমেলো ভাবে পেছন থেকে উল্‌টে চলল। আসামের সংবাদ, খেলার খবর, বেলজিয়ান কঙ্গো, ক্যানাল ওয়াটার ডিসপুট—ল-কোর্ট রিপোর্টস, সিনেমার পাতা, আকাশবাণী প্রোগ্রাম, ওয়ান্টেড্‌—ম্যাট্রিমোনিয়াল।

ম্যাট্রিমোনিয়াল—পাত্রী চাই। এবং আবার সেই ভাবনা। ঘুরে-ফিরে ঠিক এক জায়গাতেই পৌঁছানো।

আশ্চর্য! লোকেনের কপালের দুপাশে শিরাগুলো কাঁপতে লাগল। এ কি ব্যাধি পেয়ে বসেছে তাকে! সুখেন্দুটা একটা রাস্কেল! এক পেট গিলে শেষকালে এইরকম নিমকহারামি! এ কথাগুলো কেন বলতে গেল ওকে—কী দরকার ছিল?

কিছুই নয়—হয়তো নেহাতই খেয়াল! মেয়েটিকে তোমাদের সকলেরই পছন্দ হয়েছে? হতে পারে। কিন্তু আমার ভালো লাগছে না—আমার মনে ধরছে না কিছুতেই। কেন? জানি না। জবাব দিতে পারব না। এমনিই। ভালো লাগা-না-লাগা আমার নিজের ইচ্ছের ওপরেই নির্ভর করে; সেজন্যে কারো কাছে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে আমি ন্যায়ত বাধ্য নই। ব্যস্‌।

দুলালের খানিকটা কল্পিত সংলাপ মনে মনে আওড়ালো লোকেন। মানুষ তো সংসারে এমন অনেক কাজই প্রত্যেক দিন করে চলেছে যার কোনো যুক্তি নেই—কোনো লজিক দিয়ে যাকে বোঝানো যায় না। পৃথিবী-বিখ্যাত, নোবেল্-প্রাইজ-পাওয়া এমন উপন্যাসও তো আছে যা পড়ে লোকেনের একেবারেই ভালো লাগেনি। কেন লাগেনি—সে কথার উত্তর লোকেন জানে না, কোনো অবচেতনার অন্ধকারে হয়তো বা সে রহস্য লুকিয়ে আছে।

কিন্তু ব্যাপারটা হল দুলালকে নিয়ে। যে দুলাল স্থূল, যে বৈষয়িক, যে ভলিবল খেলে আর দু হাতে ধরে কাটলেটে কামড় দেয়, কোনো সূক্ষ্ম হিউমার তুললে যে ঘোলা ঘোলা গোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকে—সে কি ঠিক এমন করে নিজের মনের খেয়ালের কাছে হার মানবে? সুন্দরী, বিদুষী—সব দিক থেকে চমৎকার মেয়ে—দুলালের পক্ষে তো হাতে স্বর্গ বলতে গেলে। অবচেতনার ওপর বরাত দিয়ে সে দুলাল বলতে পারবেঃ আমার ভালো লাগছে না—তাই বিয়ে করব না? যে দুলালের মধ্যে কোনো আর্টিস্ট নেই, কোনো গভীরতাও নেই, যার মনের ভেতরে আর একটা মন থেকে থেকে যাওয়া-আসা করে না—সে কি—?

তা হলে—

তা হলে? দুলালের কাছ থেকে আর জবাব মিলবে না। মরে গেছে দুলাল। গন্ ফর গুড্। কেন আরো কিছুদিন আগেই মরল না লোকটা? অ্যাক্সিডেন্টটা তো ছ' মাস আগেও হতে পারত!

দু-হাতে মাথা চেপে ধরে বসে রইল লোকেন। শয়তানের কারখানা তৈরি হয়েছে যেন মগজের ভেতর। এসব পাগলামো ভোলা দরকার। বাড়ি ফিরে আজ সে রাত্রের শো-তে মণিকাকে নিয়ে সিনেমায় যাবে। মণিকা আমার—আমার জন্যেই সে পৃথিবীতে এসেছে। সেই অদৃশ্য বিধানেই সরে গেছে দুলাল—তাকে যেতেই হত।

ফ্ল্যাটের ছোট্ট দক্ষিণের বারান্দায় চা খাচ্ছিল দুজনে। মণিকাকে সিনেমায় যাওয়ার কথা বলতে গিয়েই একটা চিন্তা থমকে উঠল লোকেনের।

আচ্ছা—এমন তো হতে পারে, দুলালের মেয়েলি শাস্ত্রের ওপর বিশ্বাস ছিল! অসম্ভব নয়, দুলালের মতো বেরসিক স্থূল ধরনের ছেলে ওসব মানতেও পারে। মণিকার কপাল কি একটু বেশি উঁচু—যাকে উঁচ্কপালী বলে? কিংবা চিরুন চিরুন দাঁত—যা নাকি অতি অলক্ষণের নমুনা?

চায়ের পেয়ালা ভুলে গিয়ে লোকেন চোখ তুলে তাকিয়ে রইল মণিকার দিকে। কপালটা যেন সত্যিই একটু বেশি চওড়া—কিন্তু সে কি টেনে খোঁপা বেঁধেছে বলে? আর দাঁত? হাসলে দাঁতগুলো যে ঠিক কিরকম দেখায় লোকেন কিছুতেই তা মনে করতে পারল না!

—কী হল? চেয়ে আছো কেন অমন করে? কিছু বলবে?

বুকের ভেতর থেকে যেন একটা ঝড় উঠে আসতে চাইল, অনেক চেষ্টায় সেটাকে থামালো লোকেন। নির্বোধ ভঙ্গিতে হাসতে চেষ্টা করল।

মণিকা ব্যাপারটা বুঝল অন্যভাবে। লজ্জায় রাঙা হল গাল, মুখ নামিয়ে বললে, কী পাগলামো যে করো!

পাগলামোই বটে। চাপা বন্ধ ঠোঁটের ভেতর একবার দাঁতে দাঁত ঘষল লোকেন। না—এভাবে কিছুতেই চলতে পারে না। মনের এই ভারটাকে তার যেমন করে হোক নামানো দরকার। মরে গিয়ে দুলাল যেন একটা প্রেতাত্মার মতো তার কাঁধের ওপর চেপে বসেছে—যেমন ভাবেই হোক সেটাকে তার বিদায় করতেই হবে।

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে লোকেন একটা সিগারেট ধরালো। মণিকাকে সিনেমায় যাওয়ার কথাটা বলতে যাচ্ছিল, তার বদলে ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল: তুমি দুলাল চৌধুরীকে চিনতে মণি?

—দুলাল চৌধুরী?

জিজ্ঞেস করেই অনুতপ্ত হয়েছিল লোকেন, কিন্তু কথাটা আর ফিরিয়ে নেওয়া গেল না। যখন নগ্নভাবে কথাটা এসেই পড়েছে, তখন একটা ফয়সালা করে নেওয়াই ভালো। নইলে এক মুহূর্তের জন্যেও সে শান্তি পাবে না।

—কোন্ দুলাল চৌধুরী?—মণিকা আবার জানতে চাইল, ভুরু কুঁচকে উঠল তার।

—সেই যে—গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে লোকেন বললে, যার সঙ্গে তোমার একবার সম্বন্ধ—

লজ্জা পেয়ে মণিকা হাসল: বুঝতে পেরেছি। কালীঘাটে থাকতেন ভদ্রলোক—ব্যাঙ্ক না ইন্‌সিয়োরেন্সে কাজ করতেন। তুমি—

—হ্যাঁ, আমার ক্লাসমেট ছিল। শুনেছি, দু পক্ষের কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়েও বিয়ে ভেঙে যায়। কী হয়েছিল?

বলতে বলতেই লোকেন টের পাচ্ছিল এই দক্ষিণের বারান্দা, এই চায়ের পেয়ালা আর সন্ধ্যার বাতাস, মণিকার মতো স্ত্রী আর দু মাসের দাম্পত্য জীবন—সব কিছুকে সে বেসুরো করে তুলছে। তবু নিজের মনকে সে ফেরাতে পারল না, কথাটাকে শেষ পর্যন্ত বলে তারপরে সে থামল।

মণিকার মুখের চেহারা বদলালো। ভয়ের চমক দুলে গেল চোখের তারায়।

—হঠাৎ এসব কথা এল কেন?

—এমনি—কোনো কারণ নেই। বিয়েটা ভেঙে গেল কেন মণি?

মণিকা চোখ নামালো। ভীত, চাপা গলায় বললে, শুনেছি, ভদ্রলোকের শেষ পর্যন্ত আমায় পছন্দ হয়নি।

—কেন পছন্দ হয়নি?—অকারণে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লোকেন: সেই অপদার্থ ইডিয়টটা কি হেলেন অব্ ট্রয়কে বিয়ে করতে চেয়েছিল? ভেবেছিল

স্বর্গ থেকে মেনকা রম্ভা তিলোত্তমা নেমে আসবে ওর জন্যে ? তোমাকে ও এতবড় অপমান করতে কেমন করে সাহস পেলো তাই ভাবছি।

আরো আশ্চর্য হল মণিকা, আরো একরাশ গভীর ভয় এসে জড়ো হল চোখের তারায়।

—এতদিন পরে তা নিয়ে রাগ করছ কেন তুমি ? এ অপমান বাঙালী মেয়েকে তো সইতেই হয়। আমিও তো এমন অসাধারণ কিছু নই। তোমার আমাকে পছন্দ হয়েছে বলেই কি—

—বিনয় কোরো না মণি। তুমি সত্যিই অসাধারণ। রাস্কেল দুলাল তোমার পায়ের ধুলোরও যোগ্য নয়। মরে গিয়ে বেঁচেছে স্কাউন্ড্রেলটা—নইলে—

মণিকা বাধা দিয়ে বললে, মারা গেছেন দুলালবাবু ?

—হ্যাঁ, একটা মোটর অ্যাক্সিডেন্টে। বেঁচে থাকলে আমি গিয়ে ওর দুটো দাঁত উড়িয়ে দিয়ে আসতুম !

—মরা মানুষের সঙ্গে ঝগড়া করছ, পাগল হলে নাকি তুমি ?—মণিকা চেয়ার থেকে উঠে এলো। লোকেনের চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে দু হাতে ওর মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, আমি বুঝেছি। কাল রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি, তাই তোমার নার্ভগুলো ইরিটেটেড্ হয়ে আছে। আজ তাড়াতাড়ি খাইয়ে তোমায় আমি ঘুম পাড়িয়ে দেব—কেমন ?

লোকেন চোখ বুজে রইল। মণিকার বিশ্বস্ত বুকের নরম আশ্রয়ের ভেতরে সমস্ত ভুলে নিশ্চিন্ত হতে চাইল সে। ভাবতে চেষ্টা করল, দুলাল চৌধুরী বলে কেউ নেই, কেউ কোনদিন ছিল না। কিন্তু—

কিন্তু আবার একটা দুঃস্বপ্নের রাত। আবার ইন্সম্নিয়া।

ঘুম আসছে না—ঘুম আসবে না। সেই ইজিচেয়ারটায়, নীল বালবের নরম জ্যোৎস্নায় সিগারেট ধরাতে গিয়ে তার গোড়াটা চিবিয়ে ফেলল লোকেন। কাঁচা তামাকের কটু স্বাদে ভরে উঠল মুখটা।

উঠে দাঁড়ালো লোকেন। ধীরে ধীরে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো—তাকালো মণিকার মুখের দিকে।

সুন্দর, সরল, বিশ্বস্ত। ঘরের নীল্চে আলোয় করুণ ক্লান্ত ঘুমের মধ্যে এলিয়ে আছে। কোনো কথা বোঝবার উপায় নেই—মুখের নরম রেখাগুলি থেকে কোনো সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার করা যায় না।

কেন পিছিয়ে গেল দুলাল ? মণিকার জীবনের কোনো ভয়ঙ্কর গোপন ইতিহাস কি জানতে পেরেছিল সে ? যে ইতিহাস মণিকা কোনদিনই বলবে না—যে ইতিহাস একমাত্র দুলাল ছাড়া আর কেউ জানত না—দুলালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যা চিরদিনের মতোই চাপা পড়ে গেছে ?

হাত দুটো একটা আদিম ইচ্ছার তাড়নায় নিশ্পিশ করে উঠল। ঝড়ের মতো ঝাঁকুনি দিয়ে, মণিকাকে জাগিয়ে তুলে চিৎকার করে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে

করল ঃ বলো—বলো—দুলাল যা জানত—সব আমায় বলো। নইলে—নইলে—

কিন্তু কিছুই বলতে পারল না লোকেন—টলতে টলতে আবার নিজের চেয়ারটায় ফিরে এল। আর অনুভব করতে লাগল ঃ একটা দুরারোগ্য নিষ্ঠুর ব্যাধির কীট তার হৃৎপিণ্ডে বাসা বেঁধেছে। এরপর থেকে দিনের পর দিন সেই বীজাণুরা তাকে তিলে তিলে খেয়ে চলবে, সে আর বাঁচতে পারবে না—তার আর পরিত্রাণ নেই।

ঘরের গোল ঘড়িটায় দুটো বাজল। কপালের রোমকূপগুলো দিয়ে ঘামের ফোঁটা গড়িয়ে আসতে লাগল রক্তবিন্দুর মতো, মণিকার নিঃশ্বাসের শব্দে মনে হতে লাগল—ঘরের ভেতরে কোথায় একটা লুকোনো সাপ একটানা ফুঁসে চলেছে—কিন্তু সেটাকে দেখতে পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

গিলটি

গলির মুখ থেকেই হিমাংশু ঘোষালের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ি থেকে ফ্যান গালতে গালতে সব কথাই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল গৌরী। ওই একটা গুণ আছে হিমাংশুর, কখনো আস্তে কথা বলতে পারে না। অত্যন্ত খুশী হয়ে যখন সে ঘরোয়া আলাপ শুরু করে, তখন এ-পাড়ার কোনো নতুন লোক তা শুনলে সন্দেহ করে একটা নরহত্যার জন্যেই বুঝি তৈরি হচ্ছে হিমাংশু।

রান্নাঘর থেকেও গৌরী বুঝতে পারল, গলির মুখে কানা চোখের মত ঘষা আলোর গ্যাসপোস্টটার নীচে দাঁড়িয়ে পড়েছে হিমাংশু। চিৎকার করে আলাপ করছে কারও সঙ্গে।

"আমার টাকা মেরে দেবে? হকের পাওনা ঠকিয়ে নেবে আমার? গলায় গামছা দিয়ে সব টাকা আদায় করে ছাড়ব, তবে আমার নাম হিমাংশু ঘোষাল।"

গৌরী ভ্রূকুটি করল। রান্নাঘরের মেজেয় ছোটবড় অসংখ্য গর্ত। হাঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়া ফ্যান জমা হচ্ছে তাদের মধ্যে। এই দিন-দুপুরেই প্রায়ান্ধকার ঘরের এখান-ওখান থেকে কয়েকটা আরশোলা উঁকি মারছিল। অর্থহীন বিদ্বেষে একটা খুন্তির ডগায় খানিক গরম ফ্যান তুলে নিয়ে গৌরী ছিটিয়ে দিলে তাদের দিকে। একটা আরশোলা চিত হয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে, অন্তিম যন্ত্রণায় পা ছুঁড়তে লাগল।

"হাজার টাকা মাইনে পান! মোটরে চড়ে ঘুরে বেড়ান! ওঃ—ওরকম বড় সায়েব বিস্তর দেখা আছে আমার। আজ বারো বছর লোক চরিয়ে খাচ্ছি এই কলকাতা শহরে। ঘাড়ে ধরে যদি ও-টাকা আদায় করতে না পারি, তা হলে—"

তা হলে একটা ভয়ংকর কিছু করে ফেলবে হিমাংশু। কিন্তু কী করবে? গৌরী জানে হিমাংশুর দৌড় কতখানি। দাওয়ায় বসে বিড়ি টানতে টানতে গজগজ করবে, গালাগাল করবে, অশ্লীলতম ভাষা ব্যবহার করবে, তারপর একদিন সম্পূর্ণ ভুলে যাবে। ছাতাটা বগলে নিয়ে বেরুবার সময় গৌরীকে আশ্বাস দিয়ে বলবে, "আড়াইশো টাকার ফ্ল্যাট। এক মাসের ভাড়া আমার কমিশন। যদি বাগাতে পারি, একটা মাস পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে চলে যাবে—কী বলিস?"

স্ত্রীকে তুই বলেই সম্ভাষণ করে হিমাংশু। ওরা দুজন একই গ্রামের। দশ বছরের গৌরীর সঙ্গে সতের বছরের হিমাংশুর বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের আগেকার সম্ভাষণটাই চলছে এই চৌদ্দ বছর ধরে।

ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রেখে গৌরী উনুনে কড়াই চাপিয়ে দিলে। হিমাংশুর চিৎকার আর শোনা যাচ্ছে না। হয়ত চাপা গলায় আলোচনা করছে কী প্ল্যানে টাকাটা আদায় করা যায়। কিংবা হয়ত সঙ্গীর সঙ্গে কথা কইতে কইতে এগিয়ে গিয়েছে বড় রাস্তার দিকে।

কড়াই থেকে কয়েক বিন্দু গরম তেল হঠাৎ ছিটকে এসে হাতে লাগল। মুখ বিকৃত করে গৌরী নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। রান্নার ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঝাপ্সা হয়ে যাওয়া ইলেকট্রিক বাল্বটার লালচে ম্লান আলোতেও নিজের বাহুর দিকে তাকিয়ে পোড়ার যন্ত্রণা ভুলে গেল গৌরী—মুগ্ধ দৃষ্টি কিছুক্ষণ থমকে রইল সেখানে। নিয়মিত সাবান পড়ে না, তিরতিরে কলের জলে স্নান পর্যন্ত হয় না ভালো করে। তবু পুষ্ট নিটোল হাতখানার দুধ-আলতা রঙে এতটুকু মলিনতার ছায়া পড়েনি। একগাছা লাল কাচের চুড়ি আর একটি শাঁখাতেই সেই হাতখানা রাজরানীর হাতের মত দেখাচ্ছে।

শুধু গৌরীর চোখেই যে তা ধরা পড়েছে তা নয়। হিমাংশু নিজেই বলেছে কতবার।

"ভাগ্যিস দশ বছর বয়সেই তোকে বিয়ে করে ফেলেছিলুম। নইলে এই রূপ নিয়ে তুই কি ফিরেও তাকাতিস আমার দিকে? কপালে লাথি মেরে দিয়ে কোন্ জমিদারের ঘরে গিয়ে উঠতিস।"

ঠিক কথা। সত্যিই কি দশ বছর বয়েসের গৌরীকে দেখে কেউ ভুলেও ভাবতে পারত যে, এই মেয়ের ভিতরে এত রূপ লুকিয়ে আছে? কেউ কি কল্পনাও করতে পারত লক্ষ্মীছাড়া চেহারার একটা ছোট্ট পাড়াগেঁয়ে মেয়ের ভিতর থেকে একদিন বেরিয়ে আসবে ইন্দ্রাণী? এ যেন রূপকথার গল্পের ব্যাঙের হঠাৎ রাজকন্যা হয়ে যাওয়া: সেই রাজকন্যা, যে হাসলে মানিক ঝরে, কাঁদলে মুক্তো।

তখন গৌরী নিয়মিত বছরে চার মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগত। কাঠির মত হাত-পা, লালচে একরাশ জংলা চুল, মড়ার মাথার মত মাংসহীন মুখ, কোটরে ডুবে থাকা দুটো অন্ধকার চোখ। গায়ের ক্যাটকেটে সাদা রঙ দৃষ্টিকে যেন আঘাত করত। কুশ্রীতাকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে গলায় দুলত ঘামের সবুজ

কলঙ্ক মাখানো দুটো তামার মাদুলি।

আর ইস্কুল থেকে তাড়া খাওয়া হিমাংশু তখন বাপের সঙ্গে যজমানির অ্যাপ্রেন্টিস খাটত। একটু কুঁজো, সারা মুখে বসন্তের দাগ, নাকটা পাখির ঠোঁটের মত লম্বা। মাথায় বেয়াড়া ধরনের টেরি, তার সঙ্গে আরও বিসদৃশ টিকি একটা। এমন বিকট বেসুরো গলায় গান গাইত যে, হরির-লুটের কীর্তন থেকে পর্যন্ত তাকে বরবাদ করে দেওয়া হয়েছিল।

এই দুজনের যখন বিয়ে হল, তখন গ্রামের রসিকেরা মন্তব্য করেছিল : একেই বলে রাজযোটক! বাসরঘরে গৌরীর দূর-সম্পর্কের এক বৌদি গান গেয়েছিলেন, "আহা, কিবা মানিয়েছে রে, যেন শ্যামের বামে রাইকিশোরী, আহা কিবা মানিয়েছে রে!"

কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যেই গৌরী একটু একটু করে ফুটে উঠতে লাগল। তখন দু-একজনের মনে হল, মেয়েটা একেবারে ধুমাবতী নয়—একটু ছিরি-ছাঁদও আছে ওর ভিতরে। আর এর মধ্যে একদিন বাপের সঙ্গে ঝগড়া করল হিমাংশু; মাথার টিকিটাকে গোড়া থেকে কঁ্যাচ করে কেটে দিয়ে পৈতৃক উত্তরাধিকারের মুলোচ্ছেদ করল, তারপর স্ত্রীকে নিয়ে রওনা হল কলকাতায়। দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ির সমস্ত বিরক্তি আর বিতৃষ্ণার মধ্যেও জোর করে মাত্র আট মাস কাটিয়ে দিলে, তারপর আত্মীয়টির দৃষ্টান্তে ব্যবসায়ে নেমে পড়ল।

ব্যবসা আর কিছু নয়। বিনা মুলধনে যা করা যায় তাই। দালালি। বাড়ি আর জমির দালালি।

খাটতে হয় বইকি। সকালেই বেরুতে হয় ছাতাটাকে বগলদাবা করে। তারপর মেটেবুরুজ থেকে বরানগর, বালী থেকে ব্যারাকপুর। কোথায় বাড়ি বিক্রি হচ্ছে, কোথায় তিন কাঠা দক্ষিণমুখো জমি সস্তায় পাওয়া যাবে, কোথায় তিনখানা নতুন ফ্ল্যাট তৈরি হচ্ছে, সব কিছুর খবর রাখতে হয় হিমাংশুকে।

বলতে গেলে, কলকাতা আর আশপাশের কুড়ি মাইলের মধ্যে যত জমি আর ঘরবাড়ি আছে, হিমাংশু তার জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া।

"কী বললেন স্যার? হাজরা রোডের জমি? ওই যে ব্যারিস্টার ঘোষের লালরঙের বাড়িটার লাগোয়া? নেবেন না স্যার—কখনো নেবেন না। আপনি ভালোমানুষ বলেই বলছি, ও জমিতে বিস্তর ফঁ্যাকড়া আছে, গাঁটের কড়ি দিয়ে কিনে শেষে বিশ্রী লিটিগেশনে পড়ে যাবেন। কী বললেন, সার্চ করাবেন? অনর্থক আবার অ্যাটর্নিকে এককাঁড়ি পয়সা দেবেন তো? আমি বলছি, শুনুন। উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে জেঠামল ভোজমল মারোয়াড়ী—"

কিংবা :

"জানি—জানি স্যার। ছাতু চক্কোত্তি লেনে নতুন ফ্ল্যাট দুটোর কথা বলছেন তো? ওর আদত মালিক হচ্ছে হরেরাম গায়েন, ক্যানিঙে মাছের আড়ত আছে। বাড়ির চার্জে আছে ওদের ম্যানেজার কিষ্টপদ সাউ। সে

স্যার সাংঘাতিক লোক, একটি রাঘব বোয়াল। তাকে বাগানো আপনার কাজ নয়। দেখাই করবে না হয়ত। তবে আমাকে ভার দিন, দেখবেন সব ম্যানেজ করে দেব। একটা সিগরেট এগিয়ে দিয়ে বলব, কিষ্টদা—ও বাড়ি আমার চাই-ই ; ব্যস, আর বলতে হবে না। আপনাদের আশীর্বাদে স্যার এই হিমাংশু ঘোষালের—"

সকলের এই আশীর্বাদ কুড়িয়ে বেড়ানো সহজ কাজ নয়। পার্টির বাড়িতে বাড়িতে ঘোরা আছে, অ্যাটর্নি আর উকিলের অফিসে দৌড়োদৌড়ি আছে। যে পার্টির মন দ্বিধা-সন্দেহে দুলছে, দু-ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে তার মন ভেজানোর দায়িত্ব আছে। একটা ট্রানজাক্শনের সময় দুটো পার্টিকে অ্যাটর্নির অফিসে হাজির করা কিংবা সময়মত কোর্টে এনে জড়ো করা—এ সবও যেন হিমাংশুর পিতৃদায়ের মধ্যে পড়ে। এমন কি ঠিকমত কোর্ট-ফী কেনা হয়েছে কিনা অথবা কেউ ভুল জায়গায় সই করে ফেলল কিনা, সেদিকেও তার লক্ষ্য রাখতে হয়। কাজ তাতেও ফুরোয় না। তারপর সর্বশেষে আছে কমিশনের টাকা আদায় করা।

কেউ কেউ পুরোটা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেয়, কেউ ছ মাস ঘোরায়, কেউ কেউ একেবারেই ফাঁকি দেবার মতলব করে। তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাজা ভাঙা সাপের মত ব্যর্থ আক্রোশে গর্জন করে হিমাংশু।

"দেখে নেব, দেখে নেব। গলায় পা দিয়ে আমার পাওনা টাকা আদায় করে ছাড়ব, তবে আমার নাম—"

পাওনা টাকা অনেকের কাছ থেকেই আদায় হয়নি—কিন্তু সেজন্যে নিজের নাম বদল করতে পারেনি হিমাংশু ঘোষাল। দিনকয়েক গালমন্দ করেছে, নিরুপায় অন্তর্জ্বালায় বিড়ি পুড়িয়েছে একটার পর একটা, ব্যবহার করেছে অশ্লীলতম ভাষা, তারপর নিজেরই বিষ-যন্ত্রণায় নিতান্ত তুচ্ছ কারণেই গৌরীর গায়ে হাত তুলতে গিয়ে তার আশ্চর্য রূপের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত স্তব্ধ হয়ে গেছে। পরক্ষণেই ছাতাটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে। বেলেঘাটায় একটা নতুন পার্টির সন্ধান মিলেছে, নষ্ট করবার মত সময় তার নেই।

সেই সকাল আটটায় বেরিয়ে কখনো বেলা বারোটা একটায় এসে এক মুঠো খেয়ে যাওয়া। কোনো কোনো দিন তাও নয়, একেবারে সেই রাত সাড়ে এগারটায় বাড়ি ফেরা। দিনের খাওয়াটা সস্তার হোটেলে কিংবা ডালপুরীর দোকানে।

শনি-রবিবার নেই, ছুটিছাটা নেই, পুজো-পার্বণ নেই। এক-আধদিন অসুখ-বিসুখে না পড়লে বাঁধা-নিয়মে কোথাও ছেদ পড়ে না। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, শীতে কুঁকড়ে কদাকার চেহারা আরো কদাকার হয়েছে হিমাংশুর। নাকটা টিয়ার ঠোঁটের মত বাঁক নিয়েছে, উঁচু উঁচু দাঁতে পানের ছোপ কালো হয়ে বসেছে, বসন্ত-চিহ্নিত মুখটার দিকে তাকালে যে কেউ সন্দেহ করে—এই লোকটা যখন খুশি খুন করতে পারে। নুয়ে-পড়া

ঘাড়টাকে এখন নির্ভুল একটা কুঁজের মত দেখায়।

এত খাটে, তবু সংসার চলে না।

মাঝে মাঝে হিমাংশু সামান্য নেশা করে আসে, কিন্তু তাকে মাতাল বলা যায় না। সেটা বড় খরচ নয়। হিমাংশুকে আর একটা রোগে ধরেছে। সেটা রেসের।

মাঠের ভিতরে যায় না, বাইরেই জুয়ো খেলে। তবু সামান্য আয়ের একটা বড় অংশ ওইখানেই নিবেদন করে আসে হিমাংশু। যেদিন বেশি হারে সেদিন ওর মুখের গন্ধেই টের পায় গৌরী। আর অনেক রাত পর্যন্ত হিমাংশু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেঃ কতদিন মামাবাড়ি যাইনি—দাদুকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে।

গৌরী সরে যায় সামনে থেকে। একতলা জীর্ণ বাড়িটার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ছোট ছাতটায় উঠে আসে। খানতিনেক নিচু ছাতের পরেই সাদা রঙের বড় তেতলা বাড়ি একখানা—মল্লিকদের বাড়ি। দোতলার জানলায় আলো জ্বলছে। জানলার সামনে যে দাঁড়িয়ে, তাকে এখান থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তার সোনার চশমা চিকচিক করছে, সিগারেটের আগুনটা দীপিত হয়ে উঠছে থেকে থেকে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিমাংশুর কথা ভাবে গৌরী। দিনের পর দিন আরো স্থূল, আরো কর্কশ হয়ে উঠছে হিমাংশু। মধ্যে মধ্যে যখন সোহাগ করবার চেষ্টা করে, তখন ওর হাতের ছোঁয়ায় শরীর জ্বালা করতে থাকে। হিমাংশুর আঙুলগুলোকে একটা বিরাট মাকড়সার কতগুলো ক্লেদাক্ত পায়ের মত মনে হয়। অন্ধকারেও নিজের নিটোল শুভ্র হাত দুখানি সে দেখতে পায়, সেই হাত দিয়ে তার নিজের গলাই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। কাঠের রেলিঙে ভর দিয়ে গৌরী দাঁড়িয়ে থাকে, বুকের ভেতর নিজের রক্তের কলধ্বনি শুনতে পায়।

দোতলার জানলায় আগুনের একটা ঝলক ফুটে ওঠে কয়েক মুহূর্তের জন্য। আর একটা সিগারেট ধরিয়েছে লোকটা। হঠাৎ গৌরীর মনে হয়ঃ আলোর বিন্দু ছড়ানো এই অন্ধকারটা একটা বিরাট জালের মত তাকে জড়িয়ে ধরছে। অসহ্য গরম লাগতে থাকে—হাওয়া বন্ধ হয়ে যায়—গৌরীর নিঃশ্বাস আটকে আসে। চঞ্চল হয়ে ফিরে আসে সিঁড়ির দিকে। নামতে নামতে মনে হয়, শ্যাওলায় শ্যাওলায় সিঁড়িটা ভরে গেছে, যে-কোনো সময় পা পিছলে যেতে পারে।

ঘরের মেঝেতে তখন কুণ্ডলী পাকানো একটা কুকুরের মত পড়ে আছে হিমাংশু। কোটরে বসা চোখের কোণায় জলের দাগ। যে দাদুকে সাত বছর বয়েসে শেষবার দেখেছিল, তারই জন্যে কাঁদতে কাদতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বেশ আছি, গৌরী ভাবে। তক্তপোষের কোণায় বসে কিছুক্ষণ বিস্বাদ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে হিমাংশুর দিকে। পুরু কালো ঠোঁটের ফাঁকে পানের রঙ ধরা দাঁতগুলো ভ্যাংচানির ভঙ্গিতে বেরিয়ে আছে। বেশ আছি। বার

বার কথাটা মাথার ভিতর ঘুরতে থাকে গৌরীর। নিজের একটা হাতের মুঠো চোখের সামনে মেলে ধরে যেন ভাগ্যরেখাটাকে পরীক্ষা করে দেখতে চায়। কিন্তু পরক্ষণেই সব গোলমাল হয়ে যায়। নরম গোল হাতখানিকে একটা ফুটন্ত পদ্মের মতো মনে হয়। দু চোখ ভরে মুগ্ধতা নেমে আসে।

হিমাংশুর নাক ডাকতে থাকে। মুখটা আরো খানিক ফাঁক হয়ে গেছে।

গৌরী চমকে উঠল। তরকারিটা প্রায় ধরে আসবার যো হয়েছে। আর দরজার কড়ায় পাগলের মতো ঝাঁকানি দিচ্ছে হিমাংশু। আধমরা আরশোলাটা চিত হয়ে পা নাড়তে নাড়তে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে সামনের দিকে।

উঠে গিয়ে গৌরী দরজা খুলে দিল।

ভিতরে পা দিয়েই খিঁচিয়ে উঠল হিমাংশু।

"ঘুমিয়ে পড়েছিলি নাকি এই সন্ধ্যেবেলায়? সেই কখন থেকে কড়া নাড়ছি—শুনতে পাসনি?"

"ঘুমিয়ে পড়ব কী করে? রাস্তা থেকেই তো চ্যাঁচানি শুনছি।"

হাতের ছাতাটা ধপাস করে ছুঁড়ে দিয়ে হিমাংশু দাওয়ার উপরে বসে পড়ল। বিড়ি ধরাল। তারপর ঃ

"বড়লোক! ওঃ—অমন বড়লোক ঢের দেখেছে এই হিমাংশু ঘোষাল! নিজের মুখে বললে, টু পারসেণ্ট, এখন কাজ মিটে গেলে বলছে, এই একশ টাকা বখশিশ দিচ্ছি—মিষ্টি কিনে খাও। বখশিশ! আমি চাকর না দারোয়ান যে বখশিশ নেব? ওঃ—বড়লোক!"

বিড়িতে একটা হিংস্র টান দিয়ে পর পর কয়েকটা কদর্য কথা আউড়ে গেল হিমাংশু।

রান্নাঘরের দিকে এগোচ্ছিল গৌরী, কী মনে করে ফিরে এল।

"একটা কথা বলব?"

স্বগতোক্তিতে ছেদ পড়ায় হিমাংশু বিরক্ত হল। ভুরু কুঁচকে বললে, "তোর আবার কী হল?"

"পরকে তো এত বাড়ি আর জমির ব্যবস্থা করে দিচ্ছ, নিজের জন্যে কিছু করতে পার না?"

হিমাংশু হাতের বিড়িটা ছুঁড়ে দিলে। সেটা চৌবাচ্চার জলের মধ্যে গিয়ে পড়ল। কর্কশ স্বরে বললে, "আরে, চেষ্টা কি আর করছি না? ঝোপ বুঝে একখানা কোপ যখন মারব, তখন বুঝতে পারবি। নিউ আলিপুরে কিংবা পার্ক সার্কাসে—"

ছুরির ধারের মতো খানিকটা তীক্ষ্ণ বঙ্কিম হাসি গৌরীর ঠোঁটের ওপর দিয়ে খেলে গেল।

"রাজপ্রাসাদের কথা এখন থাক। একটা ভাল বাসার ব্যবস্থাও কি করতে পার না?"

"কেন, এ-বাসাটাই বা এমন মন্দ কী? তোর বুঝি দোতলায় ঘর নইলে

ঘুম হচ্ছে না? বাড়িটা একতলা, পুরনোও বটে, কিন্তু সুবিধেটা দেখছিস না? একেবারে সব আলাদা—মায় ছাত পর্যন্ত। কোথাও কোনো ঝক্কি-ঝামেলা নেই, অন্য ভাড়াটের সঙ্গে জল-চানের ঘর নিয়ে ঝগড়া করতে হয় না। এ-সব বুঝি তোর পছন্দ নয়?" সাময়িকভাবে মনের তিক্ত যন্ত্রণাটাকে ভুলে গিয়ে রসিকতার চেষ্টা করল হিমাংশু, "মেয়েমানুষ তো—স্বভাব যাবে কোথায়? ব্যাঙের মতো গলা ফুলিয়ে কারুর সঙ্গে ঝগড়া করতে না পারলে ভাত হজম হবে কেন?"

"সেজন্যে নয়।" গৌরী আস্তে আস্তে বললে, "ছাতগুলো সব গায়ে লাগা—যে-কোনো সময় চোর আসতে পারে—"

"চোর!" হিমাংশু আরো সরস হয়ে উঠল, "আরে আমার বাসায় একাদশী করতে আসবে এমন বেকুব চোর কলকাতা শহরে নেই। তোর গায়ে তো কয়েকগাছা গালার চুড়ি আছে—বোধ হয় পয়সা চারেক দাম হবে। তবে হ্যাঁ—" হিমাংশু হা-হা করে হেসে উঠল, "তোকে যদি কেউ চুরি করতে আসে সেটা আলাদা কথা। লাখ টাকাতেও তোর দাম হয় না। দালালির কাজে কলকাতা শহরে কত বড়লোকের বাড়িতেই তো যাই—" লুব্ধ চোখ মেলে স্ত্রীকে লেহন করতে লাগল হিমাংশু, "সত্যি বলছি, তোর মত রূপসী বউ কারুর ঘরে দেখিনে"

অকারণে একরাশ রক্ত জমা হল গৌরীর মুখে, খানিকটা তপ্ত বাষ্পের মতো কী যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল মাথার ভেতরে। নিজের হৃৎপিণ্ডে ঝড়ের আওয়াজ শুনতে পেল গৌরী।

মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল রান্নাঘরের দিকে, হিমাংশু তাকে ডাকল।

"শোন্?"

গৌরী ফিরে দাঁড়াল। বারান্দার মিটমিটে আলোটা নয়, গৌরীর চোখেমুখে, তার সর্বাঙ্গে আরো কিছু ছড়িয়ে পড়েছে। এই কানা গলির ভেতরেও এক টুকরো আকাশ আছে, চাঁদ উঠেছে সেখানে। তারই জ্যোৎস্নায় গৌরী স্নান করছে। ডুরে শাড়ির আবরণে ঢাকা রূপোর মূর্তির মতো দেখাল গৌরীকে, তার নিখুঁত সুন্দর কপালের উপর যেন মণির মতো কী একটা জ্বলছে বলে মনে হল। কিছুক্ষণ হিমাংশুর চোখে আর পলক পড়ল না।

"গা-ভর্তি গয়না নইলে তোকে মানায় না গৌরী—একেবারে মানায় না।" অভিভূত বিহ্বল গলায় হিমাংশু বললে, "গয়না পরবার জন্যেই যেন জন্মেছিলি তুই। সামনের ট্রানজাকশনের টাকাটা যদি পাই, সত্যি বলছি—"

জ্যোৎস্নার আলোয় হিমাংশু গৌরীকে এক চোখ দিয়ে দেখছিল, হিমাংশুকে গৌরী দেখছিল আর, এক চোখে। পিঠে কুঁজ নিয়ে বসে থাকা হিমাংশুকে অদ্ভুত জান্তব দেখাচ্ছে এখন। আরো কুৎসিত, আরো কদাকার মনে হচ্ছে।

হিমাংশুর কথার শেষটুকু শোনবার জন্যে গৌরী আর অপেক্ষা করল না। এগিয়ে গেল রান্নাঘরে।

সেদিন অনেক রাত্রে, সারাদিনের অসহ্য ক্লান্তির পরে হিমাংশু মড়ার মতো ঘুমিয়ে পড়লে গৌরী দরজা খুলে ছাদে উঠে এল। তখন চাঁদ আরো আশ্চর্য রূপ নিয়েছে, জ্যোৎস্না আরো উজ্জ্বল হয়ে রেণুরেণু সোনা বৃষ্টি করে চলেছে। গৌরীর শরীরে সেই সোনা ঝরে পড়তে লাগল। গালার চুড়ি পরা নিরাভরণ হাত দুটির উপর বার বার গৌরীর চোখ পড়তে লাগল, না দেখেও সে অনুভব করতে লাগল তার দীর্ঘ শুভ্র গ্রীবাকে এই আলোয় কী করুণ আর নিরাভরণ মনে হচ্ছে।

দোতলা বাড়ির জানলায় আবার সিগারেটের আগুন জ্বলল। জ্যোৎস্নার ভিতরে অস্বাভাবিক লাল দেখাল সেটাকে, আলোর শরীরে দপদপ করতে লাগল রক্তবিন্দুর মতো।

আর হিমাংশু স্বপ্ন দেখতে লাগল, রেসকোর্সের মাঠে একটা কালো ঘোড়া সকলকে পিছনে ফেলে তীরের মতো ছুটে চলেছে, তার পিঠে জকি হয়ে বসে আছে সেই নতুন পার্টিটা, যে তাকে তিন পার্সেণ্ট কমিশন দিতে রাজি হয়েছে।

ইদানীং ফিরতে প্রায়ই বেশী রাত হয়। তার উপরে আজ শনিবার ছিল। বিকেলে রেসের মাঠে গিয়েছিল হিমাংশু। গোটা চল্লিশেক টাকা ছিল সঙ্গে, তার প্রায় সবটাই গেছে। বিস্বাদ-বিরক্ত মনটাকে সামান্য একটু রাঙা করে, অল্প অল্প টলতে টলতে হিমাংশু যখন বাড়ি ফিরল, রাত তখন একটার কাছাকাছি।

গৌরী জেগেই ছিল। দরজা খুলে দিলে কড়ায় হাত পড়তেই।

হিমাংশু হাতের ছাতাটা উঠোনেই ছুঁড়ে দিয়ে রকের উপর বসে পড়ল।

"দুত্তোর, দিনটাই খারাপ। রাস্তায় বেরিয়ে যে কার মুখ দেখেছিলুম প্রথমে!"

গৌরী বললে, "ওঠো—হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও।"

"খেতে ইচ্ছে করছে না—একরাশ তেলেভাজা এখনো যেন আটকে আছে গলায়।" হিমাংশু হেঁচকি তুলল একটাঃ তা ছাড়া সমস্ত মনমেজাজই খিঁচড়ে রয়েছে। কী যে বাজে 'টিপ্‌স' দিলে—টাকাগুলো একেবারে বরবাদ হয়ে গেল। "সব জোচ্চোর—বুঝলি, সব জোচ্চোর! দুনিয়ায় ভালো লোকের জায়গা নেই!"

নেশা-জড়ানো চোখ তুলে সমর্থনের আশায় গৌরীর দিকে তাকাল হিমাংশু। আর দেখতে পেল এতক্ষণ পরে।

শুক্লপক্ষ ঘুরে এসেছে আবার। সেদিনের মতো চাঁদ উঁকি দিয়েছে এই জীর্ণ বিবর্ণ বাড়ির কয়েক ইঞ্চি আকাশে—ত্রয়োদশীর চাঁদ। আর গৌরীর শঙ্খগ্রীবায় কী যেন ঝিকমিক করে জ্বলছে, চাঁদমালার মতো জ্বলছে।

"গলায় ওটা কী পরেছিস তুই? হার পেলি কোথায়?"

মুহূর্তের জন্যে চুপ করে রইল গৌরী, মুহূর্তের জন্যে তাকে পাথরের

একটা মূর্তির মতো দেখাল। তারপর একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কিনেছি—পাঁচ সিকে দিয়ে।"

"ওঃ, নকল সোনার গয়না? গিলটির?" হিমাংশু উঠে দাঁড়াল: "দেখি?"

গৌরী স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। হিমাংশুর কদাকার হাতের আঙুলগুলো তার গলা স্পর্শ করল. ভয়ে শিউরে উঠল গৌরী, একবারের জন্যে মনে হল ওই আঙুলগুলো এখুনি তার গলার নরম মাংসের মধ্যে সাঁড়াশির মতো চেপে বসবে। চোখের পাতাদুটো তার বন্ধ হয়ে এল।

হিমাংশু বললে, "বেড়ে মানিয়েছে হারছড়া। দূর থেকে বোঝাই যায় না। তবে হাত দিয়ে দেখলে টের পাওয়া যায় বই কি। খাঁটি সোনা এতটা ল্যালচে হয় না—আর একটু সাদাটে হয়।"

গৌরী প্রায় নিঃশব্দ গলায় বললে, "খাঁটি সোনা বুঝি তুমি হাত দিয়ে দেখলেই টের পাও?"

গৌরীর মুখের ওপর একরাশ অল্প গন্ধ ছড়িয়ে হা-হা করে হেসে উঠল হিমাংশু, "পাই বই কি। না হয় তোকে সোনা-দানা কিনেই দিতে পারি না—তাই বলে খাঁটি-নকল চিনতে পারব না? আজ বারো বছর ধরে কলকাতা শহর চরিয়ে খাচ্ছি রে, হিমাংশু ঘোষালের অত সহজে ভুল হয় না।"

গৌরী বললে, "থাক ওসব, খাবে এসো।"

গৌরী ঘুমিয়ে পড়লেও আজ রাত্রে হিমাংশুর ঘুম এল না। নেশাটা যতই ফিকে হয়ে আসতে লাগল, ততই তার প্রতিক্রিয়াটা তীব্র তীক্ষ্ণ বেদনার মতো তাকে যন্ত্রণা দিতে লাগল। ওই গিলটির নকল হারছড়াই কী আশ্চর্য মানিয়েছে গৌরীর গলায়। বালিশের পাশে একখানা হাত এলিয়ে আছে, একগাছা লাল চুড়িতে কী দীনতা ফুটে উঠেছে তাতে। ভারী অন্যায় হয়ে গেছে—হিমাংশু ভাবল। যে-করেই হোক কয়েকখানা গয়না গৌরীকে তার গড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। সোনা ছাড়া এমন সোনার প্রতিমাকে কি মানায়!

চমৎকার দেখাচ্ছে হারছড়া। তবু ও গিলটির হার। দুদিন পরেই ময়লা হয়ে যাবে—বিবর্ণ পিতলের রঙ ধরবে। ও শুধু গৌরীর আত্মবঞ্চনাই নয়, ওর মধ্যে কেবল গৌরীর ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার বেদনাই মিশে নেই, ও হিমাংশুরও চরম লজ্জা, তার অক্ষম পৌরুষের অবমাননা।

হারটার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে হিমাংশুর রক্তে সাপের বিষের জ্বালা ধরল। একে একে মনে পড়তে লাগল, কারা তাকে ঠকিয়েছে তার দালালির পাওনা, কার কাছ থেকে এখন পর্যন্ত নিজের পুরো টাকাটা সে আদায় করতে পারেনি। হিংস্র চিত্তে হিমাংশু ভাবতে লাগল, এবার তারও সময় এসেছে। তাকেও বাঁকা রাস্তাই ধরতে হবে। সোজা পথে চলবার চেষ্টা করে সবাই ফাঁকি দিয়েছে, এবার সে-ও অন্য উপায় দেখবে।

বারো বছর কলকাতা শহরে দালালি করছে হিমাংশু ঘোষাল। কিছুই

তার অজানা নয়।

গৌরীর গলার হারছড়া ঝিকমিক করে জ্বলছে, একরাশ আলোর কাঁটা এসে তার চোখকে বিন্ধ করতে লাগল। হিমাংশু উঠে পড়ল, নিবিয়ে দিলে ঘরের আলোটা।

আর একরাশ স্তব্ধ অপরিচ্ছন্ন অন্ধকারে হিমাংশুর উত্তপ্ত উত্তেজিত মস্তিষ্কের মধ্যে কতগুলো সরীসৃপ কিলবিল করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ওই গিলটির হারটা যেন এক মুহূর্তে তার মনের ভেতরে একটা সাপের ঝাঁপির ঢাকনা খুলে দিয়েছে।

কিন্তু সাপের ঝাঁপির ঢাকনা খুললে কী হয়, সবাই ওস্তাদ সাপুড়ে নয়। অন্তত হিমাংশু ঘোষাল তো নয়ই। সাপ খেলাতে গিয়ে প্রথম চোটে তার নিজের হাতেই ছোবল লাগল।

টাকা পেয়েছিল বই কি হিমাংশু, একশ টাকা। কিন্তু একশ টাকাতেই কি আর একছড়া হার হয়? আর হলেও সরু সুতোর মতো হারে গৌরীকে কি মানাতে পারে? হাতেও কিছু চাই—অন্তত চারগাছা চুড়ি।

তার উপরে দিনটা শনিবার ছিল। অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে দুর্জয় দুরাশা হিমাংশুকে আকর্ষণ করতে লাগল। জাদুকরের হাতের ছোঁয়ায় যেখানে একশ টাকা কয়েক মিনিটে তিনশ টাকায় পরিণত হয়ে যায়—হিমাংশু সেই ঐন্দ্রজালিক জগতের দিকেই পা বাড়াল।

কিন্তু একশ টাকা তিনশ হল না। বনমানুষের হাড়ের উলটো ভেলকিতে পকেটে সাত আনা পয়সা নিয়ে রাত বারোটায় গলিতে পা দিলে হিমাংশু।

ওরা ওঁত পেতেই ছিল। তিনজন লোক—তাদের দুজন গুণ্ডা গোছের।

বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল হিমাশুর ওপরে। নিঃশ্বাস একেবারে আটকে না দিয়ে যতখানি গলা টিপে ধরা যায়, সেই নিপুণ কৌশলে হিমাংশুকে তারা আয়ত্ত করল। তারপর আত্মীয়তার সম্ভাষণ জানিয়ে বললে, "ফোর টুয়েন্টির আর জায়গা পাসনি? টাকা বার কর্—"

চোখের তারা কপালে তুলে হিমাংশু গোঁ গোঁ করতে লাগল।

ওই অবস্থাতেই হিমাংশুর গালে আর একজন প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিলে।

"জাল মালিক সাজিয়ে ভুয়ো ফ্ল্যাটের টাকা আগাম নেবে? আমার টাকাটা হজম করা এত সোজা?"

যে গলা টিপে ধরেছিল—সে গোটা কয়েক ঝাঁকুনি দিলে হিমাংশুকে—যেমন করে বেরাল মুখের ইঁদুরকে ঝাঁকুনি দেয়।—'টাকা বের কর্ বলছি, খুন করে ফেলব নইলে।"

তৃতীয় জন ততক্ষণে পকেট হাতড়ে যা কিছু সব বের করে ফেলেছে। খুচরো পয়সা কটা, ময়লা রুমাল, পুরনো নোটবই আর ক্লিপ লাগানো পেনসিলটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছে মাটিতে। হিমাংশুর কুঁজের ওপর কিল

বসিয়ে দিয়ে তিক্ত ক্রোধে সে গর্জন করে উঠল, "কিচ্ছু নেই—সব গিলে খেয়েছে।"

"গলা টিপে বের করব—" আর একবার ঝাঁকুনি পড়ল।

হিমাংশু সমানে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

তার আগেই বেরিয়ে এসেছিল গৌরী। এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার সামনে।

গলা থেকে একটানে হারছড়া খুলে নিয়ে এগিয়ে এল এবারে।

"আমার স্বামী কত টাকা ঠকিয়েছেন আপনাদের ?"

লোক তিনটে চমকে উঠল। ফিরে তাকাল একসঙ্গে। গ্যাসের মরা আলোয়, এই মাঝরাতের নির্জন গলিতে এমন আশ্চর্য একটি রূপসী মেয়ের আবির্ভাব অবিশ্বাস্য স্বপ্নের মতো মনে হল তাদের।

যে গলা চেপে ধরেছিল, তার হাতের মুঠো আলগা হয়ে গেল। ধুপ করে গলির স্যাঁতসেঁতে কালো মাটির উপরে বসে পড়ল হিমাংশু।

তিনজোড়া চোখ মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল গৌরীর দিকে।

"কত টাকা নিয়েছেন উনি ?"

যে চড় বসিয়েছিল, সে একটা ঢোক গিলে বললে, "একশ—একশ টাকা।"

হারসুদ্ধ হাতখানা তার দিকে বাড়িয়ে ধরে গৌরী বললে, "এটা নিয়ে ওঁকে ছেড়ে দিন। এর দাম একশ টাকার বেশীই হবে।"

গৌরীর দিকে চোখ রেখেই হারছড়া নিলে লোকটা। তারপর আচ্ছন্নের মতোই তিনজন নিঃশব্দে গলি পার হয়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে চলে গেল। একটা কথাও বলতে পারল না। হয়ত তখনও সমস্ত জিনিসটা ওরা বিশ্বাস করতে পারছিল না, এমন অপূর্ব, এমন অবিশ্বাস্য স্বপ্নের জালটাকে ছিঁড়তে চাইছিল না কথার আঘাত দিয়ে।

হিমাংশুকে মাটি থেকে টেনে তুলল গৌরী, একরকম বয়েই নিয়ে এল বাড়ির মধ্যে। হিমাংশুর গোঙানি থেমে গেছে তখন, চাপা গলায় কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।

হিমাংশুকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে গৌরী তার মাথাটা টেনে নিলে কোলের মধ্যে।

"ভয় নেই তোমার, ওরা চলে গেছে।"

হিমাংশু অবরুদ্ধ গলায় বললে, "আমার জন্যে তো তোর সব গেল গৌরী, গিলটির হারছড়াও গেল। কিন্তু ওরা তো অত কাঁচা নয়। একটু পরেই টের পাবে, তখন তো ফিরে আসবে আবার!"

দাঁতে দাঁত চেপে গৌরী আবার বললে, "আসে তো দেখা যাবে। তোমার ভয় নেই, আমি আছি।"

হিমাংশু ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। পিঠের কুঁজটা ওঠাপড়া করতে লাগল ঢেউয়ের মতো।

"তুই আমাকে এত ভালবাসিস গৌরী, আমি তোকে কিছুই দিতে পারলুম না, কিছুই না!"

গৌরীর দাঁতের চাপ ঠোঁটে এসে পড়ল, রক্ত গড়িয়ে পড়তে চাইল ঠোঁট দিয়ে। হারটা গিল্‌টির নয়। কিন্তু যে ভালোবাসার ভিতরে নিজেকে অসহায় শিশুর মতো ছেড়ে দিয়ে হিমাংশু এমন করে কাঁদছে, তার গিল্‌টি করা নিষ্ঠুরতার কথা ভেবে গৌরীর চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে এল।

আতিথ্য

এই কাহিনী গত মহাযুদ্ধের কোনো ভারতীয় সৈনিকের কাছ থেকে শোনা। সামরিক আদালতে তাঁর কোর্টমার্শাল হয়—কয়েক বছর জেলও খাটতে হয়েছিল তাঁকে। এখন তিনি কোনো মেশিন-টুল কোম্পানীর ট্রাভেলিং এজেন্ট। আগ্রার কোনো হোটেলে, উত্তপ্ত একটি গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় এ কাহিনী আমাকে বলেছিলেন তিনি। মোটের ওপর তাঁর নিজের কথাগুলোই এখানে তুলে দিলাম। তিনি কোন্ প্রদেশের মানুষ—তাঁর পুরো নাম কী—সেগুলো এখানে উহ্যই থাকুক।

ঃ কি জানেন, গরমের দিনের এমনি কোনো গুমোট সন্ধ্যায়, এমনি অন্ধকারে একা চুপ করে বসে থাকলেই আমার সেই দিনটাকে মনে পড়ে। যেন দেখতে পাই, খানিক দূরে আকাশটা আগুনের আভায় রাঙা হয়ে উঠল, শুনতে পাই—কান্নায় আর আর্তনাদে চারদিকে নরকের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে, আর তাকে ছাপিয়ে উঠছে একদল বর্বর মানুষের জান্তব জয়ধ্বনি।

বিশ্বাস করুন, প্রথম প্রথম আত্মহত্যা করবার এক-একটা উত্তেজনা পেয়ে বসত আমাকে। ঘৃণায়, গ্লানিতে। মনে হত, আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে দেখতে পাব না—দেখব একটা রাক্ষসের মুখ। দু হাতে শক্ত করে গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে করত সেই রাক্ষসটার। যেন দেখতে পেতাম, তার জিভটা আধ হাত বেরিয়ে পড়েছে, ঠেলে বেরিয়ে এসেছে আরক্তিম চোখ দুটো —নাকের পাশ দিয়ে তার গলে পড়ছে লাল নয়—কয়েক ফোঁটা বিষাক্ত কালো রক্ত।

তারপর অবশ্য অনেক স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। জ্বালাটা গেছে, কিন্তু ক্ষত মেলায় নি। এমনি এক-একটা দম-চাপা সন্ধ্যায় বিষিয়ে ওঠে সেটা। দপ দপ করে যন্ত্রণা। মনে হয় সারা শরীরে কতগুলো জ্বলন্ত অঙ্গার ঠেলে ধরেছে কেউ। চিৎকার ভুলে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে।

তবু আজ আপনি কাছে রয়েছেন। নিজের কথা কিছুটা বলতে পারছি আপনাকে—যন্ত্রণার ভাগ দিচ্ছি খানিকটা। জানি, এসব বলে আপনাকে তিক্ত করে তুলব—এই অসহ্য সন্ধ্যাকে আরো অসহ্য করে তুলব আপনার কাছে। তবু আশা করি আমাকে বুঝবেন। ক্ষমা করবেন আমার স্বার্থপরতাকে।

আমার বন্ধুকে দিয়েই শুরু করি। তার নামটা উচ্চারণ করতে আমার সাহস হয় না—সে অধিকার হারিয়েছি। শুধু ইনিশিয়াল বলি। কে-পি।

কে-পির সঙ্গে আমার আলাপ কাশীতে।

কাজ করত হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে। দু'জনেই অল্প মাইনের কেরানী। বাসা করবার উপায় কারোরই ছিল না। আমি থাকতাম হোটেলে, আর কে-পি থাকত মেসে।

ভোরে স্নান করা আমার বরাবরের অভ্যাস। রাত থাকতেই। সেদিনও স্নান করতে গিয়েছিলাম অসি-গঙ্গা সঙ্গমের কাছে।

সময়টা বর্ষা—সেদিন আবার টিপটিপে বৃষ্টি। আবছা অন্ধকারে ঘাটে পেঁছে দেখি অসংখ্য সাদা ফেনা নিয়ে গঙ্গা পাগলের মতো ছুটেছে। একে বৃষ্টি আর গঙ্গার এই দুরন্ত রূপ, তার ওপরে ভোর পাঁচটা—ঘাট প্রায় নির্জন। আমি ছিলাম, আর ছিল কে-পি! আর কেউ নয়।

কে-পি স্নান করতে নেমেছিল আমার আগেই। খুব সাবধানে। গঙ্গা একেবারে সিঁড়ির মাথায় মাথায় উঠে এসেছে—হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে মাথায় আঁজলা আঁজলা জল দিচ্ছিল। ভালো সাঁতার জানে না—ওরকম ক্ষ্যাপা গঙ্গায় এমনি ভোরবেলায় ওর স্নান করতে আসাই উচিত হয়নি।

হঠকারিতার ফল ফলল। আচমকা পা পিছলে পড়ে গেল স্রোতের মধ্যে। একটা চীৎকার শুনতে পেলাম, তারপরেই দেখতে পেলাম, নিরুপায় ভাবে হাবুডুবু খেতে খেতে লোকটা সেই তীব্র স্রোতে ভেসে চলেছে। সামনেই তার অনিবার্য পরিণাম।

সাঁতার আমি ভালোই জানি। লাইফ সেভিং-এর ডিপ্লোমা আছে। সোজা ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কাজটা সহজ হলো না—একটু হলে আমিও তলিয়ে যেতাম। তবু শেষ পর্যন্ত টেনে তোলা গেল লোকটাকে।

দম নিতে প্রায় দশ মিনিট লাগল। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, ভালো সাঁতার যখন জানেন না, তখন কেন এমনভাবে স্নান করতে আসেন এই ভরা গঙ্গায়?

ঠাণ্ডায় কে-পির গলা ভেঙে গিয়েছিল। ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে বললে, অভ্যেস।

—অভ্যেস? কিন্তু এখুনি যে মারা যেতেন—সেটা খেয়াল আছে?

কে-পি বললে, মারা যাব না বলেই তো আপনি এসে পড়লেন।

দেখলাম লোকটা অদৃষ্টবাদী। আমি আরো বিরক্ত হয়ে বললাম, কিন্তু সব সময়েই যে আমি এসে পড়ব এমন কোনো কথা তো নেই। ভবিষ্যতে এভাবে আর আসবেন না। অন্তত এই বর্ষার সময়।

সেই আলাপ হল। কে-পি কাছাকাছিই থাকত, তবু যাওয়ার সময় আমি ওকে একটা রিকশায় তুলে দিলাম। কে-পি বলে গেল, সন্ধ্যেবেলায় আসুন আমাদের মেসে। চা খাব একসঙ্গে।

পরিচয় অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। আমরা ভারতবর্ষের দুটি আলাদা প্রদেশের মানুষ—ওর বাড়ী থেকে আমার বাড়ীর ভেতরে অন্তত হাজার মাইলের ব্যবধান। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে আমরা মনের এত কাছাকাছি এসে গেলাম

যে ওদের বাড়ীর সামনের নদীটা, তার খেয়াঘাট, খানিক দূরে পাহাড়ের ওপর শাল আর অর্জুনের বন—এ যেন চোখের সামনেই দেখতে পেতাম আমি। আমি জানতাম, দুর্গাপূজার সময় ওদের চন্ডীমন্ডপে কত বড় প্রতিমা গড়া হয়, শুনতে পেতাম ঢাকের বাজনায় আরতির বোল, জানতাম কেমন করে বরণ-কুলো নিয়ে ওদের মেয়েরা গান গাইতে গাইতে নদীর ঘাটে যায় ; দেখতে পেতাম ওদের মেটেঘরের দাওয়ায় কেমন করে লক্ষ্মীর আলপনা আঁকা রয়েছে।

ও-ও জানত। জানত আমার দেশের পাহাড় আর সমুদ্রের কথা—দূর দিগন্ত ছাওয়া তালবনের ভেতর দিয়ে, তালপাতার টোপরের মতো ছোট ছোট ঘরগুলির খবর, ও-ও জানত আমাদের গ্রামের নরসিংহ বিগ্রহের কথা—যেখানে কচি নারকেলের জল দিয়ে দেবতাকে পুজো দিতে হয়। জানত রঙীন ঝিনুক দিয়ে আমাদের মেয়েরা কত রকম কারুকার্য করে, জানত মৃদঙ্গের বোল শুনলে কত সহজেই আমাদের মেয়েদের পায়ে পায়ে দুলে ওঠে নাচের ছন্দ।

আমি আরো জানতাম—ওর মায়ের কথা, ওর ছোট বোনের কথা, ওর ভাই দুটির খবর। এত বেশি করে জানতাম যে তাদের প্রত্যেককে আমার বহু-দিনের চেনা বলে মনে হত। এমনও ভেবেছি যে, কখনো পথেঘাটে তাদের কাউকে যদি দেখতে পাই তা হলে তক্ষুনি চিনে নিতে পারব। ও-ও ঠিক এমনি ভাবেই আমাদের পরিবারের প্রত্যেকের সঙ্গেই পরিচিত হয়ে গিয়েছিল—এমন কি আমাদের বাড়ীর কুকুরটার কী নাম—তাও ওর অজানা ছিল না। ও বলত, আর-এন, চলো এবার পুজোর সময় আমাদের দেশে বেড়াতে।

—তোমার মা, ভাই, বোন—এঁরা আপত্তি করবেন না ?

—আপত্তি ? কেন ?

—আমার অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ। ভাঙা হিন্দি আর ইংরেজী দিয়ে কাজ চালাতে হয়। ওঁদের সঙ্গে কথাই বলতে পারব না। তায় বিদেশী—একেবারে অপরিচিত।

—কে বলে তোমায় অপরিচিত ? কে-পি আপত্তি করত ঃ তোমাকে ওঁরা সবাই খুব ভাল করেই চেনেন। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, মা তো প্রত্যেক চিঠিতেই তোমায় আশীর্বাদ করেন। তুমি গেলে সবাই কত খুশী হবেন দেখো।

—আর ভাষা ?

—এক মাস থাক না আমাদের দেশে। ভাষা শিখিয়ে দেব।

আমি হাসতাম ঃ এই তিন মাসে তো গোটা পাঁচেক শব্দ শেখাতে পেরেছো, আর এক মাসেই একেবারে ভাষা শিখিয়ে দিতে পারবে ?

কে-পি বলত, এখানে কি হয় ? সেই নদী, সেই খেয়াঘাট, সেই লক্ষ্মীপুজো, দূরের মেঘলা পাহাড়ের গায়ে সেই শাল আর অর্জুনের বন, সেই ময়নামতীর গান—এ সব না হলে কি শেখানোর সুবিধে হয় ? ওখানে গেলে তোমায় চেষ্টাও করতে হবে না। ওখানকার জল-বাতাস-আকাশ-আলোর ছোঁয়াচ লাগলে তুমি আপনিই আমাদের কথা শিখে নিতে পারবে। যেমন

করে ভোরের আলো ফুটলে পাখী আপনিই সাড়া দিয়ে ওঠে।

বলতে ভুলে গেছি, কে-পি একটু ভাবুক মানুষ ছিল। দুটো-চারটে কবিতাও লিখত। আমাকে মধ্যে মধ্যে শুনিয়েওছে। অর্থ বুঝতে পারি নি, কিন্তু ওর পড়বার তন্ময় ভঙ্গীটি আমার বড় ভালো লাগত। কখনো কখনো ইংরেজী করে ও ওর কবিতার বিষয়বস্তু বোঝাবার চেষ্টা করত আমাকে। তাতে ওদের পাড়াগাঁয়ের ফুলের গন্ধ মিশে থাকত—আর থাকত একটি মেয়ের খবর—যে ওকে ভালাবাসত।

আমি অঙ্কের ছাত্র। হেসে বলতাম, মিছে কবিতা লিখে কেন সময় নষ্ট করছ কে-পি, বিয়ে করে ফেলো। কে-পি বিমর্ষ হয়ে যেত।

—কি করে বিয়ে করি। এত বড় সংসারের দায়—এই তো মাইনে। এ অবস্থায়—

বলবার কিছুই নেই। আমিও কেরানী। ওর চাইতে কিছু বেশী মাইনে আমি পাই, টি-এ-ও আছে, তবু আমারই কি সাহস হয় বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব নিতে? বাড়ীতে টাকা পাঠিয়ে নিজের খরচের জন্যে কি উদ্বৃত্ত থাকে, সে তো আমিও জানি।

কে-পি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলত, থাক ওসব কথা। তিন বছর ধরে যে অপেক্ষা করছে আরো বছর-দুই সে করুক। তারপর একটা লিফ্‌ট পাব—তখন দেখা যাবে কি করা যায়। কিন্তু তার আগে চলো আর-এন, আমার দেশ থেকে তুমি বেড়িয়ে আসবে। এই সামনের ছুটিতেই।

শুনে শুনে আমারও মনটা লোভী হয়ে উঠেছিল। বছর চারেক আমিও দেশছাড়া। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছিলাম। সে ঝগড়ার জের মিটে গেছে অনেক দিন—তবু সংকোচের আড়ালটা এখনো কাটেনি। অথচ বাড়ীর জন্যে, মায়ের স্নেহের জন্যে মন কতবার আর্ত হয়ে ওঠে। চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাই বাবার জলভরা চোখ, শুনতে পাই মায়ের কান্না। উৎসাহভরে বলতাম, যাব—নিশ্চয় যাব।

আর একদিন হয়তো কে-পি এসে বলত, শুনেছ আর-এন? আমার বোন চিঠি দিয়েছে। লিখেছে, তোমায় যেতেই হবে। ভাইফোঁটা দেবে তোমাকেও।

ভাইফোঁটা! আমি স্বপ্ন দেখতাম। ভারতবর্ষের দুটি সুন্দর প্রান্তের মানুষ আমরা—ভাষায়, আচারে, চালচলনে কত তফাৎ। অথচ কী আশ্চর্য ভাবে আমরা এক! স্নেহে, ভালোবাসায়, বিশ্বাসে—কী অপরূপ বন্ধন আমাদের মধ্যে।

—যাব, নিশ্চয় যাব। আমিও ছুটির জন্যে চেষ্টা করছি।

কিন্তু সে ছুটি আমার আর নিতে হল না—কে-পিরও নয়। অফিসের কাজে আমি গোরখপুরে গিয়েছিলাম। সাতদিন পরে ফিরে জানতে পারলাম কে-পির ছুটি হয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে। ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া।

পুজোর ছুটির তখনো সাতদিন বাকী ছিল।

আমি অঙ্কের ছাত্র। জীবনের সব কিছুকে সহজ ভাবে নেওয়া উচিত—

এই থিয়োরীতেই বিশ্বাস করেছি এতদিন। কিন্তু সে থিয়োরী এখন আর কাজে লাগল না। একটা হিংস্র উত্তেজনায় দিনকয়েক আমি পাগলের মতো পথে পথে ঘুরেছি। খালি মনে হয়েছে—একটা অলক্ষ্য ভয়ংকর শত্রুর সঙ্গে কী অসহায়—কী ব্যর্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের। এত বড় অন্যায়—এমন অবিচারের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুই করবার নেই—কিছুই না!

চোখের জলে ঝাপসা হয়ে গেল দূর গ্রামের সেই নদী—সেই খেয়াঘাট—পাহাড়ের গায়ে সেই শাল অর্জুনের বন। আর টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যেতে লাগল আমার এতদিনের চেনা ওর মা—ওর ভাইবোনদের মুখগুলো। পরনে যার নীলাম্বরি শাড়ী—যার কালো চুলে মেঘের ঢেউ, দু' চোখে যার হরিণের দৃষ্টি—যে মেয়েটিকে কে-পি ভালোবাসত—জলে আঁকা ছবির মতো কোথায় আস্তে আস্তে মিলিয়ে এল সে।

এ বছর আমার আর ভাইফোঁটা জুটল না।

প্রাক্তন ভারতীয় সৈনিকটি চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। বাইরে কৃষ্ণপক্ষের রাত নেমেছে। দূরে আগ্রা ফোর্টের বিশাল প্রাচীর অন্ধকারে দানবীয় দেখাচ্ছে। এতক্ষণের গুমোট ভাবটা কেটে গিয়ে হাওয়া বইতে শুরু হয়েছে অল্প অল্প।

পাইপটা ধরিয়ে নিয়ে আবার শুরু করলেন তিনি।

ঃ তারপর আমি আর্মিতে যোগ দিলাম।

কে-পির স্মৃতি মনের মধ্যে ম্লান হয়ে এসেছিল। জীবন এত বিচিত্র, এত অসংখ্য কাজ—ছোট বড়ো সুখদুঃখকে ভোলবার এত প্রচুর আয়োজন চারদিকে। আমিও প্রায় ভুলতে বসেছিলাম।

তা ছাড়া আর্মি লাইফ—জানেনই তো। অথবা ঠিক জানেন না—সে কী পরিবেশ। তার নিয়মকানুন, তার ডিসিপ্লিন—আর—আর তার জীবনদর্শন। নিজের ব্যক্তিত্বকে একটু একটু করে কখন যে আপনি ভুলতে শুরু করেন সেকথা নিজেই জানতে পারেন না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তিলে তিলে আপনার বিচ্ছেদ ঘটতে শুরু হয়ঃ আপনি একটা আলাদা জগতের মানুষ হয়ে যান।

আরো বিশেষ করে সেই সব দিনে, যখন মিত্রশক্তির হারের পালা। মণিপুরে যুদ্ধ হচ্ছে—একটু একটু করে পিছিয়ে আসতে হচ্ছে আমাদেরই। আপনার কাছে সত্যি কথাই বলি—যুদ্ধের ফল সম্পর্কে আমাদের অনেকের মনেই সেদিন কিছুমাত্র মোহ ছিল না। আমরা অধিকাংশই সেদিন গিয়েছিলাম টাকার জন্যে—গিয়েছিলাম চাকরি করতে। আর সে চাকরির মেয়াদই বা কয়দিন? যে কোনো সময় আমাদের ফ্রন্টে পাঠাতে পারে, একটা রাইফেলের গুলিতেই ফুরিয়ে যেতে পারে সব। কিংবা একটা এয়ার রেইড হয়ে গেলে আমাদের দু-এক টুকরো হাড়মাংসের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে হয়তো।

শুধু টাকার জন্যেই এসেছি আমরা—একদল কামানের খোরাক। আমাদের

অস্তিত্ব একেবারে পদ্মপত্রে জল। অতএব—অতএব যতক্ষণ বাঁচি উদ্দাম ভাবেই জীবনটাকে আস্বাদন করে নেওয়া যাক। আদর্শহীন—সেই উদ্দাম সামরিক জীবনের কথা এখানে আপনার কাছে আর বলতে চাই না। সে ইতিহাস নেপথ্যেই থাক। আমরা যদি পেট্রিয়টিক আর্মি হতাম, যদি স্বাধীনতার গেরিলা সৈনিক হতাম—তা হলে সে আলাদা কথা ছিল। কিন্তু কেরানীগিরির চাইতে পাঁচগুণ বেশি মাইনের আশায় যে কমিশন নিয়ে এসেছে এবং যে ভালো করেই জানে যে, যে-কোনো সময় একটি রাইফেলের গুলির ওপর দিয়েই সব কিছুর ওপর যবনিকা পড়তে পারে—মানুষ আর জীবন সম্পর্কে তার মনোভাব কী হওয়া সম্ভব, আশা করি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবার দরকার নেই।

ঘুরতে ঘুরতে আমরা তখন পূর্ব-ভারতের কোনো অঞ্চলে এসে পড়েছি। ফ্রন্ট লাইন এখান থেকে বেশি দূরে নয়—শত্রুপক্ষের বোমারুরা যে কোনো দিন হানা দিতে পারে আমাদের ওপর। তার চেয়েও বড় কথা—যে কোনো মুহূর্তে আমাদের ডাক পড়তে পারে ফ্রন্টে।

সামনে মৃত্যুকে দেখে আমরা মরীয়া হয়ে উঠেছিলাম। আমাদের কর্তারাও তা জানতেন। তাই খাবার আমাদের যতই খারাপ হোক—মদের ব্যবস্থায় ত্রুটি ছিল না। যে অনিবার্য ভবিষ্যতের জন্যে আমরা প্রস্তুত হচ্ছি, তাতে ওই উত্তেজনাটুকু প্রায় অপরিহার্য ছিল আমাদের।

এর ফলে চরম ঘটনা ঘটল একটা।

আমাদের ক্যাম্প থেকে মাইল দুই দূরে গ্রাম। আমরা প্রায়ই যেতাম সেদিকে—উপদ্রবও করতাম। বিনা অনুমতিতেই নিয়ে আসতাম গাছের ফল—মিঠাইয়ের দোকানে গিয়ে খেয়ে আসতাম নামমাত্র দাম দিয়ে। গ্রামের লোক ভয়ে মুখ বুজে সব সয়ে যেত।

কিন্তু এক-একটা সময় আসে যখন মানুষের ধৈর্য তার শেষ সীমায় পৌঁছোয়। এমন এক-একটা অপমান আছে—যা সহ্য করা পাথরের পক্ষেও অসম্ভব। একদিন আমার কোম্পানীরই জনতিনেক সৈন্য মত্ত অবস্থায় একটি মেয়েকে অপমান করতে চেষ্টা করল।

গ্রামের লোকের আর সইল না। তিনজনের একজনের মাথা ফাটল, একজনের পা ভাঙল, আর একজনের চারটে দাঁত উড়ে গেল মুখ থেকে। অপরাধের তুলনায় শাস্তিটা যে খুব বেশি হয়েছিল সেকথা আমি বলতে পারব না।

কিন্তু সেদিন সে নীতিবোধ আমাদের ছিল না। আলাদা জগতে আমরা বাস করছিলাম। আশাহীন, আদর্শহীন সেই অন্ধকারের পথ দিয়েই চলেছিলাম আমরা—যে অন্ধকারে নিজেকেই প্রেতমূর্তি বলে মনে হয়, যে অন্ধকারে নিজের চোখ দুটো বাঘের চোখ হয়ে জ্বলে, যার ভেতর নিজের হাত দুটো থাবায় পরিণত হয়ে যায়।

পরের দিন দল বেঁধে বেরুলাম আমরা। বেরুলাম একপাল নেকড়ের

মতো। শরীরে আমাদের রক্ত ছিল না—তা মদে পরিণত হয়েছিল। আমাদের সমস্ত অনুভূতিগুলো বন্য জান্তব হিংসায় মশালের মতো জ্বলছিল। গ্রামের মানুষকে আমরা শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম।

সে শিক্ষা তারা পেলো। এমন ভাবেই পেলো যে সে-ইতিহাস আমি আর বর্ণনা করতে চাইনে। প্রাণে আমরা কাউকেই মারিনি—কিন্তু অনেক মাথা অনেক পা আর অনেক দাঁত ভেঙে দিয়ে অপমানের শোধ তুললাম আমরা। আর মেয়েদের—

কিছু মাংসের ওপর একদল ক্ষুধার্ত বুনো কুকুরকে ছেড়ে দিলে কী হতে পারে—আশা করি তা বলে বোঝাতে হবে না। তিন ঘণ্টা পৈশাচিক তাণ্ডবের পরে আমরা যখন পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে এলাম, তখন গ্রাম জ্বলতে শুরু হয়েছে।

কিন্তু আমার মনে পড়ল—মনে পড়ল সেইদিন রাত্রে। নেশার উত্তেজনা কেটে যাওয়ার পরে।

যে জগৎটাকে—যে জীবনকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম, সে হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল বিদ্যুৎচমকের মতো। এই তো সেই দেশ—সেই জেলা—আর, আর এই কি সেই গ্রাম?

কে-পি!

সব মিলছে। সেই মাঠ—সেই খেয়াঘাট, সেই শিবমন্দির—দূরে পাহাড়ের গায়ে সেই অর্জুন আর শালের বন। তা হলে—

তা হলে? এতদিন পরে কি এইভাবেই কে-পির নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছি আমি? এইভাবেই কি নিয়েছি তার মায়ের আশীর্বাদ—তার বোনের হাতের ভাইফোঁটা? যার মেঘের মতো কালো চুল আর হরিণের মতো চোখ নিয়ে কে-পি কবিতা লিখত, এমনি করেই কি আমার পরিচয় হল তার সঙ্গে?

—ভাই আর-এন, মা লিখেছেন তুমি তাঁর আর এক ছেলে। তোমার জন্যে তৈরী করে রাখছেন চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের খাবার। আমার ছোট বোন বলেছে—

আমি আর পারলাম না। উঠে দাঁড়ালাম টলতে টলতে। নিজের রিভলভার তুলে নিলাম, গুলি করতে চাইলাম বুকে। কিন্তু সে গুলি বুকে লাগল না। হাত ঠিক ছিল না—কাঁধে এসে বিঁধল বুলেটটা।

ভালো হওয়ার পর কোর্টমার্শাল। জেল। কিন্তু গুলি করে মারলেই আমি খুশি হতাম।

ট্রাভেলিং এজেন্ট থামলেন।

দূরে ফোর্টের অন্ধকার প্রাচীরটা। গুমোট ভেঙে একটু একটু হাওয়া বইতে শুরু হয়েছে। নিভে যাওয়া পাইপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, এমনি এক-একটা সন্ধ্যায় সেই দুঃস্বপ্নটা আবার ঘনিয়ে আসে

চোখের সামনে। ইচ্ছে হয়—জাপানী সৈনিকেরা যেমন ভাবে হ্যাণ্ড্-গ্রেনেড্ দিয়ে আত্মহত্যা করত, নিজের শরীরটাকে তেমনি ভাবে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিই। কিন্তু—

দু হাতে মাথা গুঁজে তিনি টেবিলের উপর নুয়ে পড়লেন।

মধুবন্তী

দু-ধারে কলোনি, মাঝখান দিয়ে বাঁধের মতো বেরিয়ে গেছে রেলের লাইন। কিন্তু ওটা কেবল বাঁধই নয়—দুটো পৃথিবীকে যেন একেবারে আলাদা করে রেখেছে। পুবের দিকে উঁচু ডাঙা জমি, ঝাউ আর নারকেলের বন, কৃষ্ণচূড়া আর অশোক ফুলে একাকার, লাল কাঁকরের মনোরম ছায়াঘেরা পথ, কোথাও কোথাও পিচ্-ঢালা; তার ভেতরে ছোট-বড় নতুন শৌখিন বাড়ি—কোনো-কোনোটার সামনে গ্যারাজ। কাদের একটা বিরাট বাগান ছিল, সেইটে ভেঙে একটুকরো অভিজাত উপনগর গড়ে উঠেছে, কলকাতায় যাওয়ার জন্যে দুটো বাসরুট পাওয়া যায় এখান থেকে।

আমি এসেছিলুম এখানেই। দিনটা রবিবার। ইন্সিয়োরেন্সের এক পরিচিত ভদ্রলোক নতুন বাড়ি করেছেন, বিকেলে চা খেতে ডেকেছিলেন।

চা খেতে খেতে সন্ধ্যে নামল। দক্ষিণের গোল বারান্দার টবে ফুলগুলো খুশি হয়ে উঠল বসন্তের হাওয়ায়—ঝাউয়ের পাতায় সমুদ্রের শব্দ উঠতে লাগল। ভদ্রলোকের বিদুষী গুণবতী স্ত্রী সেতার শোনালেন—তাঁর পাঁচ বছরের ছেলে নির্ভুল ইংরেজি আবৃত্তি করলে।

বললুম, কলকাতার বন্ধ গলিতে থাকি, এখানে এসে যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। যেতে ইচ্ছে করছে না।

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, বেশ তো, থেকে যান না। আমি মুরগির ব্যবস্থা করি।

আহ্বান লোভনীয়, তবুও উঠে পড়তে হল।

বললুম, নেমন্তন্ন মনে থাকবে—কিন্তু আর একদিন আসব।

স্টেশন একটু ঘুরে যেতে হয়, বাস-স্টপটাই কাছে পড়ে। আমাকে খানিক দূর এগিয়ে দিয়ে, বিদায় নেবার সময় ভদ্রলোক দুঃখ করে বললেন, নতুন গাড়িটা এখনো ডেলিভারি পাইনি—নইলে কারেই আপনাকে কলকাতা পৌঁছে দিতুম।

আমি আরো বিনীত হয়ে বললুম, ফাঁকা বাসে এক ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায় চলে যাব—আমার কোনো অসুবিধে হবে না।

একটা বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে বাসের জন্যে অপেক্ষা করছি, তখন আমার মনে পড়ল। রেললাইনের ওপারেই তালডাঙা কলোনি। নীরদ আমাকে

খংুটিয়ে খংুটিয়ে বুঝিয়েছিল অনেকক্ষণ। বলেছিল, বেশি খংুজতে হবে না—বাবার নাম করলেই লোকে দেখিয়ে দেবে। পারেন তো যাবেন একদিন।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম সবে সাতটা বেজেছে। দশটা পর্যন্ত বাস চলে এ রুটে। হাতে অনেকখানি সময় আছে। একবার দেখা করে এলে মন্দ হত না।

টিনের বাক্স মাথায় করে একজন রুটিওলা চলেছিল। তাকেই জিজ্ঞেস করলুম।

আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে লোকটি।

ওই রেলওয়ে গুমটি দেখতে পাচ্ছেন বাঁদিকে? ওইটে পেরিয়ে সামনেই তালডাঙা কলোনি।

বেশিক্ষণ হাঁটতে হল না। কিন্তু গুমটি পার হতেই দেখতে পেলুম, একেবারে আলাদা পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছি। পায়ের তলা থেকে সরে গেছে পিচের রাস্তা—শুরু হয়েছে কাঁচা মাটির পথ। ঝাউ কিংবা কৃষ্ণচূড়া কোথাও নেই—কয়েকটা বাবলা গাছ শাঁ শাঁ করছে হাওয়ায়। আর দুধারের নাবাল জমিতে পায়ে-চলা-পথের গোটাকয়েক সরীসৃপ রেখা নেমে গেছে—দূরে কাছে মিটমিট করছে আলো। তালডাঙা কলোনি। আগে জবরদখল ছিল, কিছুদিন আগে পাট্টা করে দেওয়া হয়েছে।

নীরদ বলেছিল, বটগাছের তলায় পানবিড়ির দোকান, তার পাশ দিয়েই—

বটগাছটা পাওয়া গেল আরো পাঁচ মিনিট হাঁটবার পর। আবছা অন্ধকারে এর মধ্যেই হোঁচট খেয়েছি একবার। জুতো ছাড়িয়ে ধুলো উঠেছে ধুতিতে। বর্ষাকালের অবস্থাটা কল্পনা করা গেল না। একবার মনে হল ফিরে যাই—দিনের আলোয় আসা যাবে আর এক সময়। কিন্তু কেমন জেদ চাপল। আর তাছাড়া দক্ষিণের গোল বারান্দার সেই হাওয়া, সেতারের সেই মধুবন্তী রাগ আমার কেমন নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল।···মনে পড়ে গিয়েছিল, লণ্ঠন ধরে জয়াকে খাল পার করে দিয়ে থেমে দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম হিজল গাছটার তলায়। জয়ার একখানা হাত মুঠোয় চেপে ধরে বলেছিলুম, পাশ করে চাকরি-বাকরি জোটাতে আমার আরো তিন-চার বছর লাগবে। এর মধ্যে তুমি ফস্ করে আর কাউকে বিয়ে করে ফেলবে না তো?

কিশোরী জয়ার হাত কেঁপে উঠেছিল—চোখ দুটো বুজে এসেছিল একবারের জন্যে। প্রায় নিঃশব্দে বলেছিল, না। তারপর প্রায় ছুটে মিলিয়ে গিয়েছিল অন্ধকারের ভেতর। আমাকে আর ওকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হয় নি।

দিদি বিয়ে করে নি। নীরদ বলেছিল ঃ আর বিয়ে দেবেই বা কে বলুন। যে অবস্থায় চলে আসতে হল।···

জয়া কি কথা রেখেছে? সেই হিজলতলার সন্ধ্যাটাকে কি এখনো মনে আছে তার? এই বারো বছর পরেও? কিন্তু আমি তো—

চমক ভাঙল। দেখি বটগাছের নিচে পানবিড়ির দোকানটার সামনে

দাঁড়িয়ে আছি চুপচাপ। আমার মুখের ওপর তিন-চারটি মানুষের বিস্মিত দৃষ্টি।

হোগ্লা পাতায় ছাওয়া টিনের ঘর। শুধু পানবিড়ি নয়—চায়ের ব্যবস্থা আছে, একটা বয়ামে গোটাকয়েক মোটা মোটা বিস্কুটও দেখা গেল। কেরোসিনের টেমি জ্বলছে মশালের মতো আলো ছড়িয়ে—সেই আলোয় লোকগুলোকে অদ্ভুত অবাস্তব দেখাচ্ছিল। বাঁশের একটা মাচায় বসে ছোট ছোট কাচের গ্লাসে চা খাচ্ছিল তারা।

জিজ্ঞেস করলুম, যতীন মিত্রের বাড়িটা বলতে পারেন?

যতীন মিত্র? নীরদের বাপ? পদ্য লেখে?

হাঁ, তাঁর কথাই বলছি।

বাঁদিকের রাস্তাটা দিয়া যান। এট্টু হাটলেই একটা খাজুর গাছ পাইবেন—তার পুবদিকের ঘরখান। সাবধানে যাইবেন—বাড়ির সামনেই বাশের পোল্ডা কিন্তু ভাংগা।

কয়েক বছর আগে চশমা নিয়েছি—একটু অন্ধকারেই আর উঁচু নিচু ঠাহর পাই না আজকাল। বাঁদিকের নীচু মাঠ যেন কালি দিয়ে মাখানো—তার ওপর আবার ভাঙা বাঁশের পুল! আমি থমকে গেলুম।

একজন বললেন, কইল্কাতার থিক্যা আসছেন?

বললুম, হাঁ।

তাইলে তো মুস্কিলে পড়বেন। একটু খাড়ান—আমি আউগাইয়া দিই আপনারে।

চা শেষ করে দোকানদারকে একটা আনি দিলেন ভদ্রলোক। আমাকে বললেন, আসেন।

বললুম, আপনি আবার কষ্ট করে—

আরে, কষ্টডা কী? নতুন লোক আসছেন—অন্ধকারে পোল থিক্যা পইড়্যা হাত-পা ভাঙবেন নাকি শ্যাষে? লন্—হাটেন।

একটা ছোট টর্চ জেলে এগোলেন ভদ্রলোক—আমি ওঁকে অনুসরণ করলুম। উঁচু-নিচু রাস্তা—এখানে গর্ত ওখানে স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটি। একধারে খানিকটা জলার মতো—তাতে ঘন হোগলার বন হাওয়ায় খরখর করছে। বাঁশের পুলের এখনো দেখা পাই নি, কিন্তু এ-পথে এম্নিতেই আমার হাত-পা ভাঙতে পারত।

খুব সাপ আছিল হোগলার বনডায়। আমরাই গোটা কুড়ি মারছি।

আমার শরীর শিউরে উঠল।

বিষধর?

হ। গোখুরা—শামুখ-ভাংগা। মানুষও খাইছে জন-দুই।

এখনো আছে?

দুই-দশটা কি আর নাই?—ভদ্রলোক হেসে উঠলেন: অগোও তো থাকতে হইবো। আমরা অদের জায়গা দখল কইর‍্যা লইছি—অরা যাইবো

কই—কন ? সাপ..আছিল, শীতকালে চিতাবাঘ আসত, বুনা শুয়োরও দেখছি এইখানে। এখন আমাগো পাল্লায় পইরা অরাও আমাগো মতোই বাস্তুহারা হইছে।—স্বচ্ছন্দে রসিকতা করলেন লোকটি, আরো জোরালো হয়ে উঠল হাসির আওয়াজ। আমার মনে হল হোগলা বনের জল-কাদার মধ্যে কী একটা ছপছপ করে চলে গেল—আমি একেবারে ওঁর পাশে চলে এলুম।

তার থিক্যাও ভালো জিনিস পাইছি আমরা। মড়ার হাড়—মাথার খুলি। যে রাস্থা দিয়া আসলেন—ওইখানে আগে কত যে খুন আর ডাকাতি হইত ঠিক নাই। খুন কইর‍্যা এইখানে পুইত্যা রাখত—শিয়াল শকুনেও ট্যার পাইত না। এই হোগলাবন হাতাইলেই মানুষের মাথা পাইবেন।

চমৎকার! সাপ, বাঘ, বুনো শুয়োর, খুন! স্যাঁতসেঁতে জলা জমি! বাড়ি বাঁধবার মতো খুব ভালো জায়গা বেছে নিয়েছেন যতীনকাকা। ওপারের গোল বারান্দায় যে বসন্তের হাওয়ায় আমার রোমাঞ্চ হচ্ছিল, এপারের সেই হাওয়াই হাড় কাঁপিয়ে দিতে চাইল। মনে হল, দিগন্ত-ছাওয়া এই জলা-জমিটার বিষাক্ত নিঃশ্বাস আমার গায়ে এসে লাগছে।

যতীন মিত্তির কেউ হয় নাকি আপনার ?—ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন।

কাকা—গ্রাম সুবাদে।

ভারি মজার লোক ওই বুড়ায়। দিনরাত্তির পদ্য লিখতে আছে—গেলে আর ছাড়ান নাই—শুনাইবোই শুনাইবো।

খচ্ করে একটা ব্যথা বিঁধল। গ্রামে ছেলেবেলায় এই কবিতা লেখার জন্যেই আমাদের কাছে পরম বিস্ময়ের বস্তু ছিলেন যতীনকাকা। পুরোনো মানসী ও মর্মবাণী খুলে দেখিয়েছিলেন—তাতে তাঁর কবিতা ছাপা হয়েছে।

নীরবে হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগলুম, আশ্চর্য এই যতীনকাকা! সারা জীবন কিছুই করলেন না—কেবল কবিতা লিখেই কাটালেন। এতদিনে হয়তো হাজার দশেক কবিতা জড়ো হয়েছে ওঁর ভান্ডারে। 'মানসী ও মর্মবাণী'র সঙ্গে ওঁরও যুগ শেষ হয়েছে—আমাদের কলেজ-জীবনেই ওঁর কবিতা শুনতে হাসি পেত: 'তপন হাসিল, সুবাস ভাসিল, আসিলেন উষারাণী।' কিন্তু তবু গ্রামের লোক ওঁকে কী শ্রদ্ধাই করত! উনি কবিতা না পড়লে গ্রামের কোনো অনুষ্ঠানই সেদিন সম্পূর্ণ হত না। অথচ এখানে ওঁকে নিয়ে সবাই কৌতুক করে।

এই যে পোল—সাবধানে আসেন।

একটা কাদামাখা খাঁড়ির মতো চলে গেছে হাত-ছয়েক নিচ দিয়ে, তার ওপরে বাঁশের সাঁকো। আমি বরিশালের ছেলে, বারো বছর আগেও এদের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। কিন্তু বারো বছরে বদলে গেছি অনেক। এখন চশমা সত্ত্বেও অন্ধকারে উঁচুনিচু দেখতে পাই না—এখন আর এমন সাঁকোর ওপর দিয়ে আমার হাঁটবার অভ্যাস নেই। ধরুনির ভাঙা বাঁশ আর ঝুলে-পড়া গোটাকয়েক পাটাতনের দিকে তাকিয়ে আমার রোমাঞ্চ হল।

আসেন, খুব সাবধানে আসেন—দেইখ্যা পা ফেলবেন।—টর্চের আলো

আমার ওপরে রেখে ভদ্রলোক নিজে অন্ধকারেই পেরিয়ে চললেন ঃ আর একটু—আর একটু—ব্যস—এই তো আইস্যা পড়লেন।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার আগেই টর্চের আলো ফেলে বললেন, ওই সামনের ঘর। গিয়া ডাক দ্যান।

ধন্যবাদ দেবারও সময় পেলুম না। এর মধ্যেই পুলের অর্ধেক পার হয়ে গেছেন ভদ্রলোক—মচমচ করে শব্দ উঠছে ভাঙা বাঁশের।

একটা পুরোনো লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এলেন যতীনকাকাই। ঠিক সেই চেহারা—একটু কুঁজো হয়ে গেছেন আর কপালে অনেকগুলো রেখার কুঞ্চন। মাথার চুলগুলো ধপধপে সাদা, চশমার পুরু লেন্স-দুটো ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের মতো ঝকঝক করছে।

আমাকে আবার বলতে হল ঃ আমি চিত্ত, চিত্ত দত্ত। দক্ষিণপাড়ার মাখন দত্তের ছেলে।

তুই!—যতীনকাকা এমন একটা আওয়াজ করলেন যে আর্তনাদের মতো মনে হল।

এগিয়ে গিয়ে পায়ের ধুলো নিলুম। যতীনকাকা আশীর্বাদ পর্যন্ত করলেন না—লণ্ঠনটা আমার মুখের ওপরে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, খুব বদলাইয়া গেছস।

আমি হাসলুম ঃ আপনার চুলগুলোও সব সাদা হয়ে গেছে।

তা গেছে। বাঁচিয়া আছি এখনো এই যথেষ্ট। বস্।

বারান্দায় একটা তক্তপোষ। কাঁচা মাটির দাওয়ায় তার পায়ার ইঁটগুলো প্রায় বসে গেছে—তার ওপরে জীর্ণ একটা মাদুর পাতা। খুব সম্ভব গরমের সময় নীরদ কিংবা কাকা এখানে ঘুমোন।

বসলুম। জয়ার কথাটা জিজ্ঞাসা করতে পারছি না। বললুম, নীরদ কোথায়?

তার তো স্টেট-ট্রান্সপোর্টের চাকরি। আসতে দশটার আগে না। তোর কথা শুনছি নীরদের মুখে। ভালো চাকরি পাইছস—শুনিয়া খুব আনন্দ হইল। থাকস কই?

রাস্তার নাম করলুম।

যাউক, ভালোই আছস তাইলে?

বললুম, ভালো আর কোথায়? কলকাতার যা খরচা তাতে চারশো টাকা মাইনেতে—

হ, কুলায় না।—যতীনকাকা হাসলেন ঃ কইলকাতায় খরচ খুব।

আপনারা ভালো আছেন সবাই?

খারাপ থাকুম ক্যান? শিয়ালদার অবস্থা দেখছি, ট্রানজিট ক্যাম্পের অবস্থাও দেখছি। তার গো তুলনায় তো স্বর্গেই আছি।—যতীনকাকা আবার হাসলেন ঃ কিন্তু তুই তো দেখি আইজকাইল একেবারে কইলকাতার

কথা কস। দ্যাশের কথা ভুলিয়া গেছস নাকি ?

আমি অস্বস্তি বোধ করলুম।

না, মানে অনেকদিন অভ্যেস নেই—

হ, হ, অভ্যাস।—যতীনকাকা মাথা নাড়লেন। লণ্ঠনের লালচে আলোয় সাদা চুলগুলো আর ম্যাগ্‌নিফায়িং গ্লাসের মতো পুরু লেন্সদুটো ঝকমক করে উঠল : তা এইখানে কোথায় আসছিলি ?

কেন জানি না, সত্যি কথাটা ঠোঁটের ডগায় এসেও থমকে গেল।

বললুম, এদিকে একটু সামান্য কাজ ছিল, তা ভাবলুম একবার দেখা করেই যাই আপনাদের সঙ্গে।

অ। তা বেশ করছস।—যতীনকাকা একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, শোনলাম, তুমি নাকি লেখক হইছ ?

বললুম, সে কিছু না। সামান্য কিছু লিখি। তা আপনি এখনো কাব্যচর্চা করেন তো ?

বলেই অনুতাপ হল। সেই ভদ্রলোকের কথা মনে পড়ল। যাকে পান, কবিতা শোনান। একবার আরম্ভ করলে আর ছাড়তে চান না। এবার যদি আমাকে শোনাতে আরম্ভ করেন—

আশঙ্কা করেছিলুম, নিরাশ হতে হল। সেদিক দিয়েই গেলেন না যতীনকাকা।

আরে, বুড়া মানুষের আবার কবিতা। কাজকর্ম তো নাই—ওই সব নিয়াই একরকম সময় কাটে।

ভয়টা গেল, কিন্তু খুশি হতে পারলুম না। কল্পনা করেছিলুম, যতীনকাকা আমাকে পেলেই কবিতা পড়তে শুরু করবেন—নিজের লেখায় নিজেই ছেলেমানুষের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবেন। বলবেন : ক্যামন, এইখানে আইডিয়াটা ভালো হয় নাই ? খুব ইন্‌সপায়ার্ড হইয়া লেখছি। কাইল রাত্তিরে বুঝলি, হঠাৎ ঘুম ভাইংগা গেল। আর ঘুম আসে না। তখন উইঠ্যা বসলাম। জানলা দিয়া দেখি, হিজল গাছটার মধ্য দিয়া চাঁদের আলো—

কিন্তু যতীনকাকা কিছুই করলেন না। এই কলোনির বেরসিক লোকগুলোকে তিনি জোর করে কবিতা শোনাবেন, অথচ আমি লেখক জেনেও এতটুকু উৎসাহ দেখা গেল না ওঁর মধ্যে। অনুভব করলুম কোথায় যেন একটা ব্যবধান তৈরি হয়ে গেছে—সুরে মিলছে না।

জলা-মাঠের ওপর কালিঢালা অন্ধকারে হু-হু করে বাতাস বইছে। খেজুর গাছের পাতা নড়ছে পেতনীর চুলের মতো। দূরে বাঁধের ওপর দিয়ে একটা কালো ট্রেন ছুটে চলেছে যেন নিয়তির দিকে। শেয়ালের কোরাস উঠল, সমস্বরে তার জবাব দিলে কলোনির কুকুরের দল।

মনে হল, আমি উঠে পড়তে পারি। আর বসবার দরকার নেই। আমি কেন এসেছিলুম এখানে ? ওদের খবর নিতে ? বারো বছরের মধ্যে সে

খবরে আমার দরকার পড়ে নি। সহানুভূতি জানাতে? তার দরকার হল না—যতীনকাকা পাল্টা আমাকে সহানুভূতি জানালেন: হু ঠিকই, কইলকাতায় খরচ খুব। যতীনকাকার কবিতা শুনে বিব্রত হতে? কিন্তু যতীনকাকা আমাকে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন।

নীরদ ভদ্রতা করে আসতে বলেছিল, আমিও ভদ্রতা করে বলতে পারতুম: যাব—নিশ্চয় যাব। এমন অর্থহীনভাবে এই কষ্ট করে আসার দরকার ছিল না। আর সত্যিই কি আসতুম? ওই দক্ষিণের গোল বারান্দায় যদি ঝাউ আর ফুলের টব-কাঁপানো বাতাসটা না বইত, যদি সেই ভদ্রমহিলার সেতারে মধুবন্তী রাগ আমার মনে মোহ না জাগাত, যদি সেই হিজলতলাটা আমার মনে না পড়ত—

বুকের ভেতর ছোট একটা ঘা পড়ল হঠাৎ। জয়া এসেছে বাইরে থেকে: কে আসছে বাবা?

চিত্ত আসছে। দক্ষিণপাড়ার চিত্ত।

চিত্তদা? আরে, কী ভাগ্য আমাদের!

দাওয়ায় লণ্ঠনটা রাখা ছিল, তার সেই লালচে আলোয় আমি জয়াকে দেখলুম। সেদিনকার কিশোরী নয়—ছাব্বিশ বছরের জয়া। কোমরে শক্ত করে বাঁধা ডুরে শাড়ি—খালি পায়ে ভিজে মাটি জড়ানো। লণ্ঠনের আলো নিচে থেকে সম্পূর্ণ মুখে পড়ে নি—একটা বিচিত্র আলোছায়ায় মুখখানাকে অনেক দূরের আর অনেকখানি অচেনা বলে মনে হল। শুধু অদ্ভুত চওড়া লাগল সাদা কপালটা—একটা সিঁদুরের ফোঁটা না থাকায় কী বেমানান দেখাচ্ছে জয়াকে!

এক কোণ থেকে একটা ছোট মোড়া টেনে বসে পড়ল জয়া।

কখন আসলেন চিত্তদা?

জয়ার দিকে তাকাতে পারছি না। আমি তো কবে ভুলে গিয়েছিলুম, কিন্তু বারো বছর আগেকার সন্ধ্যাটাকে এখনো কি মনে করে রেখেছে জয়া? এখনো কি অপেক্ষা করে আছে আমার জন্যে?

আছেন ভালো?

চলছে একরকম।

রাস্তা চিনিয়া আসলেন ক্যামন করিয়া? অসুবিধা হয় নাই?

চায়ের দোকান থেকে এক ভদ্রলোক এগিয়ে দিলেন।

ওঃ।

যতীনকাকা বললেন, চিত্তরে একটু চা করিয়া দে। খাইতে আর দিবি কি, একটু সুজি—

বললুম, না-না, ও-সব কিছু দরকার নেই। আমি চা খেয়েই এসেছি এখুনি।

দত্তনগরে আসছিলেন বুঝি?—জয়া আসল।

আমি জয়ার দিকে তাকালুম। লণ্ঠনের আলোয় চওড়া সাদা কপালটা চকচক করছে। চোয়াল-ওঠা শ্রীহীন মুখ। জয়ার বয়েস এখন ছাব্বিশের

কাছাকাছি। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা পার হয়ে মুখে এখন সতর্ক কঠিনতা। শীতল ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি। আমাকে সত্যি কথাই বলতে হল।

হ্যাঁ, একটা চায়ের নেমন্তন্ন ছিল।

তাই কন। নাইলে কি আর আসতেন এইখানে ?

কেন আসতে নেই ?—হঠাৎ যেন হাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেছে। ভারি গরম লাগল। রুমাল দিয়ে কপালটা মুছে ফেলে বললুম, এমনিও কি আসতে পারি না ?

জয়া আবার হাসল ঃ পাচ বছরের মধ্যে তো আসেন নাই।

আমার জবাব ছিল। ঠিকানা জানতুম না। কিন্তু সে কৈফিয়ত যতীন-কাকাকে দিতে পারি—জয়াকে কী বলব ? আমিই তো ওকে নিজে থেকে অপেক্ষা করতে বলেছিলুম। খোঁজ নেবার দায় ছিল আমারই।

যতীনকাকাই জবাব দিলেন আমার হয়ে।

কাজের মানুষ আসবে ক্যামনে ? ভালো চাকরি করে, তার উপর লেখক হইছে। কত ব্যস্ত।

জয়া মাথা নাড়ল ঃ তা ঠিক। এইখানে আইজ আসলেন—তাতেও কতখানি সময় নষ্ট হইল।

আমি যেন ঠিক এই কথাটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম। অনাবশ্যকভাবে আসবার জের টানার আর অর্থ নেই কোনো। ওদের তরফ থেকে যেটুকু ভদ্রতা দরকার তার পালা শেষ হয়ে গেছে। আরো একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছি। এখানে দক্ষিণের বারান্দা নেই—ঝাউপাতায় সমুদ্রমর্মর তুলে এখানে বাতাস আসে না, সেতারে মধুবন্তী রাগ এখানে বারো বছর আগেকার স্মৃতিকে স্বপ্ন করে তোলে না। যে প্রতিশ্রুতি জয়াকে আমি দিয়েছিলুম, দক্ষিণের বারান্দা তা আমায় মনে পড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সে অভিজ্ঞান এখানে লুকিয়ে আছে হোগলাবনের কালো কাদার নিচে—যেখানে খুন-হওয়া মানুষের হাড়ের টুকরো ছাড়া আর কিছুই হাতে ঠেকবে না।

আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম।

না-না, সময় আর কী নষ্ট হবে। এখন সাড়ে-আটটা বাজে—পৌনে-দশটা, দশটার মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে যাব। আজ আসি।

যতীনকাকা একবারও বসতে বললেন না, আর একবারও অনুরোধ করল না জয়া। লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে জয়া বললে, তবে চলেন, আউগাইয়া দি আপনারে। ভাঙা পোল্‌ডা তো পার হইতে পারবেন না।

আমি যতীনকাকাকে প্রণাম করলুম, নিঃশব্দে আশীর্বাদ করলেন তিনি।

বারো বছর আগে লণ্ঠন ধরে জয়াকে আমি খাল পার করে দিয়েছিলুম, আজ জয়া আমাকে পার করবার দায়িত্ব নিয়েছে। ভাঙা পাটাতনের দিকে চোখ রেখে সভয়ে পুল পেরোচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি জয়ার তীক্ষ্ন মিষ্টি গলার আওয়াজ ঃ ডাইন দিকের বাশটা ধরেন—নিচে চোখ রাইখ্যা আসেন—এইখানে

খুব সাবধান—আর এটটু—

পুল পেরিয়ে এলুম। পায়ের নিচে সেই ভিজে মাটির পথ। পাশের হোগলা আর নলবনে থরথর করছে হাওয়া। ছপছপ করে তেম্‌নি একটা আওয়াজ যেন শুনতে পেলুম আবার। কী আছে ওর ভেতর? বুনো শুয়োর? গোখরো সাপ? নলবন কটকট করছে, না কাদার তলায় শব্দ উঠছে মড়ার হাড়ে? আমার ভয় করছিল। আর সেই ভয়টাকে ঠেকাবার জন্যেই আমি বললুম, আর দরকার নেই জয়া, আমি এখন যেতে পারব।

পারবেন না। বড় অন্ধকার। রাস্তা পর্যন্ত দিয়া আসি আপনারে।

কিন্তু তুমি তো আবার একলা ফিরবে।

আমাদের অভ্যাস আছে। তা ছাড়া এইখানে সকলেই আমারে চেনে। ভয়ের কিছু নাই।

না—ভয়ের আর কী আছে। কালিঢালা মাঠের এখানে-ওখানে টিমটিমে আলো। হোগলাবনে বিচিত্র ধ্বনিতরঙ্গ। একটি মানুষ কোথাও নেই। দিনের আলোয় কেমন দেখাবে জানি না—রাত্রির অন্ধকারে শ্মশানের মতো মনে হচ্ছিল চারিদিক। রেললাইনের উঁচু বাঁধের উপর সিগন্যালের একটা চোখ জ্বলছিল কালপুরুষের মতো।

তুমি আজকাল কী করছ জয়া?—চুপ করে পথ চলার অস্বস্তিটা কাটাবার জন্যে আমি জিজ্ঞেস করলুম।

কী আর করি।—জয়া আগে চলছিল, আমি ওর মুখ দেখতে পেলুম না।—ছেলেমেয়েদের ছোট একটা স্কুল আছে—সেইখানে পড়াই।

মাইনে পাও?

তিনজনে পড়াই—আট-দশ টাকা ভাগে পড়ে।

আট-দশ টাকা!

মন্দ কি।—জয়ার হাসির শব্দ কানে এল: আধমণ চাউলের দাম হয়।

মন্দ কি, ভালোই আছে। আমার সহানুভূতি জানাবার দরকার নেই—কেউ তা চায়ও না। ওদের ভালো থাকবার পৃথিবীটা আলাদা। আমার সঙ্গে সেখানকার হিসেব মিলবে না।

আবার নিঃশব্দে এগিয়ে চলা। সামনে দিয়ে একটা শেয়াল চলে গেল পথ পেরিয়ে—একবার তাকিয়ে গেল আমাদের দিকে। দুটো চোখ একজোড়া সবুজ প্রদীপের মতো দপদপ করে উঠল। আমি অস্বস্তি বোধ করলুম। এখানে আগে বাঘ আসত।

তুমি কলকাতায় যাও না জয়া?

যাই কখনো কখনো। নীরদ নিয়া যায়।

বলতে যাচ্ছিলুম, যেয়ো আমার ওখানে, আর তখনই মনে হল, কী হবে অনাবশ্যক কথা বাড়িয়ে? সামনে চায়ের দোকানটা দেখা যাচ্ছে একটু দূরেই—সেই কেরোসিনের ডিবেটা মশালের মতো জ্বলছে।

এবার আমি যেতে পারব জয়া। বড় রাস্তা এসে পড়েছে।

জয়া আমার কাছে এগিয়ে এল। লণ্ঠনটা রাখল মাটিতে। ওর মাথাটা ঝুঁকে পড়ল আমার বুকের নিচে, পা ছুঁয়ে প্রণাম করল জয়া। এই একবারের জন্যে কেবল আমার মনে হল, মাত্র এই মুহূর্তে জয়া কোমল, নমনীয় হয়ে উঠেছে, মাত্র এই মুহূর্তে আমি ওর হাতখানাকে আবার টেনে আনতে পারি মুঠোর ভেতরে, বলতে পারি···

কিন্তু কাছাকাছি কোথাও কুকুরের ডাক মুহূর্তটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিলে। সোজা কঠিন হয়ে দাঁড়াল জয়া—তারপর অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়ে ফিরে চলল আবার। একটা বিদায়-সম্ভাষণও জানাল না।

কিছুক্ষণ একা দাঁড়িয়ে থেকে আমি রাস্তার দিকে এগিয়ে চললুম। এতক্ষণ সব সহজ স্বাভাবিক ছিল—কিন্তু হঠাৎ এমন অস্বাভাবিক ভাবে কেন চলে গেল জয়া? ও কি আমাকে সময় দিয়েছিল? বারো বছর আগেকার মতো একটুখানি আকস্মিক সময়—যাকে চকিতের মধ্যে পেয়েও আমি হারিয়ে ফেললুম? আর সেই দুর্বলতার লজ্জাতেই এমন করে চলে গেল—ফিরে আর চাইল না আমার দিকে?

চায়ের দোকান পেছনে ফেলে চলেছি। গুমটিটা দেখা যাচ্ছে। একবার পাশে অন্ধকার মাঠের দিকে দৃষ্টি মেলে দিলুম। অনেকগুলো আলো ছাড়া-ছাড়া ভাবে মিটমিট করছে এখানে ওখানে। ওর মধ্যে কোন্‌টা যে জয়ার লণ্ঠনের আলো বোঝবার জো নেই।

ওই ভাঙা পুলটা পেরিয়ে যাবার সাহস আর আমি রাখি না। হোগলা বনের তলায় মড়ার হাড়গুলো ওখানেই থাকুক। আমার পুবের দত্তনগরই ভালো। সেখানে দক্ষিণের গোল বারান্দায় বসে সেতার শুনতে শুনতে আমি জয়ার কথা ভাবতে পারব।

দাম

স্কুলে কী বিভীষিকাই যে ছিলেন ভদ্রলোক!

আমাদের অঙ্ক কষাতেন। আশ্চর্য পরিষ্কার ছিল মাথা। যেসব জটিল অঙ্ক নিয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পণ্ডশ্রম করেছি, একবার মাত্র তাকিয়ে দেখতেন তার দিকে। তারপরেই এগিয়ে যেতেন ব্ল্যাক বোর্ডে, খস্‌খস্‌ করে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলতো খড়ি। হঠাৎ খড়ি ভেঙে গেলে বিরক্ত হয়ে টুকরো দুটো আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ আর একটা তুলে নিতেন, একটু পরেই আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে দেখতুম—ছবির মতো অঙ্কটা সাজিয়ে দিয়েছেন।

পৃথিবীতে যত অঙ্ক ছিল, সব যেন ওঁর মুখস্থ। কিংবা মুখস্থ বললেও ঠিক নয় না। মনে হত, আমাদের অদৃশ্য অক্ষরে অঙ্কটা বোর্ডে আগে

থেকেই কষা রয়েছে, অথচ উনি দেখতে পাচ্ছেন ঠিক, আর সঙ্গে সঙ্গে তার উপরে খড়ি বুলিয়ে চলেছেন।

অঙ্কে যারা একশোর ভিতরে একশো পায়, ওঁর ভয়ে তারাই তটস্থ হয়ে থাকত। আর আমাদের মতো যেসব অঙ্ক-বিশারদের টেনেটুনে কুড়িও উঠতে চাইত না, তাদের অবস্থা সহজেই কল্পনা করা যেতে পারে। প্রকাণ্ড হাতের প্রচণ্ড চড় খেয়ে মাথা ঘুরে যেত, কিন্তু কাঁদবার জো ছিল না। চোখে এক ফোঁটা জল দেখলেই ক্লাস ফাটিয়ে হুঙ্কার ছাড়তেন: পুরুষ মানুষ হয়ে অঙ্ক পারিসনে—তার উপর কাঁদতে লজ্জা করে না? এখনি পা ধরে স্কুলের পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

তা উনি পারতেন। ওঁর চড়ের জোর থেকেই আমরা তা আন্দাজ করে নিয়েছিলুম।

পুরুষমানুষ হয়ে অঙ্ক পারে না—এমন অঘটন কল্পনাও করতে পারতেন না মাস্টার মশাই। বলতেন, প্লেটোর দোরগোড়ায় কী লেখা ছিল, জানিস? যে অঙ্ক জানে না—এখানে তার প্রবেশ নিষেধ। স্বর্গের দরজাতেও ঠিক ওই কথাই লেখা রয়েছে। যদি সেখানে যেতে চাস, তা হলে—

স্বর্গের খবরটা মাস্টার মশাই কোত্থেকে যোগাড় করলেন তিনিই জানেন। প্লেটো কে, তাঁর দরজা দিয়ে ঢুকতে না পারলে কী ক্ষতি হবে, এ নিয়ে আমরা কোনোদিন মাথা ঘামাইনি। তাছাড়া যে স্বর্গে পা দিয়েই জ্যামিতির একস্ট্রা কষতে হবে কিংবা স্কোয়ার মেজারের অঙ্ক নিয়ে বসতে হবে, সে স্বর্গের চাইতে লক্ষ যোজন দূরে থাকাই আমরা নিরাপদ বোধ করতুম।

ম্যাট্রিকুলেশনের গণ্ডী পার হয়ে অঙ্কের হাত থেকে রেহাই পেলুম, মাস্টার মশাইয়ের হাত থেকেও। কিন্তু অঙ্কের সেই বিভীষিকা মন থেকে গেল না। এম-এ পাশ করবার পরেও স্বপ্ন দেখছি, পরীক্ষার লাস্ট্ বেল পড়ো-পড়ো, অথচ একটা অঙ্কও আমার মিলছে না। মাস্টার মশাই গার্ড হয়ে একবার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, দু-চোখ দিয়ে তাঁর আগুন ঝরছে। দাঁতে দাঁতে ঘষে বলছেন—

মাথার উপর ঘুরন্ত পাখা সত্ত্বেও ঘামে নেয়ে আমি জেগে উঠেছি। মৃদু নীল আলোয় দেখেছি চেনা ঘরটাকে, চোখে পড়ছে সামনে আমার পড়ার টেবিল, আমার বইপত্রের স্তূপ। গভীর তৃপ্তির সঙ্গে ভেবেছি, এখন আর আমাকে স্কুলে অঙ্ক কষতে হয় না, আমি কলেজে বাংলা পড়াই।

একদিন একটি পত্রিকার পক্ষ থেকে ফরমাস এল, আমার ছেলেবেলার গল্প শোনাতে হবে। আমি জানালুম, লেখক হিসেবে আমি নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি, আমার ছেলেবেলার গল্পে কারো কোনো কৌতূহল নেই। তাছাড়া এমন কোনো স্মরণীয় ঘটনাও ঘটেনি যে আসর করে তা লোককে শোনাতে পারি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ছাড়লেন না। তাঁরা জানালেন, সাহিত্যের ইন্দ্র চন্দ্র মিত্র বরুণেরা কেউ তাঁদের বিশেষ পাত্তা দেন নি, অতএব—

অতএব আমি ভাবলুম, তা হলে নির্ভয়ে লিখতে পারি। ওঁরা নিজেরা

ছাড়া ওঁদের কাগজের বিশেষ পাঠক নেই, সুতরাং আমার আত্মকথা কারো কাছে স্পর্ধার মতো মনে হবে না। কয়েকটি ঘরোয়া মানুষের কাছে ঘরোয়া গল্প বলব—ওটা প্রীতির ব্যাপার, পদমর্যাদার নয়। কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলুম।

মনে এল, মাস্টার মশাইয়ের কথা। লিখলুম তাঁকে নিয়েই।

ছবিটি যা ফুটল, তা খুব উজ্জ্বল নয়। লেখবার সময় কল্পনার খাদ কিছু মিশিয়ে নিলুম সেটা বলাই বাহুল্য। সেই সঙ্গে সদুপদেশও একটু বর্ষণ করেছিলুম। মূল কথাটা এই ছিল, অহেতুক তাড়না করে কাউকে শিক্ষা দেওয়া যায় না; গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করতে গেলে গাধাটাই পঞ্চত্ব পায়। তার প্রমাণ আমি নিজেই। মাস্টার মশাই আমাকে এত প্রহার করেও অঙ্ক শেখাতে পারেন নি, বরং যা শিখেছিলুম তা-ও ভুলেছি। এখন দুই আর দুইয়ে চার না পাঁচ হয়, তাই নিয়েই মধ্যে মধ্যে সন্দেহ জাগে।

পত্রিকার কর্তৃপক্ষ খুশি হয়ে আমাকে দশ টাকা দক্ষিণা দিয়ে গেছেন। মাস্টার মশাইয়ের কাছ থেকে এইটুকুই আমার নগদ লাভ।

তারপরে আরো অনেকদিন পার হয়ে গেল। সেই লেখার কথা ভুলে গেলুম, ভুলে গেলুম মাস্টার মশাইকেও। বয়স বেড়েছে, বিনিদ্র রাত্রিযাপনের মতো অনেক সমস্যা এসে দেখা দিয়েছে জীবনে। বর্তমানের দাবীটা এত বেশি জোরালো যে স্মৃতির দিকে তাকাবার অবসর পর্যন্ত মেলে না।

এমনি সময় বাংলা দেশের এক প্রান্তের একটি কলেজ থেকে ডাক এল। ওঁদের বার্ষিক উৎসব, অতএব আতিথ্য নিয়ে যেতে হবে ওখানে। এবং বক্তৃতা দিতে হবে।

এই সব উপলক্ষেই বিনা পয়সায় বেড়ানো যায়। তাছাড়া কলকাতা থেকে কেউ বাইরে গেলেই তার রাজোচিত সম্বর্ধনা মেলে—এখানকার চড়ুই পাখিও সেখানে রাজহংসের সম্মান পায়। কলকাতা থেকে দূরত্বটা যত বেশি হয়, আমাদের মতো নগণ্যের পক্ষে ততই সুখাবহ।

আমি সুযোগটা ছাড়তে পারলুম না।

গিয়ে পৌঁছুতেই চা-খাবার-আতিথেয়তার উচ্ছ্বাস। ছেলেরা তো এলই, দু'চারজন সম্ভ্রান্ত লোক এসেও বিনীতভাবে আলাপ করে গেলেন। এমন কি খানকয়েক অটোগ্রাফের খাতা পর্যন্ত এগিয়ে এল। রোমাঞ্চিত কলেবরে আমি স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে বাণী বিতরণ করতে লাগলুম, ব্যক্তি হিসেবে আমি যে এত মূল্যবান এর আগে কে ভেবেছিল সে-কথা!

সভায় জাঁকিয়ে বক্তৃতা করা গেল। রবীন্দ্রনাথ থেকে বারোটা উদ্ধৃতি দিলুম, আর একটা ইংরেজি কোটেশন চালিয়ে দিলুম বার্ণার্ড শ'র নামে, শেষে দেশের তরুণদের নিদারুণভাবে জাগ্রত হতে বলে যখন টেবিলে একটা প্রকাণ্ড কিল মেরে বক্তৃতা শেষ করলুম, তখন অল্পের জন্যে ফুলদানিটা রক্ষা পেলো। আর হল-ফাটানো হাততালিতে কান বন্ধ হওয়ার জো।

বুড়ো প্রিন্সিপ্যাল পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে আমাকে বললেন, ভারী চমৎকার

বলেছেন আপনি, যেমন সারগর্ভ, তেমনি সুমধুর।

আমি বিনীত হাসিতে বললুম, আজ শরীরটা তেমন ভালো নেই, তাই মনের মতো করে বলতে পারলুম না।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেরা বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল।

—শরীর ভালো নেই, তাতেই এইরকম বললেন স্যার। শরীর ভালো থাকলে তো—

অর্থাৎ প্রলয় হয়ে যেত। আমি উদার হাসি হাসলুম। যদিও মনে মনে জানি, এই একটি সর্বার্থসাধক বক্তৃতাই আমার সম্বল, রবীন্দ্র-জন্মোৎসব থেকে বন-মহোৎসব পর্যন্ত এটাকেই এদিক ওদিক করে চালিয়ে দিই।

স্তুতিতে স্ফীত মনে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছি, এমন সময় একটি ছেলে এসে খবর দিলে—এক বুড়ো ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, বেশ তো, ডেকে আনো এখানে।

ছেলেটি বললে, তিনি আসতে চাইছেন না—বাইরে মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আমার বক্তৃতায় নিশ্চয় কেউ অভিভূত হয়েছেন, আমাকে অভিনন্দন জানাবেন। এ অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে। সুতরাং দাক্ষিণ্য-পুলকিত চিত্তে আমি বললুম, আচ্ছা চলো, আমি যাচ্ছি।

হলের বাইরে ছোট একটি মাঠ—তরল অন্ধকারে ঢাকা। অত আলো থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমে ভালো করে কিছু দেখতেই পেলুম না। তারপর চোখে পড়ল মানুষটিকে। কুঁজো লম্বা চেহারা, মাথার সাদা চুলগুলি চিকমিক করছে।

ডাকলেন, সুকুমার!

আমি চমকে উঠলুম। এখানে কেউ আমার নাম ধরে ডাকতে পারে সেটা যেমন আশ্চর্য, তারও চেয়ে আশ্চর্য ওই গলার স্বর। আমার মনটাকে অদ্ভুত-ভাবে দুলিয়ে দিলে। স্মৃতির অন্ধকার থেকে একটা ভয়ের মৃদু শিহরণ আমার বুকের ভিতর দিয়ে বয়ে গেল।

—আমাকে চিনতে পারছ না সুকুমার? আমি—

চিনেছি। ভয় পাওয়ার অর্থটা বুঝতেও আর বাকী নেই। ওই ডাক শুনে ছেলেবেলায় বহুদিন আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে এসেছে—জানি এখনই একটা ভয়ংকর চড় আমার পিঠের উপর নেমে আসবে। সেই ভয়টার কংকাল লুকিয়ে ছিল মনের চোরাকুঠুরিতে—ওই স্বর বিদ্যুতের আলোর মতো তাকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

আমার মাথা তখনই ওঁর পায়ে নেমে এল।

—মাস্টার মশাই, আপনি!

মাস্টার মশাই বললেন, বেঁচে থাকো বাবা, যশস্বী হও। রিটায়ার করার পর এখানে এসেই মাথা গুঁজেছি। বাড়ী থেকে বড় বেরুই না। আজ তুমি বক্তৃতা করবে শুনে ছুটে এসেছি। খুব ভালো বলেছ সুকুমার, খুব খুশি হয়েছি।

কিন্তু আমি খুশি হতে পারলুম না। বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন মাস্টার মশাই, বুদ্ধিতে ছুরির ফলার মতো ঝক্‌ঝক্‌ করত চোখ। আজ আমার বক্তৃতার ফাঁপা ফানুস দিয়ে যদি ওঁকে ভোলাতে পেরে থাকি, তা হলে সেটা আমার কৃতিত্বে নয়, ওঁর মনেরও বয়স বেড়েছে বলে।

অপরাধীর মতো চাইলুম, না স্যার, আপনার সামনে—

মাস্টার মশাই আমাকে বলতে দিলেন না।

—তোমরাই তো আমাদের গর্ব, আমাদের পরিচয়। কিছুই দিতে পারি নি, খালি শাসন করেছি, পীড়ন করেছি।—বলতে বলতে জামার পকেট থেকে বের করলেন শতচ্ছিন্ন একটি জীর্ণ পত্রিকা : একদিন আমার ছেলে এইটে এনে আমাকে দেখালে। পড়ে আনন্দে আমার চোখে জল এল। কতকাল হয়ে গেল, তবু সুকুমার আমাকে মনে রেখেছে, আমাকে নিয়ে গল্প লিখেছে। সকলকে এই লেখা আমি দেখাই, বলি, দেখো, আমার ছাত্র আমাকে অমর করে দিয়েছে।

মুহূর্তে আমার জিভ শুকিয়ে গেল, লজ্জায় আত্মগ্লানিতে আমার মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। একটা কিছু বলতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু মুখে কথা ফুটল না।

মাস্টার মশাইয়ের গলা ধরে এসেছিল। একটু চুপ করে থেকে বললেন, কী যে আমার আনন্দ হয়েছে সুকুমার, কী বলব! তোমার এই লেখাটা সব সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। দু-একজন বলে, যেমন ধরে ধরে মারতেন, তেমনি বেশ শুনিয়ে দিয়েছে আপনাকে। আমি বলি, শোনাবে কেন—কত শ্রদ্ধা নিয়ে লিখেছে। আর সত্যিই তো—অন্যায় যদি করেই থাকি, ওরা ছাত্র —ওরা সন্তান—বড় হলে সে অন্যায় আমার শুধরে দেবে বই কি। জানো সুকুমার, আনন্দে তোমাকে আমি একটা চিঠিও লিখেছিলুম। কিন্তু পাঠাতে সাহস হয় নি। তোমরা এখন বড় হয়ে গেছ—এখন—

আর বলতে পারলেন না। আবছা আলোটায় এখন অভ্যস্ত হয়ে উঠে-ছিলুম, দেখলুম, মাস্টার মশাইয়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

মনে হল, স্নেহ-মমতা-ক্ষমার এক মহাসমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। সেই স্নেহ—কোটি মণি-মাণিক্য দিয়ে যার পরিমাপ হয় না ; সেই মমতা—যার দাম সংসারের সব ঐশ্বর্যের চাইতে বেশি ; সেই ক্ষমা—কুবেরের ভাণ্ডারকে ধরে দিয়েও যা পাওয়া যায় না।

আমি তাঁকে দশ টাকায় বিক্রী করেছিলুম। এ অপরাধ আমি বইব কী করে, এ লজ্জা আমি কোথায় রাখব!

রাণীর গল্প

'অনেক রাত হয়েছে, এবার ঘুমোও।'

'ঘুম আসছে না রাণী, তোমার সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগছে।'

'গল্প? তুমি আমাকে রাণী বলে ডাকো, আজ ওই ডাকটা শুনে একজন সত্যিকারের রাণীর গল্প আমার মনে পড়ল।'

'সত্যিকারের রাণীর সঙ্গে বুঝি তোমার খুব আলাপ ছিল?'

'পাগল! রাণীর সঙ্গে আলাপ করবার সাহস পাব কোত্থেকে? তবে তাঁকে চিনতুম। এই ঘরের পুবের জানালায় দাঁড়ালে ঠিক পার্কের গায়ে যে হলদে রঙের বাড়ীটা দেখা যায়, সেখানে তিনি থাকতেন। বাড়ীটার রঙ তখন অবশ্য সাদা ছিল।'

'চোখে পড়েছে বাড়ীটা। তা রাণী কী করতেন? হ্যাভানা চুরুট মুখে দিয়ে দুটো বাঘা কুকুর নিয়ে পার্কে বেড়াতেন বুঝি?'

'ঠাট্টা নয়। গল্পটা ভারী করুণ।'

'করুণ? রাজাসাহেব বোধ হয় রাত্রে মদ খেয়ে এসে রাণীকে হাণ্টার দিয়ে পিটতেন!'

'রাজাসাহেবই ছিলেন না—হাণ্টার আসবে কোত্থেকে?'

'ওঃ—রাজাসাহেব ছিলেন না? সেই দুঃখেই বুঝি রাণী ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে সুইসাইড্ করলেন?'

'তুমি ভারী দুষ্টুমি আরম্ভ করেছ। এই রইল তোমার গল্প, আমি পাশ ফিরছি।'

'না—না—আর কমেণ্ট করব না। তুমি বলে যাও।'

'বছর পাঁচেক আগেকার কথা। আই-এ পড়ি তখন।

আমাদের কলেজে মেয়েদের সেক্‌শন হয় সকালে—সে তো জানোই। বাড়ী থেকে যখন বেরোলুম তখনও সূর্য ওঠেনি। ট্রামলাইনের দিকে যেতে যেতে বাড়ীটাকে চোখে পড়ল। আমি দাঁড়িয়ে গেলুম।

বাড়ীটা ফাঁকা পড়েছিল প্রায় সাত মাস। জাঁদরেল একজন মিলিটারি অফিসার বাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে এই ক্রাইসিসের দিনেও যে ওটা খালি পড়ে ছিল, তার কারণ বোধহয় দুটো। একে অসম্ভব ভাড়া, তায় বাড়ীওলা কোটিপতি বলে কুলীন জাতের কেউ না হলে পাত্তাই পেতো না।

তাই খানতিনেক লরী থেকে দামী ফার্নিচার নামতে দেখে বুঝলুম, ও বাড়ীতে অসামান্য কারুর আবির্ভাব হয়েছে। ট্রাম এসে পড়েছিল, কলেজেরও সময় হয়ে গেছে, তাই বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলুম না। কিন্তু কৌতূহলটা জেগেই রইল মনের ভেতর।'

'কিউরিয়সিটি, দাই নেম ইজ—'

'আবার ইয়ার্কি' হচ্ছে ! যাও—বলব না গল্প।'

'লক্ষ্মীটি, প্লীজ। আর গোলমাল করব না।'

'কলেজ থেকে ফিরে দেখি ফার্নিচার সব তোলা হয়ে গেছে। আর প্রকাণ্ড এক মেরুন রঙের মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে পোর্টিকোর নীচে।

খবর পেলুম বড়দির কাছ থেকে।

—কোথাকার এক রাণী এসে বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছেন।

—রাজা আসেন নি ?

—না, তিনি বিলেতে আছেন ছ'সাত বছর। ওখানে নাকি এক মেম-সায়েবকে বিয়ে করেছেন।

—এত খবর তুই কী করে জানলি দিদি ?

—আমাদের সুবল বাজার করতে যাওয়ার সময় রাণীর খাস চাকর জগন্নাথের সঙ্গে ভাব জমিয়ে এসব জেনে এসেছে।

—রাণীর বয়স কত দিদি ? বুড়ী নাকি ?

—না—না, বুড়ী নয়। তিরিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না। কয়েকবার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল, তখনই দেখেছি। এমনিতে বছর পঁচিশেকের মতো লাগে। তবে রাজারাজড়ার কারবার তো, রংটং মেখে দশ বছর কমিয়েছে নিশ্চয়।

—দেখতে কেমন রে ?

—ছিপছিপে লম্বা চেহারা—টকটকে গায়ের রঙ। তবে রঙের ওপর কতখানি পালিশ আছে ওরাই জানে।

বড়দির কাছে এই পর্যন্ত খবর পেলুম। তারপর প্রায়ই দেখতে পেতুম রাণীকে। পার্কে কখনো আসতেন না, তবে বিকেলের রোদ পড়ে এলে মধ্যে মধ্যে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াতেন, ব্যালাস্ট্রেডের ওপর কনুই রেখে তাকিয়ে থাকতেন অন্যমনস্ক ভাবে। এতদূর থেকে মুখখানা ভালো দেখা যেত না—তবে যেটুকু বুঝতে পারতুম, নকলের কারবার যদি কিছু থাকেও তবু ভদ্রমহিলা রূপবতী। আর রাজরাণী হতে গেলে রূপ না হলেই বা চলবে কেন !

রাণীর বাড়ীতে কিন্তু কখনো লোকজনের বিশেষ আনাগোনা চোখে পড়ত না। দু'তিনটি ঝি-চাকর, সোফার—মধ্যে মধ্যে এক-আধজন কারা কী সব জিনিসপত্র নিয়ে আসত। রাত্রে চড়া সুরে রেডিও বাজত—প্রায় বারোটা একটা পর্যন্ত বিলিতী গান শুনতে পেতুম—বি-বি-সি কিংবা ওইরকম একটা কিছু হবে। তাছাড়া সারাদিন একেবারে নিঝুম হয়ে পড়ে থাকত বাড়ীটা। বোঝা যেত, রাণী অসামাজিক মানুষ।

অসামাজিক হওয়ার আসল কারণ তো প্রথম দিনই শুনেছিলুম। রাণীই হোক আর যাই হোক—স্বামী যাকে ছেড়ে দিয়ে বিদেশে নতুন করে বিয়ে করেছে, সামাজিক হওয়ার মতো মনের শান্তি তার না থাকাই স্বাভাবিক। সুবল মধ্যে মধ্যে ও-বাড়ীতে আসা-যাওয়া করত। সে-ই বলত, রাণী

সারাদিন বই পড়েন—নয়তো চুপচাপ শুয়ে বসে থাকেন। সন্ধ্যে হলে রেডিও খুলে দিয়ে গেলাস নিয়ে বসেন তার সামনে। কিসের গেলাস সুবল তা বলেনি, আমরাও জিজ্ঞেস করিনি।

কিছুদিন বাদে আশপাশের আরো দশজন প্রতিবেশীর থাকার মতো রাণীর থাকাটাও সহজ হয়ে গেল। যেদিন ফার্স্ট পিরিয়ডে ক্লাস থাকত, সেদিন কখনো কখনো রাণীকে সেই বড় মেরুন রঙের গাড়ীটাতে দেখতে পেতুম—আমার পাশ দিয়েই বেরিয়ে যেতেন। খুব সম্ভব লেকে কিংবা গড়ের মাঠে বেড়াতে বেরুতেন। ওই সময়টায় খুব কাছ থেকে রাণীকে দেখতে পেতুম। বেশ সুন্দর ধারালো চেহারা—তবে বড্ড রোগা। কোনো রাণী অত রোগা হলে ভালো লাগে না—মনটা কেমন খচখচ করতে থাকে।

এই পথেই একদিন রাণীর সঙ্গে আলাপ হল।

ট্রামলাইনের দিকে পা বাড়িয়েছি, হঠাৎ সেই মেরুন রঙের গাড়ীটা প্রায় আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি চমকে উঠলুম।

গলা বের করে রাণী বললেন, তুমি কোন্ দিকে যাবে ?

—আমাকে বলছেন ? আমি দিশেহারা হয়ে তাকালুম এদিকে-ওদিকে। কিন্তু কাছাকাছি আমি ছাড়া আর কেউই ছিল না। রাণীর মুক্তোর মতো দাঁতে আবার একঝলক হাসি দেখা দিলে।

—আশুতোষ কলেজে যাচ্ছ তো ? চলো, তোমায় লিফট্ দিই—

বলেই খুলে দিলেন গাড়ীর দরজা।

ব্যাপারটা এত হঠাৎ আর এমনি হকচকিয়ে গিয়েছিলুম যে কোনো কথা বলতেই পারলুম না। খানিকটা হিপ্নটাইজডের মতো গাড়ীতে উঠে বসলুম। গাড়ী চলতে শুরু করল।

আমার থেকে মাত্র চার আঙুলের তফাতে বসেছেন রাণী—সেই রহস্যময় মানুষটি—যার সম্বন্ধে যত শুনেছি, কল্পনা করেছি তার পাঁচগুণ। রাণীর ফিকে গোলাপী শাড়ীর আঁচল আমার গায়ে পড়েছে, একরাশ তীব্র সুগন্ধির আঘাত লাগছে মুখের ওপর, সবুজ ভেলভেটের স্ট্র্যাপ্ দেওয়া বর্মা চটির ভেতরে দুখানা টুকটুকে পা চোখে পড়ছে। এত কাছে বসে আছেন রাণী, অথচ আমি ওঁর মুখের দিকে চোখ তুলে চাইতে পারলুম না।

রাণী বললেন, প্রায়ই তোমাকে এই সময়ে কলেজে যেতে দেখতে পাই। ভাবি আলাপ করব। কোন্ ইয়ারে পড়ো তুমি ?

মাথা নীচু রেখেই বললুম, এবার ইণ্টারমিডিয়েট দেব।

—ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করতে পারবে তো ?

আমার কেমন অপমান বোধ হল। মুখ তুলে রাণীর দিকে তাকিয়ে বললুম, আমি স্কুল ফাইন্যালে স্কলারশিপ পেয়েছি।

রাণীর শীর্ণ সুন্দর মুখখানা হাসিতে ভরে উঠল।

—তাই নাকি ? ভারী খুশী হলুম। আই-এ'তে স্ট্যাণ্ড করতে পারবে তো ?

বললুম, দেখি চেষ্টা করে।

রাণী আস্তে আস্তে বললেন, আমি লেখাপড়ায় খুব খারাপ ছিলুম। দু'বার বি-এ দিয়েও পাশ করতে পারিনি। পড়াশুনোয় কাউকে ভালো দেখলে তার ওপর আমার হিংসে হয়।

এ কথার কী জবাব দেওয়া যায় আমি জানতুম না। কিছু না ভেবেই বললুম, আপনি রাণী—আপনাকেই তো সবাই হিংসে করে।

রাণী একটু চুপ করে রইলেন। তারপর অল্প একটু হেসে বললেন, হিংসে করে? তা বটে।

তারপর আর কোনো কথা হল না। আমার কেমন অস্বস্তি লাগছিল, অপরিচিত বিলিতি সেন্টের গন্ধে কেমন ঝিম ঝিম করছিল মাথাটা। জানালা দিয়ে আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

গাড়ী কলেজের সামনে এসে দাঁড়াল। সোফার নেমে দরজা খুলে দিলে।

বললুম, আমি যাই।

রাণী হেসে হাত নেড়ে বললেন, এসো।

গাড়ী চলে গেল।

কিন্তু কলেজে না ঢুকতেই মেয়েরা ছেঁকে ধরলে চারদিক থেকে।

—তোরা বুঝি গাড়ী কিনেছিস?

বললুম, আমার বাবা গরীব মানুষ। গাড়ী কেনার স্বপ্নও আমরা দেখি না।

—তবে কার গাড়ীতে এলি? সোফার যে রকম স্যালুট ঠুকল, তাতে মনে হল কোনো রাজা-মহারাজা—

—ঠিক ধরেছিস, উনি একজন রাণী। আমাদের পাড়ায় থাকেন।

—রাণী! একটা চাপা গুঞ্জন উঠল মেয়েদের ভেতর। তারপর একজন বাঁকা হেসে বললে, যাক, ভালো ঘাটেই নোঙর ফেলেছিস, তোর আর ভাবনা নেই।

—মানে?

—মানে রাণীর যখন মোসাহেব হতে পেরেছিস তখন ভবিষ্যতে হয়তো রাজপুত্রকেই ঘায়েল করে বসতে পারিস।

এমন অশ্লীল ভাবে বললে যে অপমানে আমার সারা গা জ্বলে উঠল।

—আমি কারো মোসাহেব নই।

—ঠিক কথা—গ্রামার ভুল হয়েছে। মোসাহেবের ফেমিনিন কী হবে রে? মোমেম?

উৎকট হাসিতে ভেঙে পড়লো অন্য মেয়েরা—এমন কি এতদিন যাদের বন্ধু বলে ভেবে এসেছি, তারাও। আমি পা চালিয়ে সোজা ক্লাসরুমে চলে গেলুম।

মনটা খিঁচড়ে গিয়েছিল, বিশ্রী লাগল ক্লাসগুলো। প্রতিজ্ঞা করলুম, রাণীর সঙ্গে কোনোদিন আর কথাই বলব না। ও-সব উঁচু জাতের লোকের

একটু কাছাকাছি যাওয়াও বিপজ্জনক।

পরদিন আবার ফার্স্ট পিরিয়ডে ক্লাস। দুরু দুরু বুকে বেরিয়েছি। আর কী যোগাযোগ—রাণীর গাড়ী আবার ঠিক আমার পাশটিতে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

রাণী হেসে বললেন, এসো।

আমি শক্ত হয়ে উঠলুম। বললুম—মাপ করবেন। পথে একটা কাজ আছে—সেইটে সেরে কলেজে যেতে হবে।

—বেশ তো, আমি নিয়ে যাচ্ছি যেখানে যেতে চাও।

—ধন্যবাদ। দরকার নেই।

রাণীর হাসিটা নিবে গেল—তাঁর মুখের রঙটা কেমন বদলে গেছে বলে মনে হল। আস্তে আস্তে বললেন, আচ্ছা তা হলে থাক।

মেরুন রঙের মস্ত বড় গাড়ীটা দীর্ঘশ্বাসের মতো খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে এগিয়ে চলে গেল। জানি না কেন, আমার ভারী কষ্ট হল। মনের মধ্যে অপরাধ-বোধ হল খানিকটা, হয়তো আরো ভদ্রভাবে ওঁকে কথাগুলো বুঝিয়ে বলা চলত।

তারপর থেকে রাণীর গাড়ী আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে অনেকবার। কিন্তু আর থামেনি। রাণী আমার দিকে কখনো তাকিয়েছেন কিনা বলতে পারব না, কিন্তু আমি আর চোখ তুলে চাইতে পারিনি তাঁর দিকে।

'ঘুমুলে ?'

'না, ঘুমোবার জো কী! খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে। তবে ভাবছি ব্যক্তিটি রাণী না হয়ে যদি রাজপুত্র হত, তা হলে এ গল্প আমার শোনবার সুযোগ ঘটত কিনা।'

'হয়েছে, ফাজলামো করতে হবে না। তারপর শোনো।

আমাদের পাড়ায় তখন মেয়েদের একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। ছিল কেন—এখনো আছে। তবে ওটা এখন বড় বড় লোকদের হাতে—সাদার্ন এভিনিউয়ের দিকে সরে গেছে। তখন আমরাই ওটা চালাতুম।

প্রোব্লেম ছিল চিরকাল যা থাকে—তাই। অর্থাৎ টাকার অভাব। বড় একটা শো করবার চেষ্টা হচ্ছিল। অন্ততঃ সাত-আটশো টাকা দরকার। আমরা বড়জোর শ'দুয়েকের যোগাড় করতে পারি। বাকীটার কী হবে ?

একজন দিদিগোছের বললেন, রাণীর কাছে গেলে হয় না ?

সকলে সমস্বরে বললেন, ঠিক ঠিক। তা ছাড়া মহিলাদের প্রতিষ্ঠান—ওঁর তো সহযোগিতা করাই উচিত। আর একজন বললেন, শ'পাঁচেক টাকা যদি দান করেন, তা হলে ওঁকে আমাদের স্থায়ী সভানেত্রী করতে পারি।

সকলে যেন একসঙ্গে স্বপ্ন দেখতে লাগল। পাঁচশো টাকা কেন, রাণী ইচ্ছে করলে পাঁচ সাত হাজারই বা কতক্ষণ!

—সীতা, তোমাকেও যেতে হবে ডেপুটেশনে।

আমি প্রতিবাদ করে বললুম, না—না।

—না কেন ? রাণী তোমাকে ভালোবাসেন, তাঁর মোটরে লিফট্ দেন—তুমি গেলে কিছুতেই আমাদের কথা ঠেলতে পারবেন না।

আমার ট্র্যাজেডিটা দ্যাখো একবার। কতদিন আগে মাত্র একবার মোটরে চেপেছিলুম—সেই খ্যাতি কী ভাবে ছড়িয়েছে! আর ভোর ছ'টায় রাণীর মোটরে উঠে বসাটা যে এত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে—সে-কথাই বা কে ভাবতে পেরেছিল!

আমি বিব্রত হয়ে বললুম, সেই কবে একদিন লিফট্ দিয়েছিলেন—তাতে এমন কিছু খাতির হয়নি আমার সঙ্গে। আমি যেতে পারব না।

সবাই তখন এক বাক্যে বললেন, তা হলে বুঝব তুমি আমাদের সংঘের উন্নতি চাও না।

এরপরে আর না বলবার জো রইল না। আমরা তিনজন গেলুম ডেলিগেশনে। আমি, রেণুদি আর জ্যোতি মাসিমা। জ্যোতি মাসিমা এ্যাডভোকেটের স্ত্রী—লোকে বলে, হাইকোর্টে প্র্যাক্‌টিস করলে নাকি স্বামীর চাইতে তাঁরই বেশি পশার হত।

দারোয়ান আমাদের নিচের মস্ত ড্রয়িংরুমে নিয়ে গিয়ে বসালো। আমি অস্বস্তিতে ঘামতে লাগলুম।

দু'মিনিটের মধ্যেই রাণী নেমে এলেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হাসলেন, আমি মাথা নামিয়ে নিলুম। তারপর স্নিগ্ধ কোমল ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই আপনাদের ?

প্ল্যান আগেই করা ছিল। বাড়ী গিয়েই টাকাটা ফস্ করে চেয়ে বসাটা ঠিক হবে না। বিকেলে ওঁকে আমাদের সংঘে নিয়ে আসা হবে। উনি একবার অনুগ্রহ করে সব দেখবেন শুনবেন। ওঁর সহযোগিতা পেলে মেয়েদের এই প্রতিষ্ঠানটা—

আমাদের দুজনকে কিছু করতে হল না—জ্যোতি মাসিমা একাই বলে চললেন। একটানা পঁচিশ মিনিট।

আমাদের বিরক্তি লাগছিল। কিন্তু মুখে একটুখানি হাসি টেনে রেখে রাণী নিঃশব্দে শুনে গেলেন সব। আমি লক্ষ্য করে দেখলুম, এর মধ্যে যেন আরো শীর্ণ হয়ে গেছেন রাণী—মুখে একটা অদ্ভুত চাপা-যন্ত্রণা যেন কোথায় লুকিয়ে আছে—চোখের দৃষ্টি অসাধারণ ক্লান্ত। জ্যোতি মাসিমা বললেন, তা হলে আজ সন্ধ্যেয় একবার—

—আমার শরীরটা তেমন ভালো নেই। দয়া করে যদি এখন আমায় মাপ করতেন—

—আপনাকে বিশেষ কষ্ট দেব না। যেতে আসতে দশ মিনিট, আমাদের সংঘে মিনিট পনেরো।

একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে রাণী বললেন, আচ্ছা।

এর মধ্যে আমাদের চা এল। রুটি, মাখন, কেক্, আঙুর। আমি চা ছাড়া বিশেষ কিছু খেলুম না—রেণুদি একটা কেক পর্যন্ত এগোলো। কিন্তু

জ্যোতি মাসিমা তার বক্তৃতার দামটা আদায় করতে ছাড়লেন না—আমাদের তিনজনের খাওয়াটা একাই সেরে নিলেন।

রাণী কিছুই স্পর্শ করলেন না। জানালা দিয়ে পার্কের একটা কাঞ্চন গাছের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেটা বসন্তের ফুলে ফুলে ভরে উঠেছিল।'

'এ পর্যন্ত করুণ কাহিনী তো কিছু পাচ্ছি না। রাণী বুঝি শেষ পর্যন্ত বিয়ে করলেন তোমাদের? গেলেন না?'

'ব্যস্ত হয়ো না, শেষটা শোনো।'

সন্ধ্যেবেলায় কাঁটায় কাঁটায় ছ'টাতে মেরুন রঙের গাড়ীটা আমাদের সংঘের দুয়োরে এসে দাঁড়ালো।

দুটি মেয়ে শাঁখ বাজালে, জ্যোতি মাসিমা নিজে রাণীর গলায় একছড়া গোড়ের মালা পরিয়ে দিলেন। রাণীকে আমরা রাণীর মতোই অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলুম। আমাদের পাঠাগার তাঁকে দেখানো হল—ওরই মধ্যে এক ফাঁকে জ্যোতি মাসিমার দশ বছরের মেয়ে কাবুলী একখানা ভরতনাট্যও দেখিয়ে দিলে। একজন ভজনও শোনাল একখানা।

তারপরে নিয়ে যাওয়া হল চায়ের টেবিলে। খরচপত্র করে চৌরঙ্গীর খাবার আনা হয়েছিল। কে. সি. দাশ থেকে সুইস্ কন্‌ফেক্‌শনারি পর্যন্ত কিছুই বাদ পড়েনি। আইডিয়া জ্যোতি মাসিমার। বড় মাছ ধরতে গেলে ভালো চারের ব্যবস্থা রাখা দরকার।

রাণী কিন্তু একটুকরো খাবারও ছুঁলেন না। কেবল আমার মনে হল, খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে মুহূর্তের জন্য তাঁর চোখ দুটো অস্বাভাবিক ভাবে জ্বলে উঠল, কিন্তু চায়ের পেয়ালাটাই মাত্র টেনে নিলেন তিনি।

—কেন এ-সব করলেন? বিকেলে অনেক খেয়ে বেরিয়েছি, কিছুই ছুঁতে পারব না এখন।

খাবারগুলো ফেলা যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, আমরা অনেকেই আছি, বিশেষ করে জ্যোতি মাসিমা তো আছেনই। তবু এগুলো নষ্ট হবে বলে মাসিমাই সাজিয়ে-গুছিয়ে অনেকক্ষণ দুঃখ করলেন। আসল কথাটা ভাঙলেন তারপর।

—আপনার কাছ থেকে কিছু সাহায্য আমরা চাই, যদি অন্তত শ'পাঁচেক টাকা—

রাণী চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলেন। নামিয়ে রাখলেন। গম্ভীর বিষণ্ন দৃষ্টিতে সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। আস্তে আস্তে বললেন, পাঁচশো টাকা?

তাঁর কথার স্বরে উৎসাহ পেয়ে জ্যোতি মাসিমা বললেন, বেশি পেলে আমাদের তো আরো ভালো হয়।—প্রকাণ্ড মুখখানা তাঁর বিগলিত হাসিতে ভরে গেলঃ তবে—

রাণী ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে চেক-বই বের করলেন আর ছোট একটি কলম।

তারপর চেক লিখতে লাগলেন।

কিন্তু আমার কেমন বিশ্রী লাগছিল। রাণীর চোখ দুটো অমন ঘোলা দেখাচ্ছে কেন—হাতটা কাঁপছে কেন অল্প অল্প?

রাণী চেক লিখলেন। তারপর ভাঁজ করে মাসিমার হাতে দিয়ে বললেন, আচ্ছা, উঠি আজ—

ওদিকে চেক খুলে মাসিমার চোখ প্রায় আকাশে উঠল। পাঁচশো নয়—পাঁচ হাজারের চেক!

খাবি খেতে খেতে জ্যোতি মাসিমা বললেন, দেখুন—কী বলে—কী যে আপনাকে ধন্যবাদ—

কিন্তু ধন্যবাদের আর দরকার ছিল না। রাণী উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ অসহ্য যন্ত্রণায় তাঁর চোখ যেন বুজে এল, বিকৃত মুখে টেবিলের কোণটা চেপে ধরলেন—তারপরেই হুড়মুড় করে পড়ে গেলেন।

ডাক্তার! জল! পাখা! তুমুল কান্ড!

রাণী সেই রাতেই হাসপাতালে মারা গেলেন।'

'মারা গেলেন?'

'হ্যাঁ—হার্ট খারাপ ছিল। তার চাইতেও বড় কথা—প্রায় এক মাস নাকি রাণী প্রায়-অনাহারে ছিলেন।'

'অনাহারে? শখ করে?'

'না—খাবার পয়সা ছিল না।'

'তার মানে?'

'মানেটা বোঝা গেল পরের দিনই। মোটর, ফার্নিচার, রেডিও—সব ভাড়া, কিন্তু এই তিন মাসে কেউ এক পয়সা ভাড়া পায়নি। আমাদের জন্যে যে খাবারটা এসেছিল—তা-ও বাকীতে।'

'বলো কি! বাকীতে চাল বজায় রেখেছিলেন, অথচ নিজের খাওয়া যোগাড় করতে পারেন নি?'

'হয়তো ওইটুকুই রাণীর আত্মমর্যাদা। বাইরের সম্মান বাঁচাতে চেয়েছেন—কিন্তু নিজেকে প্রতারণা করতে পারেন নি। দু'দিনের মধ্যেই ফার্নিচারওলা কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে তার জিনিস নিয়ে গেল, মোটর ফিরে গেল গ্যারাজে। আরো মজার কথা শুনবে? তেতলায় রাণীর শোবার ঘরে ওই রেডিওটা ছাড়া ছিল মাত্র একটা টেপের খাটিয়া—তাতে ময়লা একটা সুজনি আর একটা পুরোনো বালিশ। জ্যোতি মাসিমার সবচেয়ে বড় দুঃখ, চেকটা তিনি ক্যাশ করতে পারেন নি—রাণীর একাউণ্টে এক পয়সাও ছিল না। আমার কী মনে হয় জানো? শেষ মিথ্যেটা ধরা পড়বার আশঙ্কাই অত তাড়াতাড়ি ওঁর মৃত্যু ডেকে আনল।'

'রাণী—না না, সীতা, এ-ই হয়। এই রাজা-রাণীরা এমনি ফাঁকির ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। নিজের মিথ্যের ভারে এমনি করে সবাই ওরা ধ্বসে পড়বে। এ-ই হল এদের জীবনের প্রতীক। তাই না? তোমার গল্পটা

সিম্বলিক। কী বলো? জবাব দিচ্ছ না যে? ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? আচ্ছা ঘুমোও—ঘুমোও—।'

গলি

সেই ভদ্রলোক বলছিলেন, তখন রায়টের সময়—বুঝলেন! আমাদেরই মেসের একটি ছেলে ওই গলিটা দিয়ে শর্টকাট করছিল। প্রায় কারফিউয়ের মুখ—সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ভেবেছে এইটুকু তো রাস্তা—চট করে পেরিয়ে যাব! কিন্তু পার হতে আর পারল না। উঁচু প্রাচীরটার ওপরে যেখানটায় আইভির ছায়া খুব ঘন হয়ে নেমেছে—সেখান থেকে শাঁ করে বেরিয়ে এল একজন লোক—ছেলেটা ভালো করে কিছু বোঝবার আগেই একখানা ছোরা একেবারে পেটের ভেতর!

এমন একটা বীভৎস ব্যাপারের বর্ণনা দিতে গিয়েও কী নির্বিকার ভদ্রলোক। একমুখ পান-জর্দা খেয়েছিলেন, পচাৎ করে পিক ফেললেন রাস্তার ধারে—পিচকারি দিয়ে খানিক রক্ত ছিটকে পড়ল যেন। তারপর একটা সিগারেট বের করে দেশলাইয়ের ওপর ঠুকতে ঠুকতে বলে চললেন, ডেড্ বডিটা তিন-চারদিন পড়ে রইল ওখানেই। ফুলে প্রকাণ্ড হয়ে উঠল—উত্তর দিকের জানালা খুলে রাখলে হাওয়ায় পচা গন্ধ ভেসে আসত। সবচাইতে বিশ্রী লাগতো মশাই, সামনের ছড়ানো ডান হাতটা—তার আঙুলে ছিল একটা তামার আংটি। এত দূরে থেকেও দেখতে পেতুম সেই আংটিটা রোদে ঝিকমিক করছে।

ভদ্রলোক সিগারেট ধরিয়েছিলেন। একেবারে স্বাভাবিক ভাবেই। গল্পটা এর আগে নিশ্চয় আরো অনেককে বলেছেন—বলতে বলতে প্রায় পার্ফেকশনে পৌঁছেছেন এখন। সেদিনের ভয়াবহ স্মৃতিটা এখন একটা নিপুণ বর্ণনায় পরিণত হয়েছে—সেরা আর্টিস্টের কাজের মতো ইম্পারসোন্যাল।

কিন্তু গলা শুকিয়ে উঠল অজিতের। ধড়ফড় করতে লাগল বুকের ভেতরে।

—থাক্ থাক্। আর বলবেন না।

টিউশন সেরে রাত্রে তাকে ফিরতে হয় ওই গলিটা দিয়েই। উত্তর কলকাতার মানুষ-গিস্‌গিস্-করা এই অঞ্চলে অমন একটা আশ্চর্য গলি যে আছে না দেখলে কল্পনাই করা যায় না। প্রায় সতেরো-আঠারো ফুট চওড়া মাছের টান-লাগা ছিপের মতো বেঁকে দুটো বড় রাস্তার সঙ্গে মিশেছে দুদিকে। গলির চৌদ্দ আনা অংশেই কোনো বসতি নেই—দুটো উঁচু প্রাচীর চলেছে দুধার দিয়ে। একদিকে পৌর-প্রতিষ্ঠানের ময়লা ফেলা গাড়ীর আস্তানা—আর একদিকে একটি মিশনারী কলেজ। কলেজের দেওয়ালের

ওপর এখানে ওখানে ঝুলে পড়েছে আইভির ঝাড়—উঁচু হয়ে আছে পামের মাথা আর পৌর-প্রতিষ্ঠানের নিশ্ছিদ্র কানা-দেওয়াল আস্তর-ঝরা ইঁটে যেন একরাশ রক্তমাখা দাঁত মেলে রেখেছে।

দিনের বেলা তবু এক-আধজন মানুষ চলে। কিন্তু রাত কিছু বেশী হলে—রায়টের এই এতদিন পরেও, ছোরা নিয়ে এসে যে কেউ ঘাতক হয়ে দাঁড়াতে পারে সামনে। কিন্তু এখন আর কোনো ঘটনা ঘটে না এখানে। দিনে গলিটা শান্ত ছায়ার মধ্যে ঝিমিয়ে পড়ে থাকে—রাত্রের ঝিলিমিলি আলোয় কখনো কখনো কলেজের দেওয়ালের ওপাশ থেকে আসা ফুলের গন্ধে ভরে যায়।

অজিতও এই পথ দিয়ে ফিরেছে এতকাল। শুধু টিউশন করে নয়—অন্য কারণেও কতদিন রাত বেশি হয়ে গেছে, আর এই গলিতে পা দিয়েই খুশি হয়ে উঠেছে তার মন। আঃ, এতক্ষণের ভিড়, এত বিশ্রী প্রগল্ভ আলো থেকে হঠাৎ যেন চোখের ছুটি। মানুষ আর আলোর মরুভূমিতে ছায়া আর নির্জনতার মরূদ্যান। কোনো কোনো দিন পামের পাতা থেকে এসেছে অদ্ভুত মর্মর—মনে পড়েছে দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রতীরে তালবনের ঝঙ্কার। 'রাত কী রাণী' একঝলক গন্ধ উপহার দিয়েছে—মনে পড়েছে জ্যোৎস্না রাতে টাঙ্গায় চড়ে তাজমহলে যেতে যেতে এমনি গন্ধ পেয়েছে বাতাসে।

কিন্তু এখন থেকে অন্যরকম।

দেড়মাস আগে সুমিত্রার বিয়ে হয়ে গেছে এক এন্‌জিনিয়ারের সঙ্গে। তীরের মতো এসে বিঁধেছিল খবরটা। না—সুমিত্রার দোষ নেই। একে তো ছেলেমানুষ—সবে সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। অজিতের জন্যে সে সারাজীবন অপেক্ষা করে থাকবে এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া তার পক্ষে যেমন অবাস্তব—সেটা পালন করা আরো অসম্ভব। আর একটি সতেরো বছরের মেয়ে। নিজের মনকেই বা কতটুকু সে জানে?

অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হয়েছে দুদিন, মনে হয়েছে বুকের ভেতর থেকে হৃৎপিন্ডটাকে টেনে উপড়ে নিয়েছে কেউ। কিন্তু সুমিত্রার ওপর অজিত রাগ করতে পারেনি। সামান্য কেরানী তার বাবা। চার-চারটি মেয়ে—বড়টির বিয়ে দিয়েই ঘাড় গুঁজড়ে পড়েছিলেন। মেজো মেয়ে সুমিত্রার কপাল ভালো—মার রূপ আর বাবার লম্বাটে ছাঁদ পেয়েছিল বলে বিনা পণে এক এন্‌জিনিয়ার ওকে তুলে নিয়ে গেলেন। রূপকথার নায়ক এসে উদ্ধার করল রাজকন্যাকে। সেখানে কী করে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবে অজিত? নিতান্ত সাধারণ চেহারার শ্যামবর্ণ একটি মানুষ—থার্ড ক্লাস এম-এ, স্কুল মাস্টার একজন?

সহজ করেই নিতে চেয়েছে। তিন দিনের দাড়ি রেখে, দু দিন না খেয়ে দুঃখ-বিলাস করেনি। সময়ই বা কোথায়? টিউশন আছে, স্কুল আছে, টার্মিনাল পরীক্ষার খাতা আছে। কোনো কাজে ত্রুটি হয়নি অজিতের—তার স্বভাব-গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ জিজ্ঞেস করেনি, 'ও মশাই, হল কী

আপনার? কেবল এক-একদিন রাত্রে ঘুম আসেনি, কেবল মেসের ঘরের দেওয়ালে সোঁদা গন্ধটা অসহ্য ঠেকেছে এক-এক সময়, কেবল কখনো কখনো এক-আধটি সুশ্রী দীর্ঘচ্ছন্দা মেয়েকে পথেঘাটে দেখে চমকে উঠেছে চিন্তাটা ঃ সুমিত্রা নয় তো?

আর ভুলে গেছে এই গলিটাকে। অভ্যাসের বশেই শর্টকাট করেছে পথটা দিয়ে। অন্য যে কোনো পথের সঙ্গে এর আর তফাৎ নেই এখন। সেই পামের পাতায় দক্ষিণ-সমুদ্রবেলার তালমর্মর নেই—'রাত-কী রাণীর' গন্ধে আর তাজের চূড়ো জ্যোৎস্নার মেঘের মতো ভেসে ওঠেনি, আর ছায়া জড়ানো আলোর কণাগুলোকে মনে হয়নি সুমিত্রাদের বাড়ীর সামনের বকুল গাছটার একমুঠো ঝরা ফুলের মতো। যে কোনো একটা পথ দিয়ে মেসে ফিরতে হবে, তাই এই গলি দিয়ে চলা। এ ছুতোরপাড়ার গলি হলেও কিছু আসে যায় না—নূর মহম্মদ লেন হলেও তার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

তারপর এই ভদ্রলোক গল্পটা বললেন। বললেন, রাস্তার মোড়ে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। জর্দা খেয়ে খানিকটা পিক ফেললেন, সিগারেট ধরালেন, ধীরেসুস্থে হেঁটে গেলেন বত্রিশের সি বাস-স্টপের দিকে। আজ ছুটির দিন—দক্ষিণেশ্বরে কোথায় মাছ ধরতে যাবেন।

পাকা আর্টিস্টের মতো ইমপার্সোন্যাল। অনেকের কাছে বার বার বলে বলে নিপুণ নিখুঁত বিবরণ। এমন কি খুন হয়ে যাওয়া মানুষটার ছড়ানো ডান হাতে তামার আংটির ঝিকিমিক পর্যন্ত।

না—এই ভদ্রলোকের ওপর রাগ করা চলে না। সেই রায়টের সময়। এক যুগেরও বেশি। এখন তো সবই স্মৃতির ওপর রঙ-চড়ানো—এখন তো সব কিছুই গল্প হয়ে যাওয়া। পনেরো বছর আগে এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার বরদাবাবুর বড় ছেলে বাসের তলায় চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল—সেদিনও তো টিফিনের সময় চা খেতে খেতে তার খুঁটিনাটি বিবরণ দিচ্ছিলেন বরদাবাবু। শুনতে শুনতে বরং অজিতের মনে হয়েছিল, এক ধরনের আত্মপ্রসাদই পাচ্ছেন তিনি, সকলের ছেলেরই বাস চাপা পড়ে মরবার সুযোগ ঘটে না—বরদাবাবু হয়তো একটা বিশিষ্টতার গৌরবই অনুভব করছিলেন।

এ ভদ্রলোকের দোষ নেই। বরং তাঁর বাচন-কৌশল প্রশংসা করবার মতো। সেই কতদিন আগেকার একটা খুনের ঘটনাকে চোখের সামনে একেবারে জীবন্ত করে তুললেন। অজিত বেশি কথা বলতে পারে না—যা বলে তা-ও গুছিয়ে আসে না জিভের ডগায়। তাই বাক্‌পটু মানুষদের সম্পর্কে সশ্রদ্ধ ঈর্ষা আছে তার মনে।

কিন্তু এই গলির পথটাই দুর্গম হয়ে উঠল আপাতত।

রাত্রে টিউশন থেকে ফিরে এই তার শর্টকাট্। অথচ—

অথচ পা দিলেই সমস্ত স্নায়ুগুলো কুঁকড়ে আসে। আগের মতো এখনো মানুষের ভিড় আর কলকাতার অসহ্য অজস্র আলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সে। কিন্তু এখন এ আর ছায়া-গন্ধের মরূদ্যান নয়; আর সমুদ্র-

তীর নয়, তাজের প্রকাণ্ড গম্বুজটা আর জ্যোৎস্নার মেঘ হয়ে আকাশে পাখা মেলে দেয় না। অজিতের মনে হয়—মনে হয়ঃ একটা অদ্ভুত—অনাত্মীয় জগতে পা দিয়েছে সে। বিলিতী বইতে পড়েছে, মধ্য এশিয়ার এমন সব শহরের কথা, যেখানে এখনো ক্যারাভানে অনন্ত মরুভূমি পাড়ি দিয়ে গিয়ে পৌঁছুতে হয়; যেখানে সন্ধ্যার উত্তপ্ত অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে পুরু কম্বলের মতো—যেখানকার আঁকা-বাঁকা রহস্যময় গলির আনাচ-কানাচ থেকে যে কোনো সময় ছুরি ঝলকায়—রাইফেলের আগুন চমকে ওঠে।

সেই আশ্চর্য অচেনা দেশের অজানা ভয় এসে এক মুহূর্তে মস্তিষ্কের কোষে কোষে জমাট বাঁধে। ছুটে পালাতে চায় অজিত—পারে না; যেন এই ভয়টাকে আস্বাদন করবার জন্যেই আরো ধীরে ধীরে পা ফেলে হাঁটে। যত খারাপ লাগে, তত নেশা ধরে। অজিত শুনেছিল, সব নেশা পার হয়ে গেলে নাকি গোখরো সাপের ছোবল নেয় মানুষ; এই গলিটাও এখন একটা সাপ হয়ে তাকে ছোবল মারে আর তার বিষাক্ত উত্তেজনায় শরীর-মন আচ্ছন্ন হয়ে যায় অজিতের।

এই নেশার টানেই যত ভয় ধরে—তত ধীরে ধীরে হাঁটে এই গলি দিয়ে। এ পথ ছাড়াও তার দুটো যাবার রাস্তা আছে, অথচ এর মায়া সে কিছুতেই কাটাতে পারে না। অজিত জানে, এ মৃত্যু। এ নেশাখোরের আত্মহত্যা। একটু একটু করে—দিনের পর দিন।

এক পা এক পা করে এগোয়—এক-একটা করে চমক লাগে। স্পষ্ট দেখে, আইভির ঝাড়টা বাঁদিকের প্রাচীরটার তলায় যেখানে খানিক ছায়া জমিয়ে রেখেছে—সেখানে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে, নিঃশ্বাস বন্ধ করে কে প্রতীক্ষা করছে যেন। তার একটা হাত লুকোনো আছে জামার তলায়, সেই হাতের শক্ত মুঠোয় কী যে ধরা আছে, তা-ও অজিতের অজানা নয়। চলতে চলতে অজিত চোখ বোজে—নিজের নিয়তির জন্যে অপেক্ষা করে। পায়ের পাতা থেকে একটা হিম ধীরে ধীরে উঠে আসতে থাকে হৃৎপিণ্ডের দিকে।

অথচ কিছুই না—এ-সব একেবারেই মতিভ্রম। সেই রায়ট এখন কত দূর অতীতের কথা—নিতান্তই গল্প বানাবার উপকরণ। এক পেয়ালা চায়ে চুমুক দিয়ে কিম্বা পানের বোঁটায় জিভে চুন ছুঁইয়ে বলবার মতো গল্প। আজ চৌদ্দ বছর ধরে এই গলিটা উত্তর কলকাতার গিস্‌গিসে ভিড়ের মধ্যেও তার ছায়া, শান্তি, শ্যাওলার ছোপ, পামের মর্মর আর হাসনুহানার গন্ধ নিয়ে অবিশ্বাস্য নির্জনতায় এলিয়ে আছে। কোনো স্মরণযোগ্য ঘটনা এখানে আর ঘটেনি, হয়তো কোনোদিনই আর ঘটবে না।

তবু কী দুর্বোধ—কী অর্থহীন ভয়!

রাত্রে এই গলিটা সাপ হয়ে যায়। যেখানটায় বাঁক নিয়েছে সেখানে স্পষ্ট অনুভব করে অজিতঃ আবছা অন্ধকারটা আস্তে আস্তে প্রকাণ্ড একটা পাতার মতো পরিষ্কার রূপ নিচ্ছে—পাতা? পাতা নয়—ফণা। আর তার ওপরে দুটো অদ্ভুত ছোট আর আশ্চর্য কুটিল চোখ জ্বলজ্বল করছে।

অথচ অজিত জানে—ওটা নিতান্তই দেওয়ালের কোলে একটুখানি ছায়া—ওই চোখ দুটো পাশের মিশনারী কলেজের বাগান থেকে উড়ে আসা জোনাকি ছাড়া আর কিছুই নয়।

বর্ষার এক টুকরো জমাট জলকে আচমকা মনে হয় রক্ত। মনে হয়, ঠিক পায়ের সামনেই কে উবুড় হয়ে পড়ে আছে—তার ছড়িয়ে দেওয়া হাতের আঙুলে চিকচিক করছে তামার আংটি।

সুমিত্রার বিয়ের পরে কিছুই করেনি অজিত। দাড়ি কামিয়েছে, দু'বেলা খেয়েছে, নিয়মিত যাতায়াত করেছে স্কুলে, টিউশন করেছে, টার্মিনাল পরীক্ষার খাতা দেখেছে। কিন্তু এতদিনে সেই অঘটনের আরম্ভ হয়ে গেল।

ক্লাসে পড়াতে পড়াতে একসময় নিজেই থমকে গেল সে। ক্লাসসুদ্ধ ছেলে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। অষ্টম শ্রেণীতে ইংরেজি পড়াচ্ছিল—এবার নিজের কণ্ঠস্বর কানে গেল তার। অজিত শুনল, সে আউড়ে চলেছে ঃ

> "The time has been,
> That when the brains were out,
> The man would die,
> And there an end ; but now they
> rise again,
> With twenty mortal murders on
> their crowns—"

অজিত স্তব্ধ হয়ে গেল। ম্যাক্‌বেথ! ক্লাসে সে পড়াচ্ছিল অ্যানালিসিস—কোথা থেকে উঠে এল এই প্রেতাত্মা—রক্তমাখা বীভৎস রূপ নিয়ে এসে দাঁড়ালো তার সামনে!

একটু চুপ করে থেকে টেবিল থেকে বইটা তুলে নিলে সে। বললে, আজ আর পড়াব না—এই পর্যন্তই থাক।

স্টাফ্ রুমে এসে কুঁজো থেকে মস্ত এক গ্লাস বাসি জল গড়িয়ে খেলো, গুরগুর করে উঠল পেটের ভেতর। মাথায় আর চোখে দিলে জলের ছাট। তারপর দু হাতে মুখ গুঁজে বসে রইল চুপচাপ।

অঙ্কের মাস্টার সত্যবাবু শব্দ করে খড়ি আর ডাস্টার ছুঁড়ে ফেললেন। দুটো আরক্ত চোখ মেলে অজিত তাকালো।

—কী হয়েছে অজিতবাবু?—হাত ঝাড়তে ঝাড়তে সত্যবাবু জানতে চাইলেন।

—শরীর ভালো লাগছে না।

—তাই তো মনে হচ্ছে দেখে। যান যান, ছুটি নিয়ে চলে যান। খুব ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে মশাই, দিনকাল ভালো নয়।

—হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি।

দুর্বল পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে অজিত রওনা হল হেড্‌মাস্টারের ঘরের দিকে।

অসময়েই মেসে ফিরে এল সে। মেস খালি, চাকরেরা বেরিয়ে গেছে সবাই—ফিরতে সেই পাঁচটা। ভাদ্রের লালচে রোদের ওপর ছাড়া-ছাড়া মেঘের আসা-যাওয়া। ভ্যাপ্সা গরম একটা। ঘরের একমাত্র পশ্চিমমুখো জানলাটি দিয়ে একবিন্দুও বাতাস আসছে না। দেওয়ালের সোঁদা গন্ধটা বুকের ওপর চেপে বসছে।

পাখা নেই। এ ঘরের তিনটি মানুষ পাখা রাখবার বিলাসিতার কথা ভাবতে পারে না। অজিত হাতপাখাটা তুলে নিলে। কবে একটা ছারপোকা মারা হয়েছিল পাখার ওপর—টানা রক্তের দাগ শুকিয়ে আছে। তার নিজের রক্ত।

পাখাটা ছুঁড়ে ফেলে অজিত দু হাতে নিজের মাথায় ঝাঁকুনি দিলে কয়েকবার। বুঝতে পারছে, ওই গলি শুধু এখন আর তার রাত্রি সহচর নয়, দিনেও অনুসরণ করছে তাকে। ওর হাত থেকে তার বুঝি আর নিস্তার নেই। এভাবে চললে সে পাগল হয়ে যাবে; চৌদ্দ বছর আগেকার গল্প-হয়ে-যাওয়া একটা খুন পাগল করে দেবে তাকে।

অজিত দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো হাত-আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ালো। এতদিন নিজের মুখখানাকেও সে কি দেখেনি? গালে কপালে চামড়ার কোঁচকানো রেখা পড়েছে, চোখের কোণে কোণে কালি। দৃষ্টির ওপর কুয়াশার মতো খানিকটা স্তম্ভিত ভয় অল্প অল্প কাঁপছে। এ কী হল অজিতের? এ সে চলেছে কোথায়?

কলকাতায় যতদিন থাকবে—এই গলির হাত থেকে পরিত্রাণ নেই তার। রাত্রে ফিরে আসবার জন্যে তার আরো দুটো পথ আছে—ওই গলিটা দিয়ে এলে তার যে দেড়-দু মিনিটের বেশি সময় বাঁচে তা-ও নয়। তবু ওই পথেই সে আসবে—ওই অসহ্য ভয়টাকে আস্বাদন করবে—আর বুঝতে পারবে চরম নেশাখোরের মতো দিনে দিনে আত্মহত্যা করছে সে, পাগল হয়ে যাচ্ছে।

একবার ডাক্তার দেখালে কেমন হয়? কোনো সাইকো-অ্যানালিস্টকে?

নাঃ, সে সাহসও নেই। ওরা ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখে। মনের আড়াল থেকে কী বস্তুকে টেনে বের করে আনবে তা ধারণারও বাইরে। তারপরে শান্ত গলায় হয়তো বলতে থাকবেঃ আসলে আপনার কোনো শত্রুকে আপনি হত্যা করতে চান। গলিটায় পা দিলেই আপনার মনে হয়, এটাই হল খুন করবার পক্ষে আদর্শ জায়গা। তাই সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পান—

অজিতের সাহস নেই। যে ভয়টা চেতনার ওপরে ভাসছে সেই আতঙ্কই তার পক্ষে যথেষ্ট; অন্ধকারকে নাড়া দিয়ে তুলে তার মধ্যে থেকে সে আর বিভীষিকার দৈত্যকে জাগাতে চায় না।

সে পাগল হয়ে যাবে। এ-ই তার পরিণাম। চৌদ্দ বছর আগেকার একটা খুন তিলে তিলে তাকে শুষে নিচ্ছে, কুরে কুরে খাচ্ছে তার মস্তিষ্ক। হয়তো কলকাতা ছেড়ে পালালে তার আশা আছে এখনো। আছে কি?

সারা দুপুর, বাইরে লালচে রোদের ওপর দিয়ে মেঘের পর মেঘ ভেসে গেলে ছারপোকার রক্ত আঁকা রক্তের দাগটা দেখে দেখে, ভ্যাপসা গরমে সেদ্ধ

হয়ে যায়—যন্ত্রণাভরা অবসাদে অজিত তলিয়ে রইল। তারপর ঘরের বাকী দু'জন ফিরে এলে উঠে বসল তক্তপোশের ওপর। তখন মুখের ভেতরে তেতো—জিভ আঠা-আঠা।

—জ্বর হয়েছে নাকি অজিতবাবু?

—না, বড় মাথা ধরেছে।

—মাথা ধরার দোষ নেই—যা গুমোট গরম। তবু একটু হাওয়া দিয়েছে এতক্ষণে। যান না—বেড়িয়ে আসুন বাইরে।

—হাঁ, বেরুতেই হবে।—মুখের তিক্ততাকে আস্বাদ করতে করতে নীরস গলায় বললে, তা ছাড়া টিউশন আছে। আর—

বলতে যাচ্ছিল, 'গলিটাও আছে'।—বলল না, জামা গলিয়ে, চটি টেনে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

আজ টিউশন নয়। একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। এইভাবে নিজেকে কিছুতেই ভাগ্যের হাতে সঁপে দেওয়া চলবে না। এতদিন অজিত ভুলে গিয়েছিল, চাকরি টিউশন আর মনের ভার ছাড়া সংসারে আরো কিছু আছে। ছ মাসের মধ্যে সে সিনেমা দেখেনি—আজকে যা হোক কিছু একটা ছবি দেখে আসবে।

আলোতে খুশি-হওয়া চৌরঙ্গী। ঝলমল মেট্রো সিনেমা। ট্রাম-বাস-মোটর-মানুষের পা—সব কিছুতে ভালো লাগার ছন্দ। কে যেন ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছে। বিক্রী হচ্ছে বেলফুলের মালা।

কিছুক্ষণের জন্যে সহজ হল মনটা। একটা টিকেট কিনে ঢুকে পড়ল 'টাইগারেই'।

রক্-এন্-রোল দিয়ে শুরু—শেষ হল সস্তা নাচ-গানে ভরা প্রেমের গল্পে। কিন্তু হল থেকে বেরুবার আগেই টের পাচ্ছিল, ওই গলিটার বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেছে তার মধ্যে। এই আলো—এই চৌরঙ্গী তার কাছে মরীচিকা। যা তার সত্য—যা তার পরিণাম—তা-ই নিষ্ঠুরভাবে নাড়ী ধরে টান দিয়েছে।

চেনা জায়গায় এসে নামল বাস থেকে, অভ্যস্ত পথ ধরে এগিয়ে এল। তারপর—

সেই দেওয়ালে গায়ে গা মিলিয়ে, সেই আইভিলতার ছায়াপুঞ্জের তলায় কে দাঁড়িয়ে; জামার তলায় হাত মুঠো করে ধরে' রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে। অজিত চোখ বুজে পার হতে গিয়েও পারল না। বুকের ওপর পরিষ্কার টের পেলো ছোরার আঁচড়—একটা অব্যক্ত আওয়াজ তুলে পড়ে গেল রাস্তায়।

কতক্ষণ? দু মিনিট? তিন মিনিট? পাঁচ মিনিট? মাটিতে দু হাতের ভর দিয়ে উঠে বসল, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল দুর্বল পায়ে। ছোরার আঁচড় নয়। একটা চামচিকে উড়ছে ঘুরে ঘুরে—সেইটেই হয়তো এসে পড়েছিল গায়ের ওপর। টলতে টলতে এগিয়ে চলল অজিত। মনে হল, সে খুন হয়ে গেছে—ছিটের শার্ট পরা তার শরীরটা এখন পড়ে আছে পথের

ওপর। আর আড়ষ্ট পায়ে যে চলেছে সে তার আত্মা—ওই দেহটা থেকে বেরিয়ে এসেছে।

মন স্থির হয়ে গেছে। স্কুল থেকে ছুটি নেবে মাসখানেকের জন্যে। চলে যাবে কলকাতার বাইরে—যেখানে হোক। এই গলিটার আকর্ষণ থেকে পালাতে চেষ্টা করবে প্রাণপণে। এর মধ্যেই সে পাগল হতে শুরু করেছে, আর একটুও দেরী করা চলবে না তার।

বাগবাজারের টিউশনটার জন্যে একটু মায়া হচ্ছে। মেয়েটা লেখাপড়ায় ভালো। যদি অত চঞ্চল না হত, যদি গানের দিকে অত ঝোঁক না থাকত, তা হলে বেশ উঁচু প্লেস পেত ইন্টারমিডিয়েটে। কিন্তু অত ছটফটে মেয়ের কিছু হয় না। বাপ-মা নেই—বড় ভাইয়েরা আদর দিয়ে দিয়ে ছোট বোনটার মাথা খেয়েছে।

এই মেয়েটার জন্যে তার খাটতে ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আর উপায় নেই। অন্ধকারের ওই সাপটার নাগপাশ থেকে এখন তার মুক্তি চাই। এমন করে, নিজের মৃতদেহকে পথের ওপর ফেলে রেখে, সে আর চলতে পারে না।

পড়বার ঘরে আলো জ্বলছে। গালে হাত দিয়ে বসে আছে তার ছাত্রী মল্লিকা। আস্তে আস্তে ঘরে পা দিল অজিত, দুটো আশ্চর্য ভারী আর ভিজে চোখ তুলে মল্লিকা তাকালো।

—দু দিন কেন আসেন নি মাস্টার মশাই ?

—শরীর ভালো ছিল না।

চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল অজিত। কেমন নতুন রকমের দেখাচ্ছে মল্লিকাকে। ভিজে আর শান্ত চোখ মেলে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। বলতে যাচ্ছিল, কাল থেকে আমি আর আসব না—কিন্তু এই মুহূর্তে কথাটা কিছুতেই বলা গেল না।

—আপনি খুব রোগা হয়ে গেছেন।

ক্লান্ত হাসি হাসল অজিত।

—ও কিছু না। বই বার করো।

কিন্তু বই বের করল না মল্লিকা। চোখ নামিয়ে বলে, জানেন, পরশু আমার জন্মদিন ছিল।

ভুলে গিয়েছিল অজিত। এই দু'দিন ধরে তার দেহ—তার আত্মা ওই গলির মধ্যে মূর্ছিত হয়ে পড়ে ছিল। আস্তে আস্তে বললে, শরীর ভালো ছিল না।

—কেন এত শরীর খারাপ হয় আপনার ?—মল্লিকার চোখে জল এল : জানেন, পরশু রাত এগারোটা পর্যন্ত আমি আপনার জন্যে আশা করে বসে ছিলুম ? আপনি এলেন না—আমার একটুও ভালো লাগে নি, একটুও না।

চেয়ার থেকে উঠে হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মল্লিকা।

আর একটা নতুন আঘাতে, একটা বিদ্যুতের চমকে জেগে উঠল অজিত। সুমিত্রা! আবার সুমিত্রার চোখ—আবার সুমিত্রার গলার স্বর। এই ছ' মাসের মধ্যে কিছুই টের পায়নি সে—তখন আগের সুমিত্রা তার চোখ মন সব আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল। তারপর এই দেড় মাস—

মল্লিকা ফিরে এল—হয়তো মুছে এল চোখের জল। মাথা নিচু করে বসে পড়ল আবার।

গলাটা একবার পরিষ্কার করে নিলে অজিত।

—পড়বে না আজ?

—না।

—কেন?

এবার দুটো চোখ তুলে মল্লিকা সম্পূর্ণ ভাবে তাকালো অজিতের দিকে। সেই চঞ্চল, গান-পাগলা মেয়েটা আর নেই। এ আর একজন। ভুরু কুঁচকে বললে, পড়ব না—আমার খুশি। আপনার কেন শরীর খারাপ হয় এত?

না—আজ আর আইভির ছায়ায়, দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নেই কেউ। গলিটা হাল্কা জ্যোৎস্নায় ঘুমুচ্ছে। টুকরো টুকরো আলো পড়েছে একরাশ বকুলের মতো। পামের পাতায় আবার সমুদ্র-মর্মর; তাজের পথে সেই 'রাত-কী-রাণীর' গন্ধ।

অজিত বুঝেছে, এত দিন ওখানে ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে যে অপেক্ষা করত সে সুমিত্রা। আবার নতুন করে শান্তি, বকুল, সমুদ্র আর হাসনুহানাকে মল্লিকা ফিরিয়ে আনল। চৌদ্দ বছর আগেকার খুনের রক্ত অনেক নবজাতকের পায়ে পায়ে মুছে গেছে অনেক দিন আগেই।

চলতে চলতে মনে হল, হয়তো মল্লিকাও একদিন সুমিত্রার মতোই দূরে সরে যাবে। যদি তা-ও হয়, তবু আর ভয় পাবে না অজিত। বুঝেছে, ফাঁকা গলির ক্ষণিক দুঃস্বপ্নের চেয়ে অনেক বেশি সত্য ওই জ্যোৎস্নার বকুল—ওই পামের পাতার গান।

চিরকালের গান॥

রাঙা মাসিমা

ঠিক আট মাস আগে কথাটা বলেছিলাম। আমার পরিষ্কার মনে আছে সব।

প্রাইভেট টিউশন শেষ করে বাসায় ফিরছি রাত ন'টার পর। মেজাজটা অত্যন্ত বিশ্রী হয়ে আছে। ছাত্রের বাবা আজও মৃদু হাস্যে বলেছেন, আপনার

টাকাটা দিতে আরো দিন দশেক দেরি হবে মাস্টার মশাই। বড় টানাটানি যাচ্ছে এখন।

সত্যিই তো—ত্রিশটা টাকা ফেলে দিতে তাঁর কষ্ট হবারই কথা। মাত্র দু'হাজার টাকা মাইনে পান, সেই সঙ্গে আরো কী কী পান তিনিই জানেন। অবশ্য খরচও অনেক। মাত্র দু'দিন আগেই নাকি পাঁচশো টাকা খরচ করে একটা পার্টি দিতে হয়েছে। এত খরচপত্রের ভেতর যখন তখন ছাত্রের প্রাইভেট টিউটরকে ত্রিশটা টাকা ফেলে দেওয়া তো সহজ কাজ নয়।

আমার মনের জ্বালা নিভছিল না। দামী পেয়ালায় দামী চা (শুনেছিলাম সাড়ে আট টাকা পাউন্ড) খেয়েও কিছুতেই বোঝাতে পারছিলাম না নিজেকে। এমন কি ছাত্রের বোন কথাকলি নাচে যে সোনার মেডেলটা পেয়েছে, সেটা দেখেও আমার যথেষ্ট পুলক বোধ হচ্ছিল না। মুখে পর্যন্ত বলতে পারলাম না : বাঃ, লাভ্‌লি!

টাকা ত্রিশটার দরকার ছিল, বিশ্রী ভাবেই দরকার ছিল। কিন্তু চাল ডাল ইত্যাদি তুচ্ছ ব্যাপারের সঙ্গে তা এমনভাবে জড়িত যে সুগন্ধি দামী সোনালি চায়ে চুমুক দিতে দিতে কিছুতেই মুখ ফুটে বলা গেল না সেটা।

গলির মোড়ে আজ গ্যাস জ্বলছিল না। এক টুকরো ইঁটে হোঁচট খেলাম, জুতোর তলায় একটা ছুঁচোকে মাড়িয়ে ফেললাম। তারপর বাসায় পা দিয়েই দেখি সেই সতেরো আঠারো বছরের ছেলেটা বসে আছে।

আমি চিনি। খুব ভালো করেই চিনি আজ সাত আট বছর ধরে। অমনি রুক্ষ চেহারা, ময়লা সেলাই করা শার্ট, ঘোলাটে চোখ। ওরা আমার দেশের লোক, চেনা, আধ-চেনা, নাম শোনা। পার্টিশনের শিকার। কেউ থাকে বস্তিতে, কেউ কলোনীতে, কেউ বা জোর করে অন্যের ঘাড়ে চেপে বসে আছে।

কী আর চাই? সাহায্য!

ছেলেটা উঠে দাঁড়ালো। প্রণাম করল। তারপর এক্‌সারসাইজ বুকের ছেঁড়া পাতায় পেন্‌সিলে লেখা একখানা চিঠি আমার হাতে তুলে দিলে।

চিঠিতে কী আছে আমি জানি। আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। তবু ভাঁজ খুলে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলাম একবার। স্নেহের মনু, আশীর্বাদ জানিবা। তোমার রাঙা মাসিমাকে নিশ্চয় ভুলিয়া যাও নাই। পাকিস্তান হইতে প্রায় দু'বছর হইল আসিয়াছি। তোমার ঠিকানা জানি না বলিয়া এতদিন—

সম্প্রতি ঠিকানা জেনে মাসিমা তাঁর ছোট ছেলে বিনয়কে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। ছেলেটি স্কুল ফাইন্যাল দেবে। কিন্তু মাইনে দিতে না পারায় স্কুল থেকে নাম কাটা গেছে। এ অবস্থায় আমি যদি কিছু সাহায্য—

আর পড়বার দরকার ছিল না। ক্লান্ত বিরক্ত মস্তিষ্ককে আগুন ধরিয়ে দেবার পক্ষে ওইটুকুই যথেষ্ট।

—আমার হাতে এখন একটা পয়সাও নেই।

—অন্তত যদি গোটা পনেরো টাকা—

—কলকাতার রাস্তায় টাকা ছড়ানো থাকে না—তোমার মাকে বলে দিয়ো। গায়ের রক্ত জল করে পয়সা উপায় করতে হয় এখানে।

মাথা নিচু করে বিনয় দাঁড়িয়ে রইল। দেখলাম, ওর ঠোঁট কাঁপছে।

—পরীক্ষাটাও যদি দিতে পারতাম!

আমার মুখের চেহারাটা কেমন হয়ে উঠেছিল সে আমি বলতে পারব না, অন্তত খুব চমৎকার যে নয় তাতে সন্দেহমাত্র নেই। সেই বিকৃত মুখে উপদেশ দিয়ে আমি বললাম, স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেই বা এমন কি চতুর্ভুজ হবে তুমি? এম. এ. পাশ করেও তো আমার এই দশা। বরং সরকারী লোনের চেষ্টা করো—একটা দোকান-টোকান যদি করতে পারো—

—আচ্ছা—চাপা একটা নিঃশ্বাস ফেলে আমাকে আবার প্রণাম করল বিনয়, তারপর শ্রান্ত পায়ে অন্ধকার গলিটায় নেমে গেল।

ছেলেটা চলে যাওয়ার পরে আমার কেমন খারাপ লাগল। স্মৃতিতে আলোড়ন উঠছে একটা। রাঙা মাসিমার কথাটা ভাবতে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময়েই স্ত্রী এসে হাজির হলেন। এতক্ষণ বোধহয় অপেক্ষা করছিলেন নেপথ্যে।

—দিলে সাহায্য? স্ত্রীর ঠোঁটের কোণায় বাঁকা হাসির বিদ্যুৎ।

—না। কোথায় পাব টাকা?

—বলো কি! টাকা নেই তোমার?—স্ত্রীর হাসিতে জ্বালা ঠিকরে পড়ল: তোমার আত্মীয়দের তো ধারণা যে টাঁকশালটা তোমারই বাসায়। দিলেই পারতে দু'দশ হাজার ফেলে।

আমি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মড়ার খুলির মতো কোটরে বসা চোখ মুখ। ম্যালনিউট্রিশন, খেতে পায় না। শাড়ীটা সেলাই করা। হাতে গাছকয়েক ব্রোঞ্জের ওপর গিল্টি করা চুড়ি—সোনার নামে আত্মবঞ্চনা। স্কুল মাস্টারের স্ত্রী। এ আক্রমণ ও করতে পারে। সে অধিকার ওর আছে।

স্ত্রীর চোখ দুটো কোটরের মধ্য থেকে জ্বলতে লাগল। দু'টুকরো জ্বলন্ত কাঠকয়লার মতো।

—ওরা টাকা দিয়েছে?

—না।

—সত্যি কথা বলছ?

—তার মানে?

স্ত্রীর বাঁকা ঠোঁট থেকে সমস্ত বঞ্চনার জ্বালা আবার বিদ্যুতের মতো ঠিকরে পড়ল: ওই ত্রিশটা টাকা আত্মীয়ের হাতেই তুলে দিলে কিনা তাই জানতে চাইছিলাম। তোমাকে তো জানি—মূর্তিমান করুণার অবতার তুমি।

এর পরে একটা রুদ্ধ কদর্য চিৎকার আমার গলা পর্যন্ত ফুটে এসেই

থমকে দাঁড়িয়ে গেল। শিক্ষিত ভদ্রলোক আমি—রাত ন'টার পরে একটা বীভৎস পারিবারিক কলহ সৃষ্টি করে পাড়ার লোকের কাছে সুনাম নষ্ট করতে চাই না। দাঁতে দাঁত চেপে আমি ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

—কাল সকালে বাজারের কী ব্যবস্থা হবে ?—স্ত্রীর হিংস্র জিজ্ঞাসা।

—সে আমি দেখব।

হাঁ, কালকের কথা কাল। আজ ভাববারও সময় নেই। পরীক্ষার খাতাগুলো পড়ে আছে—কালকের মধ্যে সেগুলো দেখে না দিলে হেড মাস্টার যা বলবেন তা শুনে শরীর জুড়িয়ে যাবে এমন আশা নেই।

সত্যিই ভাববার সময় কোথায়! বোঝাই গাড়ির গোরুর কাছে কোমরভর কাদার ভেতর দিয়ে চাকা টেনে তোলা ছাড়া কী করবার আছে আর। স্ত্রীর চোখের দৃষ্টি যেন গাড়োয়ানের হাতের 'পাঁটা'র মতো পিঠে এসে পড়ছে।

অতএব রাঙা মাসিমাকে একবার ভাববার আগেই 'জিরান্ডিয়াল ইন্‌ফিনিটিভ' এসে তার জায়গা দখল করে বসল, আর সেই সঙ্গে থেকে থেকে এক-একটি কালো ছায়ার মতো ভেসে আসতে লাগল : কাল সকালে বাজারের কী ব্যবস্থা হবে ? চলবে কী করে ?

কিন্তু আজ আট মাস পরে রাঙা মাসিমাকে ভাবছি। আজ বছরের প্রথম দিনটিতে।

মনে পড়ে যাচ্ছে, দেশে থাকতে প্রতি বছর এইদিন তিনি আমায় নেমন্তন্ন করতেন। সেই বিরাট থালাটায় সাজিয়ে দিতেন ঘিয়ে ভেজানো সুগন্ধি চালের গরম ভাত, পাঁচরকম ভাজা, আট-দশটা বাটিতে মাছ তরকারী মিষ্টি পায়েস। হেসে বলতেন, বছরের এই দিনটিতে ওকে খাইয়ে বড় তৃপ্তি পাই আমি। আমি যে ওর ভিক্ষে-মা—উপনয়নের পরে আমিই তো ওকে প্রথম ব্রতভিক্ষে দিয়েছি।

এই রাঙা মাসিমাই তো। বারো-তেরো বছর বয়সে মরণাপন্ন টাইফয়েডে যখন আমার আশা সবাই-ই ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন এই মাসিমাই বুক চিরে রক্ত মাখিয়ে বেলপাতায় অঞ্জলি দিয়েছিলেন কালীবাড়ীতে। ডাক্তার বলেছিলেন, হাউ ফুলিশ!

আজ সব মনে পড়ছে। ঘুম থেকে উঠেই দেখেছি কে যেন একটা মাটির ভাঁড়ে আধসের দুধ, একছড়া কলা আর দুটো পাকা পেঁপে রেখে গেছে।

ঠিকে-ঝি বললে, সতেরো-আঠারো বছরের একটি ছেলে এসেছিল। দিয়ে চলে গেল। বাবু ঘুমুচ্ছেন শুনে বললে, থাক, তা হলে আর জাগিয়ে দরকার নেই।

গলির ভেতর দিয়েও আকাশ দেখা যাচ্ছে। স্বচ্ছ নীল একটুকরো আকাশ। তবু আমার মনে হল ওই স্বচ্ছ নীলটুকু একটা বিরাট অশ্রুবিন্দুর মতো টলমল করছে।

রাঙা মাসিমার চোখের জল। আমার জন্যেই। আমার দুঃখ, দুর্গতি আর গ্লানির জন্যে আজও বুকের রক্তে বেলপাতা রাঙিয়ে পুজো দিচ্ছেন আমার ভিক্ষে-মা।

রাঙা মাসিমার ঠিকানা আমি জানি না। আর জানলেই বা কী করতে পারি?

সাহিত্যে ছোটগল্প

গল্পগুরু মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে

দীন প্রণাম

এক

[সূচনা : প্রথম নায়ক সূর্য]

গল্পের জন্ম হল কবে ?

প্রশ্নটির একমাত্র জবাব আছে। মানুষের ইতিহাস যেদিন থেকে আরম্ভ, গল্পের জন্মও সেদিন থেকেই। বিবর্তনের অনেকগুলি পর্ব পার হয়ে প্রস্তর যুগের সেই দিনগুলিকে আমরা স্বচ্ছন্দেই কল্পনা করতে পারি। আদিম যুগের পাহাড়ের কালো গুহার ভিতর বড় বড় কাঠের কুঁদো জ্বালিয়ে আমাদের শিকারজীবী পিতৃপুরুষেরা গোল হয়ে বসেছে একসঙ্গে ; আগুনের রক্তাভ আলোয় শৈল-প্রাকারে তাদেরই আঁকা হরিণ ও বাইসন শিকারের বিচিত্র চিত্রকলা রচনা করেছে অপরূপ পরিবেশ। বাইরে ফার্ণজাতীয় দীর্ঘ তরুণ ঘন অরণ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করছে আর বনের কলরোলকে ছাপিয়ে ভেসে আসছে ক্ষুধাতুর নরখাদক হিংস্র জন্তুর গর্জন। সেই সময় ভিতরের ঘনীভূত নিরাপত্তার মধ্যে কথাকুশল প্রাজ্ঞেরা গল্প বলে চলেছে।

কিসের গল্প ? প্রকৃতির নানা বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম এবং জয়লাভ ; নিষ্ঠুর ও জান্তব প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে আত্মরক্ষার উপায় এবং উপকরণ ; সাহস ও বুদ্ধির সহযোগিতায় অন্যান্য বিরোধীগোষ্ঠীর উপর প্রভুত্ব বিস্তারের কাহিনী। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। প্রথমতঃ তরুণদের শিক্ষা দান—জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তোলবার মূল্যবান উপদেশ, দ্বিতীয়তঃ আনন্দের পরিবেষণ। জ্ঞানাঞ্জন-প্রলেপন এবং চিত্ত-বিনোদন, এই দ্বৈত প্রেরণা থেকেই গল্পের আবির্ভাব।

পৃথিবীর প্রাচীনতম কাহিনীগুলি আজ অবলুপ্ত। আফ্রিকার সব চাইতে দুর্গম বনভূমি অথবা অ্যামাজনের সবচেয়ে দুষ্প্রবেশ বনাঞ্চল—যার এক দশমাংশেও আজ পর্যন্ত সভ্য মানুষের পদক্ষেপ ঘটেনি, সেই সব তমসাচ্ছন্ন নিভৃত প্রান্তেও মানুষের কালগত স্বাভাবিক বিবর্তন পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীনতম মানবের শিলীভূত কঙ্কালগুলির মতো, আদিম তরুর অতলবাসী অঙ্গার রূপের মতো, আদি গল্পেরাও মৃত্তিবরে আশ্রিত হয়েছে, তাদের খনন করে তোলবার বিদ্যা কোনো ভূ-তাত্ত্বিকেরই জানা নেই। তবু প্রাথমিক মানুষের মনন আজও 'তথাকথিত' অসভ্যদের মধ্যেই কিছু পরিমাণে অবিকৃত রূপে পাওয়া যাবে—আফ্রিকার জঙ্গলের অতিকায় বাওবাবের মতো তারা অনেকেই দীর্ঘকাল ধরে মাটির গভীরে শিকড় মেলে বসে আছে।

মানববিজ্ঞানী বলেন, পৃথিবীতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ—আর্য, মোঙ্গল, সেমিটিক কিংবা নিগ্রয়েড—পরস্পর-সাপেক্ষতা না রেখেই বহুদিন ধরে স্বয়ংসিদ্ধরূপে বিকশিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিকের তথ্যপঞ্জীকে অবিশ্বাস করবার উপায় নেই। তবু জগতের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত নিজস্ব গল্প-

কথার মধ্যে যদি তুলনামূলক আলোচনা করা যায়, তাহলে চোখে পড়বে, চিন্তায় কল্পনায় ও গল্পগঠনে তাদের মধ্যে কী আশ্চর্য মিল, কী অবিশ্বাস্য সহযোগ।

আমরা বলেছি, শিক্ষা ও আনন্দ—এই যুক্তবেণীতেই মানুষের গল্প-রচনা আরম্ভ। নীতিগল্পের জন্যে সে প্রধানতঃ আশ্রয় করেছে জীবজন্তুর রূপককে; আর আনন্দের প্রয়োজনে এসেছে রাক্ষস-খোক্কস, অত্যাচারী রাজা, বন্য হিংস্র জন্তু অথবা জিঘাংসু সরীসৃপের শত্রুতা, শঠতা ও প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে সুখ-সৌভাগ্য লাভের কাহিনী। এই দুটি মৌলিক উপকরণের জন্য আফ্রিকার গল্পকথার দিকেই তাকানো যাক। এদের মধ্য থেকে অনেকগুলি কৌতূহলজনক জিনিস আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

আফ্রিকার বিশাল মরুভূমিতে ছিল একটি পুকুর—নির্মল স্বচ্ছ তার জল। কিন্তু স্বয়ং রাজাধিরাজ হাতী ছাড়া সে জল আর কারোই পান করবার আদেশ ছিল না।

চালাক খরগোসের গল্প ১।

একদিন একটি খরগোস পিপাসায় কাতর হয়ে সেই জল খেয়ে ফেলল, কিন্তু পুকুরের কাদায় পায়ের দাগ পড়েছে, সুতরাং সে ধরা পড়বেই। তাই বুদ্ধি করে, অদূরেই গভীর ঘুমে মগ্ন একটি জারবোয়া ইঁদুরের পায়ে আর মুখে কাদা মাখিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল সে।

যথাসময়ে রাজা হাতী জল চুরির ঘটনা জানতে পারল। আর তৎক্ষণাৎ নির্দোষ জারবোয়া ইঁদুরের হল প্রাণদণ্ড। অবশ্য সত্যটা বেশি দিন চাপা রইল না—মনের আনন্দে নিজেই একদিন খরগোস তা প্রকাশ করে ফেলল। জন্তুরা যখন তাকে আক্রমণ করতে এল, তখন সে পালিয়ে গিয়ে নিলে সিংহের আশ্রয়।

সিংহের খাদ্যাভাব। ধূর্ত খরগোস অপূর্ব কৌশল খাটিয়ে বোকা জন্তুদের একেবারে সিংহের মুখে এনে দিলে, এক অতি সতর্ক বাঁদর এবং তার শিশু ছাড়া আর কেউই প্রায় রক্ষা পেল না। কিন্তু এর পর থেকেই সবাই সাবধান হয়ে গেল, সিংহের আর খাবার জোটে না। সুতরাং নিরুপায় হয়ে সিংহ খরগোসকেই গ্রাস করবার উপক্রম করল।

খরগোস পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল কিন্তু প্রতিজ্ঞা করল বিশ্বাসঘাতক সিংহকে সে জব্দ করবে। একদিন সে ঘুমন্ত সিংহের ল্যাজটি বেশ শক্ত করে কাঠের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিলে। সেই ল্যাজের বাঁধন আর খুলতে পারল না সিংহ—খরগোসকে অনেক স্তুতি-মিনতি করেও লাভ হল না। শেষে ক্ষুধার জ্বালায় সিংহ মরে গেল।

তখন খরগোস সেই সিংহের চামড়া গায়ে পরল। তাকে দেখে সমস্ত প্রাণীজগৎ যেমন আশ্চর্য হল, ভয়ও পেল তেমনি। খরগোস পরমানন্দে

১। Fairy Stories from Africa—Retold by Florence A. Tapsell.

সকলকে বোকা বানিয়ে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু এবারেও শেষরক্ষা করতে পারল না—নিজের ভুলেই ধরা পড়ল একদিন। তখন সব জন্তুরা তাকে তাড়া করল—সে পালিয়ে গিয়ে মানুষের বসতির কাছে বাসা বাঁধল। আর মানুষের কাছে সব চালাকিই বৃথা। সেখানেই শিকারীর হাতে একদিন লীলাখেলা তার শেষ হয়ে গেল—'**and so ended the life of artful hare**।'

খুব সংক্ষেপে বিস্তৃত কাহিনীটিকে এখানে বর্ণনা করেছি, কিন্তু ধূর্ততার একটি চূড়ান্ত নমুনা এতে পাওয়া যাবে এবং এ শিক্ষাও পাওয়া যাবে যে অন্যায় ও অসত্যের চতুরতা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তার চাইতেও উল্লেখযোগ্য, এর মধ্যে 'পঞ্চতন্ত্রে'র দুটি গল্পের অঙ্কুর পাওয়া যায়। প্রথমটি মন্দমতি (ভাসুরক) সিংহের গল্প—যে মদোন্মত্ত হয়ে শশকের দ্বারা 'নিপাতিত' এবং দ্বিতীয়টি সিংহ-চর্মাবৃত গর্দভের কাহিনী। দক্ষিণাপথের মহিলারোপ্যানিবাসী ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্মার আফ্রিকার লোককাহিনী শোনবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না এবং কঙ্গো-কিলিমঞ্জেরোর মানুষ নিশ্চয়ই সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পূর্বঘাটের ছায়ায় কৃষ্ণা নদীর তীরে গল্প শুনতে এসে উপস্থিত হয়নি। এই সাদৃশ্য এসেছে মানবজাতির চিন্তা ও কল্পনার সর্বব্যাপী মৌলিক সাদৃশ্য থেকেই।

এইবার একটি রূপকথার গল্পকেও এইভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

সাপ ও রাজকন্যার গল্প ১।

রাজকন্যা একা পথ বেয়ে চলেছে দূর বিদেশে তার কাকার বাড়ীতে। নিবিড় বনের মধ্যে তার দেখা হল বিরাট এক অজগরের সঙ্গে। অজগর বললে, রাজকন্যা, আমাকে দেখে ভয় পেয়ো না। দুর্গম জঙ্গল কেমন করে একা পার হবে তুমি ? আমি পথ চিনি, এসো, তোমায় দেখিয়ে দেব।

সরল বিশ্বাসে রাজকন্যা সাপকে সঙ্গে নিলে। কিন্তু সাপ ছিল মায়াবী। সে জানত যে রাজকন্যার কাছে যে কোমরবন্ধটি আছে, সেইটি পরলে সে অবিকল রাজকন্যার রূপ ধরতে পারবে।

সুতরাং কৌশলে রাজকন্যাকে ঠকিয়ে কোমরবন্ধটি সে যোগাড় করে নিলে। তারপর যখন তারা কাকার খামারবাড়ীর (**kraal**) কাছে গিয়ে পৌঁছুল, তখন সাপ রাজকন্যাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে নিজেই চলে গেল ভিতরে আর কোমরবন্ধটি পরে রাজকন্যার রূপ ধরল।

সাপের সুন্দর পোশাক—পরিষ্কার শরীর ; আর রাজকন্যা দীর্ঘ পথশ্রমে ধূলিমলিন, তার বেশবাস ছিন্নভিন্ন। সুতরাং সাপ যখন রাগ করে বললে যে সে পথের মধ্যে একটা গরিব ভিখারী মেয়েকে দেখে দয়া করে সঙ্গে নিয়ে এসেছে, আর সেই ভিখারী মেয়েই এখন তার দয়ার

১। Fairy Stories from Africa—Retold by Florence A. Tapsell.

সুযোগ নিয়ে রাজকন্যা সাজবার চেষ্টা করছে, তখন কাকা সাপের কথাতেই বিশ্বাস করলেন। সাপ রইল রাজকন্যার আদরে, রাজকন্যা দাসী হয়ে পাকা ফসলের ক্ষেত পাহারা দিতে লাগল। একটু কাজের ভুল হলেই আর কথা নেই—গালমন্দ, মারধোর তার নিত্য বরাদ্দ।

অবশ্য ভাগ্যক্রমে রাজকন্যার কাছে ছিল একটি জাদুর ঝাঁপি—সাপ যার সন্ধান জানত না, সেই ঝাঁপির সাহায্যেই শেষ পর্যন্ত সব ভুলের নিষ্পত্তি হল—শয়তান সাপ প্রাণ হারালো।

গল্পটির সারাংশ মাত্র উদ্ধৃত করেছি কিন্তু এর ভেতরে সভ্য পৃথিবীর অনেকগুলি রূপকথা এসে উঁকি দিচ্ছে। ফরাসী রূপকথা 'লে গ্রোয়া সিত্রঁ'—অর্থাৎ 'তিন লেবু'র গল্পে সেই নিগ্রো ক্রীতদাসীকে মনে আনবে—যে এইভাবে রাজকন্যার ছদ্মবেশ ধরেছিল; আমাদের বাংলা দেশের রাজবধূ 'কাঞ্চনমালা' আর কাঁকন-দাসী 'কাঁকনমালার' গল্পও সঙ্গে-সঙ্গেই মনে পড়বে; আর মনে পড়বে সেই রাক্ষসীকে—যে রাজপুত্রকে খেতে না পেরে শেষে সুন্দরী রাজকন্যা হয়ে রাজার অন্তঃপুরে ঢুকেছিল। তফাৎ এই, বনের মানুষ রাক্ষসের খবর জানে না, ও ভীতিটা একান্তই সভ্য জগতের; তাই রাক্ষসী হয়েছে সাপিনী—যে সাপ তার প্রতিদিনের পরম শত্রু—যার সম্পর্কে তার ভয় আর ঘৃণার অন্ত নেই—যে সাপ ওল্ড টেস্টামেন্টে আর ইস্‌লামে সাক্ষাৎ শয়তানের প্রতিমূর্তি, ইব্‌লিশ্‌।

কিংবা জাপানী 'জিভকাটা চড়াই'য়ের কাহিনীটিকেও মনে করা যেতে পারে।

এক বুড়ো-বুড়ীর বাড়ীতে একটি চড়াই পাখী বাস করত। বুড়ো ভালোমানুষ ছিল, কিন্তু বুড়ী ছিল নিষ্ঠুর এবং লোভী চরিত্রের। একদিন খাবারে মুখ দেওয়ার অপরাধে বুড়ী চড়াইকে ধরে তার জিভ কেটে দিলে—রক্তাক্ত চড়াই আর্তনাদ করতে করতে বনে উড়ে পালালো।

কিছুকাল পরে বনের ভেতর বুড়োর সঙ্গে চড়াই পাখির দেখা। চড়াই সেখানে বিয়ে করে সুখে ঘরসংসার পেতেছে। বুড়োকে দেখে পাখিটা পরম আদরে তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল—প্রচুর খাওয়ালে দাওয়ালে, দু'তিনদিন কাছে রাখল, তার আসবার সময় একটা বড় এবং একটা ছোট ঝুড়ি বুড়োকে দিয়ে বললে, যেটা খুশি তুমি বেছে নাও।

নির্লোভ বুড়ো ছোট ঝুড়িটি নিয়েই বাড়ী ফিরল। তাতে সোনাদানা মণি মুক্তো—কত কী।

বুড়ী রাগ করে বললে, তুমি কি বোকা! বড় ঝুড়িটা আনলে তাতে কত বেশি পাওয়া যেত! আচ্ছা—আমিই যাচ্ছি।

বুড়ী বনে গেল। চড়াই তাকে দেখে খুশি হল না—বলাই বাহুল্য। চড়াই-গিন্নী তো সামনেই বেরুল না। তবু চড়াই তাকে যথাসম্ভব আদর আপ্যায়ন করল এবং বুড়ীর আসবার সময় সেই রকম ছোট-বড় দুটি ঝুড়ি সামনে এনে উপস্থিত করল।

লোভী বুড়ী বড় ঝুড়িটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়েই বাড়ীর দিকে রওনা হল। পথে আর ধৈর্য থাকে না।—খুলেই দেখি না—কী আছে এর ভেতর। তারপর—১।

আশা করি, গল্পের শেষাংশটুকু বলবার আর প্রয়োজন নেই এবং বাঙালীর রূপকথার "সুখু ও দুখুর" গল্প এর মধ্যেই আমাদের মনে পড়েছে। কে কার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে—জোর করে সেকথা কে বলতে পারে।

মানব ইতিহাসের একেবারে প্রথম পাতায় আদমের মাটি কোপানো এবং ইভের কাপড় বোনা শেষ হয়ে গেলে সন্ধ্যার অবসরে যে গল্প তারা করত সন্তানদের কাছে, শ্বেত-পীত-কৃষ্ণ দেশে-দেশান্তরে বিভক্ত হয়ে গিয়েও কি যুগ-যুগান্ত পর্যন্ত সেই প্রথম শোনা গল্প তারা মনে রেখেছে? সারা জগতের লোককথার মধ্যে এই আশ্চর্য ভাব-সংযোগ বিশাল গবেষণার বিষয়—ইয়োরোপের কোনো কোনো পণ্ডিত তা করেছেন এবং করেও চলেছেন। আমাদের সে বিস্তৃতিতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা মাত্র এই কথাই বলতে পারি, পরিবেশ, জীবনযাত্রা এবং আনন্দ লাভের প্রয়োজনে সব দেশের মানুষই মোটামুটি একভাবে গল্প ভাবতে শিখেছে।

নীতিশিক্ষা আর রূপকথা। উপকরণ প্রায় একই রকম।

গল্পের ভিতরে গল্প আছে। সে হল সূর্যকে নিয়ে।

সূর্যোদয় নিরাপদ করে মানুষকে। সূর্য উঠলেই নিশাচরেরা বনের অন্তরালে আত্মগোপন করে; যারা দিনের বেলাতেও আতঙ্ক সৃষ্টি করে—তাদের দেখতে পেয়ে মানুষ সতর্ক হয়ে যায়। শীতের জড়তা থেকে এই সূর্যই তাকে পরিত্রাণ করে। হ্রদের জল যখন জমে যায়, তখন ক্ষুধিত হ্রদ-মানব (Lake Man) অপেক্ষা করে, কখন সূর্যের দীপ্ত দাহনচ্ছটা সে জল গলিয়ে দিয়ে ভাসিয়ে তুলবে মাছের ঝাঁক; সূর্যের আলোয় শস্য তেজ পাবে, ফলের বুক গাঢ় সুমিষ্ট রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

সূর্য

প্রাচীন মানুষ সূর্যের গল্প বলতে ভালোবাসে। সূর্যের মহিমায় সে মুগ্ধ, চিরকৃতজ্ঞ। পরবর্তীকালে ভারতের ঋষিকবির কল্পনায় এই সূর্যই হয়ে দাঁড়িয়েছেন সত্যের আবরণ, 'ঈশোপনিষৎ' বলছে:

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে॥" (১৫)

হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছন্ন আছে; হে সূর্য, সেই সত্যকে পরিদৃষ্ট করাবার জন্য সে আবরণ অপাবৃত করো।

মানুষের পরম জ্ঞানসত্তার প্রতীক হয়েছেন সূর্য: 'আদিত্যবর্ণং তমসো পরস্তাৎ।' এই জ্যোতির্ময় রূপকে অবগত হয়েই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়—

১। অনুরূপ আর একটি জাপানী গল্পে এক ধীবর সমুদ্রের অতলে ড্রাগন রাজের কাছ থেকে এই রকম দুটি ঝুড়ি পেয়েছিল।

অন্য পন্থা বিদ্যমান নেই। এই সবিতৃমণ্ডল অধিষ্ঠিত নারায়ণই সদা ধ্যেয়। এই সূর্যের কাছেই মানুষের প্রার্থনা ঃ 'সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।' ১।

কিন্তু কবি-কল্পনা ও দার্শনিকতার পর্বে পৌঁছোনোর আগে সূর্য মানুষের কাছে দেখা দিয়েছেন লৌকিক প্রয়োজনে, তার জীবন-ধাতা রূপে, তার পরম দেবতারূপে।

একটি লৌকিক গল্পই স্মরণ করা যাক। ২।

"সুন্দরী মেয়েটি বললে, আমি সূর্যের কন্যা। তাঁর আদেশ ছাড়া তোমাকে তো আমি বিয়ে করতে পারি না। তুমি সূর্যের অনুমতি নিয়ে এসো। ৩।

সূর্যের কাছে যেতে হবে তাকে সমুদ্র পেরিয়ে। এগিয়ে এল একটি শ্বেত হংস—তার ডানায় চেপে ছেলেটি সমুদ্র পার হয়ে সূর্যদেবের দেশে গিয়ে পেঁছুল।

শ্বেত হংস বললে, "সামনে তোমার অনেক প্রলোভন আসবে। গাছে গাছে দেখবে সুমধুর স্বর্গীয় ফল, ইতস্তত কত লোভনীয় সুখাদ্য, পথে পথে দেখবে মণিমাণিক্য ছড়ানো। সাবধান, কিছু স্পর্শ কোরো না। তুমি সব লোভ জয় করে এগিয়ে যাও সূর্যের কাছে, প্রার্থনা করো তাঁর বর, তারপর—"

তারপর যা স্বাভাবিক তাই ঘটেছিল। গল্পের কথক তাঁর শিশু শ্রোতাদের বঞ্চিত করেন নি।

একদিকে হিংস্র শক্তির উপরে জয়, অন্যদিকে কল্যাণশক্তির কাছে বরাভয়। নিজের শক্তি, বুদ্ধি এবং কৌশলের সহায়তা সত্ত্বেও প্রাচীন মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভয়-বিস্ময়-শ্রদ্ধা-কৌতূহলের অন্ত ছিল না। (এইভাবেই দেবতাদের জন্ম হয়েছে।) তাই প্রকৃতির মধ্যে একদিকে যেমন সে দেখেছে তার পরম শত্রুকে—অন্যদিকে পেয়েছে তার ঐকান্তিক বান্ধবকেও। জীব-জগতের হিংসক বিরাট প্রাণীদের কাছ থেকে ক্ষুদ্রদের আত্মরক্ষার প্রয়াস তাকে অভিজ্ঞ এবং সহানুভূতিশীল করে তুলেছে।

আদিম মানুষের দুর্ভাগ্যের অন্ত ছিল না। সেদিন আকাশের বজ্র তার কাছে ছিল অমোঘ, অরণ্যের দাবানল তার চারদিকে বেষ্টনী রচনা করত মৃত্যু-বলয়ের মতো, সমুদ্র থেকে ছুটে আসত টাইডাল্ ওয়েভ—পাহাড়ের উপর থেকে যে-কোনো সময় প্রলয়ঙ্কর আভালাঁশ নেমে এসে সগোষ্ঠী তার সমাধি

১। পূষন্নেকর্ষে যমসূর্য প্রাজাপাত্য ব্যূহ রশ্মীন্। সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। যোঽসাবসৌ পুরুষ সোঽহমস্মি। (ঈশ, ১, ১৬)

২। রেড ইণ্ডিয়ান গল্প।

৩। মহাভারতের সম্বরণ-তপতীর আখ্যান স্মরণীয়। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রেও বলা হয়েছে, অনূঢ়া কন্যা সূর্যের দ্বারা সংরক্ষিতা—তাই বিবাহ অনুষ্ঠানে সূর্যার্ঘ্য দিয়ে কন্যাকে গ্রহণ করতে হয়।

রচনা করে দিতে পারত। তাই তার উৎকল্পনায় হঠাৎ পাহাড়ের প্রাচীর ফাঁক হয়ে গিয়ে তাকে তার মধ্যে আশ্রয় দিত—গাছের ডাল মানুষের ভাষায় আসন্ন বিপদের পূর্বসংকেত তার কাছে ঘোষণা করত। আর সূর্য ছিল তার মহত্তম বন্ধু, তার উদারতম আশ্রয়। আবার বন্য জন্তুদের মধ্যে একদল হিংস্র প্রাণী যেমন ছিল তার পরম শত্রু, তেমনি আর একদল ছিল তার একান্ত সহায়ক, তার বন্ধু। প্রকৃতির এই অনুকূল এবং প্রতিকূল শক্তিকে নিয়ে আদিম মানুষ অসংখ্য গল্প রচনা করেছে। এই কারণে আমাদের বাংলা সাহিত্যেই শত্রু বাঘ এবং বন্ধু শেয়ালের গল্পের এমন প্রাচুর্য; তাই শত্রু নেকড়ে যখন প্রিয় পরিচিত শুয়োরছানার কৌশলে ফুটন্ত জলভরা কড়াইয়ের মধ্যে প্রাণ হারায় তখন ইয়োরোপের শিশুরা এতে বেশি খুশি হয়ে ওঠে।

প্রকৃতির এই দ্বিমুখী শক্তির নিদর্শন স্বরূপ একটি গল্পকে গ্রহণ করা যাক: ১।

"পাহাড়ের অনেক—অনেক উপরে, যেখানে কেবল রাশি রাশি তুষার, যেখানে প্রকৃতি যেন রুদ্ররূপে ভ্রূকুটি করে আছে, এতটুকুও প্রাণের স্পন্দন নেই, সেখানেই থাকে তুষাররাজ্যের রাজা। তারও দেহ যেন তুষারের পাহাড়, আর স্বভাবেও সে যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি ভয়ঙ্কর। বছরের একটি দিনে মহা সমারোহে তার পুজো—সেদিন প্রকাণ্ড শ্বেত ভালুক আর দুর্দান্ত নেকড়ে বাঘ থেকে আরম্ভ করে, হরিণ-খরগোস-পাহাড়ী ছাগল সবাই তাকে পুজো দিতে যায়।

পুজো শেষ হওয়ার পরে—রাত্রি ভোর হওয়া পর্যন্ত, তুষারের রাজা অপেক্ষা করে। তারপরে যেই আসে শেষ প্রহর, অমনি সে ধরে তার সংহার-মূর্তি। তখন তার সামনে কারোই আর পরিত্রাণ নেই। ঘর-পালানো দুষ্টু ছেলেটি সে-কথা ভুলে গিয়েছিল। সে লক্ষ্য করেনি, রাত্রের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে, পাহাড়ী বনের পাতায় পাতায় ভোরের হাওয়া শিরশিরিয়ে বলছে: সাবধান—সাবধান!

টের পেয়েছিল বলগা-হরিণ, তার বন্ধু—যে তাকে পিঠে করে নিয়ে গিয়েছিল রাক্ষস রাজার পুজাপ্রাঙ্গণে। সে কানে কানে বললে, পালাও—আর সময় নেই!

চোখের পলকে ছেলেটি উঠে বসল বলগা-হরিণের উপর। তুষারস্তূপকে দ্রুতগামী চলার পথে পেঁজা তুলোর মতো উড়িয়ে দিয়ে পিছল পাথরের উপর ক্ষুরের শব্দ বাজিয়ে তীরের মতো উড়ে চলল হরিণ। আর ঠিক তখনই পেছন থেকে ভেসে এল পাহাড়-ফাটানো, আকাশ-কাঁপানো এক পৈশাচিক গর্জন। যেমন করে সর্বনাশের রূপ ধরে আভালাঁশ গড়িয়ে আসে, দেখা গেল তুষাররাজ্যের রাজা সেই মৃত্যুদানব তেমনি ঝড়ের বেগে ছুটে

১। এসকিমো গল্প

আসছে তাদের ধরতে—তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে ক্ষুধার্ত নেকড়ে আর ভালুকের দল”—

ছেলেটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছিল সূর্যের দয়ায়, গলে জল হয়েছিল রাক্ষস-দেবতা। কিন্তু এই কাহিনীটির মধ্যে আদিম গল্পের সমস্ত সূত্রগুলিই যেন পাওয়া যাচ্ছে। তুষারদানব এখানে নির্মম প্রকৃতির প্রতীক, ভালুক আর নেকড়েরা প্রকৃতির বিরোধী শক্তির দল ; দ্রুতগামী বল্‌গা-হরিণ মানুষের পলায়নের সহায়তা আর সূর্যের আলো তার পরমতম রক্ষাকবচ। ভারতীয় শাস্ত্রে যিনি ব্রহ্মস্বরূপ, কঠোপনিষদে যাঁকে বলা হয়েছে “প্রাণেন সম্ভবত্যাদিতির্দেবতাময়ী”—তার সম্পর্কে প্রাথমিক প্রেরণা এসেছিল এই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকেই।

আর রূপকথার রাজপুত্র কি সূর্যেরই প্রতীক রূপ ?

গ্রীক পুরাণের গল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এ সম্বন্ধে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন জর্জ কক্‌স্‌। তাঁর বক্তব্য এখানে উদ্‌ধৃতি-যোগ্য ঃ

“Thus grew up a multitude of expressions which described sun as the child of the night, as the destroyer of darkness, as the lover of the dawn and the dew—of phrases which would go on to speak of him as killing the dew with his spears, and of forsaking the dawn as he rose in the heaven. The feeling that the fruits of the earth were called forth by his warmth, would find utterances in words which spoke of him as the friend and the benefactor of man……His journey, again, might be across cloudless skies or amid alternations of storm and calm ; his light might break fitfully through the clouds or be hidden for many a weary hour.” ১।

তিমিরান্তক বিঘ্নবিনাশী এই সূর্য তাঁর কল্যাণস্পর্শে মানুষকে ধন্য করেছেন—কৃতার্থ করেছেন। তাই সূর্যকে আশ্রয় করে মানুষের রূপক-কল্পনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এ একেবারে রূপকথার রাজপুত্রের আদিমূর্তি ঃ

“He would thus be described as facing many dangers and many enemies, none of however, may arrest his course ; as sullen or capricious, or resentful ; as grieving for the loss of the dawn whom he had loved, or as nursing his great wrath and vowing a pitiless vengence. Then as the veil was rent at eventide, they would speak of the chief, who had long remained still, grinding, on his armour ; or of the wanderer

১। **Tales of Ancient Greece, George W. Cox. Introduction ; P.3**

throwing off his disguise and seizing his bow or spear to smite his enemies; of the invincible warrior whose face gleams with the flush of victory when the fight is over as he greets the fair-haired Dawn who closes as she had begun the day. To the wealth of images thus lavished on the daily life and death of the sun there would be no limit."১।

এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করেই কক্স দেখিয়েছেন, গ্রীক-পুরাণের বহু গল্পই সূর্য, মেঘ, শিশির আর অন্ধকারের প্রতীক কাহিনী। দাফনের (Daphne) কাহিনী সংক্ষেপে স্মরণ করা যাক। সূর্যের নিরাশ-প্রণয়ের একটি বৃত্তান্ত এটি ঃ

অলিম্পাস্ পর্বতের নীচে শ্যামল উপত্যকা দিয়ে যেখানে পিনিয়স নদী কলধ্বনি তুলে বয়ে যায় সমুদ্রে, সেইখানে থাকে পরমাসুন্দরী পিনিয়স-কন্যা কুমারী দাফ্নে। মানুষের সঙ্গ, প্রেম, কিছুই তার কাম্য নয়,—নিজের আনন্দেই সে মগ্ন।

একদিন পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে দাফ্নে যখন সূর্যোদয় দেখছে, তখন তার সামনে আবির্ভূত হল এক অপূর্ব মূর্তি। সূর্যের দ্যুতিতে ঝলমল করছে তার দীপ্ত দেহ। কন্দর্পের বাণে জর্জরিত হয়ে ফিবাস আপোলো এসেছেন স্বয়ং।

আপোলো বললেন, 'হে প্রভাত-নন্দিনী, তুমি আমার পরমা বাঞ্ছিতা। বহুদিন ধরে অপেক্ষা করেছি তোমার জন্যে—তারপর আজ তোমাকে পেয়েছি। তুমি বরণ করো আমাকে।'

দাফ্নে সভয়ে বললে, 'আমি প্রেম কিংবা বন্ধনকে স্বীকার করি না। পাহাড়ে আর ঝর্ণায় আমার মুক্ত জীবন। আমাকে কেউ পায় না।'

ক্রোধে অন্ধ হয়ে আপোলো ধরতে চেষ্টা করলেন দাফ্নেকে। দাফ্নে ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে—হরিণের মতো লঘু তার চরণ; ঝর্ণা, খাদ, পাহাড় পেরিয়ে উড়ে চলল শরতের ঝরা-পাতার মতো। কিন্তু আপোলো তাকে সমানে অনুসরণ করছেন। পৃথিবীর কোথাও যখন দাফ্নে আশ্রয় পেলো না, ক্লান্তিতে যখন শরীর অবসন্ন, পা আর চলে না, পেছনে প্রায় তপ্ত-নিঃশ্বাসের হল্কা লাগছে আপোলোর, তখন সে পিনিয়স নদীর কাছে মিনতি করে বললে, 'পিতা, তোমার সন্তানকে আশ্রয় দাও।'

এই বলে দাফ্নে পিনিয়সের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল—নদীর তরঙ্গ গ্রাস করল তাকে। আশাহত, ব্যথিত আপোলো আবার নিঃসঙ্গ আকাশযাত্রার পথে ফিরে চললেন। ২।

১ Ibid ; p-4

২ গল্পটির পাঠান্তর আছে। তাতে আপোলোর ভয়ে দাফ্নে লরেল বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। আর এই পাঠান্তরটিই ব্যাপকভাবে প্রচলিত—ওভিদের কাব্যে, তাইপোলো কিংবা পোল্লোইউয়োলোর ছবিতে।

কক্‌স বলেছেন—এ হল বস্তুত সূর্য আর উষার কাহিনী। সূর্যের উদয় হলেই উষার পলায়নী শুরু হয়, অবশেষে সূর্য যখন একান্তই কাছে এগিয়ে আসেন, তখন সে একেবারেই মিলিয়ে যায়। আকাশ যখন সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত, তখন অম্লান নদীর জলে উষার শেষ আভাসটি মুছে যায়। ১।

গ্রীক পুরাণের বিখ্যাত পার্সিয়ুসের গল্পটিও এই ভাবে রূপকের মধ্যে আসে। আথেনী কর্তৃক অভিশপ্তা মেদুসাকে পার্সিয়ুস হত্যা করেছিলেন—শাপমোচন করেছিলেন তার। এই সর্বপরিচিত কাহিনীকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

"The mortal Medusa is the night which comes to an end on the rising of the sun, while her dearthless sisters are the power of the eternal darkness which no sun ever penetrates." ২।

মাত্র গ্রীক পুরাণেই নয়। ভারতীয় ঋষিরাও উপনিষদের কাব্যস্বপ্নে পৌঁছুবার অনেক আগেই সূর্যের এই নায়করূপ কল্পনা করেছিলেন। 'ঋগ্বেদ সংহিতা'র প্রথম মণ্ডল দ্বাবিংশ সূক্তে সূর্যকে 'বিষ্ণু' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ

"অতো দেবা অবংতু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে।
পৃথিব্যা সপ্তধামভিঃ॥" ১৬ ॥
"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধ নিদধে পদং।
সমূলহমস্য পাংসুরে॥" ১৭ ॥

"বিষ্ণু সপ্তকিরণের সহিত যে ভূপ্রদেশ হইতে পরিক্রমা করিয়াছিলেন, সেই প্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদের রক্ষা করুন।" ১৬ ॥ "বিষ্ণু এই (জগৎ) পরিক্রমা করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত পদে জগৎ আবৃত হইয়াছিল।"

—রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ

এই বিষ্ণুনামিক সূর্যই পরবর্তী সময়ে পুরাণ-সাহিত্যের মহানায়কত্ব লাভ করেছেন। উদ্‌ধৃত সূক্ত থেকে রমেশচন্দ্র দত্ত, ম্যাক্‌স্‌মুলার প্রভৃতি দেখিয়েছেন যে সূর্যের উদয়শৈল, মধ্যগগন এবং অস্তাচল—এই ত্রিপাদ পরিক্রমাই রূপকার্থ থেকে কাহিনীতে বিন্যস্ত হয়ে বামন অবতারের বলিদমন লীলায় পর্যবসিত। অন্ধকার-প্রতীক দুর্গতির বিনাশ করবার জন্য সূর্যবিষ্ণুই নব নব অবতারে অভ্যুদিত হন। বিভীষিকাময়ী রাত্রির

১ ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১ মণ্ডল, ১১৫ সূক্তে বলা হয়েছে, মনুষ্য যেমন নারীর পশ্চাৎ গমন করে, সেইরূপ সূর্য দীপ্তিমান উষার পশ্চাতে আসিতেছেন। (রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ)

২ Tales of Ancient Greece, Cox, Int. P-14

মধুকৈটভকে তিনিই হনন করেন, তিনিই সর্বজীবের "শ্রী" বা লক্ষ্মীর অধিপতি। রামায়ণে তিনিই "সূর্যবংশে" নরচন্দ্রমা হয়ে জন্ম নেন; মহাভারতের রক্তফেনিল রণক্ষেত্রে চক্রধারী হয়ে ব্রহ্মাবর্ত আর্যভূমির ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করেন; আবার তিনিই বৃন্দাবনলীলার রসতরঙ্গে চিরকিশোররূপে নীলকমলের মতো বিকশিত হয়ে ওঠেন। ব্রহ্মার ভূমিকা ভারতীয় সাহিত্যে গৌণ—তাঁর তো পূজাই নিষিদ্ধ; বেদের পুরুহূতঃ ইন্দ্র পুরাণে যে বর্ণে চিত্রিত হয়েছেন, সেটিকে উজ্জ্বল বলা যায় না; আর মহেশ্বর মহীয়ান হতে পারেন, পুরাণ আত্মভোলা একটি প্রৌঢ়মূর্তি কল্পনা করে তাঁকে নিয়ে কিছু কিছু রসিকতাও করেছে, কিন্তু চিত্তজিৎ নায়ক তিনি নন। শৌর্যে বীর্যে, প্রেমে, নরাবতারে বিষ্ণুই পুরাণের রাজকুমার—শত্রুজয়ী, চিরসুন্দর, প্রেমিক-বল্লভ, তাঁকে নিয়েই কাহিনী-উপকাহিনী, ভক্তি-প্রীতি-কামনা-কল্পনা সহস্রধারায় উচ্ছলিত—এক কথায় বিষ্ণুই হচ্ছেন ভারতীয় সাহিত্যের সর্ববাঞ্ছিত নায়ক। তাই 'দাফনে' বা 'ইয়স' (Eos)-এর অনুবর্তী 'ফিবাস্ আপোলো'র সঙ্গে তিনি অভেদাত্মা—তাই মেদুসা-বিনশী পার্সিয়ুসের সঙ্গে কংসারি কৃষ্ণ একপ্রাণ।

আর সেই জন্যই আদি রাজপুত্র এই সূর্য। প্রথম গল্পের প্রথম নায়ক। কিরণের দীপ্তরথে তাঁর জয়যাত্রা। কখনো মেঘের বাধার সঙ্গে তাঁর সংগ্রাম, কখনো অন্ধকারের দৈত্যকে নিধন করা তাঁর কাজ। দুর্যোগের দিনে এই সূর্যই দানবপুরের কারাগারে ইন্দ্রজালবন্দী রাজপুত্র, আবার দুর্যোগের অবসানে তাঁর উদার অভ্যুদয়—'কানা দানবের মানা-দেওয়া দ্বার' ভেঙে রাজকন্যাকে উদ্ধার করা তাঁর ব্রত।

কে এই রাজকন্যা? মাত্র ঊষা একাই নয়। সূর্যের আলোয় যে ফুলের কুঁড়িটি ফুটবে বলে অপেক্ষা করে আছে; যে শস্যের কণা প্রাণের ঐশ্বর্যে ভরে উঠবার আশায় দীপ্তির দাক্ষিণ্যের জন্য প্রতীক্ষারত; আলোর ছোঁয়ায় যে ফল রসভারে ও মিষ্টতায় টলটল করে উঠবে; তুষার গলে গেলে যে নতুন অঙ্কুর প্রসন্নতায় উন্মীলিত হবে। ১।

রাজপুত্রের কল্পনা এইখানেই সূচিত হয়েছে। পুরাণের হিমপুঞ্জ থেকেই রূপকথার প্রথম নির্ঝরের অবতরণ। কিন্তু তারপর আরো বহু ধারা-উপধারা এসে মিশেছে তার সঙ্গে—রূপকথার গল্প বৃহত্তর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে।

রূপকথার যথার্থ বিকাশ ঘটল আরো পরে। সৌর-প্রতীকতার সীমা

১। লোকচলিত ধর্ম সংস্কারে তাই সূর্য আর পৃথিবীর মিলন-কাহিনী দেশে দেশে পরিব্যাপ্ত, গ্রীকদের আকাশের দেবতা 'জিউসে'র সঙ্গে শস্যদেবতা 'ডেমিটারে'র (Demeter)-এর বিবাহ থেকে বাঙালী ওঁরাওদের মধ্যে পর্যন্ত সর্বত্র সূর্য-পৃথিবীর প্রণয় ও প্রসঙ্গ কাহিনী বিদ্যমান:

"The Oraons of Bengal Worship the Earth as a Goddess, and annually celebrate her marriage with the Sun-God Dharma at the time when the Sal tree is in blossom."—The Golden Bough, Abridged, Frazer, 144-145,

ছাড়িয়ে রাজপুত্র মানুষের কামনা-কল্পনা এবং বিজয়-যাত্রার প্রতিনিধি হয়ে উঠল।

রূপকথার পরিপুষ্টি ঘটল মানবেতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে। এই সময় মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে, শহর গড়ে তুলেছে, সভ্যতার মধ্যে পদক্ষেপ করছে। এ আর তার আত্মরক্ষার যুগ নয়—এ হল তার আত্মবিস্তারের পর্যায়। এখন আর বল্গা হরিণের ক্ষিপ্রগতির উপর আশ্রয় ক'রে প্রাণপণে সে পালাতে চেষ্টা করে না—তার আততায়ীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়; ড্রাগনের আগুন-ঝরা বিষাক্ত নিঃশ্বাস, দৈত্যের লোহার মুগুর, ডাইনির মন্ত্রতন্ত্র, সাপের ফণা—সব কিছুকে তুচ্ছ করেই তার অপ্রতিহত অভিযান। নব নব দেশ জয় করে সে—লাভ করে নতুন ঐশ্বর্য, আর লাভ করে তার স্বপ্ন-কামনার রূপমূর্তি বন্দিনী রাজকন্যাকে। সে রাজকন্যা কখনো সোনালী চুলের রাশ এলিয়ে দেয় জানলা দিয়ে—তাই আশ্রয় করে রাজকুমার তার কাছে উঠে আসবে বলে; কখনো সে জীয়ন কাঠি মরণ কাঠির পাহারায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে; কখনো এক বিশাল দৈত্য কোনো অন্ধকার দুর্গের বন্ধ দুয়ারের সামনে পথ আগলায়, কখনো বা নাগপাশে এলিয়ে থাকে রাজকন্যা—রাজপুত্র দৈব-খড়্গ আর অজগরের মাথার মণি এনে তাকে মুক্তি দেবে।

রূপকথার এই সমস্ত গল্প মানুষের জয় এবং জয়েচ্ছার সংকেত বহন করে। তাকে যে-কোনো উপায়ে আত্মরক্ষারই উপদেশ দেয় না—দুর্লভ্যের অভিযানে নির্ভয়ে বেরিয়ে পড়বার জন্য অনুপ্রাণিতও করে। সভ্যতার প্রথম পর্যায়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্নের সর্বাঙ্গীণ অভিব্যক্তি ঘটেছে এই সব রূপকথায়। সূর্যের রূপও ক্রমে ক্রমে মানবিক জয়যাত্রার রূপকে বিবর্তিত হয়েছে।

রূপকথার ধারা অবশ্য আজও বয়ে চলেছে—কিন্তু এখন তার স্থান শিশু-জগতে। তবু এই সমস্ত শিশুপাঠ্য কাহিনীর অন্তরালে মানুষের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের গভীর তত্ত্বটি সন্নিহিত। অধ্যাপক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রূপকথার মর্মসত্য এইভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন :

"এই ছদ্মবেশ খুলিলেই ইহার সহিত আমাদের যোগসূত্র সুস্পষ্ট হইবে। বাস্তব জগতে যে শক্তি আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে, যে আদর্শের আমরা সন্ধান করি, রূপকথার রাজ্যেও সেই মানব মনের আদিম, সনাতন নীতিরই আধিপত্য। সেই দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ, সেই সৌন্দর্য পিপাসার পূর্ণ পরিতৃপ্তি, সেই আশাতীত শক্তি-সম্পদ লাভ, পাপ-পুণ্যের জয়-পরাজয়—পৃথিবীর সমস্ত পুরাতন জিনিসই এই নূতন রাজ্যের অধিবাসী। পৃথিবীর চিরপরিচিত মূর্তিগুলিই একটু অতিরঞ্জনের রাগে রঞ্জিত হইয়া, কল্পনার দ্বারা সামান্যমাত্র রূপান্তরিত হইয়া, রূপকথার রাজ্যের অলিতে-গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়।" ১।

১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'রূপকথা'।

চমৎকার বিশ্লেষণ। অতীতের মানুষ রূপকথার মধ্য দিয়ে আত্মবিস্তারের এবং অভীষ্ট লাভের যে নির্দেশ পেয়েছিল, আজও সে ধারা অব্যাহতভাবেই চলেছে। তবে আজকের রূপকথা অগ্রসর হয়েছে অন্যদিকে, এইচ্ জি ওয়েল্সের বৈজ্ঞানিক 'ফ্যান্টাসিয়ায়'—অল্ডাস্ হাক্সলির ব্রেভ নিউ ওয়ার্লডের আগামী পৃথিবীর রূপকল্পনায়, জর্জ অরওয়েলের মতো আধুনিক ঔপন্যাসিকদের বিচিত্র রূপকাত্মিক সৃষ্টিতে। এখনকার রূপকথাবিলাসী মানুষের চোখে " Shape of Things to Come"-এর স্বপ্ন।

রূপকথার গল্পে শ্রেণী-বিভাগ ঘটল। তার কিছু গেল শিশুমহলে, কিছু বয়স্কদের আসরে গিয়ে নবতর সার্থকতা লাভ করল। আরো জীবননিষ্ঠ, বস্তু-সংপৃক্ত এবং মানবতার আবেদনে মণ্ডিত হয়ে এই রূপকথাই মধ্যযুগীয় রোমান্সের তীব্র নিখাদে ঝঙ্কার তুলল। এল নাইট এরান্টি আর শিভাল্রির পালা, দেখা দিলেন শার্লামেন, রাজা আর্থারের গোল টেবিলকে ঘিরে বসলেন স্যার ল্যান্সেলটের দল। প্রেম, বীরত্ব আর নিয়তির কাহিনী নানা রূপে-রসে মণ্ডিত হয়ে গ্রেকো-রোম্যান্ পৌরাণিক কাহিনীকে দিল নতুন শ্রী। নতুনভাবে দেখা দিলেন ভেনাস আর অ্যাডোনিস, ইয়োরোপা আর জুপিটার, প্লুটো আর প্রসার্পিন (Hades and Peresephone). ইকো আর নার্সিসাস, ট্রয়লাস আর ক্রেসিডা। প্রতীক রূপকথার ইতিহাস শেষ হয়ে সাহিত্যের ইতিহাস আরম্ভ হয়ে গেল। আরব আর মিশরের মরুভূমিতে জন্ম নিল "আলিফ্ লয়লা ওয়া লয়লা"—এক সহস্র এক রাত্রির মায়ামঞ্চের যবনিকা অপসারিত হল। তারপর ইতালির 'নভেলা' থেকে আধুনিক কথাসাহিত্যের সূত্রপাত।

রূপক-রূপকথা-রোমান্সের পাশাপাশি আর একটি ধারাও বয়ে আসছিল। এই দুই ধারার মিশ্রণ যে কখনো কখনো না ঘটেছে তা নয়, কিন্তু তবু মোটের উপর এদের সমান্তরাল বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই দ্বিতীয় প্রবাহটি হল 'ডাইডাক্টিক্' বা নীতিমূলক উপদেশাত্মক কাহিনী—এর আশ্রয় হল 'ফেব্ল'—জার্মান Märchen।

মানুষের চরিত্রে দুটি দিক আছে—একটি তার বহির্মুখীনতা, আর একটি তার পারিবারিকতা। একটি ধর্ম তার কেন্দ্রাতিগ, আর একটি কেন্দ্রাভিগ; একটি তার উন্মত্ত গতিবেগ, একটি প্রশান্ত স্থিতিমুখীনতা। রূপকথা-রোমান্সে গতিপ্রবণতার বার্তা, নীতিগল্পের (Fable) অন্তরে স্থিতিশীলতার তত্ত্ব।

একদিকে যেমন উদ্দাম প্রাণবেগ নিয়ে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর চতুঃসীমায়, লাভ করতে হবে বিশ্বসম্পদকে; অন্যদিকে তেমনি তাকে সমাজানুগত্য মেনে নিয়ে গোষ্ঠিক এবং পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে—স্বীকার করে চলতে হবে লোকস্থিতির বিধি-বন্ধতাকে। তাই রোমান্সের পার্শ্ব-প্রবাহরূপে ধর্ম ও নীতি শিক্ষার প্রেরণায় দেখা দিল জাতক সাহিত্য, রামায়ণ-মহাভারতের নানা উপকাহিনী, বাইবেলের

প্যাম্বারজস্, বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র, গেস্তা রোমানোরাম, হিতোপদেশ, ঈশপের গল্প, হুমায়ুননামা, তুতিনামা, বিদ্পাই, কথাকোষ।

এদের উদ্দেশ্য হল মানুষকে ধর্মজ্ঞ ও সংযতচেত রূপে গড়ে তোলা, লোকব্যবহার সম্পর্কে প্রাজ্ঞ আর সচেতন করে দেওয়া, বিপদ থেকে বুদ্ধিবলে ত্রাণ পাওয়ার উপায়, শত্রু-মিত্র চেনবার পদ্ধতি—মিত্রভেদ মিত্রলাভশ্চ। এই সব গল্পে কোথাও পশু-পাখি-জীবজন্তুর রূপককে আশ্রয় করা হয়েছে, কথনো কথনো সোজাসুজি মানুষকেই এনে ফেলা হয়েছে ; এবং ধীরে ধীরে এদের মধ্য থেকে বিকশিত হয়ে উঠেছে সমাজের চিরন্তন মূল সমস্যার স্বরূপ : নারী এবং পুরুষের বিশ্বস্ততা ও কৃতঘ্নতার কাহিনী।

প্রেম ও দাম্পত্য জীবন সমাজস্থিতির মেরুদণ্ড। নারী এবং পুরুষের মিলিত পারিবারিক জীবনের ভিত্তিতেই সমাজের বিকাশ ও বর্ধন। তাই নারীকে কেন্দ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠা করে সমাজ ও পরিবারগত শিক্ষা এই গল্পগুলিতে ধীরে ধীরে মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যে পাশাপাশি দুটি ধারার কথা আমরা বলেছিলাম, এইখানে এসে তারা একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। মিলেছে আরব্য উপন্যাসে, মিশেছে দেকামেরনে। সামাজিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্তবেণী রচনা করেছে রসোল্লাস। আমাদের সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছে।

আজও যখন আর্টের প্রয়োজনে আর্টের সাধনার কথা ওঠে, তখন তা রোমান্সের আকুলতারই এক কেলাসিত রূপ ; তাই-ই "Pure Poetry"র সঙ্গীতঝঙ্কাররূপে নব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উচ্ছ্বিত হয়। আবার যখন আর্টকে সামাজিক প্রয়োজনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলা হয়, তখন নীতিশিক্ষার মৌল প্রেরণাই তার মধ্যে আভাসিত হয়ে ওঠে। এঁরা দু পক্ষই খণ্ডবিলাসী, পূর্ণ সত্যের সাধক নন। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আমাদের নয়। এ-কালের গল্পকে জানতে হলে আমাদের সেই দেশেই সর্বাগ্রে পরিক্রমা করতে হবে, যাকে জার্মান অধ্যাপক বেন্‌ফি বলেছেন, সমস্ত গল্পের জন্মভূমি। আর সেই দেশ হল—ভারতবর্ষ। জাতক, পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎ কথা, দশকুমার চরিতের গৌরবিনী জননী। এইখান থেকে কিভাবে গল্পকথা পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছিল, তার প্রামাণ্য ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে গেছেন ম্যাকস্-মুলার থেকে আরম্ভ করে রবিনসন্ পর্যন্ত বহু বিশ্রুতকীর্তি পণ্ডিত। সেই তুলনামূলক আলোচনায় আমাদের অধিকার নেই—তবে প্রসঙ্গত আমরা মধ্যে মধ্যে সেদিকে দৃষ্টিপাত করব।

দুই

[গল্পের উৎসভূমি ঃ ভারতবর্ষ]

কথা ও আখ্যায়িকা—ভারতীয় গল্প-সাহিত্যকে মোটের উপর দু ভাগে ভাগ করা যায় এবং কাজ চালাবার প্রয়োজনে এদের ইংরেজি পরিভাষা দেওয়া যেতে পারে ঃ **Fable** এবং **Tale** ; **Tale** আখ্যায়িকা, **Fable** কথা। আখ্যায়িকা ব্যাপ্ত, বিস্তীর্ণ-বহুলতায় পৃথুল ; কথা সংক্ষিপ্ত, একমুখী। অনেক সময় একটি আখ্যায়িকায় বহু কথা বিন্যস্ত—যেমন পঞ্চতন্ত্রের পঞ্চাধ্যায়ে এক-একটি সূচনা সূত্রে 'মণিগণা ইব' অসংখ্য কথা ঝকমক করে উঠেছে। আখ্যায়িকা উপন্যাসের পূর্বাভাস, কথা আদিতে প্রাণীনির্ভর হলেও তাতেই ছোট গল্পের সংকেত। কীথ্ অবশ্য দণ্ডীর মত অনুসরণ করে কথা এবং আখ্যায়িকার মধ্যে বিশেষ কোনো ভেদ মানতে চাননি ; কিন্তু আলোচনার সুবিধার্থে এই শ্রেণীবিভাগ আপাততঃ আমরা স্বীকার করে নিতে পারি। ১।

ভারতবর্ষের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রাচ্যপ্রেমিক অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার একদা বলেছিলেন ঃ

'Their life was yearning after eternity ; their activity a struggle to return into that divine essence from which life seemed to have severed them. Believing as they did in a divine and really existing eternal being they could not live in another. Their existence on earth was to them a problem, their eternal life a certainty'' । ২

অধ্যাপক মুলারের এই সশ্রদ্ধ ভাষণে যে কোনো ভারতীয়েরই গর্বিত হওয়া স্বাভাবিক। এ দেশের মানুষ মাত্রেই অধ্যাত্মপথের পথিক, নশ্বর লৌকিক জীবনের লাভালাভের উর্ধ্বে সে অনন্ত দিব্য জীবনের অন্বেষ্টা, তার যাবতীয় কর্মপ্রয়াস, ধ্যানধারণা মাত্র তারই অভিমুখী—যেখান থেকে প্রাণঃ এজতি নিঃসৃতম্—বিদেশী পণ্ডিতের কাছ থেকে এই ধরণের উক্তি শুনলে নিঃসন্দেহে আমরা অতিশয় শ্লাঘা অনুভব করে থাকি। আমাদের জাতীয় জীবনের যে পর্যায়টিকে আমরা র‍্যান্যাসাঁস বলে চিহ্নিত করি এই রকমের ভাবনা তাকে অনেকখানিই প্রভাবিত করেছিল। আমরা তাই

---

১ কথা ও আখ্যায়িকা ঃ

(ক) তৎ কথাখ্যায়িত্যেকা জাতিঃ সংজ্ঞান্বয়াঙ্কিতা।—দণ্ডী

(খ) প্রবন্ধ কল্পনাং স্তোকসত্যাং প্রাজ্ঞাঃ কথাং বিদুঃ।
পরম্পরাশ্রয়া যা স্যাৎ সা মতাখ্যায়িকা ক্বচিৎ ॥

—কোলাহলাচার্য

(গ) প্রবন্ধ কল্পনা রচনা বহুবনৃতা স্তোকসত্যা (কথা)।—[illegible]

২ **Max Muller, History of Skt, Lit. The Indian Mind, p —10**

ভারতের আত্মিক প্রতিনিধিরূপে স্বামী বিবেকানন্দকে নির্বাচন করেছিলাম ; নোবেল্ প্রাইজ তাই কবি রবীন্দ্রনাথ পাননি, পেয়েছিলেন ঋষি রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষেরা মাত্র তপস্বীই ছিলেন না, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় দিবারাত্র "জীবাত্মায় শাণ দিয়ে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করাই" তাঁদের একমাত্র ব্রত ছিল না। যে জীবন পরিপূর্ণ—ভোগে বাসনায় কর্মে বিজ্ঞানে যা "শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ"—তাঁরা তার সর্বাঙ্গীণ সাধনাই করে গেছেন। তার নিদর্শন আছে মহাভারতে, আছে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে', আছে বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে'। ধর্মও অবশ্যই ছিল, কিন্তু তা চতুর্বর্গের অন্যতম, একাই চতুর্মুখ নয়। রামায়ণ-মহাভারত সেই পূর্ণাঙ্গ জীবন-সম্ভোগের অকুণ্ঠ ইতিবৃত্ত, সংহিতায়, গৃহ্যসূত্রে তার নির্দেশিকা।

ভারতীয় কথা-সাহিত্যও তার সমুজ্জ্বল নিদর্শন। সমাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, সাংসারিক বিবিধ জ্ঞান, প্রলয়ংকরী স্ত্রী-চরিত্র—সবই তাঁরা তাঁদের সাহিত্যে পরিবেষণ করে গেছেন। ভারতবর্ষের কথা-সংগ্রহের প্রথম পরিপূর্ণ নিদর্শন হল 'জাতক'—'জাতকত্থ বণ্ননা'।

* * *

সিংহলে 'জাতকে'র যে পালি রূপ সংগৃহীত হয়েছ, তার রচয়িতা সম্পর্কে সংশয় আছে। মহেন্দ্রর সঙ্গে যে 'অর্থ কথা' সিংহলে গিয়েছিল, তার মূল বিলুপ্ত, বর্তমান জাতক তারই সিংহলী অনুবাদের পুনরনুবাদ। এই পালি রূপান্তরের কর্তা কারো কারো মতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের বুদ্ধঘোষ, কিন্তু রিস্ ডেভিড্স্ থেকে উইণ্টারনিৎস পর্যন্ত কেউই সেকথা সম্পূর্ণ মানতে পারেন নি।

জাতক

বর্তমান জাতক কাহিনীমালা যাঁরই অনূদিত হোক, এগুলি যে ভারতের প্রাচীনতম সংকলন এবং এদের অনেকগুলিই যে খ্রীষ্টজন্মের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের পূর্ববর্তী এ সম্বন্ধে সকলেই একমত হয়েছেন। এদের কিছু কিছু কাহিনী বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই চলিত, কতকগুলি বুদ্ধের সমকালীন, কতকগুলি বা পরবর্তী। মোটের উপর খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত জাতক কাহিনীর নির্মিতিকাল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ১।

জন্ম-জন্মান্তরের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় শীলব্রতের চর্চায় কি ভাবে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্বের মহা চরিতার্থতায় অগ্রসর হয়েছেন—'জাতক' তারই অপরূপ ইতিহাস। এদের সংখ্যা সাড়ে পাঁচশোর কাছাকাছি, পুনরাবৃত্তি বা খণ্ডিত অংশ বাদ দিলে কাউয়েলের মতে পাঁচশোর মতো দাঁড়ায়। বিভিন্ন জীবজন্তুর রূপে, নানা শ্রেণীর মানুষরূপে বোধিসত্ত্বের ক্রমবিকাশ এক দিকে যেমন বৌদ্ধ ধর্মাদর্শ শিক্ষার নিদর্শন, অন্যদিকে এদের মধ্যে সামাজিক নীতি-

১ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে রিস্ ডেভিড্সের Buddhist India, Chapter IX দ্রষ্টব্য।

নিয়ম, জাগতিক প্রজ্ঞারও অপূর্ব অভিব্যক্তি। 'জাতক' প্রাচীন ভারতের সব চাইতে বাস্তব এবং অন্তরঙ্গ আলেখ্য।

হর্‌উইৎস্ বলেছেন :

"They are (the stories of Jataka) biographies of Gotama's various incarnations, brimful with fun, practical wisdom and incidents taken from the life of people. If we want to know something of Mesopotemian Civilisation, about A. D. 800 when Harun-al-rashid was Commander of the faithul, the Arabian Nights inform us even so much better about the doings of the multitudes that were buzzing in the streets and swarming in the warehouses of Bagdad than learned volumes of Oriental History. Similarly, the Jataka stories are like vivid flashes throwing light on the old Indian panorama of bazar and caravan, farmyard and barracks, the busy workshop and closed cloister. *The Jatakas are the oldest fairy tales of the Aryan race*" ১।

সুতরাং জাতকের গল্পগুলি মাত্র বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের পরিবাহক নয় ; এরা আর্য জাতির প্রাচীনতম কাহিনী সংকলন—প্রাচীন ভারতের রসান্বিত ইতিবৃত্ত।

'জাতকে'র গল্পে বোধিসত্ত্ব নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ। কখনো তিনি মূল কাহিনীর নায়ক, কখনো, পার্শ্বচরিত্র, কখনো বা পর্যবেক্ষক মাত্র। সহজেই বোঝা যায়, একদিকে যেমন বোধিসত্ত্বকে অবলম্বন করে স্বতন্ত্রভাবে কিছু কিছ কাহিনী গড়ে উঠেছে, তেমনি তার পাশে পাশে বহু লোকপ্রচলিত গল্পকেও বোধিসত্ত্বের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। 'তখন বোধিসত্ত্ব একটি শশক হইয়া জন্মিয়াছেন'—মাত্র এই একটুখানি সূত্র ধরেই হয়তো জীবাশ্রয়ী একটি প্রাচীন নীতিগল্পকে জাতকের মধ্যে টেনে আনা হয়েছে। উইন্‌টারনিৎস বলেছেন :

"One had only to make a Bodhisatta out of some human, animal or divine being which occurred in the story, and any story, however wordly and however removed from the sphere of Buddhist thought, could become a Buddhist Story." ২।

১ E. Horrwitz, A short Hist. of the Ind. Lit, P—139 : ইটালিক্‌স্ আমার।

২ Winternitz, A Hist. of Indian Lit, vol II, P—114

প্রতিটি জাতক মোটের উপর পঞ্চাঙ্গ। (১) পচ্চুপ্পন বত্থু—সূচনা পর্ব, বর্তমানের পটভূমি। (২) অতীত বত্থু—গদ্যে বোধিসত্ত্বের অতীত জন্মগত মূল কাহিনীটির বর্ণনা। (৩) 'গাথা'—কবিতায় কাহিনীর মর্মবীজ; এইগুলিই জাতকের প্রাচীনতম উপকরণ, এদের উপরেই ভিত্তি করে পরবর্তীকালে কাহিনীর ভাষ্যরূপ। (৪) 'বেঙ্জকরণ'—এতে গাথার আক্ষরিক অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (৫) 'সমবধান' বা যোগ-রচনা, কাহিনীর পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে বর্তমানের ঐক্য-বিনির্ণয় করা হয়েছে, যেমনঃ 'তখন কোকালিক ছিল মূর্খ বৃক্ষদেবতা, সারিপুত্ত ছিলেন সিংহ, মোগ্গল্লান ছিলেন ব্যাঘ্র এবং জ্ঞানী বৃক্ষদেবতা ছিলাম আমি (বোধিসত্ত্ব) স্বয়ং' (ব্যাগ্ঘ জাতক—২৭২ নং)। পঞ্চাঙ্গ জাতক কাহিনীর কতকগুলি অংশ অতি প্রাচীন, কতকগুলি পরবর্তীকালের সংযোজন—অর্থাৎ তারা গাথার ভাষ্যরূপ মাত্র।

জাতক ভারতবর্ষের এক অসামান্য সম্পদ। কথা ও আখ্যায়িকার অফুরন্ত সমাবেশে এদের মধ্যে নীতিগল্প, রোমান্স ও পারিবারিক 'নভেলা'রও উপকরণ পরিকীর্ণ। আর এই গ্রন্থ যথার্থভাবেই 'আর্যজাতির প্রাচীনতম গল্প সংকলন'—পঞ্চতন্ত্র থেকে দেকামেরন সকলেই এর মধ্যে নিহিত। নীতি উপদেশ, নারীচরিত্র, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রথা, এবং সর্বোপরি প্রাচীন ভারতের একটি সামগ্রিক জীবনেতিহাস জাতকে সন্নদ্ধ। জাতকের সঙ্গে ইউরোপে একমাত্র তুলনীয় চতুর্দশ শতকের Gesta Romanorum, যার বিন্যাস, কল্পনা, মূল কথাসমুচ্চয় এবং উদ্দেশ্য প্রধানত প্রাচ্য থেকেই সংগৃহীত। পরে আমরা 'গেস্তা রোমানোরামের' পরিচয় নেব অন্য অধ্যায়ে।

জাতকের অধিকাংশ নীতিগল্প (প্রাণী বা মনুষ্যভিত্তিক), উত্তরকালে কিভাবে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়েছে—তার সুদীর্ঘ তালিকা রচনা করা যেতে পারে। আমরা মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করব।

'বেদব্ভ জাতকে' (৪৮) বেদব্ভ, মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ—যে কোনো বিশেষ তিথিতে একবার আকাশ থেকে রত্নবর্ষণ করাতে পারত, তার নির্বুদ্ধিতার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে; জাতকটির দ্বিতীয় অংশে রত্নলোভী দস্যুদের যে পরস্পরঘাতী পরিণাম প্রকাশিত হয়েছে, ঈশানচন্দ্র ঘোষ ঠিকই দেখিয়েছেন, তার সঙ্গে 'ক্যাণ্টারবেরি টেল্‌সে'র পার্ডনারের কাহিনীর আশ্চর্য সাদৃশ্য বিদ্যমান। 'সীহচম্ম জাতক' (১৭৯) সিংহচর্মাবৃত গর্দভের সুপরিচিত গল্প—পঞ্চতন্ত্রে এবং ঈশপে প্রাপ্তব্য। 'কচ্ছপ জাতক' (১৭৮) হংস কর্তৃক শূন্যবাহিত কচ্ছপের হঠকারিতা ও মৃত্যুর কাহিনী, পঞ্চতন্ত্রের মধ্য দিয়ে এই গল্পই ঈশপের হাতে পরিবেষিত হয়েছে। 'বক জাতক' (৩৮) একেবারে সোজাসুজি 'বক-কুলীরক কথা'। 'সুংসুমার জাতক' (২০৮) বানর বন্ধুর হৃৎপিণ্ডলোভী বিশ্বাসঘাতক মকরকথা—পঞ্চতন্ত্রের 'লব্ধপ্রণাশে'র সূচনা। 'জম্বুখাদক জাতকে' (২৯৪) চতুর শৃগাল মূর্খ কাককে অলীক গুণগানে

ভুলিয়ে গাছ থেকে পক্ব জম্বু সংগ্রহ করেছিল—ঈশপের The fox and the crow এরই রূপান্তর। 'জবশকুন জাতক' (৩০৮) গলায় হাড়বিদ্ধ নেকড়ে ও সারসের গল্পের ভারতীয় রূপ। 'দীপি জাতক' (৪২৬) নেকড়ে বাঘ ও জলপানকারী ছাগ-শিশুর আদিম ভাষ্য।

নীতিগল্পের সহজ ও সরল গল্পগুলির পাশে সমাজস্থিতির কেন্দ্রবর্তিনী নারীচরিত্র স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। নিঃসংকোচে বলা যেতে পারে, জাতকেই হোক আর পঞ্চতন্ত্রেই হোক—এই কাহিনীগুলি নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধক নয়। নারী-নিন্দায় পঞ্চতন্ত্রে পঞ্চমুখ হয়েছেন গৃহী বিষ্ণুশর্মা; সুতরাং বৈরাগ্যব্রতী বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীরাও যে স্ত্রী-জাতিকে বিষবৎ পরিহার করবেন—এ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

উদাহরণ হিসেবে 'অসাতমন্ত জাতক' (৬১) একটি অবিশ্বাস্য কুৎসিত কাহিনী। পরিণত বার্ধক্যেও নারীর মনে বাসনার পারবশ্য, সেই বাসনার বিমূঢ়তায় তার অসাধ্য কাজ নেই। এই গল্পে দেখা যায়, বোধিসত্ত্বের অতি বৃদ্ধা জননী, যার একশো কুড়ি বছর বয়স হয়েছে এবং পুত্র নিজের হাতে যার সদাসর্বদা পরিচর্যা করেন, সেই জরতীও একজন যুবকের ছলনায় নির্বিকার চিত্তে নিষ্কণ্টক হওয়ার জন্য কুঠার নিয়ে পুত্র-হননে উদ্যত হয়েছে!

আর একটি গল্প 'অন্ধভূত জাতক' (৬২)। এটিতে দেখানো হয়েছে স্ত্রী জাতিকে যত সাবধানেই রক্ষা করা যাক না কেন—নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় সে করে নেবেই এবং প্রবল ধূর্ততার সাহায্যে যে-কোনো সংকট থেকেই পরিত্রাণ পেতে চেষ্টা করবে। 'অন্ধভূত জাতক' দেকামেরন এবং আরব্য উপন্যাসকে মনে করিয়ে দেয়।

গল্পটি সংক্ষেপে এই:

রাজা তাঁর মন্ত্রীর সঙ্গে নিয়মিত অক্ষক্রীড়া করতেন। খেলতে বসে রাজা সর্বদাই জপমন্ত্রের মতো নারীর শিথিল চরিত্রতা বিষয়ে একটি শ্লোক পাঠ করে দান ফেলতেন এবং খেলায় তিনি বরাবর বিজয়ী হতেন। কিছুদিন পরে মন্ত্রী একটি অনাথা কুমারীর লালনপালনের ভার পান। মেয়েটিকে অতি সন্তর্পণে রক্ষা করতেন তিনি। এর পর থেকে রাজা নারীনিন্দাবাচক শ্লোক পাঠ করে খেলতে বসলেই মন্ত্রী পাল্‌টা জবাব দিতেন—'কেবল আমার কন্যাটি ব্যতীত'। ফলে প্রত্যেক খেলায় মন্ত্রীই জিততে লাগলেন।

পরাজয়ক্ষুব্ধ রাজা তখন উক্ত কন্যাটিকে পরীক্ষার জন্য একজন যুবককে নিয়োগ করলেন এবং নানা কৌশলের সাহায্যে যুবকটি অচিরাৎ মেয়েটিকে প্রলুব্ধ করতে সক্ষম হল। শুধু তাই নয়—মেয়েটির শঠতায় একদিন মন্ত্রীকে মাথায় এক প্রচণ্ড আঘাত পর্যন্ত খেতে হল যুবকের হাতে। মূর্খ ব্রাহ্মণ সেটাকে মেয়েটির করস্পর্শ বলে বিশ্বাস করলেন। বললেন, কোমল হাতেও তো বেশ কঠিন আঘাত করা যায়।

এর পর পাশা খেলায় বসে মন্ত্রীর হারের পালা শুরু হল। রাজারূপী বোধিসত্ত্ব তখন মেয়েটির ছলনার কথা সবই জানিয়েছিলেন মন্ত্রীকে। মন্ত্রী

সক্রোধে গৃহে ফিরে মেয়েটিকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। মেয়েটি তখন সরোষে বললে, সে সতী, এক মন্ত্রী ছাড়া আর কোনো পুরুষই তাকে স্পর্শ করেনি। তার প্রমাণ সে দেবে অগ্নিপরীক্ষায় এবং যদি সে যথার্থই সতী হয়, তবে আগুনের শিখা তার প্রভাবে তৎক্ষণাৎ নির্বাপিত হবে।

সেই ব্যবস্থাই হল। প্রজ্বলিত করা হল বিরাট এক অগ্নিকুণ্ড। সেই অগ্নিতে প্রবেশ করার আগে মেয়েটি আবার নিজের পবিত্রতা সম্পর্কে দীর্ঘচ্ছন্দে বক্তৃতা দিতে লাগল। তারপর আগুনের দিকে এগিয়ে যেতেই ভিড়ের মধ্য থেকে ছুটে এল প্রণয়ী যুবকটি—মেয়েটির হাত ধরে টেনে সরিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণকে ধিক্কার করে বললে, ছিঃ ছিঃ, তোমার কি মনুষ্যত্ব বলে কিছুই নেই? এমন পুণ্যচরিত্রাকেও কিনা তুমি অবিশ্বাস করো!

মেয়েটি তখন বিলাপ করে বললে, হায় হায়, আমি তো আর অগ্নি-প্রবেশ করতে পারব না! অন্য পুরুষের স্পর্শে আমি যে অশুচি হয়ে গেলাম!

অভিনয়টি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণের চোখে ধুলো দেওয়া গেল না। মেয়েটিকে তিনি প্রহার করে তাড়িয়ে দিলেন।

নারী সম্পর্কিত বক্তব্য এতে যা-ই থাক—গল্পটির বৈশিষ্ট্য অন্যত্র। জীবমূলক নীতিগল্পের পাশাপাশি এই সব কাহিনীতে সমাজ-নির্ভর নভেলার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। বহুকাল পরে, ইতালির রেনেসাঁসের প্রাক্কালে বোক্কাচ্চো যে নবীন কথাসাহিত্যের ভূমিকা ইয়োরোপে রচনা করেছিলেন, খ্রীষ্টজন্মের পূর্বেই ভারতবর্ষে তার সূত্রপাত হয়ে গিয়েছিল।

অনুরূপ আর একটি গল্প 'বন্ধনমোক্ষ জাতক' (১২০)।

বারাণসীপতি ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন বোধিসত্ত্ব। একবার রাজা সীমান্তের দস্যুদের দমন করবার জন্য রাজধানী পরিত্যাগ করে কিছু দিনের জন্য চলে যান। ব্রহ্মদত্ত মহিষীকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, তাই যাত্রাপথের প্রতি যোজনে একটি করে দূত মহিষীর কুশল সংবাদ জানবার জন্যে প্রেরণ করতে থাকেন। নারী ছিলেন নীতিহীনা, তিনি রাজ-প্রেরিত মোট বত্রিশজন দূতের সঙ্গেই প্রণয়-সম্বন্ধ রচনা করেন। দস্যুদমনের পর প্রত্যাবর্তনের পথেও রাজা অনুরূপ ভাবে দূত পাঠাতে থাকেন এবং রাণী আরও বত্রিশজন অর্থাৎ মোট চৌষট্টি জন দূতকে নিজ প্রণয়ী করেন। অতঃপর বোধিসত্ত্বের প্রতি রাণীর দৃষ্টি পড়ে এবং তাঁরও প্রণয় ভিক্ষা করেন তিনি। ধর্মনিষ্ঠ বোধিসত্ত্ব স্বভাবতই রাণীর অন্যায় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। রাজা ফিরে এলে রাণী অভিযোগ করেন যে বোধিসত্ত্ব বলপূর্বক তাঁর অমর্যাদা করেছেন। কুপিত মূঢ় রাজা তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত মন্ত্রীর বধাজ্ঞা দান করেন। বধ্যভূমিতে নীত হওয়ার পূর্বে বোধিসত্ত্ব রাজার কাছে রাণীর যথার্থ স্বরূপটি প্রকাশ করে দেন। রাণী তখন নিজের অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হন। রাজা আদেশ দেন, এই চৌষট্টি জন দূতের এবং রাণীর শিরশ্ছেদ করা হোক।

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, এই দূতদের হত্যা করবেন না। এরা নিরপরাধ—রাণীর আদেশ পালন করেছে মাত্র। আর রাণীও ক্ষমাযোগ্যা। কারণ তিনি স্বেচ্ছায় অপরাধ করেন নি; স্ত্রী-জাতির বাসনাবেগ অপ্রতিরোধ্য এবং অতৃপ্য—রাণী সেই প্রকৃতি-ধর্মের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছেন মাত্র।'

বোধিসত্ত্বের কথায় রাজা সকলকেই মার্জনা করলেন। কিন্তু 'আর্যজাতির সর্বাদি গল্প-সাহিত্যে' নারী সম্বন্ধে এই যে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে—ভবিষ্যতে এর ব্যাপক প্রভাব আমরা দেখতে পাব। 'পঞ্চতন্ত্রে'র প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনার অবকাশ পাওয়া যাবে।

'জাতক' প্রাচীন ভারতের পরিপূর্ণ জীবনচিত্র। জীবাশ্রয়ী নীতিকথা এবং নারী-চরিত্র প্রভৃতি ছাড়াও এতে অনেকগুলি বিশিষ্ট দিক আছে। 'সচ্চংকির জাতকে' বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের দুরাচার পুত্র দুষ্টকুমার যখন প্রাণদাতা বোধিসত্ত্বের জীবননাশে উদ্যত হয় তখন প্রকৃতিপুঞ্জ ক্ষুব্ধ বিদ্রোহে বিচারের ভার তুলে নিয়ে দুরাত্মা দুষ্টকুমারকে বধ করে। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে (এবং রসশাস্ত্রেও) রাজবিদ্রোহ মহাপাপ; কিন্তু জাতকের একাধিক গল্পে আমরা আর্যসমাজের সেই অবস্থার সন্ধান পাই যখন সিংহাসন বংশগত ছিল না—প্রয়োজন হলে প্রকৃতিপুঞ্জ দুরাচার রাজাকে অপসারিত করবার ভার স্বহস্তে তুলে নিত এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে দেশনায়করূপে নির্বাচিত করত। সংস্কৃত সাহিত্যে পরবর্তীকালে মাত্র 'মৃচ্ছকটিকেই' পালকের অপসারণে এবং আর্যকের রাজসিংহাসন লাভে অনুরূপ সংসাহসের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

'বড্ঢকি শূকর' জাতক (২৮৩) বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বোধিসত্ত্ব বৃক্ষদেবতা রূপে এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কোনো অরণ্যে একদল শূকর এবং একটি ব্যাঘ্র বাস করত। এই ব্যাঘ্রের আক্রমণে প্রতিদিন একটি করে শূকরের প্রাণনাশ হত ও ব্যাঘ্র সেই শূকরের মাংস জনৈক ভণ্ড তপস্বীর সঙ্গে ভাগ করে খেতো। এই ব্যাঘ্রপীড়ন থেকে নিজগোষ্ঠীকে বাঁচাবার জন্য নেতৃত্ব নিল বড্ঢকি (বর্ধকী) শূকর। তার প্রেরণায় শূকরেরা সংঘবদ্ধ হল, ব্যাঘ্র ও ছদ্মতপস্বী তাদের সম্মিলিত আক্রমণে প্রাণ হারাল। শত্রু প্রবল-পরাক্রান্ত হলেও সংঘশক্তির মহিমায় তাকে যে বিনাশ করা যায়—এই গল্প থেকে সে সম্বন্ধে শিক্ষালাভ ঘটে। রণনীতি ও ব্যূহরচনার কৌশলও এতে বিবৃত হয়েছে।

পারিবারিক জীবনচিত্রও জাতকে উপেক্ষিত হয়নি। 'কচ্চানি জাতকে' (৪১৭) কলহকন্দলা পুত্রবধূ কী কৌশল বিস্তার করে শাশুড়ীকে গৃহত্যাগিনী হতে বাধ্য করেছিল, তার অতি বাস্তব আলেখ্য মেলে। আবার শক্রের (ইন্দ্রের) ক্রোধে যখন সেই বধূই স্বামী এবং নবজাত সন্তানসহ ভস্মীভূত হওয়ার উপক্রম, তখন বৃদ্ধার ক্ষমাশীলতা এবং মাতৃমমতা সমগ্র কাহিনীটিতে স্নিগ্ধ মহিমা বিস্তার করে দেয়। ব্যবসায়িক জ্ঞানের এবং লৌকিক উন্নতির পথিনির্দেশক 'সেরিবাণিজ' (৩) এবং 'চুল্লক-শেঠ্ঠী' (৪) জাতক। প্রথম গল্পে অসাধু ও লোভী ফেরিওয়ালা প্রাণ হারালো, সাধু

ফেরিওয়ালা (বোধিসত্ত্ব) প্রচুর লাভবান হলেন। দ্বিতীয় গল্পটিতে একটি মৃত মূষিককে মূলধন করেও যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কর্মজীবনে লক্ষ্মীলাভ করতে পারেন তার চমৎকার উপদেশ আছে। 'চুল্লক-শেঠ্ঠীর' অনুরূপ গল্প 'কথাসরিৎসাগরে'ও প্রাপ্তব্য।

কৌতুক গল্পেরও উপাদেয় নিদর্শন আছে জাতকে। উপস্থিত বুদ্ধি ও কৌতুক সৃষ্টির চমৎকার নিদর্শনরূপে 'দূত জাতক' (২৬০) স্মরণযোগ্য :

এই জন্মে বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মদত্তের পুত্ররূপে কাশীর রাজা হয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত ভোজনবিলাসী ছিলেন এবং সহস্র সহস্র মুদ্রাব্যয়ে প্রত্যহ তাঁর ভোজ্য প্রস্তুত হত। এক বিরাট সুসজ্জিত দরবারে রাজপুরুষবৃন্দ পরিবৃত হয়ে তিনি খাদ্যগ্রহণ করতেন। জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁর খাদ্যবস্তুর স্বাদ গ্রহণে লালায়িত হল। কিন্তু রাজার ভক্ষ্য তার কোনোমতেই আয়ত্তগম্য নয়। সুতরাং একদিন সে 'দূত দূত' বলে চিৎকার করতে করতে ধাবমান অবস্থায় রাজার ভোজনের আসরে গিয়ে উপস্থিত হল। নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর সংবাদ বহন করে এনেছে ভেবে প্রহরীরা তাকে বাধা দিল না। ব্রাহ্মণ রাজার সম্মুখে গিয়ে তাঁর ভোজনপাত্র থেকে তৎক্ষণাৎ আহার আরম্ভ করল। রক্ষকেরা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে রাজা তাদের বারণ করলেন এবং আহার শেষ হলে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন সে কার দূত—তার বার্তাই বা কী। উত্তরে ব্রাহ্মণ বললে, 'মহারাজ, আমি উদরের দূত এবং লোভের বার্তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি।' এই বলে এক শ্লোকে সে জানালো : 'হে মহারাজ, এই উদরের দূতের প্রতি আপনি ক্রুদ্ধ হবেন না। সংসারের প্রতিটি মানুষই উদরের অনিবার্য তাড়নায় দিবারাত্র দৌত্য করছে।' রাজা খুশি হয়ে বললেন, 'ঠিক কথা' এবং ব্রাহ্মণকে প্রচুর পুরস্কার দিলেন।

'রুহক জাতকে' (১৯১) রাজমন্ত্রী তার স্ত্রীর বুদ্ধিতে ঘোড়ার সাজ পরে নগরীর লোকের উপহাসাস্পদ হয়েছে। স্ত্রীর উদ্দেশ্য ছিল স্বামীকে নিয়ে কিছু কৌতুক সৃষ্টি করা—ব্রাহ্মণের পক্ষে সেটা অবশ্য মর্মঘাতী হয়ে দাঁড়ালো। গল্পটি আবার দেকামেরনকে স্মরণ করায়। 'বীণামূলজাতক' (২৩১) আরও একটি রসগল্প। একটি হৃষ্টপুষ্ট বলীবর্দকে প্রাণিশ্রেষ্ঠ ব'লে সমাদৃত হতে দেখে জনৈকা কুমারীর মানুষশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধে একটি ধারণা জন্মায়। এই ধারণার ফলে একটি কুব্জকে দেখে সে তাকে নরোত্তম বলে মনে করে—কুঁজটিতে সে ককুদের মহিমা প্রত্যক্ষ করে। অবশ্য বোধিসত্ত্বের প্রভাবে পরে তার ভ্রান্তিমোচন হয়। 'মকস জাতক' (৪৪) নির্বোধ পুত্র কর্তৃক পিতার মস্তকে যষ্টি-প্রহারে মশক বধের কৌতুক কাহিনী ; গল্পটির নানা রূপান্তর প্রচলিত আছে—বাংলা দেশের রূপকথায় হবুচন্দ্র রাজা ও গবুচন্দ্র মন্ত্রী অনুরূপ কীর্তিতে যশস্বী হয়েছেন।

'জাতক সাহিত্য' প্রাচীন আর্য ভারতের রূপময় ইতিহাস—রসমধুর সমাজ-চিত্র। হেন বিষয় নেই যা নিয়ে জাতকে গল্প রচিত হয়নি—ব্যবহারিক জীবনের এমন কোনো দিক নেই—যা এতে প্রতিফলিত হয়নি।

বুদ্ধের পূর্ববর্তী, সমকালীন এবং উত্তরকালীন ভারতের একটি কায়িক ও আত্মিক পরিচয় লাভ করতে গেলে জাতক সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য বস্তুনিষ্ঠ পাঠ্যবস্তু।

কিন্তু চমকপ্রদ রোমান্সও 'জাতক' সাহিত্যে আছে। এগুলিতে মাত্র নীতিশিক্ষা, রসসৃষ্টি বা কৌতুক পরিবেষণই করা হয়নি—এদের মধ্য দিয়ে প্রাচীন আর্যদের কল্পনাশক্তির একটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটে। আমরা এতক্ষণ জাতকের কেন্দ্রাভিগ দিকটিই প্রত্যক্ষ করেছি—এবার তার কেন্দ্রাতিগ রূপটিও পরীক্ষা করা যেতে পারে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'মহাজনক জাতক'টি (৫৩৯) দেখা যাক। এর প্রথম অংশটি একাধারে বিচিত্র রোমান্স এবং অ্যাডভেঞ্চার—বলা যেতে পারে, স্যার ওয়ালটার স্কটের উপন্যাসের উপকরণ।

মিথিলার রাজা ছিলেন অরিষ্টজনক। তাঁর ভ্রাতা পোলজনক তাঁকে হত্যা করে রাজ্য অধিকার করে নিলেন। অরিষ্টজনকের অগ্রমহিষী ছিলেন অন্তর্বত্নী, তিনি নিজের এবং গর্ভস্থ সন্তানের প্রাণ বাঁচানোর জন্য রাজধানী থেকে পলায়ন করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের অনুগ্রহে (কারণ স্বয়ং বোধিসত্ত্ব মাতৃগর্ভে রয়েছেন) রাজরাণী শেষে চম্পা নগরে এসে উপস্থিত হন এবং সেখানে দেশবন্দিত আচার্য উদীচ্য ব্রাহ্মণ মহাসার ভগ্নীর মর্যাদায় নিজগৃহে তাঁকে আশ্রয় দেন। এইখানেই 'মহাজনক কুমার' নামে বোধিসত্ত্বের জন্ম হয়।

বয়োবৃদ্ধি হলে সর্বগুণভূষিত মহাজনক কুমার মায়ের কাছে অতীত বৃত্তান্ত ও পিতৃ-পরিচয় জানতে পারেন এবং অপহৃত পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধারের সংকল্প নিয়ে তিনি নিষ্ক্রান্ত হন। একটি অর্ণবযানে একদল বণিকের সঙ্গে তিনি সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। জাহাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলতে থাকে, ফলে তার তলা থেকে কাষ্ঠখণ্ড খুলে যায় এবং মধ্যপথে তা জলমগ্ন হতে থাকে। সাহসে এবং কৌশলে জলচর হাঙর-মকরদের কাছ থেকে আত্মরক্ষায় সমর্থ হন মহাজনক কুমার এবং তাঁর পুরুষকারকে সাহায্য করেন মণিমেখলা নাম্নী জনৈকা দেবকন্যা। পরিশেষে কুমার সমুদ্র পার হয়ে চম্পা নগরে এসে উপস্থিত হন।

পিতৃঘাতী পিতৃব্য রাজা পোলজনক তখন বার্ধক্যে উপনীত এবং মৃত্যুশয্যায়। তাঁর পুত্র নেই। সুতরাং অমাত্যেরা অত্যন্ত সংকটে পড়েছেন। রাজার দেহান্তের পরে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কে হবেন—এই মর্মে রাজার অনুজ্ঞা তাঁরা জানতে চাইলেন। রাজার একমাত্র সন্তান ছিলেন পরমা রূপবতী ও প্রজ্ঞাবতী কন্যা সীবলি। রাজা বললেন, 'ষোল স্থানে রত্ন লুক্কায়িত আছে, যে তা উদ্ধার করতে পারবে; সহস্র মল্লও চেষ্টা করে যে ধনুক নোয়াতে পারে না—তাতে যে জ্যা-রোপণ করতে পারবে; পালঙ্কের রহস্য যে নির্ণয় করতে পারবে এবং তাঁর কন্যা সীবলির যে মনস্তুষ্টি করতে পারবে, সেই সীবলির স্বামী হবে এবং মিথিলার আধিপত্য লাভ করবে।'

রূপসী ও বিদুষী পত্নীলাভের আশায় এবং রাজ্যলোভে অনেকেই অগ্রসর হলেন। প্রথমেই সেনাপতি এলেন বীরদর্পে, কিন্তু অপমানিত হয়ে ফিরে গেলেন। তারপর একে একে ভাগ্য পরীক্ষা করলেন ভাণ্ডাগারিক, শ্রেষ্ঠী, অসিগ্রাহক, সূত্রধার ইত্যাদি—কিন্তু কারো অদৃষ্টই প্রসন্ন হল না। অবশেষে এলেন মহাজনক কুমার। প্রখর বুদ্ধির দ্বারা তিনি ষোড়শ স্থান থেকে লুক্কায়িত রত্ন আবিষ্কার করলেন, মত্ত হস্তীর বলে ধনুকে জ্যা-বিন্যাস করলেন, পালঙ্কের রহস্য তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তিতে উদ্‌ঘাটিত হল, সীবলিকে তিনি তুষ্ট করলেন এবং পত্নীরূপে লাভ করলেন।

এইভাবে পিতার রাজ্য উদ্ধার করলেন মহাজনক কুমার।

কাহিনীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজা মহাজনক কুমারের চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় এবং তাঁর প্রব্রজ্যা নেওয়ার বাসনা। কাহিনীর এই অংশটি স্পষ্টই স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠেনি; এখানে রোমান্সের কথক তাঁর গল্প শেষ করে উঠে গেছেন এবং তাঁর আসনে এসে বসেছেন বৌদ্ধশ্রমণ—সম্পূর্ণ নতুন ভাবে একটি বৈরাগ্যমুখ্য দ্বিতীয় গল্প তৈরি করতে বসেছেন। কিন্তু এ অংশটিরও কিছু বিশেষত্ব আছে। ঐশ্বর্য-বিরক্ত সন্ন্যাসেচ্ছু রাজাকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্য রাণী সীবলি নানা কৌশল বিস্তার করেছিলেন—সেগুলি বাংলা সাহিত্যের "গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস" স্মরণ করায়। জাতকটি অজন্তায় চমৎকার চিত্রোজ্জ্বল হয়ে আছে।

'মহা-উম্‌মগ্‌গো জাতক' (৫৪৬) আর একটি বিচিত্র বস্তু। এ একসঙ্গে রোমান্স, নাটক, দণ্ডনীতি, চাতুর্য এবং শঠতার এক বিস্ময়কর সমাহার। এই গল্পে মহোষধ পণ্ডিতরূপে হাতে একখণ্ড ঔষধ নিয়েই বোধিসত্ত্ব মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হন। শৈশবকাল থেকেই তিনি অলৌকিক বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞার নিদর্শন দিতে লাগলেন। তারপর শুরু হল তাঁর বিজয়াভিযান। এই বিশাল জাতকটিকে একখানি স্বয়ং-সম্পূর্ণ মহাগ্রন্থ বলা যেতে পারে।

উনিশটি প্রজ্ঞার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মহোষধ বিদেহ রাজের সভাপণ্ডিত হলেন। 'পুত্র-প্রজ্ঞায়' মহোষধ একটি শিশুর জননীত্ব নিয়ে বিবাদকারিণী দুই নারীর বিচারে যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা অনুরূপ অবস্থায় রাজা সলোমনের বিখ্যাত বিচারের স্মারক। রাজার সভাপণ্ডিত রূপে তিনি বৃত হলে সেনক, পুক্কুশ, কবীন্দ্র ও দেবেন্দ্র প্রমুখ অন্যান্য পণ্ডিতেরা তাঁর প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ হয়ে তাঁকে রাজার বিরাগভাজন করবার চেষ্টা করেন। মহোষধের বুদ্ধিনৈপুণ্যে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাঁর উপযুক্ত পত্নী অমরা দেবীও একবার পণ্ডিতদের কুচক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁদের বিধিমতে লাঞ্ছনা করেন।

ইতোমধ্যে বারাণসীরাজ চূড়ানী ব্রহ্মদত্ত তাঁর অতি শঠ মন্ত্রী কৈবর্তের কুপরামর্শে আর্যাবর্ত জয়ে অগ্রসর হলেন। সমস্ত রাজাই পরাভব স্বীকার করে নিলেন, কেবল বিদেহ রাজ্যে এসেই মহোষধের বুদ্ধিকৌশলে অপমানিত হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে হল চূড়ানী ব্রহ্মদত্তকে। কৈবর্তও যৎপরোনাস্তি

লাঞ্ছিত হলেন। অসম্মানিত বারাণসীরাজ ছলনার দ্বারা এর প্রতিশোধ নেবেন স্থির করলেন। পঞ্চালচণ্ডী নামে তাঁর অতি রূপবতী এক কন্যা ছিল। বিদেহরাজকে এই কন্যাদান করবেন বলে তিনি তাঁকে বারাণসীতে আমন্ত্রণ করলেন—উদ্দেশ্য নিজ কুক্ষির মধ্যে পেয়ে শত্রুকে বিনাশ করবেন। মহৌষধ পূর্বাহ্ণেই সতর্ক করে দিলেন, কিন্তু বিদেহপতি তখন পাঞ্চালচণ্ডীর রূপলালসায় উন্মত্ত—উপদেশে কর্ণপাত দূরে থাক, তিনি পণ্ডিতকে অপমান করে বসলেন।

মহৌষধ অবশ্য রাজার হিতৈষণা পরিত্যাগ করলেন না। বিদেহরাজকে রক্ষা করা এবং সেই সঙ্গে ব্রহ্মদত্তকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া—এই উভয় উদ্দেশ্য নিয়ে বিবাহপূর্ব আয়োজনের ছলে কিছু আগেই তিনি বারাণসীতে পৌঁছুলেন। তারপর কী অপূর্ব কৌশলে তিনি বিদেহরাজের প্রাণ বাঁচালেন—পাঞ্চালচণ্ডী, রাজমহিষী এবং রাজমাতাকে বন্দিনী করে বিদেশে নিয়ে গিয়ে রাজার সঙ্গে পাঞ্চালচণ্ডীর বিবাহ দেওয়ালেন এবং ব্রহ্মদত্তের স্থায়ী পরাজয় ঘটিয়ে তার বন্ধুত্ব অর্জন করলেন, সে কাহিনী যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি বিচিত্র।

এই জাতকে রাজমাতা তলতা দেবী এবং মন্ত্রী ছম্ভীর যে উপকাহিনীটি আছে, তা থেকে হ্যামলেটের অনুরূপ একটি নাটক নির্মিত হতে পারে।

সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেই এই জাতকটি অদ্বিতীয় সৃষ্টি—প্রত্যেক সাহিত্য-পাঠকের দৃষ্টি এর দিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গ এতে নেই বললেই চলে। একদিকে এর মধ্যে যেমন উদয়ন-যৌগন্ধরায়ণ কথা ও 'মুদ্রারাক্ষসের' অঙ্কুর, অন্যদিকে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' থেকে প্রহেলিকার উত্তর পর্যন্ত বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতীয় কথা-প্রতিভার পরিপূর্ণ রূপ এই জাতকে উদ্ভাসিত হয়েছে।

রামায়ণ মহাভারতের কিছু কিছু অভিনব ভাষ্যও জাতকে লভ্য। যেমন 'দশরথ জাতক' (৪৬১) 'ঘট জাতক' 'শ্যাম জাতক' (৫৪০) ইত্যাদি। এইগুলির কোনো কোনোটি রামায়ণ মহাভারতের অনুরূপ—কোনো কোনোটি সম্পূর্ণই নতুন ধরনের। এ থেকে স্বভাবতই একটি প্রশ্ন জাগে। এরা রামায়ণ মহাভারতের পূর্ববর্তী কিনা? রিস্ ডেভিড্স্ এবং ঈশানচন্দ্র ঘোষের প্রতিধ্বনি করে আমরা বলতে পারি, এই সমস্ত জাতক প্রাক্ রামায়ণ মহাভারত হওয়াই সম্ভব। কারণ উক্ত গ্রন্থদুটি রচিত হওয়ার পর যে বিপুল জনপ্রিয়তা ও লোকপাঠ্যতা অর্জন করেছিল, তাতে তাদের কাহিনী স্বেচ্ছানুযায়ী বিকৃত করা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। পণ্ডিতেরা সকলেই বলেন, বাল্মীকির হস্তক্ষেপের বহু পূর্ব থেকেই রামায়ণ-কথার একটি রূপ চলিত ছিল, বিশাল মহাভারতের মূল গল্পটি বাদ দিলে তার শাখা-কাহিনীসমূহ ইতস্ততঃ আহরণ করা। সুতরাং রামায়ণ মহাভারতের স্রষ্টা ঋষিদ্বয় এবং জাতক-গল্পের রচয়িতারা একই আদিম উৎস থেকে জলধারা নিয়ে এসেছেন—কেউ তাকে বইয়ে দিয়েছেন জাহ্নবীর পথে, কেউবা

প্রবাহিত করেছেন নিরঞ্জনার খাতে।

এই অসামান্য রত্নমঞ্জুষা বহুকাল ধরে ধর্মীয় কুণ্ডিকায় বন্ধ ছিল, গুপ্তধনের মতো প্রোথিত ছিল সিংহলের মৃত্তিকায়। তাই এর উপযুক্ত প্রচার ও প্রসার ঘটেনি। এক-আধটুকু কালেভদ্রে বেরিয়ে এসেছে—তার প্রমাণ সপ্তম শতাব্দীতে গ্রীসের "Barlaam and Josaphat"—জাতকের প্রভাবেই সেটি রচিত।

'জাতকে'র পরে ভারতীয় কথাসাহিত্যে 'পঞ্চতন্ত্রে'র আবির্ভাব এবং দিকে দিকে তার জয়যাত্রা। যে কাজ জাতকের করণীয় ছিল তা পঞ্চতন্ত্র করেছে। কিন্তু জাতকের রস যেন পঞ্চতন্ত্রে পুরোপুরি পাওয়া যায় না। পঞ্চতন্ত্র পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার দ্বারা বিশেষভাবে রচিত, তার মধ্যে সভাবিহারী মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণের একটি নীতিশিক্ষাদানেচ্ছু মনের সজ্ঞান অভিনিবেশ আছে, তা ব্যক্তিক; আর জাতক যেন সমগ্র জাতির হস্তস্পর্শে রচিত—এর রচনার বৈচিত্র্য থেকে বোঝা যায়, এক-একজন এক-একখানি পাথর বসিয়ে এই মিনারটিকে গড়ে তুলেছেন।[১] বৌদ্ধাচার্যেরা এদের সঙ্গে 'বোধিসত্ত্ব'কে যুক্ত করে নিজেদের ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতের লোককথাগুলি নিজেদের স্বরূপ হারায়নি—যেমন শ্রমণের পীত বস্ত্র পরিয়ে দিলেই কোনো মানুষের কায়িক পরিবর্তন সম্ভব হয় না। পঞ্চতন্ত্রে যেন একটা পোশাকী রূপ আছে—রাজসভার গন্ধ আছে; আর জাতকের গল্পে ভারতের পথ-নদী অরণ্য-পর্বত নগর-পল্লী এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবন একেবারে অকৃত্রিম ভাবে উপস্থিত হয়েছে। ই. বি. কাউয়েল্ বলেছেন ঃ

"The Jataka themselves are of course interesting as specimens of Buddhist literature; but their foremost interest to us consists in their relation to folk-lore and the light which they often throw on those popular stories which illustrate so vividly ideas and superstitions of the early times of civilisation. In this respect they possess a special value, as although much of their matter is peculiar to Buddhism, they contain embedded with it an unrivalled collection of folk-lore. They are also full of interest as giving a vivid picture of the social life and customs of ancient India"[২]।

১। "And this is really only the very natural and necessary result of what has been pointed out above, that the books (The Jatakas) grew up gradually, that they were not books in our modern sense, and that they had no single authors"—Buddhist India, T. W. Rhys Davids, Chap XI. P, 190.

২। The Jataka, Ed. by E. B. Cowell. Vol. I. Preface, p.—XI

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যেও জাতকের প্রভাব কতখানি তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। বৌদ্ধ সাহিত্যের এই মণিমঞ্জুষা থেকেই তিনি তুলে নিয়েছেন 'কুশ জাতক'—গড়ে উঠেছে 'রাজা' 'অরূপরতন'; 'শ্যামা জাতক' থেকে জন্ম নিয়েছে 'পরিশোধ'এর শ্যামা। প্রথমটি তাঁর রূপদর্শনের গভীরে ডুব দিয়েছে—'চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে' আর দ্বিতীয়টি তাঁর অন্যতম প্রধান রোম্যান্টিক গাথাকবিতায় এবং সার্থক গীতিনাট্যে রূপায়িত হয়েছে।

যে কথা আগেই বলা হয়েছে—প্রাচীন আর্য জাতির লোকসাহিত্যের সংকলন এই জাতক বিশেষ একটি ধর্মগত গণ্ডীতে নিবদ্ধ হয়ে পড়ায় এবং দীর্ঘকাল সিংহলে প্রায় নির্বাসিত থাকার ফলে এর উপযুক্ত প্রসার ঘটতে পারেনি। জৈন সংকলন 'কথাকোষ' প্রভৃতিরও অনুরূপ অবস্থাই ঘটেছে। তবে জাতকের কিছু কিছু গল্প বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে চীন-জাপানে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সে আলোচনা স্বতন্ত্র ও দীর্ঘ। আমরা সে পথে না গিয়ে ভারতীয় কথা-সাহিত্য কিভাবে আরব ও পারস্যের মধ্যে দিয়ে ইয়োরোপে অগ্রসর হয়েছিল, সেই ধারাটিই অনুসরণ করব। কারণ আধুনিক ছোট গল্পের লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে ইয়োরোপই আমাদের নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল।

জাতকের স্রোত পূর্ববাহিনী—বৌদ্ধভিক্ষুরা হিমালয়ের তুষারপথের মধ্য দিয়ে শঙ্খধ্বনিতে তাকে আহ্বান করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাই সে কাল-কালান্তর ওই তুষারের মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে রইল; আর নইলে দক্ষিণ সমুদ্রের ওপারে চন্দন বনের গন্ধে সে মগ্ন হয়ে রইল স্তূপ-চৈত্যের মাঝখানে। কিন্তু ওই একই উৎসমুখ থেকে গতি আহরণ করে পঞ্চতন্ত্র হল পশ্চিমবাহিনী। জাতক যেদিকে অগ্রসর হল, যেদিকে ধ্যান ধারণা তপ-তপস্যার স্তব্ধ প্রশান্তি—বিশাল বিচিত্র বৌদ্ধগুম্ফার ধূপ-দীপশোভিত পবিত্র পুঁথিগুলির মধ্যে সে স্থান পেলো। পঞ্চতন্ত্রকে গ্রহণ করল সেই সব জাতি—যারা গতিচঞ্চল, যারা ভোগতৎপর—যারা জীবন-রসের রসিক। তাই যে কাজ জাতক পারে নি তা করল পঞ্চতন্ত্র—সমাজনীতি প্রচার করে এবং জীবন-রসিকতার উল্লাসময়তায় তা প্রাণদীপ্ত ইয়োরোপের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেল।

পঞ্চতন্ত্র

জাতক সংকলিত হল বৌদ্ধমঠে আর পঞ্চতন্ত্র রচিত হল রাজসভায়। জাতক নিলেন রাজ্যত্যাগী সন্ন্যাসী মহেন্দ্র, পঞ্চতন্ত্রকে নিয়ে গেলেন বিলাসী রাজা নুশিরবান। একটি যোগীর জন্য, অন্যটি ভোগীর জন্য। একটি সহজ সরল, অন্যটি কুশলী শিল্পীর হস্তস্পৃষ্ট। প্রাচীন ভারতের এই দুটি মহাগ্রন্থের মধ্যে মূল পার্থক্য ট এইখানেই।

মহিমায় এবং বিশালত্বে পঞ্চতন্ত্র জাতকের অপেক্ষা ন্যূন; কিন্তু সচেতন কথাশিল্পীর রচনাগুণে এর সাহিত্যিক মূল্য বেশি এবং ইতিহাসগৌরব

অতুলনীয়।

বস্তুত একমাত্র The Holy Bible ছাড়া মধ্যযুগে পৃথিবীতে কোনো গ্রন্থ এত অধিক সংখ্যক ভাষায় অনূদিত হয়নি—এমন ব্যাপক ভাবে পঠিতও হয়নি। প্রাচীন ফার্সীভাষা পহ্লবীর মাধ্যমে পঞ্চতন্ত্র প্রথম ভারতের বাইরে পদার্পণ করে। অনুমান করা যায়, পারস্য থেকেই ঈশপ নামে খ্যাত গ্রীক ক্রীতদাস একে ইয়োরোপে নিয়ে যান—তারপর এর গল্পমালা দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, ইউরোপে যে সমস্ত প্রাণিমূলক কথা (fable) প্রচলিত রয়েছে—তা যে ভারতবর্ষেরই নিঃসন্দিগ্ধ দান, এমন সিদ্ধান্ত করবার কী হেতু থাকতে পারে? একই আর্য ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার মধ্যে একই ধরণের লোককথা, বিশেষত প্রাণিপ্রতীক নীতি-সাহিত্য প্রচলিত থাকা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। হয়ত স্বাভাবিক—কিন্তু একটি বিশেষ সময়ের পূর্বে এই ধরণের গল্পের সন্ধান ইয়োরোপে পাওয়া যায় না কেন—সে প্রশ্ন অবশ্যই করা যেতে পারে। তা ছাড়া লিন্ য়ুটাং রবিন্সনের যে যুক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন সেটিও প্রণিধানযোগ্য :

"That the migration of fables was originally from East to West, and not vice versa, is shown by the fact that animals and birds who play the leading parts, the lion and the jackal, the elephant and the peacock, are mostly Indian ones. In the European version, the jackal becomes the fox: the relation between the lion and the jackal is a natural one, whereas between the lion and the fox is not."[১]।

অনর্থক বিতর্ক বিস্তারের অভিপ্রায় না থাকলে এ সত্য মানতেই হবে যে প্রাণিমূলক কথা (fable) ভারতীয় জাতক, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ এবং জ্ঞাত-অজ্ঞাত অন্যান্য বহুবিধ উত্তমর্ণের কাছ থেকে ইয়োরোপ গ্রহণ করেছে। ম্যাক্সমূলার, বেন্ফি, কেলার ও কীথ্ প্রমুখ গবেষকরা এ সম্বন্ধে অখণ্ডনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক থিয়োডোর বেন্ফি লীপজীগ্ থেকে পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ প্রকাশ করে ইয়োরোপীয় লোকসাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক ব্যাপক আলোচনা আরম্ভ করেন। অবশ্য অনুবাদ ও আলোচনা আরো পূর্বেই সূচিত হয়েছিল অরিয়েন্টালিস্টদের হাতে। ১৭৮৭ সালে চার্লস উইল্কিন্স্ হিতোপদেশের ইংরেজি অনুবাদ করেন এবং পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের উপর অত্যন্ত মূল্যবান একটি ভূমিকা লেখেন। তারপর পঞ্চতন্ত্র নিয়ে কাজ করেন কোজগার্টেন (Bonnae Ad Rhenum—1848)।

১ Lin Yutang—The Wisdom of India, Jaico Ed. P—361

Kellar-ও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন—A. B. Keith (Hist. of Skt. Lit P—358.) দ্রষ্টব্য।

এছাড়া বুহ্‌লার ও কিলহর্ন (একসঙ্গে), রাইডার এবং জোহানস্ হার্টেল প্রমুখ মনীষীরাও সুদীর্ঘ গবেষণা করেছেন।

এঁদের মধ্যে জোহানস্ হার্টেলের গবেষণাই সবচাইতে মূল্যবান ও বিস্তৃত। পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত ও প্রচারিত এই গ্রন্থটির উৎস-সন্ধানে যাত্রা করে তিনি 'তন্ত্রাখ্যায়িকায়' পৌঁছেছেন, কাল নির্দেশ করেছেন খ্রীষ্টপূর্ব দুই শতক, স্থান নির্ধারণ করেছেন কাশ্মীর। তাঁর প্রধান উপকরণ হল ঃ

"It is one of the Kashmirian Mss. got by Buhler, is written in Sarada character and bears the title of 'Tantrakhyaika'. This recension probably dates from about 200 B. C."[১] ।

'তন্ত্রাখ্যায়িকা'ই যে পঞ্চতন্ত্রের আদি রূপ, কাশ্মীরই যে এর জন্মভূমি এবং এই বই যে খ্রীষ্টজন্মের পূর্বেই সংকলিত, এ কথা হার্টেল নিঃসংশয়িত-রূপে প্রমাণ করতে পারেননি। তাঁর পরিশ্রমের জন্য তিনি ধন্যবাদভাজন কিন্তু এই সব সিদ্ধান্ত গভীর তমসার মধ্যে এক দিক থেকে আলোক-প্রক্ষেপ মাত্র—ভারতীয় মতে 'অন্ধের হস্তিদর্শন ন্যায়'। এ কথাই বা কে জোর করে বলতে পারেন—এই বই গোড়াতে মাত্র একটি তন্ত্রের আকারেই প্রচারিত ছিল না ?—এর নাম ছিল না করটক ও দমনক ? কিছুই বলা যায় না। কারণ প্রাচীন ফার্সী থেকে ফরাসী পর্যন্ত করটক-দমনক নামেরই প্রাধান্য আমরা দেখতে পাই ; যথা—**'Chalila u Damnah', 'Chalila u Damna', 'Calila u Dimna', 'Calaileg and Damnag', Kalilok va Dimanaka'**, অথবা **'Galland Cardonne'**। অনুমান এবং অনুসন্ধানে দোষ নেই—নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আপাতত পঞ্চতন্ত্র থাকাই বাঞ্ছনীয়।

এ. বী. কীথ্ তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে সব দিক পর্যালোচনা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তাতে মোটামুটি একটা সামঞ্জস্যের চেষ্টা আছে। হার্টেলের যুক্তি খণ্ডন করে কীথ বলতে চাইছেন—

সম্ভবত 'পঞ্চতন্ত্র' হচ্ছে পাঁচটি বিষয়—এবং এই পঞ্চবিষয়ের সমন্বয়েই গঠিত হয়েছে 'পঞ্চতন্ত্র'। মূল গ্রন্থটি সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে এর পহ্লবী অনুবাদ হওয়ার কিছুকাল পূর্বে এটি সংকলিত হয়েছিল। হার্টেল নিজেই আর নিঃসন্দেহে শেষ পর্যন্ত বলতে পারেন নি যে এই বইয়ের রচনাকাল খ্রীষ্টজন্মের পূর্বে, বরং পরবর্তী বলেই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। পঞ্চতন্ত্রকার মহাভারতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, দীনারের ব্যবহার তাঁর জানা ছিল এবং এগুলি অনিবার্য ভাবেই খ্রীষ্টজন্মের পরবর্তী কাল সংকেতিত করে। এমন কি খ্রীষ্টীয় দুই শতককেও এর সুনির্দিষ্ট রচনাকাল বলে নির্দেশ করা যায় না। মোটের উপর, গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্য মহিমার পুনঃ প্রতিষ্ঠাকালই এর যথার্থ জন্মলগ্ন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দ্বারা রাজকুমারদের শিক্ষার প্রয়োজনেই গ্রন্থটির সংকলন—এটি গুপ্তযুগের সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর

---

১ **'Panchatantra',—Ed. by Johannes Hartel, Harvard University, 1904. Introduction.**

রচয়িতা নিঃসন্দেহেই বিষ্ণুশর্মা নামিক ব্রাহ্মণ। মহিলারোপ্য (মিহিলারোপ্য, প্রমদারোপ্য নামান্তরও পাওয়া যায়) নামক দক্ষিণ ভারতের কোনো নগরে এর জন্ম-পরিবেশ, অতএব গ্রন্থটি দাক্ষিণী-প্রতিভা-সমুদ্ভব। হার্টেল বলেছেন, গ্রন্থটি কাশ্মীরেই যে রচিত তার বিশেষ আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হল, তাঁর প্রাপ্ত 'তন্ত্রাখ্যায়িকা'য় বাঘ কিংবা হাতীর কোনো মুখ্য ভূমিকা নেই—বরং উষ্ট্রের কাহিনী প্রচুর পরিমাণে আছে ; এই উষ্ট্রের আধিক্য কাশ্মীরকেই যেন স্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করছে। কিন্তু এ থেকেও কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে না। কারণ এই বিশাল দেশ ভারতবর্ষের মানুষগুলি সব রকম জীবজন্তুর সঙ্গেই সম্যক্‌রূপে পরিচিত ছিলেন। উপরন্তু এতে গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ ও বারাণসীরও উল্লেখ আছে। অতএব 'পঞ্চতন্ত্রে'র স্থান কোনো বিশেষ অঞ্চলে নির্দেশ না করে কীথ্‌ অভিমত প্রকাশ করেছেন : এ অবস্থায় "We must have the place of composition open"[১]।

মনে হয়, 'Place of Composition open' রাখার কোনো প্রয়োজন নেই—এ কুণ্ঠা অনাবশ্যক। শুধু দক্ষিণের মহিলারোপ্যই নয়, সমগ্র পঞ্চতন্ত্রের ভৌগোলিকতা বিচার করলে দাক্ষিণাত্যকেই পঞ্চতন্ত্রের জন্মভূমি বলে মেনে নিতে হয়। ভারতীয় হিন্দুমাত্রেই নেপালের পশুপতিনাথ, দক্ষিণের সেতুবন্ধ, পশ্চিমের দ্বারকা এবং পূর্বের গয়াতীর্থ পর্যন্ত তীর্থ-চারণা করেছেন, তাই দাক্ষিণী লেখকের কাছে হরিদ্বার-প্রয়াগ-কাশী অপরিচিত থাকবার কথা নয়। আর মোটের উপর 'পঞ্চতন্ত্রের' কাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী। এর উপরে জাতকের প্রভাব কতখানি বিস্তীর্ণ হয়েছে, সে আলোচনায় প্রবেশ না করেও বলা যায়, একই লোককথার জলাধার থেকে বৌদ্ধ শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত খাত কেটে নিয়েছেন।

আরো একটু কথা আছে। 'পঞ্চতন্ত্র'কে খ্রীষ্টজন্মের পরবর্তী বলায় কীথের যুক্তিই বা সম্পূর্ণ গ্রাহ্য হবে কেন? এর সম্প্রতি প্রাপ্ত গ্রন্থগুলি থেকে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তেই আসা যায় না। উত্তরকালীন প্রক্ষেপে 'দীনারের' আবির্ভাব ঘটা অসম্ভব নয়। ঈশপ নাকি খ্রীষ্টপূর্ব ৬২০ থেকে ৫৬০ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তা যদি হয়, তা হলে ঈশপের পারস্য থেকে পঞ্চতন্ত্রের গল্প আহরণ করায় এইটিই প্রমাণিত হয় যে 'পঞ্চতন্ত্রে'র কোন মূল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় কেন—আরো অনেক, অনেক পূর্বে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সংশয়ের এ অন্ধকারে আলোক নিক্ষেপ কে করবেন!

পঞ্চতন্ত্র কিভাবে প্রাচীন পহ্লবী ভাষায় পল্লবিত হয়ে পারস্যে প্রবেশ করেছিল, এইচ্‌ টি কোলব্রুক তাঁর 'হিতোপদেশে'র (১৮০৫) ভূমিকায় তার বিস্তৃত সন্ধান দিয়েছেন।[২] তা থেকে জানা যায়, পারস্যের রাজা

১ A. B. Keith, Hist. of Skt. Lit. P—447-48 ; এই প্রসঙ্গে S. N. Dasgupta and S. K. De রচিত Hist. of Skt. Lit, Vol. I,—696 দ্রষ্টব্য।

২ H. T. Colebrook, Introductory Remarks, Hitopodes'a, (Serampore—1805)

নুশিরবান (Nushirvan) বরজুয়া (Barzuah) নামে বিখ্যাত পণ্ডিত ও চিকিৎসককে পঞ্চতন্ত্র সংগ্রহের জন্যেই বিশেষভাবে ভারতে পাঠান। এই বই ভারতের রাজার ভাণ্ডারে অতি সাবধানে রক্ষিত ছিল। বুজেরচুমির (Buzerchumir)-এর তত্ত্বাবধানে পহ্লবী ভাষায় এটি অনূদিত হয়—কলিলহ উ দম্‌নহ্‌ (Calilah u Damnah) নামে। এ থেকে তুর্কীতে 'হুমায়ুননামা' রূপে এর রূপান্তর ঘটে। আব্বাস বংশীয় দ্বিতীয় খলিফা আবুল মন্‌সুর (Abul Jaffer Mansur)-এর অনুজ্ঞায় ইমাম আবুল হাসান আবদুল্লা (Imam Abul Hasan Abdullah) এর আরবী অনুবাদ করেন। আরবী থেকে আবার এই বই ফার্সীতে ফিরে আসে—সুলতান মামুদ সবুক্তগীনের জন্যে কবি রুদাকি (Rudaci) এর পদ্যানুবাদ করেন। রুদাকি বা রুদাগির অনুবাদ সম্বন্ধে একটি গল্পও আছে। কবি, উজীর মন্‌সুরের ক্রীতদাসী নাগিনার প্রেমে পড়েন এবং তাকে নিয়ে পলায়ন করেন। ক্রুদ্ধ উজীরের আদেশে নাগিনাকে হত্যা করা হয়—রুদাগিকে অন্ধ করে দেওয়া হয়। মৃত্যুপথযাত্রিণী নাগিনার অন্তিম অনুরোধ পালন করবার জন্য রুদাগি 'কলিলা ও দম্‌নার' পদ্য অনুবাদ করে জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তিটি রেখে যান। জীবনের একটি পরম মুহূর্তে একজন মহাকবি পঞ্চতন্ত্রকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যের উপকরণ হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন—বইখানির এই গৌরবও অসামান্য।

যাই হোক এইভাবে নানা অনুবাদ-পুনরনুবাদের পথ বেয়ে শেষ পর্যন্ত এই বইকে আকবরের সভাসদ আবুল ফজল 'আয়ার দানেশ' (আইয়ার-ই-দানীশ) নামে রূপান্তরিত করেন এবং মার্জিত ও কাব্যমণ্ডিত আর একটি ভাষ্য এর প্রস্তুত হয়, 'আনোয়ারী সুহাইলি' (Anwari Suhaili)। এরই নামান্তর 'Stories of Pilpay'—'বিদ্‌পাই' বা বিদ্যাপতি (উইলসনের মতে 'বিদ্যাপ্রিয়') ব্রাহ্মণের গল্প।

এই দীর্ঘ ইতিহাসের সংক্ষেপিত রূপ মোটামুটি এই :

"Originally of Indian origin, it was brought to Persia in the sixth century of our era, in the reign of King Kisra' Anus' hirwan and translated into Pahlawi ; from the Pahlawi sprung up immediately the earlier Syriac and the Arabic versions ; and from the Arabic it was rendered into numerous other languages Eastern and Western···Of the Persian versions that which we are about to discuss in the oldest extent, though, as we have already seen, the tale had in much earlier date been versified by the poet Ru'dagi'. By far the best known Persian version, however, is that made about the end of the fifteenth century of our era by Hysayan Wai'dhi—Ka'shifi'."[১]।

১ E. G. Browne, A Literary History of Persia, Vol II. P—305-51

এই থেকেই আবুল ফজলের 'আয়ার-ই-দানীশ' (জ্ঞানের স্পর্শমণি) এবং প্রথম সুলেমানের জন্যে আলি চেলিবির তুর্কী রূপায়ণ 'হুমায়ুননামা' বা রাজগ্রন্থ[১]।

পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ প্রসঙ্গ আমরা দীর্ঘ করেছি। কিন্তু এ আলোচনা নিরর্থক নয়। এ থেকে বোঝা যাবে কি ভাবে পঞ্চতন্ত্র জনসমাদর লাভ করেছে এবং বার বার দেশে দেশে লেখক ও কবিদের কল্পনাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। নাগিনা ও রুদাগির অপূর্ব প্রেমের কাহিনীর সঙ্গে এর সম্পর্ক আগেই উল্লেখ করেছি। ঈশপ কিছুকাল পারস্যে বসবাস করেছিলেন জানা যায়—সুতরাং এর প্রলোভন তাঁর পক্ষে সম্বরণ করা সম্ভব হয়নি। আবুল ফজল এর যথার্থই নামকরণ করেছিলেন, পঞ্চতন্ত্র সত্যিকারের 'জ্ঞানের পরশমণি'।

"অস্তি দাক্ষিণাত্যে জনপদে মিহিলারোপ্যং নামং নগরং। তত্র চ সকলশাস্ত্রকল্পদ্রুমঃ প্রবরনৃপমুকুটমণিমরীচিচয়চর্চিতচরণঃ সকলকলাপারংগতঃ অমরশক্তির্নাম রাজা বভুব।" তাঁর তিন 'পরম দুর্মেধসো' পুত্র বহুশক্তি, উগ্রশক্তি ও অনন্তশক্তিকে শাস্ত্র ও সংসারবিদ্যা শিক্ষা দেবার প্রয়োজনে 'অনেকশাস্ত্রসংসিদ্ধিলব্ধকীর্তি' বিষ্ণুশর্মা নামে ব্রাহ্মণ নিয়োজিত হলেন। এই পঞ্চতন্ত্রই সেই শিক্ষণের উপকরণ।

প্রথম—মিত্রভেদঃ, দ্বিতীয়—মিত্রসম্প্রাপ্তিঃ, তৃতীয়—কাকোলূকীয়ঃ, চতুর্থ—লব্ধ-প্রণাশঃ, পঞ্চম—অপরীক্ষিত কারিতং। বিভিন্ন পাঠ এবং সংস্করণ মিলিয়ে এই পঞ্চাখ্যায়িকায় মোটের উপর সত্তরটির মতো কথা আছে।

প্রথম তন্ত্রই দীর্ঘতম। ঘটনাচক্রে পিঙ্গলক নামে সিংহের সঙ্গে সঞ্জীবক নামক বলীবর্দের যে 'মহান্ স্নেহের' সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, করটক ও দমনক নামে অতি ধূর্ত দুই শৃগাল কেমন করে সেই অসম বন্ধুত্বের সমাপ্তি ঘটায় এবং ভ্রান্ত সিংহ কি ভাবে স্বমিত্রের প্রাণহনন করে, এই অংশে তারই বিবরণ। প্রায় ছাব্বিশটি কথার সমাবেশ আছে 'মিত্রভেদে'। অনুমান করা

১ সম্প্রতি প্রচারিত একটি প্রবন্ধে অধ্যাপক এ সেনিয়োনভ ভারতের সঙ্গে তাজিকিস্থানের সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন : 'During the period of the Sasanidae the cultural ties between India and the people of the Middle East and Central Asia flourished. The "Panchatantra" was translated into the Middle Persian (Pahlevi) language under the title of "Kolilok va Dimanaka" (named after two jackals). This became universally famous as "Kalila and Dimana" and considerably later in the 16th Century, it was brilliantly retold in the Tajik by the great scholar Husein Vais al-Kashifi under the title of "Anbar-i Suhaili."'

যেতে পারে, পারস্যের চিকিৎসক বর্‌জুয়া হয়তো এই প্রথম তথ্যটিই পেয়ে থাকবেন—তাই কালিলহ উ-দমনহ্‌' নামে এর পহ্লবী অনুবাদ হয়। কিন্তু বুজেরচুমিরের সেই আদি অনুবাদ অবলুপ্ত—সেটি পাওয়া গেলে হয়তো পঞ্চ-তন্ত্র সম্পর্কিত বহু সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত।

এর প্রাণিমূলক কাহিনীগুলি সর্বজনপরিচিত—'জাতক', 'হিতোপদেশ', 'কথাসরিৎ-সাগর', 'তুতিনামা', 'ঈশপ'—সর্বত্র তারা নানারূপে বিদ্যমান। কীলোৎপাটক বানর, নীলবর্ণ শৃগাল, মন্দমতি সিংহ ও চতুর শশক, বৃদ্ধ কপটাচারী বক এবং কুম্ভীর, কম্বুগ্রীব কচ্ছপ এবং হংসবন্ধুদ্বয়, চটক-দম্পতি, মত্ত বনগজ ও মেঘনাদ ভেক—নীতিগর্ভ কাহিনী রূপে এরা বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বাকী চারটি তন্ত্রে প্রাণিমূলক সূচনা থাকলেও মানবমূলক কথারই প্রাধান্য। জাতকের বৌদ্ধ-বিহারের গণ্ডিরেখা থেকে বিনির্গত হয়ে পঞ্চতন্ত্র প্রাচীন ভারতের রাজসভা এবং অন্তঃপুরে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। পঞ্চতন্ত্রে জাতকের মতোই একাধারে মনু, কৌটিল্য, আশ্বলায়ন এবং বাৎস্যায়নের সন্ধান মেলে।

জীবমূলক গল্পের তো কথাই নেই—মানবমুখ্য কাহিনীগুলিও তুলনা-রহিত। 'মিত্রভেদে'র পঞ্চম গল্প (হার্টেলের অষ্টম) একটি বিশুদ্ধ রসগল্প, বোক্কাচেচার দেকামেরনের সমধর্মী।

'অস্তি গৌড়েষু জনপদেষু পুণ্ড্রবর্ধনং নাম নগরম্‌। তত্র কৌলিক রথকারঃ চ দ্বৌ সুহৃদৌ' স্ব স্ব শিল্পে অত্যন্ত পারঙ্গত ছিল। একদা কৌলিক (তন্তুবায়) রাজকন্যা সুদর্শনাকে দেখে প্রেম-বিকারে মুমূর্ষুপ্রায় হয়ে পড়ল। কিন্তু রাজকন্যার সঙ্গে সাধারণ শ্রমজীবী কৌলিকের মিলন অসম্ভব; সুতরাং বন্ধু রথকার তাকে একটি শূন্যচর গরুড়-যন্ত্র নির্মাণ করে দিল। সেই যন্ত্রে আরোহণ করে কৌলিক নিশাযোগে রাজাবরোধে প্রবেশ করল—তার দেহে বিষ্ণুর ছদ্মবেশ। ভণ্ড বিষ্ণু রাজকন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করতে চাইলে সুদর্শনা বললেন, 'দেবতার সঙ্গে মানবীর মিলন কিভাবে সম্ভব?' উত্তরে কৌলিক জানাল, 'রাধা নামে পূর্বজন্মে তুমি আমার পত্নী ছিলে। সুতরাং মিলনে বাধা নেই। তস্মাৎ ত্বামহম্‌ গান্ধর্বেণ বিবাহেন বিবাহয়ামি।'

অতএব গান্ধর্ব-বিবাহ হয়ে গেল। কালক্রমে রাজা জানলেন, স্বয়ং বিষ্ণুই তাঁর জামাতা। বিষ্ণুর শ্বশুরত্ব লাভ করে অহংকারে রাজা মদমত্ত হলেন, প্রতিবেশী অন্য রাজাদের আক্রমণ করে বসলেন। এবং ফল যা দাঁড়ালো তাতে রাজার সমূহ সর্বনাশের উপক্রম। অবশেষে গোলোকের আদি-অকৃত্রিম বিষ্ণু এবং মহানস বৈনতেয় নিজেদের সম্মানরক্ষার প্রয়োজনেই (অবশ্য false prestige) সংকটত্রাণে অবতীর্ণ হলেন—গল্পের শুভ-সমাপ্তি ঘটল।[১]।

১ আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন গল্পে জানা যায়, এক ধূর্ত ব্যক্তি শৃঙ্গধারী মিশরীয় দেবতার ছদ্মবেশ পরে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে অনুরূপ ভাবে বঞ্চনা করেছিল।

দেবতার হস্তক্ষেপে যদিও কিছু অলৌকিকতা এতে এসেছে, কিন্তু রস তাতে কিছুমাত্র ব্যাহত হয়নি, বরং আরো স্বাদিষ্টতা সঞ্চারিত হয়েছে। কূটতায়, কৌতুকে এবং ঘটনার জটিলতায় এতে বোক্কাচেচোর পদধ্বনি পাওয়া যায়, পূর্বেই সেকথা আমরা বলেছি।

সাগরদত্ত বণিকের পুত্র 'প্রাপ্তব্যমর্থং লভতে মনুষ্য'র কাহিনী নিয়তির অপূর্ব লীলার বিবরণ। চোর ব্রাহ্মণের অপর ব্রাহ্মণ চতুষ্টয়ের অর্থহরণের বাসনা, পরে কিরাতদলের হাত থেকে সেই চারজনকেই রক্ষা করবার জন্য আত্মপ্রাণ সমর্পণ—মানবচরিত্রের বিচিত্র জটিলতার অভিমুখে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার ট্র্যাজিডিকে আশ্রয় করে একটি কৌতুক-সুন্দর গল্পের সন্ধান মেলে 'কাকোলূকীয়ের' অষ্টম কথায়। বিগতযৌবন জরাভিভূত বণিক তরুণী ভার্যার মন পায় না। শেষে যখন একদিন গভীর রাত্রিতে ঘরে সন্ধিহারক এসে প্রবেশ করেছে, চিরবিমুখিনী স্ত্রী চোরভয়ে তৎক্ষণাৎ স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হল। কৃতজ্ঞ গৃহস্বামী চোরকে ডেকে বললে, 'হে প্রিয়কারী, মঙ্গল হোক তোমার। আমার যথাসর্বস্ব তুমি গ্রহণ করো।' উত্তরে তস্কর বললে, 'আজ আমার নেবার মতো কিছু দেখছি না। কিন্তু ভবিষ্যতে তোমার ভামিনী স্ত্রী যদি পুনর্বার তোমায় আলিঙ্গন না দেয়, তবে সেই সময় আমি ফিরে আসব।'[১]।

শ্রেষ্ঠী-ক্ষপণক-নাপিত-কাহিনী আর একটি সর্ববিদিত কৌতুককথা। শক্তু-কলসবাহী দিবাস্বপ্ন দ্রষ্টা ব্রাহ্মণ 'জাতকে' উপস্থিত—আরব্য উপন্যাসেও বিদ্যমান। পণ্ডিত-মূর্খতার অনবদ্য উদাহরণ অপরীক্ষিত কারকের ষষ্ঠ কথাটি—সেখানে চারটি নির্বোধ পণ্ডিত শাস্ত্রোক্তির অপূর্ব ভাষ্য করেছিল। 'মহাজনো যেন গতঃ'—সেই পন্থা অবলম্বন করে তারা শ্মশানে পৌঁছেছিল; রাজদ্বারে শ্মশানে চ' যে অবস্থান করে সে-ই বান্ধব, অতএব তারা এক গর্দভের গলা জড়িয়ে ধরল; 'ধর্মস্য ত্বরিতা গতিঃ'—সুতরাং দ্রুতগামী একটি উটকে তারা ধর্ম বলে নির্বাচন করল এবং যেহেতু 'ইষ্টং ধর্মেণ যোজয়েৎ'—সেই জন্যে তারা উষ্ট্রকে এবং গর্দভকে একসঙ্গে বেঁধে ফেলল; রজকের দ্বারা তাড়িত হয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা দেখল একটি পলাশপত্র ভেসে আসছে—তাদের মনে পড়ল 'আগমিষ্যতি যৎ পত্রং তদস্মাং তারয়িষ্যতি'—তাই পলাশপত্র অবলম্বন করতে গিয়ে একজন যখন জলমগ্ন হওয়ার উপক্রম, তখন সমুৎপন্ন-সর্বনাশ দেখে 'অর্ধং ত্যজতি' নীতিতে

দেকামেরনে একজন পাদ্রীও 'সেণ্ট গৌব্রিয়েল' সেজে একটি নারীর উদ্দেশে বাতায়ন-পথে অভিসার করত—অবশ্য তার পরিণাম খুব সুখের হয়নি।

১ শ্লোকটি চমৎকার। উদ্ধারের লোভ সংবরণ করা গেল না :

'হর্তব্যং তে ন পশ্যামি হর্তব্যং চেত্তবিষ্যতি।

পুনরপ্যাগমিষ্যামি যদীয়ং নাবগূহতে।"

তারা যজমানের শিরশ্ছেদ করল ; কোনো গ্রামে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে একজন ব্রাহ্মণের ঘৃতে একগাছি সুতোর সন্ধান মিলল—শাস্ত্রে আছে 'দীর্ঘসূত্রী বিনশ্যতি'—অতএব বন্ধুর অনিবার্য বিনাশ জেনে তারা তাকে ত্যাগ করল। ইত্যাদি।

পঞ্চতন্ত্রের রাজভাণ্ডার থেকে রত্ন প্রদর্শনের চেষ্টা বিড়ম্বনা। যে প্রলয়ঙ্করী নারীশক্তিকে আশ্রয় করে সাহিত্যের প্রধানতম ধারাটি প্রবাহিত হয়েছিল, তার কিছু নিদর্শন পঞ্চতন্ত্র থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে। 'জাতকে' সন্ন্যাসীরা নারীবিদ্বেষ প্রচার করেছেন সংসার-বৈরাগ্যের প্রয়োজনে, বিষ্ণুশর্মা করেছেন সংসার-প্রজ্ঞার উদ্দেশ্য থেকে।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজে মাতৃগোত্রিক মানুষের ইতিহাস একদিন সমাপ্তি টানল। যতদিন প্রকৃতি অকৃপণভাবে ফল দিয়েছে, জল দিয়েছে, ছায়া দিয়েছে এবং আশ্রয় দিয়েছে, ততদিন যাযাবর মানুষের জীবনে নারীই কেন্দ্রশক্তি, তাকে পাওয়ার জন্যেই বীরের বীর্যপরীক্ষা—সুন্দ-উপসুন্দের ভ্রাতৃবিরোধ। তারপর মনুর সন্তানেরা হল স্থিতিকামী। তারা যাযাবরী-বৃত্তি পরিহার করে গ্রামাশ্রয়ী হল, হল কর্ষণজীবী, মাটির উপর দিয়ে ব্যক্তিক অধিকারের গণ্ডীরেখা টেনে দিলে। সেইদিনই অর্থনৈতিক প্রয়োজনে, আশ্রয় ও আহার্যের অপরিহার্য তাগিদে, স্বচ্ছন্দচারিণী নারীকে স্বীকার করে নিতে হল পুরুষের অর্থনৈতিক দাসীত্ব। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের আবির্ভাব ঘটল।

কিন্তু স্বেচ্ছাবিহারিণী নারীকে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলে বন্দিনী করেও পুরুষ তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারল না। তার সর্বাঙ্গে সহস্র বন্ধন জড়িয়ে দিলে—হিন্দুললনার আয়সী বলয় থেকে ফ্রান্সের 'সতীত্ব কটি-বন্ধনী' পর্যন্ত তারই বিবিধ বহিরঙ্গ রূপ ; আর অন্তরঙ্গে নারীর প্রতি অসীম ঘৃণা, কুৎসিত সন্দেহ, কদর্য দুরুক্তি, পদে পদে নিষেধ—শাস্ত্র-পুরাণ-লোকসাহিত্যকে কলঙ্কিত করে রাখল। মনু বললেন, 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' —পদ্মপুরাণ উপদেশ দিলেন :

> 'ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্‌।
> তস্মাদ্‌ঘৃতঞ্চ বহ্নিঞ্চ নৈকস্থানে চ ধারয়েৎ ॥
> যথৈব মত্ত মাতঙ্গ সৃণিমুদ্গর যোগতঃ।
> স্ববশং কুরুতে যন্তা তথা স্ত্রীণাং প্ররক্ষকঃ ॥'

ঘৃণা আর অবিশ্বাসের কী অপরূপ দৃষ্টান্ত! মুদ্গরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন পুরাণকর্তা—নারী আর পালিত হস্তী এক হয়ে গেছে।

কটুতম ভাষায় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ নারী-নিন্দায় উল্লসিত। কিছু কিছু অপেক্ষাকৃত শালীন শ্লোক উদ্ধৃত করা হল :

> 'দুর্নিবার্যশ্চ সর্বেষাং স্ত্রীস্বভাবশ্চ চাপলঃ।
> দুস্ত্যাজ্যং যোগিভির্সিদ্ধৈরস্মাভিশ্চ তপস্বিভিঃ ॥
> জিতেন্দ্রিয়ৈর্জিতক্রোধৈঃ স্ত্রীরূপং মোহকারণম্‌।
> সর্বমায়াকরণ্ডঞ্চ কামবর্ধন-কারণম্‌ ॥…

মোক্ষদ্বারকবাটঞ্চ হরিভক্তিবিরোধনম্ ।
সংসারবন্ধনস্তম্ভরঞ্জুরূপমকৃন্তনম্ ॥
বৈরাগ্যনাশবীজঞ্চ শশ্বদ্রাগবিবর্ধনম্ ।
পত্তনং সাহসানাঞ্চ দোষাণামালয়ং সদা ॥
অপ্রত্যায়ানাং ক্ষেত্রঞ্চ স্বয়ং কপটমূর্তিমৎ ।
অহঙ্কারাগ্রয়ং শশ্বদ্বিষকুম্ভং সুধামুখম্ ॥
সর্বৈরসাধ্যমানঞ্চ দুরারাধ্যঞ্চ সর্বদা ।
স্বকার্যসাধ্যং চারাধ্যং কলহাঙ্কুর কারণম্ ॥'

'পঞ্চতন্ত্রে'ও এর কয়েকটি উদাহৃতি মেলে ।

'মিত্রভেদের' চতুর্থ গল্পে দেবশর্মা নামে কৃপণ ব্রাহ্মণ তাঁর তস্কর ভৃত্য আষাঢ়ভূতি কর্তৃক সর্বস্বান্ত হয়ে এক মদ্যপ কৌলিকের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কৌলিকের অসতী স্ত্রী অদ্ভুত কৌশলে স্বামীকে বঞ্চনা করে তার প্রণয়ী দেবদত্তের উদ্দেশে অভিসারে গেল এবং তার উপযুক্তা বান্ধবী নিজের নাসা-কর্ণচ্ছেদনের বিনিময়েও কৌলিক-গৃহিণীকে রক্ষা করল। শেষ পর্যন্ত যখন নাপিতানীর শঠতায় নিরীহ নাপিতের মৃত্যুদণ্ড হওয়ার উপক্রম, তখন দেবশর্মার হস্তক্ষেপে সত্য প্রকাশিত হল এবং পাপিনী নারীরা সমুচিত শাস্তি লাভ করল। আর পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ দেবশর্মা অর্জন করলেন এই জ্ঞান :

'মধু তিষ্ঠতি বাচি যোষিতাং
হৃদি হলাহলমেব কেবলং ।[১]
অতএব মুখং নিপীয়তে[২] ।
হৃদয়ং মুষ্টিভির্ এব তাড্যতে ॥'[৩]

যজ্ঞদত্ত ব্রাহ্মণের কাহিনীও[৪]। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। সংক্ষেপে গল্পটি উদ্ধৃত করা যাক :

যজ্ঞদত্তের অসতী স্ত্রী প্রতিদিন তার প্রণয়ীর জন্যে দধি, ক্ষীর, মিষ্টান্ন ইত্যাদি প্রস্তুত করে নিয়ে যায়। স্বামী প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়, এই সমস্ত মিষ্টান্নের দ্বারা আমি দেবোপাসনা করে থাকি।

অবশেষে একদিন যজ্ঞদত্তের সন্দেহ হল, স্ত্রীকে অনুসরণ করল সে। স্ত্রী স্নান করে পূজার সরঞ্জাম এবং খাদ্যসম্ভার নিয়ে প্রবেশ করল এক মন্দিরে। ব্রাহ্মণ পূর্ব থেকেই মন্দিরের বিগ্রহের পেছনে আত্মগোপন করে ছিল।

---

১ পাঠভেদ : 'হৃদয়ে হলাহলং মহদ্ বিষম্'

২ ঐ : 'নিপীয়তেঽধরো'

৩ ভর্তৃহরির 'শৃঙ্গার শতকে'ও শ্লোকটি প্রাপ্তব্য। যথেচ্ছ লালসা ও ভোগবাদের জয়গান গেয়েও শেষ পর্যন্ত বোধ হয় ভর্তৃহরি নারী সম্পর্কে রেড্ সিগন্যাল তুলে ধরেছেন।

৪ দেকামেরনের একটি গল্পের অঙ্কুর এখানে মেলে।

রোমাঞ্চিত হয়ে সে শুনতে পেল, পূজা-শেষে তার সাধ্বী স্ত্রী দেবতার কাছে প্রার্থনা করছে, হে ঠাকুর, তুমি অনুগ্রহ করে বলে দাও, কী উপায়ে আমার হতভাগ্য স্বামীটিকে আমি অন্ধ করে দিতে পারি ?

ক্রোধ সম্বরণ করে সুকৌশলী ব্রাহ্মণ বিগ্রহের পশ্চাৎ থেকে জানালো : তুমি নিয়মিত তোমার স্বামীকে ঘৃত-নবনী-ক্ষীর খাওয়াতে থাকো, তাহলেই কিছুদিনের মধ্যেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

খুশী হয়ে ব্রাহ্মণী ফিরে এল আর প্রাণভরে স্বামীকে সুখাদ্য খাওয়াতে আরম্ভ করল। খেয়ে খেয়ে দিনের পর দিন মোটা হতে লাগল ব্রাহ্মণ। তারপর ব্রাহ্মণীকে ডেকে বললে, আমি যে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বোধ হয় আমি অন্ধ হয়ে গেলাম।

শুনে ব্রাহ্মণীর আনন্দের আর অবধি রইল না। দেবতা তবে অনুগ্রহ করেছেন। আর ভাবনা কী ? সে নির্ভয়ে নিজের প্রেমিকটিকে বাড়িতে এনে উপস্থিত করল। তখন ব্রাহ্মণ নিজমূর্তি ধরল। লাঠির ঘায়ে প্রেমিকটির প্রাণান্ত হল আর ব্রাহ্মণ অসতী স্ত্রীর নাক-কান কেটে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল।

কূটবুদ্ধিসম্পন্না চতুরা নারীর নিম্নোক্ত আত্মরক্ষার কাহিনীটিও একেবারে 'দেকামেরনের' সমপর্যায়ী। 'কাকোলূকীয়ে'র এই গল্পে দেখা যায় রথকার বীরধরের ভার্যা কামদমনী ছিল অতিশয় দুরাচারিণী। লোকের কানাঘুষায় এই সংবাদ বীরধরের কানে গেল। সে শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করল :

"যদি স্যাৎ পাবকঃ শীতঃ প্রোষ্ণো বা শশলাঞ্ছনঃ।
স্ত্রীণাং তদা সতীত্বং স্যাৎ যদি স্যাৎ দুর্জনোহিতঃ ॥"

সুতরাং সে ছলনা করে স্ত্রীকে জান'লো যে তাকে বিশেষ কাজে গ্রামান্তরে যেতে হচ্ছে, ফিরতে কিছুদিন বিলম্ব হবে। কামদমনী পরম হৃষ্টমনে তাকে ঘৃত-শর্করা ভোজ দিয়ে বিদায় করল এবং প্রণয়ী দেবদত্তকে রাত্রে গৃহে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এল।

ওদিকে কিছু পরেই বীরধর ফিরে এসে অন্য দ্বার দিয়ে ঘরে ঢুকে শয্যার তলায় লুকিয়ে রইল। প্রেমিক যথাসময়ে এসে হাজির। উত্তেজনায় বীরধরের রক্ত গরম হয়ে উঠল, তবে তো লোকের কথা মিথ্যে নয়। 'স্ত্রীকে আগে বধ করব, না দুটোকেই একসঙ্গে নিপাত করব', ভাবতে ভাবতে সে বিছানার তলায় উঠে বসল। কামদমনী তার স্পর্শ পেল এবং তৎক্ষণাৎ রথকারের সমস্ত ছলনাই তার বোধগম্য হল।

কিন্তু স্ত্রী-বুদ্ধি অনেক প্রখর। কামদমনীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও অসাধারণ। এক মুহূর্তের মধ্যেই সে মতলব ঠিক করে নিলে। তারপরেই সে তারস্বরে দেবদত্তকে বললে, 'সাবধান, তুমি আর আমার অঙ্গ স্পর্শ করো না। আমি সতী-সাধ্বী, সে-কথা মনে রেখো।'

দেবদত্ত আকাশ থেকে পড়ল। বললে, 'সে কি কথা। তুমিই তো আমায় আদর করে ডেকে আনলে। এখন আবার এ কিরকম ব্যবহার।'

কামদমনী বললে, 'তাহলে শোনো। আমি আমার স্বামীর কল্যাণের জন্যে চণ্ডিকার কাছে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ দৈববাণী শোনা গেল, বৎসে, তুমি আমার নিষ্ঠাবতী সেবিকা, কিন্তু দুঃখের কথা কী বলব, বিধির বিধানে তুমি ছ' মাসের মধ্যেই বিধবা হবে। আমি কেঁদে বললাম, মা, এর কি কোনো প্রতীকার নেই? এমন কোনো উপায় নেই—যার ফলে আমার স্বামী শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করতে পারেন? মা বললেন, আছে। যদি কোনো পরপুরুষকে স্বগৃহে আহ্বান করে তার দ্বারা তুমি আলিঙ্গিতা হও, তা হলেই তোমার পতি শতবর্ষব্যাপী দীর্ঘজীবন লাভ করবেন। তাই তোমাকে ডেকে এনেছিলাম। সংকল্প সিদ্ধ হয়েছে, আমার স্বামী সেই পরমায়ুর অধিকারী হয়েছেন, এইবার তুমি স্বস্থানে প্রস্থান করো, আর আমাকে স্পর্শ করো না।'

শুনে আনন্দে আর আবেগে রথকারের রোমাঞ্চ হল। আহা—এমন সতী স্ত্রীকেও সে অবিশ্বাস করেছিল! তৎক্ষণাৎ খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল সে। অশ্রুপূর্ণ চোখে বললে, 'প্রিয়ে, তোমার সতীধর্ম যে এমন স্বর্গীয় তা কি আমি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম! তোমার জন্য আমার শতবর্ষ আয়ু লাভ হয়েছে—এসো, তোমাকে আমার কাঁধে তুলে নাচি। আর হে মহাত্মা দেবদত্ত, তোমার জন্যেই আমার স্ত্রী এমন শুভব্রতে সিদ্ধিলাভ করেছে—অতএব তোমাকেও আমি কাঁধে করব।'

এই বলে দুজনকে কাঁধে তুলে নৃত্য, পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ এবং সতী-স্ত্রীর মহিমা-কীর্তন।[১]

'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্'—যা নাকি দেবতাদেরও অজ্ঞেয়, পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পূর্ণ আধিপত্য সত্ত্বেও যে নারীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যায়নি এবং সূণিমুস্গরযোগতঃ যাকে অহর্নিশ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, তার সম্পর্কে নিন্দা ও সতর্কতাবাচক প্রচুর কাহিনীসহ অসংখ্য উক্তি পঞ্চতন্ত্রেও বিকীর্ণ। রামায়ণ, মহাভারত, বিবিধ পুরাণ, মনুসংহিতা ইত্যাদি থেকে এদের অনেকগুলি আহৃত, কিছু মৌলিক, কিছু বাচ্যান্তরিত। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক:

(ক) জল্পন্তি সার্ধম্ অন্যেন। পশ্যন্ত অন্যং সবিভ্রমাঃ
হৃদ্‌গতং চিন্তয়ন্ত্যা অন্যং প্রিয়ঃ কো নাম যোষিতানাম্ ॥

(খ) যো মোহন্মন্যতে মূঢ়ো রক্তেহয়ং মম কামিনী।
স তস্যা বশগো নিত্যং ভবেৎ ক্রীড়াশকুন্তবৎ ॥

(গ) যদন্তস্তন্ন জিহ্বায়াং য জিহ্বায়াং ন তদ্বহিঃ।
যদ্বহিস্তন্ন কুর্বন্তি বিচিত্রচরিত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

(ঘ) ন বশং যোষিতো যান্তি ন দানৈর্ন চ সস্তবৈঃ
আস্তাং তাবৎ কি মন্যেন দৌরাত্মেনেহ যোষিতাং।

১ অনুরূপ গল্পও বোক্কাচ্চোর দেকামেরনে আছে। আমরা তা নিয়ে পরে আলোচনা করব।

বিধৃতং সোদরেণাপি ঘ্নন্তি পুত্রং স্বকং রুষা ॥
(৬) স্ত্রীষন্ত্রং কেন লোকে বিষামৃতযুতং
ধর্মনাশায় সৃষ্টম্ ।

অতএব চরমপন্থী সিদ্ধান্ত হল এই : "নার্য শ্মশানঘটিকা ইব বর্জনীয়াঃ"—নারী শ্মশানস্থিত ঘটের ন্যায় বর্জনযোগ্যা। সৌভাগ্যের কথা, ভারতবর্ষের মানুষ এই শেষ উপদেশটি গ্রহণ করেননি, করলে আর্যাবর্ত-দাক্ষিণাত্য জনহীন হয়ে যেত এবং পঞ্চতন্ত্রের আর শ্রোতা জুটত না ।

পঞ্চতন্ত্রের যে বিবিধ রূপের কল্পনা পণ্ডিতেরা করেছেন (যেমন দক্ষিণী, কাশ্মীরী তন্ত্রাখ্যায়িকা, নেপালী ইত্যাদি) তাদেরই অপর কোনো বিলুপ্ত রূপ হয়তো 'হিতোপদেশের' উৎস। কিন্তু 'হিতোপদেশ' পঞ্চতন্ত্র থেকে নিঃসৃত হয়েও বহু উপধারায় পুষ্ট এবং স্বয়ংসিদ্ধ। এতে মহাভারতের গল্প আছে, বেতাল-পঞ্চবিংশতিরও উপাখ্যান রয়েছে (রাজা শূদ্রক ও আত্মদানকারী সেবক বীরবরের কাহিনী)। হিতোপদেশের রচয়িতা বা সংকলক গোড়াতেই বলে দিয়েছেন, তাঁর উদ্দেশ্য হল : 'কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে' এবং তাঁর উপকরণ : 'পঞ্চ-তন্ত্রাত্তথান্যস্মাদ্ গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে'। পঞ্চতন্ত্র এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে আকর্ষণ করে বইখানি লিখিত হয়েছে।

হিতোপদেশ

কীথ দেখিয়েছেন, 'হিতোপদেশের' সংকলনকাল আনুমানিক চতুর্দশ শতকের পূর্বে[১]। এর সংকলক এবং আংশিক রচয়িতার নাম নারায়ণ, এর জন্মভূমি বাংলাদেশে। নারায়ণ যে বাঙালী তার প্রমাণ 'হিতোপদেশে' গৌরী উপাসনার ছলনায় ব্যভিচারের সাপেক্ষতা আছে—যা বাংলাদেশের তন্ত্রধর্মের অনুকূল—পঞ্চতন্ত্রে একই কাহিনীতে গৌরীপূজার উল্লেখ নেই।[২]

নারায়ণ বাঙালী হোন বা না-ই হোন, তিনি যে পূর্বভারতীয়, হিতোপ-দেশের সূচনাতেই তার প্রমাণ আছে। দক্ষিণাপথের মহিলারোপ্য নগর নয়, রাজা অমরশক্তিও নয়। 'অস্তি ভাগীরথী তীরে পাটলিপুত্র নামধেয়ং নগরং, তত্র সর্বস্বামিগুণোপেতঃ সুদর্শনো নাম নরপতিরাসীৎ।' এই পাটলিপুত্রের রাজা সুদর্শনই তাঁর অনধিগত শাস্ত্র 'নিত্যমুন্মার্গগামিনাং' পুত্রদের শাস্ত্র-শিক্ষা দেবার প্রয়োজনে বিষ্ণুশর্মা পণ্ডিতকে নিয়োগ করলেন। বিষ্ণুশর্মা 'মিত্রলাভ', 'সুহৃদ্ভেদ', 'বিগ্রহ' ও 'সন্ধি' এই চতুরধ্যায় শিক্ষণের দ্বারা

১। A Hist of Skt. Lit. P-263

২। কীথের এই যুক্তি নিঃসন্দেহে গ্রহণীয় নয়। কোনো পঞ্চতন্ত্রে চণ্ডীপূজার উল্লেখ আছে, আবার কোনো কোনো হিতোপদেশে চণ্ডী আরাধনার কথা নেই। ইতিপূর্বে আমরা বজ্রদন্তের যে কাহিনীটি উদ্ধৃত করেছি, তাতে চণ্ডিকার কথা আছে, কামদমনীর গল্পেও তাই। চণ্ডী কি নীতিহীনা নারীদেরই উপাস্যা ছিলেন ?

রাজপুত্রদের জ্ঞানদীপ্ত করে তুললেন। ভাগীরথী নদী, পাটলিপুত্র, মগধ ও গৌড়দেশ ইত্যাদির পুনঃপৌনিক ব্যবহার 'হিতোপদেশে'র প্রাচ্যভৌমিকতার প্রমাণ।

পঞ্চতন্ত্রকার নীতিশিক্ষণেচ্ছু হলেও মূলত গল্পকথক ; আর হিতোপদেশের রচক মূলত নীতিশিক্ষক, গল্পকথন তাঁর গৌণ উদ্দেশ্য। তাই হিতোপদেশে নীতিশ্লোকের ছড়াছড়ি, গল্পের অংশ কম। পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলি কখনো সংক্ষিপ্ত হয়েছে, কখনো বা একাধিক গল্প সংযোগে রূপান্তরিত হয়েছে। (যেমন কন্দর্পকেতু নামক সন্ন্যাসীর গল্পটি বেতালপঞ্চবিংশতির একটি কাহিনীর সঙ্গে পঞ্চতন্ত্রের পরিব্রাজক দেবশর্মার গল্পের সহযোগে গড়ে উঠেছে।) আর রাশি রাশি শ্লোকের সমাবেশে সমাজনীতি, ধর্মনীতি, রাজনীতি এবং লোক-ব্যবহার সম্পর্কে উপদেশ বর্ষণ করা হয়েছে। এদিক থেকে হিতোপদেশের সাহিত্যিক মূল্য পঞ্চতন্ত্রের চাইতে অনেক কম, এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেন চতুষ্পাঠীর ছাপ অঙ্কিত।

নারীর ছলনা সম্পর্কে এতেও বিবিধ বৃত্তান্ত আছে। পঞ্চতন্ত্র ব্যতিরিক্ত একটি নিদর্শন নেওয়া যাক ঃ

"পুরা বিক্রমপুরে সমুদ্রদত্তো নাম বণিগাসীৎ, তস্য রত্নপ্রভা নাম গৃহিণী" একটি গৃহদাসের প্রতি আসক্তা ছিল।

"অথৈকদা রত্নপ্রভা তস্য সেবকস্য মুখচুম্বনং দদতী সমুদ্রদত্তেনাবলোকিতা। ততঃ সা বন্ধকী সত্বরং ভর্তুঃ সমীপং গত্বাহ, নাথ, এতস্য সেবকস্য মহতী কুমতি যতোঽয়ং চৌর্যং কৃত্বা কর্পূরং খাদতীতি ময়াস্য মুখমাঘ্রায় জ্ঞাতং।"—এই সুযোগে ভৃত্যও আত্মরক্ষার জন্য কৃত্রিম কোপে বললে, "নাথ, যস্য স্বামিনো গৃহে এতাদৃশী ভার্যা, তত্র সেবকেন কথং স্থাতব্যং, যত্র প্রতিক্ষণং গৃহিণী সেবকস্য মুখ্য জিঘ্রতি।"

এই বলে সে সরোষে যাওয়ার উপক্রম করলে মূর্খ সমুদ্রদত্ত স্ত্রী এবং ভৃত্য উভয়ের প্রতি অত্যন্ত প্রীত হয়ে ভৃত্যকে 'যত্নাৎ প্রবোধ্য' ধরে রাখল।

হিতোপদেশের যথার্থ মহিমা গল্পে নয়—নীতিশ্লোকে, সেকথা আমরা পূর্বেই বলেছি। এরা বহুজনের বহু রচনা থেকে নানাভাবে আহৃত, ভালোমন্দ মিশিয়ে 'হিতোপদেশে'র কথাগুচ্ছ অতিরিক্ত একটি শ্লোক-সংগ্রহ রূপেও যেন আত্মপ্রতিষ্ঠা করছে। এই শ্লোকগুলি প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে, ভারতবর্ষের মানুষ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সেগুলি ব্যবহার করেন, অতএব তাদের আলোচনা নিরর্থক।[১]

'শুক সপ্ততি'র তৃতীয় কাহিনীতে কুটিল নামে ধূর্ত বণিক বিমলের ভার্যা ও সম্পদ অধিকারের জন্য 'অম্বিকাং দেবীমারাধ্য বিমলরূপং' লাভ করেছিল।

১। "The moral verses with which the Hitopodesa abounds are in many cases, perhaps in all, quotations from different writers. They consequently form a sort of anthology—a collection of passages, not only remarkable for striking thought, but offering examples of various styles. (Prof. Francis Johenson, Hitopodes'a, 1847)

সংস্কৃত সাহিত্যের বৃহত্তম কথাসংগ্রহ 'কথাসরিৎ-সাগর'। এই বিপুল গ্রন্থ 'সাগর'ই বটে—অসংখ্য সরিৎ এসে এই সাগরে আত্মদান করেছে।

'বৃহৎ কথা' ও কথাসরিৎ-সাগর

'কথাসরিৎ-সাগরের' রচয়িতা (অথবা পৈশাচী থেকে সংস্কৃতে রূপান্তরকর্তা) সোমদেব। জাতক পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী ছাড়াও এর প্রধানতম আকর্ষণ রোমান্সে, বৎসরাজ উদয়ন এবং তাঁর পুত্র নরবাহন দত্তের বহু বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চারে, প্রেম-বিরহ-মিলন কাহিনীতে এক অভিনব সামগ্রী।

'উদয়ন কথা' ভারতের প্রাচীনতম রোমান্স। কালিদাসের কালেও অবন্তীর গ্রামবৃদ্ধেরা এই গল্প নবীনদের শোনাতেন ঃ

"প্রাপ্যাবন্তীন্ উদয়নকথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধান্
পূর্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্"—(পূর্বমেঘঃ, ৩০)

এই উদয়ন কথাকে আশ্রয় করেই গুণাঢ্য রচনা করেছিলেন তাঁর 'বৃহৎ কথা'। কীথ্ মোটামুটি গুণাঢ্যের নির্ণয় করেছেন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে। ষষ্ঠ শতাব্দীও হওয়া সম্ভব।

গুণাঢ্যের 'বৃহৎ কথা' নিঃশেষে অবলুপ্ত। আজ আমাদের কাছে বর্তমান ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী', বুধ স্বামীর 'বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ' এবং সোমদেবের 'কথাসরিৎ-সাগর'। গুণাঢ্যের গ্রন্থের আর সন্ধান পাওয়া যায় না।

'কথাসরিৎ-সাগরে'র সূচনায় 'বৃহৎ কথা' রচনার একটি অপূর্ব কৌতূহলজনক ভূমিকা আছে। একদা পার্বতী শিবকে বললেন, তিনি এখন কোনো অভিনব কাহিনী শুনতে চান, ইতঃপূর্বে যা লোকসমাজে প্রচলিত হয় নি। অতএব শঙ্কর একটি রুদ্ধদ্বার প্রহরীবেষ্টিত কক্ষে গোপনে শঙ্করীকে গল্প বলতে আরম্ভ করলেন। শিবের অন্যতম গণ পুষ্পদন্ত এই গল্প শোনবার লোভ কিছুতে সম্বরণ করতে পারলেন না, অদৃশ্যভাবে উপস্থিত থেকে মহাদেব-কথিত কাহিনী শুনে নিলেন। কিন্তু পুষ্পদন্তের স্ত্রী জয়ার মুখ থেকে সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়ল এবং শিবের অভিশাপে পুষ্পদন্ত ও তাঁর বন্ধু মাল্যবান জন্ম নিলেন মর্ত্যভূমিতে। পুষ্পদন্ত মর্ত্যাবতীর্ণ হলেন নন্দের মন্ত্রী বররুচি-কাত্যায়ন রূপে আর মাল্যবান হলেন গুণাঢ্য নামধারী—প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা সাতবাহনের সভাসদ্।

একদা রাজা সাতবাহন তাঁর পত্নীবৃন্দ পরিবৃত হয়ে জলক্রীড়া করতে গিয়েছিলেন। তাঁর পত্নীদের মধ্যে একজন ছিলেন পরমা রূপবতী এবং বিদুষী। পরম কৌতুকে সাতবাহন বার বার তাঁর বিদুষী মহিষীর গায়ে জল ছিটিয়ে দিতে লাগলেন। অতিরিক্ত জলাঘাতে কাতর হয়ে মহিষী বললেন, "মোদকৈঃ পরিতাড়য়"। সাতবাহন তৎক্ষণাৎ প্রচুর মিষ্টান্ন আনিয়ে সেগুলি রাণীর গায়ে নিক্ষেপ করতে লাগলেন। রাণী ক্রুদ্ধা এবং বিস্মিতা হয়ে বললেন, 'মহারাজ, আপনি যে সংস্কৃতে এমন অনভিজ্ঞ, এতবড় মূর্খ—সে তো আমার জানা ছিল না।' বস্তুত 'মা+উদকৈঃ' সন্ধি করে রাণী বলেছিলেন

'মোদকৈঃ'।

অপমানে ক্ষোভে জর্জরিত হয়ে ফিরে এলেন সাতবাহন। রাজকার্য করেন না, সভাস্থ হন না—অন্তর্বেদনায় দিনের পর দিন তিনি কৃশ ও বিবর্ণ হয়ে যেতে লাগলেন। গুণাঢ্য এবং তাঁর অন্যতম সহকর্মী শর্ববর্মা রাজার কাছে তাঁর মনঃপীড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সাতবাহন সব কথা খুলে বললেন। গুণাঢ্য বললেন, তিনি ছ' বছরে রাজাকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে পারেন। শর্ববর্মা হেসে বললেন, তিনি ছ' মাসেই রাজাকে সংস্কৃতজ্ঞ করতে পারেন। ছ' মাসে সংস্কৃত? সারাজীবন পড়ে যার পার পাওয়া যায় না, তা অধিগত হবে ছ' মাসে? উত্তেজিত হয়ে গুণাঢ্য বাজী রাখলেন, যদি শর্ববর্মা এই অসাধ্য সাধন করতে পারেন, তা হলে তিনি আর কখনোই সংস্কৃত বা প্রাকৃত ব্যবহার করবেন না।

শর্ববর্মা গেলেন মরণপণ তপস্যায়। কার্তিকেয়র আরাধনা করে তিনি কৃতী হলেন 'কা-তন্ত্র' বা 'কলাপ' ব্যাকরণে এবং ছ' মাসের মধ্যেই সাতবাহনকে সংস্কৃতে বিশারদ করে তুললেন। অপমানিত ক্ষুব্ধ গুণাঢ্য প্রস্থান করলেন বিন্ধ্যারণ্যে। সেখানে তিনি দেখলেন এক বৃক্ষতলে পিশাচ-পরিবৃত কাণভূতিকে। এই কাণভূতির কাছেই 'বৃহৎ কথার' গল্প বলে মুক্তি পেয়েছিলেন পুষ্পদন্ত; আবার কাণভূতি সেই কাহিনী শোনালেন গুণাঢ্যকে।

গুণাঢ্য ভাবলেন, এই আশ্চর্য কথাচয় তিনি গ্রন্থাকারে লিপিবন্ধ করবেন। কিন্তু কোন্ ভাষায়? সংস্কৃত এবং প্রাকৃতকে বর্জন করেছেন, অতএব নিলেন পৈশাচী ভাষার আশ্রয়; অতি যত্নে নিজের রক্তে লেখনী রঞ্জিত করে গ্রথিত করলেন এই অপরূপ কাহিনী। তারপর তাঁর শিষ্যেরা এই মহাগ্রন্থ নিয়ে গেলেন সাতবাহনের কাছে।

একে পৈশাচী ভাষা, তায় নররক্তে লিপিবন্ধ—সাতবাহন ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করলেন গ্রন্থটি, ত্রুটিও ধরলেন অনেক। বেদনাহত গুণাঢ্য তখন এক বৃহৎ অগ্নি প্রজ্বলিত করলেন; এক-এক পাতা পড়েন আর নিক্ষেপ করেন অগ্নিতে। সেই অপূর্ব কথা শোনবার জন্যে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে ঘিরে থাকে বনের পশুপাখিরা, শিষ্যেরা অশ্রুসিক্ত চোখে দেখে এই মহান্ সৃষ্টির পরিণতি।

আহার বর্জিত বন্যপশুদের শুষ্ক মাংসে রাজা সাতবাহনের স্বাস্থ্যভঙ্গ হল। অতএব শুরু হল বন্য পশুপক্ষিদের এই অবস্থার কারণ সন্ধান। অবশেষে খুঁজতে খুঁজতে যখন রাজা গুণাঢ্যের কাছে গিয়ে পৌঁছুলেন, যখন সাত লক্ষ শ্লোকে রচিত এই বিপুল গ্রন্থের ছয় লক্ষই অগ্ন্যাহুতি লাভ করেছে, কেবল এক লক্ষ শ্লোকে রচিত 'নরবাহন দত্তে'র কাহিনীই শিষ্যদের অনুনয়ে অগ্নিতে অর্পিত হয়নি। অনুতপ্ত সাতবাহন গুণাঢ্যের কাছে গিয়ে মার্জনা ভিক্ষা করেন এবং এই এক লক্ষ শ্লোকই 'বৃহৎ কথা' নামে রক্ষিত হয়। এই গ্রন্থটিই হল সোমদেবের অবলম্বন: "সর্বদা শিবসেবা-নিরতা

শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্না দেবী সূর্যবতীর চিত্তবিনোদনার্থে নানা কথামৃতময়ী বৃহৎ কথার সারাংশ লইয়া সর্বজনগণের চিত্তসমুদ্রের পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ বিস্তৃত বহুল তরঙ্গযুক্ত এই কথাসরিৎ-সাগররূপ সংগ্রহ গুণী বিপ্র রামতনয় শ্রীমান সোমদেব-ভট্ট"[১]। একাদশ শতাব্দীর মধ্য থেকে শেষ ভাগের মধ্যে কাশ্মীরে গ্রন্থন করেন। সোমদেব নিজেই বলেছেন, তিনি গুণাঢ্যের নৈষ্ঠিক অনুকারী, কিন্তু তাঁর কৃতিত্বও আছে। অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও:

"It stands on the solid fact that Somadeva has presented in an attractive and elegant if simple and unpretentious form a very large number of stories which have for us a very special appeal either as amusing or gruesome or romantic or as appealing to our love of wonders on sea and land, or as affording parallels to tales familiar from childhood."[২]।

বিপুলায়তন এই কথাসরিৎ-সাগর মোট আঠারোটি 'লম্বক' এবং অজস্র আখ্যায়িকা ও কথায় আকীর্ণ। গ্রন্থ-সূচনায় জানা যায় দ্বীপিকর্ণীর পুত্র রাজা সাতবাহনের দ্বারা অপমানিত হয়ে গুণাঢ্য এর ছয় লক্ষ শ্লোক অগ্নিতে অর্পণ করেছিলেন, মাত্র বিদ্যাধর চক্রবর্তী রাজা নরবাহন দত্তের কাহিনীর এক লক্ষ শ্লোক অবশিষ্ট ছিল; কিন্তু কথাসরিৎ-সাগরের অনেকখানি অংশই বৎসরাজ উদয়ন, পট্টমহাদেবী বাসবদত্তা, রাণী পদ্মাবতী, মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ, সেনাপতি রুমন্বান্‌ এবং বয়স্য বসন্তকের উপাখ্যান। শিল্পসৃষ্টি হিসাবে উদয়ন-কাহিনী নরবাহন দত্তের কাহিনী অপেক্ষা সার্থকতর এবং সরস। উদয়ন-কথা ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম রোমান্স—তাই এ থেকেই ভাসের নাটক অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল।

জাতকের পরেই কথাসরিৎ-সাগরকে ভারতীয় কথা-সাহিত্যের দ্বিতীয় কোষগ্রন্থ বলা চলে। রাজা উদয়ন এবং তাঁর পুত্র নরবাহন দত্তের দুটি প্রধান আখ্যায়িকাকে ভিত্তি করে এতে নল-দময়ন্তীর গল্প, জাতকের কাহিনী, বিখ্যাত 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', সংক্ষেপিত পঞ্চতন্ত্র সব কিছু একসঙ্গে স্থান পেয়েছে। 'জীমূতবাহন চরিত' (চতুর্থ লম্বক), 'শক্তিবেগে'র উপাখ্যান (পঞ্চম লম্বক), 'সুনীথ সুমন্তীক' প্রসঙ্গ (অষ্টম লম্বক) প্রভৃতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ উপন্যাসই বলা যায়। 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' (দ্বাদশ লম্বক) একেবারেই বিচ্ছিন্ন সামগ্রী। এরা ছাড়াও বিভিন্ন চরিত্রের মুখে গল্পের ভিতর গল্প, তার ভিতর আরো গল্প জুড়ে দিয়ে কথাসরিৎ-সাগরের বিশাল আয়তন গড়ে উঠেছে। কিন্তু বিন্যাসের পরিচ্ছন্নতার অভাবে, একই ধরণের গল্পের পুনরাবৃত্তিতে, স্থানে অস্থানে যে-কোনো চরিত্রকে দিয়ে গল্প বলানোর

১। কথাসরিৎ-সাগর, বসুমতী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯২

২। A Hist. of Skt. Lit—Keith, P 282-83

ফলে কথাসরিৎ-সাগরে গৃহিণীপনার দৈন্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। সোমদেব উদ্যান রচনা করতে গিয়ে অরণ্য বানিয়েছেন—তাতে সৌন্দর্য সৃষ্টির চাইতে আরণ্যক জটিলতাই প্রধান হয়ে উঠেছে। এই জটিলতাকে আরো ক্লান্তিকর করে তুলেছে দৈব, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল—দেবতা-রাক্ষস-গন্ধর্বের আতিশয্য। বিশেষভাবে নরবাহন দত্তের উপাখ্যান—যেটি এই গ্রন্থের প্রধান অবলম্বন, নায়কের একটির পর একটি বিবাহ এবং পূর্বনির্দিষ্টলিপি অনুযায়ী সৌভাগ্যের পর সৌভাগ্য লাভ—গল্পশিল্পের বিচারে তার মূল্য যৎসামান্য। বিদ্যাধর মানসবেগ কর্তৃক কলিঙ্গদত্তাকন্যা নরবাহনদত্ত-মহিষী মদনমঞ্জুষার হরণ এবং মানসবেগ ও গৌরীমুণ্ডকে বধ করে মদনমঞ্জুষার পুনরুদ্ধার—এই প্রধান গল্পটিকে খানিকটা রামায়ণের ধাঁচে গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কথাসরিৎ-সাগরের যেটি মূল ত্রুটি—সেটি এই গল্পে সবচাইতে স্পষ্ট; বাল্মীকির সঙ্গে তুলনা দূরে থাক,—সাধারণ রক্ত-মাংস-বাস্তবতার কোনো চিহ্নই এর মধ্যে নেই। উদ্দাম কল্পনা এবং স্বর্গ-মর্ত পরিক্রমার যথেচ্ছাচারে এ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে, অথচ কল্পনায় বৈচিত্র্যের যেমন অভাব, কাহিনী-রচনায় তেমনি পটুত্বের দৈন্য। মহা-উম্মার্গ জাতকে কিংবা পঞ্চতন্ত্রে গল্প রচনার যে পরাকাষ্ঠা আমরা দেখেছিলাম, কথাসরিৎ-সাগরের ক্লান্তিকর কাল্পনিকতা সে গৌরবের উত্তরাধিকার বহন করে না।

সংস্কৃত সাহিত্যে রোমান্স মাত্রেই কিছু পরিমাণে কৃত্রিম—নায়ক-নায়িকার মিলন-বিরহ-বাসনা-বেদনা সর্বত্রই অলংকার-শাস্ত্রের অনুশীলন, অন্তরধর্মের সহজ অভিব্যক্তির চাইতে সভারঞ্জনের দিকেই তার প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু তার মধ্য দিয়েও মহৎ জীবনসত্য প্রকাশ করেছেন কালিদাস, কল্পনাকে সপ্তবর্ণে অনুরঞ্জিত করে অপরূপ রসসাহিত্য গড়তে পেরেছেন মহাকবি বাণভট্ট। সে শক্তি ভট্ট সোমদেবের ছিল না। তাই নরবাহন দত্তের কাহিনী শেষ পর্যন্ত পাঠকের ধৈর্যকে আঘাত করতে থাকে—অতিমাত্রায় অলৌকিকতার বিন্যাস গল্প সম্পর্কে কৌতূহলকে নষ্ট করে দেয়। বরং উদয়ন-কথা সেদিক থেকে খানিকটা তৃপ্তিদায়ক। যান্ত্রিক হস্তীর সাহায্যে উদয়নের বন্ধনের বৃত্তান্ত অভিনব—'Trojan Horse'-এর সঙ্গে সাদৃশ্য পাঠকমনে কৌতূহল জাগায়।

কিন্তু নরবাহন দত্তের কাহিনী যেমনই হোক—'কথাসরিৎ-সাগরের' অন্যত্র ঐশ্বর্যের অভাব নেই। এর 'কথাপীঠ' নামীয় প্রথম লম্বকটিই অসাধারণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইতিহাসকে উদ্দাম কল্পনায় পরিণত করেছেন সোমদেব (বা গুণাঢ্য)। এ-কথা কে ভাবতে পেরেছিল, শাপভ্রষ্ট পুষ্পদন্তই হচ্ছেন বিখ্যাত বররুচি, শিবের হুঙ্কার শুনে তিনি পাণিনির কাছে তর্কে পরাজিত হয়েছিলেন! কে জানত মহারাজ নন্দ মারা গেলে তাঁর দেহের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ ইন্দ্রদত্ত আর চাণক্য নামে ব্রাহ্মণ অভিচার-ক্রিয়ার দ্বারা সেই ইন্দ্রদত্তেরই প্রাণনাশ করেছিলেন! পাটলীপুত্র নামোৎপাদনের বিচিত্র বৃত্তান্তও এতে আসছে।

ইতস্তত বিন্যস্ত বহু কথা ও আখ্যায়িকার মধ্যে অনেকগুলি চমৎকার গল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানের বহু শিশুরঞ্জনী রূপকথার বীজরূপ কথাসরিৎ-

সাগরে মেলে। চণ্ডমহাসেন দৈত্য অঙ্গারকের পুরীতে পৌঁছে দৈত্যকন্যা অঙ্গারবতীর সাক্ষাৎ পেলেন এবং তাঁদের মধ্যে প্রণয় ঘটল। কিন্তু অঙ্গারক যুদ্ধে অজেয়—সুতরাং তাকে বধ করে অঙ্গারবতীকে লাভ করা অসম্ভব। অতএব অঙ্গারবতী কৌশলে দৈত্যের কাছ থেকে তার মৃত্যুছিদ্রের কথা জেনে নিলেন এবং চণ্ড মহাসেন তার প্রাণনাশে সক্ষম হলেন (দ্বিতীয় লম্বক, একাদশ তরঙ্গ)। এ থেকেই পরে রাক্ষসীদের প্রাণ-ভ্রমরের গল্প গড়ে উঠেছে। সপ্তম লম্বকের দ্বিচত্বারিংশ তরঙ্গে ইন্দীবর সেন এবং অনিচ্ছা সেনের গল্প শীত-বসন্তের রূপকথারই আদি বীজ। ভাগ্যচক্রে মূর্খের রাজজ্যোতিষী হয়ে ওঠার কাহিনী বাংলা দেশের বহু পরিচিত লোককথা।

কথাসরিৎ-সাগরের অনেক কটি গল্প আরব্য উপন্যাসে বিদ্যমান। শাহ্রিয়ার, শাহ্জমান এবং নির্বোধ ইফ্রিতের ব্যভিচারিণী প্রণয়িণী থেকে আরম্ভ করে অসংখ্য ছোট বড় গল্প আরব্য উপন্যাসে গৃহীত হয়েছে। সরস সামাজিক গল্পের একটি অতি উপাদেয় কাহিনী পাওয়া যায় দ্বিতীয় লম্বকের দ্বাদশ তরঙ্গে, ব্রাহ্মণ যুবা তার প্রণয়িণী রূপিণিকা নাম্নী গণিকার অতি দুশ্চারিণী মা-কে যে ভাবে জব্দ করেছিল, স্থূল হাস্যরসের তা সার্থক নিদর্শন।

সর্বজন-পরিচিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র গল্পগুলির রচনা-চাতুর্য অভিনব —প্রহেলিকার মাধ্যমে ধর্মনীতি লোকনীতি খুব সুন্দরভাবে এগুলিতে পরিবেষিত হয়েছে।[১] প্রাচীন ভারতের সমাজচিত্রও 'কথাসরিৎ-সাগরে' খুব উজ্জ্বলবর্ণে প্রদর্শিত। শাকিনী এবং খেচরী তন্ত্রে সিদ্ধিপ্রাপ্তা হীনবুদ্ধি পরিব্রাজিকারা কিভাবে গৃহস্থের সর্বনাশ করত, তার নানা কাহিনী তান্ত্রিক বিকৃতির পরিচয় বহন করে। হিন্দু এবং বৌদ্ধের শত্রুতা লুপ্ত হয়ে গিয়ে যে একটি উদার সহিষ্ণুতা তখন ভারতবর্ষে গড়ে উঠছিল রাজা বিনীতমতির উপাখ্যানে (দ্বাদশ লম্বক, ৭২ তরঙ্গ) বিভিন্ন পারমিতার শিক্ষাদানের মধ্যে তার প্রমাণ রয়েছে।

পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলিকে কথাসরিৎ-সাগরে 'প্রাজ্ঞকথা' এবং তারই পাশাপাশি কতকগুলি রসকথা এবং নির্বুদ্ধিতার কাহিনীকে 'মূঢ়বুদ্ধির' উপাখ্যান নামে চিহ্নিত করা হয়েছে (দশম লম্বক—৬১, ৬২, ৬৩ তরঙ্গ)। এই গল্পগুলি ভারতীয় কৌতুক সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট সংকলন। এদের দুটি একটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

(১) একজন কৃপণ ধনীকে এক গায়ক গান শুনিয়ে খুশি করেছিল। ধনী বললেন, 'একে হাজার টাকা পুরস্কার দাও।' 'আচ্ছা'—বলে খাজাঞ্চী চলে গেল—কিন্তু গায়ক টাকা পেল না। ধনীর কাছে গিয়ে টাকার কথা বলতে ধনী জবাব দিলেন, তুমি গান শুনিয়ে আমার কর্ণ তৃপ্ত করেছ, আমি

১। 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র মূল রচয়িতা হিসাবে জম্ভল দত্ত, শিবদাস ইত্যাদির নাম পাওয়া যায়। অধ্যাপক ভেবার (Weber)-এর মতে বইখানি বেতালভট্টের রচনা। সোমদেবের গ্রন্থে সম্পূর্ণ বইটিই সংকলিত হয়েছে।

টাকার কথা শুনিয়ে তোমার কর্ণতৃপ্তি করেছি। উভয় ক্ষেত্রেই পরিতৃপ্তি বিশুদ্ধ শ্রুতিমূলক, বাস্তবে টাকা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

(২) এক গুরুর দুই নির্বোধ শিষ্য ছিল। তাদের একজন গুরুর দক্ষিণ পায়ে তেল মাখাত, দ্বিতীয়জন বাম পায়ে। দৈবক্রমে একদিন গুরু বামচরণসেবীকে দক্ষিণ পায়ে তেল দিতে বলায় সে আপত্তি করে বললে, আমার প্রতিপক্ষ ওই চরণ সেবা করে, সুতরাং আমি ও পায়ে তেল দিতে পারব না। গুরু তখন জেদ করতে লাগলেন। শিষ্য চটে গিয়ে পাথরের ঘায়ে পা-খানা ভেঙে ফেলল। গুরু আর্তনাদ করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে গ্রামান্তর থেকে দ্বিতীয় শিষ্য ফিরে এসেছে। সব ব্যাপার শুনে সে রেগে আগুন হয়ে বললে, বটে! আমার পা ও ভেঙে দিয়েছে! দেখি ওর পা কেমন করে আস্ত থাকে।—বলেই তৎক্ষণাৎ বাঁ পায়ে এক প্রচণ্ড ঘা দিয়ে দ্বিতীয় শিষ্য সেখানাকেও ভেঙে ফেলল। প্রতিবেশীরা দুই শিষ্যকে উত্তম-মধ্যম দিতে এলে গুরু বললেন, 'থাক থাক। মেরে আর কী হবে? আমার দু পা-ই তো গেল, এখন ওদের কাঁধে ভর দিয়েই তো চলতে হবে আমাকে।'

(৩) এক নির্বোধ ব্যক্তি প্রথম শ্বশুরালয়ে গিয়েছিল। খিদের জ্বালায় সে একমুঠো কাঁচা চাল মুখে পুরে দিতেই দেখে শাশুড়ী আসছেন। লজ্জায় সে না পারল ফেলে দিতে, না পারল গিলতে—গাল ফুলিয়ে বসে রইল। শাশুড়ী ভাবলেন, জামাইয়ের অসুখ করেছে। শ্বশুর ব্যতিব্যস্ত হয়ে কবিরাজ ডেকে আনলেন। কবিরাজ ভাবল শোথ রোগ—শেষে গাল-গলা টিপে চাল বের করে ফেলল।

(বাংলা লোকসাহিত্যের বিখ্যাত বোকা জামাইয়ের গল্প এই অঙ্কুর থেকেই পল্লবিত হয়েছে।)

নরবাহন দত্তের কাহিনী যেমনই হোক—নানা রসের শত শত গল্পের সমাবেশে জাতকের মতোই কথাসরিৎ-সাগরও অতি মূল্যবান সংগ্রহ। ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল প্রচলিত বিচিত্র কথা ও কাহিনীকে নানা ক্ষীণ সূত্রে একসঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে সোমদেব গল্পের রাজসূয় যজ্ঞ করেছেন। নারীচরিত্র সম্পর্কিত গল্পেরও অভাব নেই। দুশ্চারিণী, প্রবঞ্চনাপরায়ণা নারীর অজস্র উদাহরণ সর্বত্র বিকীর্ণ। 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র তৃতীয় প্রসঙ্গে শুক এবং শারিকা দুইজনেই দুটি গল্প বলেছে। শুক বলেছে বিশ্বাসঘাতিনী নারীর কথা—শারী বলেছে দুরাচার পুরুষের ইতিবৃত্ত। বেতাল রাজাকে প্রশ্ন করেছে, 'পুরুষ পাপিষ্ঠ কি নারী পাপিষ্ঠা?' উত্তরে বিক্রমাদিত্য চরম কথা বলেছেন, 'পুরুষ কেউ বা কোথাও এমন দুরাচার হয় বটে কিন্তু প্রায় সর্বদাই স্ত্রীলোকেই এ রকম নৃশংসতা করে থাকে!'

কথাসরিৎ-সাগরের পরে স্মরণীয় দণ্ডীর 'দশকুমার চরিত'।

সংস্কৃত কথা-সাহিত্যে 'দশকুমার' অনন্য মহিমায় ভাস্বর। 'জাতক পঞ্চতন্ত্রের' উদয়গিরিতে প্রাচীন ভারতীয় গল্পকথার অরুণচ্ছটা, 'দশকুমার

চরিতে' অস্তাচলের বর্ণরাগ। এই দুটি শিখরের মধ্য দিয়েই ভারতীয় গল্পসাহিত্যের সৌরযাত্রা।

'কথাসরিৎ-সাগরে'র পদ্ধতিতেই এর বিন্যাস, রোমান্স এরও উপজীব্য ; কিন্তু নাটকীয়তার ঐশ্বর্যে, কবি-কল্পনার সৌন্দর্যে, বাস্তবতার অনুরঞ্জনে, কৌতুকের সরসতায় দশকুমার অনেক উন্নত স্তরের শিল্পসৃষ্টি। আধুনিক পাঠকের চিত্ত-বিনোদনে দশকুমার সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের সবচাইতে বিশিষ্ট কলাকৃতি।

'দশকুমার চরিত'

'দশকুমার' রচয়িতা দণ্ডী। এই দণ্ডী কে—তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার এখনো অবসান ঘটেনি। তাঁর পরিচয় আজও তিমিরাচ্ছন্ন। যিনি 'কাব্যাদর্শ' রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন, তিনিই কি এর স্রষ্টা? 'দশকুমারে'র যৌবন-চাঞ্চল্য, স্বার্থের ক্ষেত্রে নীতি বিসর্জনের দৃষ্টান্ত, তার দুঃসাহসিক মনোভাব—এই সব দেখে উইলসন[১] অনুমান করেছেনঃ 'দণ্ডী সন্ন্যাসীরা হচ্ছেন বিষয়-বিরক্ত যোগীন্দ্র শঙ্করের সাধক, তাঁরা কেউ এই রকম ভোগরাগের সাহিত্য রচনা করবেন না ; অতএব কোনো দণ্ডবাহীই (বিচারক ?) এই গ্রন্থ লিখেছিলেন—কোনো সন্ন্যাসী নন্।'

অথচ 'ভোজ প্রবন্ধে' এক শ্লোকে পাওয়া যায়ঃ "ভট্টিন'ষ্টো ভারবীয়োঽপি নষ্টো ভিক্ষুর্নষ্টো"—ইত্যাদি। এখানে ভিক্ষু স্পষ্টতই দণ্ডী, সন্ন্যাসব্রতধারী।

দণ্ডী সম্বন্ধে বহু প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে সশ্রদ্ধ ধারণা বিদ্যমান। লোক-প্রচলিত শ্লোকে তাঁকে ব্যাস-বাল্মীকির পাশে স্থান দেওয়া হয়েছেঃ

"জাতে জগতি বাল্মীকি কবিরিত্যভিধাভবৎ
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্রয়ি দণ্ডিনি।"[২]

দণ্ডীর কাল সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে না পৌঁছুতে পারলেও স্থান সম্পর্কে একটা ধারণা করা সম্ভব। পণ্ডিতাগ্রগণ্য প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ তাঁর টীকাযুক্ত 'কাব্যাদর্শে' এই ভাবে দণ্ডীর আবাস নির্ণয় করেছেনঃ

"শ্রী দণ্ড্যাচার্য কস্মিন্ দেশে কস্মিন্ কালে বা জাত ইতি নিশ্চেতুং ন শক্যতে কিন্তু প্রবন্ধেঽস্মিন্ বৈদর্ভমার্গস্য নিতরাং প্রশংসনেন তন্মার্গানুসারিগুণালংকারোদাহরণপ্রদর্শনেন চ দাক্ষিণাত্যে বিদর্ভ-দেশজোঽয়মিতি সম্ভাব্যতে।"[৩] তাহলে আচার্য দণ্ডী দাক্ষিণাত্যের বিদর্ভ দেশজাত—তাঁর 'কাব্যাদর্শে'র আভ্যন্তরীণ লক্ষণ তাই বলে। আর

১। Das'acumar Charita, H. H. Wilson (1846). Intr.

২। তাঁর অর্থাৎ জগতে বাল্মীকি জন্ম নিলেন—কবি এই নামও জাত হল ; এলেন ব্যাস—হলেন কবিদ্বয় ; তারপর দণ্ডী এলে হল কবিত্রয়—তাতে প্রথমা দ্বিতীয়ার পর বহুবচন সৃষ্টি হয়—কবয়ঃ।

৩। কাব্যাদর্শ—প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, ভূমিকা।

যিনি 'কাব্যাদর্শে'র রচয়িতা, 'দশকুমার' তাঁর লেখা হতেই বা বাধা কিসের? 'কাব্যাদর্শে' অলংকারের উদাহরণ দিতে গিয়ে যে সব শ্লোক তিনি ব্যবহার করেছেন, তাতে তাঁকে তো শুষ্ক জ্ঞানমার্গী দণ্ডী ব্রহ্মচারী বলে মনে হয় না। যেমন বিরোধালঙ্কারের দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে 'কাব্যাদর্শে':

"মৃণালবাহু রম্ভোরু পদ্মোৎপলমুখেক্ষণম।
অপি তে রূপমস্মাকং তন্বি তাপায় কল্পতে॥"

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ ৩৩৭

আসল কথা হল, প্রাচীন ভারতের সন্ন্যাসীরা চতুর্বর্গ সাধনার কথা মানতেন। দশকুমারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্গের তপস্যাই যদি মুখ্য হয়ে থাকে—তা হলেও তাতে দণ্ডীর সন্ন্যাসীত্ব নষ্ট হয়নি। আর "জাতে জগতি" শ্লোকে তাঁর যে মহিমার উল্লেখ পেয়েছি—তার অতিশয়োক্তি সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার্য যে দণ্ডীর যথার্থ পরিচয় তাঁর তপশ্চর্যায় নয়, অলংকারিত্বেও নয়—কবিত্বে। বাল্মীকী-বেদব্যাস সন্ন্যাসী হয়েও যেমন জীবন-রসিকতারই মহাকবি—দণ্ডীর ভূমিকাও ঠিক তাই। 'আচার্য দণ্ডিনো বাচামাচান্তামৃত-সম্পাদাম্'—অমৃত-নিষিক্ত বাণী রচনাতেই তাঁর পরমতম সাফল্য।

'কাব্যাদর্শ' রচয়িতার কথাকাব্যে যে সমস্ত ব্যাকরণ ও রসগত বিচ্যুতি রয়েছে, তার সমর্থনে কীথ্ খুব চমৎকার যুক্তি দিয়েছেন। তাঁর মতে, যে দণ্ডী তরুণ বয়সের উচ্ছলতায় 'দশকুমার চরিত' লিখেছেন, তিনিই পরিণত বয়সের প্রজ্ঞা নিয়ে রচনা করেছেন 'কাব্যাদর্শ'। বাংলা সাহিত্যে বড়ু চণ্ডীদাস এবং দ্বিজ চণ্ডীদাস প্রসঙ্গেও অনুরূপ যুক্তি আমরা শুনেছিলাম। বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে কীথের মত আমরা প্রণিধান করতে পারি:

"Apart from the notorious differences between precept and practice, it is perfectly possible and even probable that the romance came from the youth of Dandin and the Kavyadarca form his more mature judgement, while most of the alleged errors in grammer may safely be denied or at least are of the type which other poets permit themselves,"[১] অর্থাৎ নিরঙ্কুশাঃ হি কবয়ঃ।

দণ্ডীর কালও এখন পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হয় নি। বুহ্‌লার রিচার্ডসন প্রভৃতি তাঁকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে স্থান দিয়েছেন, 'কাব্যাদর্শে'র কাল বিচারে অষ্টম শতাব্দীর পূর্ববর্তী বলেছেন কীথ, আবার উইলসন অগাশে প্রভৃতি তাঁকে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

'দশকুমার চরিতের' আন্তর-লক্ষণ বিচার করলে উইলসনের সঙ্গে সাহিত্য-পাঠকের একমত হতে ইচ্ছে করে। কীথের মতে 'পূর্ব পীঠিকা' অর্বাচীন, 'উত্তর পীঠিকা'-তেই দণ্ডীর লেখনী প্রয়োগ ঘটেছে বলে মনে হয়। এই 'উত্তর

১। **Keith, Hist. of Skt, Lit. P.—296.**

পূর্বপীঠিকা'-তেই ধারাপতি ভোজরাজের উল্লেখ আছে (ভিনসেন্ট স্মিথের মতে ১০১৮-১০৬০ খ্রীষ্টাব্দ), যবন জলদস্যু বা বণিকদেরও সন্ধান পাওয়া যায়। তর্কের অন্ত নেই। কিন্তু দশকুমারের সমাজনীতি এবং ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত স্মরণে রাখলে উইলসনের এই কথাই সম্ভাব্য মনে হয় যে দশকুমার ভারতবর্ষের অবক্ষয়-যুগের সাহিত্য। তখন প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল, জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি সহজিয়া। নীতি প্রয়োজন-নির্ভর, দৈব-মহিমার চাইতেও যাদুবিদ্যা, অভিচার, তান্ত্রিক বিকৃতি (যার কিছু কিছু কথাসরিৎসাগরে আছে) তখন অধিকতর আশ্রয়যোগ্য। উইলসন বলেছেন ঃ

"The subject of the stories of the 'Das'akumar' are taken from domestic life and are interesting as pictures of Hindu society for centuries probably anterior to the Mohammedan conquest. The portrait is not flattering, profligacy and superstition seem to be the characteristic features;—not in general, the profligacy that invades private happiness, nor the superstition that bows down before imaginary divinities, but loose principles and lax morals, and implicit faith in the power of occult rites and magical incantations."[১]

কেউ কেউ একাধিক দণ্ডীর কথা বলেন। তা যদি হয়, তা হলে সব সংশয়ের নিরসন ঘটে। 'কাব্যাদর্শ'কে ষষ্ঠ শতাব্দীতে স্থান দিয়ে দশকুমারকে একাদশ শতকে নিয়ে আসা চলে এবং মাত্র সে-ক্ষেত্রেই একটি সামঞ্জস্য হতে পারে। পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক চলুক, আমাদের প্রয়োজন কথাকার দণ্ড্যাচার্যের সঙ্গে।

দশকুমারের নীতিগত বিচ্যুতিই তাকে সাহিত্যগতভাবে সত্যতর করে তুলেছে। ধর্মের প্রতি বিশ্বাস শিথিল বলেই এতে পুরুষকারের জয়জয়কার—যে পুরুষকার কথাসরিৎ-সাগরে দৈবাচ্ছাদিত হয়ে নরবাহন দত্তের কাহিনীকে বিরক্তিকর করে ফেলেছে ; হিন্দু সমাজের মর্মে মর্মে গ্লানির অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলেই নারী-পুরুষের কামনা-বাসনা অকৃত্রিমভাবে দেখা দিয়েছে। হিন্দু রাজাদের অধঃপতনের অপূর্ব বাস্তব চিত্র আছে 'উত্তর পীঠিকা'র অষ্টম উচ্ছ্বাসের 'বিশ্রুত-চরিতে'—সেখানে রাজা অনন্তবর্মার বিট-পারিষদ বিহারভদ্র, চন্দ্রপালিতের সাহায্যে রাজাকে টেনে নিয়ে চলেছে সর্বনাশের পথে, নৃপত্যোচিত 'দণ্ডনীতি' থেকে অপসারিত করে দীক্ষা দিচ্ছে মৃগয়ায়, অক্ষক্রীড়ায়, অঙ্গনা-সেবায় এবং সুরাসক্তিতে। হিন্দুর পতনের এই অত্যুজ্জ্বল চিত্রগুলি যেন নববলদীপ্ত ঐস্‌লামিক শক্তির আবির্ভাবের পূর্বভাষণ। প্রাচীন ভারতের কথা-সাহিত্যের শেষ চূড়া—রাগরঞ্জিত অস্তাগিরি এই 'দশকুমার

১। Wilson, 'Das'akumar Charita', Intr, P—7

চরিত' ; আর এরই মধ্যে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের উপন্যাস, রোমান্স এবং ছোট-গল্প সম্ভাবিত হয়েই মৃত্যুমগ্ন হয়ে গেছে।

দণ্ডী কবি গণেশ বন্দনান্তে, "ব্রহ্মাণ্ডছত্রদণ্ডঃ শতধৃতিভবনাম্ভোরুহোনালদণ্ডঃ ক্ষুরদমরসরিৎপট্টিকাকেতুদণ্ডঃ" থেকে "বিবুধদ্বেষিণাং কালদণ্ডঃ" পর্যন্ত স্তুতি করে তাঁর অপরূপ কাহিনী আরম্ভ করেছেন ঃ

"অস্তি সমস্তনগরীনিকষায়মানা…মগধদেশশেখরীভূতা পুষ্পপুরী নাম নগরী।" এই পুষ্পপুরীর রাজা হলেন প্রবল-প্রতাপী রাজহংস—তাঁর মহিষীর নাম বসুমতী। বসুমতী যখন সন্তান-সম্ভবা, তখন মগধেশ্বরের পূর্বশত্রু মালবরাজ মানসার মগধ আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে পরাভূত হলেন রাজহংস, পলায়িতা মহিষীর সঙ্গে আশ্রয় নিলেন দুর্গম বিন্ধ্যারণ্যে। সেইখানেই জন্ম নিলেন কাহিনীর কেন্দ্রনায়ক কুমার রাজবাহন।

এই রাজবাহন এবং তাঁর নয় মিত্র ঃ প্রমতি, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, বিশ্রুত, উপহারবর্মা, অপহারবর্মা, পুষ্পোদ্ভব, অর্থপাল এবং সোমদত্ত একবার দিগ্বিজয়ে বিনিষ্ক্রান্ত হলেন। পথে শবরাচারী মাতঙ্গ ব্রাহ্মণের সাহায্য করতে রাজবাহন সকলের অজ্ঞাতে চলে যান এবং সেই সময় সহচর মিত্রদের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। তারপর পুষ্পোদ্ভবের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি অবন্তীপুরীতে প্রবেশ করেন, রাজোদ্যানে দেখতে পান মালব-রাজকন্যা অবন্তি-সুন্দরীকে—কন্যান্তঃপুরে দুজনের গান্ধর্ব-বিবাহ ঘটে। কিন্তু পূর্বজন্মে রাজহংসরূপী তাপসকে 'বিসগুণ-নিগড়ে' বিজড়িত করার অভিশাপে রজত-শৃঙ্খলে বদ্ধপদ রাজবাহন ধরা পড়লেন রাজ্যপরিচালক চণ্ডবর্মার হাতে। যে মুহূর্তে তাঁর 'চিত্রবধ' হতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই আবির্ভাব হল অদ্ভুত শক্তিমান অপূর্ব কুশলী অপহারবর্মার। শঠের শিরোমণি অলৌকিক বীর অপহারবর্মা চণ্ডবর্মাকে হত্যা করে রাজবাহনকে নিষ্কণ্টক করলেন। পুষ্পোদ্ভব ও সোমদত্ত পূর্বেই এসেছিলেন, অপহারবর্মার পরে একে একে আসতে লাগলেন উপহারবর্মা, অর্থপাল, প্রমতি, মন্ত্রগুপ্ত, মিত্রগুপ্ত ও বিশ্রুত। রাজবাহন-অবন্তিসুন্দরী ব্যতিরিক্ত বাকী ন'টি কুমারের অভিজ্ঞতা ও অভিযানের কাহিনীই 'দশকুমার চরিত'। বিশ্রুতের কাহিনী শেষ হতে না হতেই পুঁথি খণ্ডিত।

'পূর্ব পীঠিকা'র মধ্যে যে সমস্ত অসামঞ্জস্য আছে এবং রচনাভঙ্গিতে যে সব পার্থক্য পাওয়া যায়, তা থেকে প্রায় সকলেই অনুমান করেন যে দশকুমার এক হাতের রচনা নয়, 'পূর্ব পীঠিকা'ই বিশেষভাবে সন্দেহজনক। সে যাই হোক, মোটের উপর বিভক্ত এবং খণ্ডিত দশকুমারও একটি অসাধারণ শিল্পসৃষ্টি—দণ্ডীর গ্রন্থে যিনি বা যাঁরা হস্তক্ষেপ করেছিলেন—তিনি বা তাঁরাও নিতান্ত উপেক্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। দীর্ঘ সমাসবদ্ধভাষায় জটিল গদ্যে লিখিত হলেও দশকুমারের ভাষায় এমন চিত্রধর্মিতা এবং প্রসাদগুণ আছে যে তা 'কাদম্বরীকে' মনে করিয়ে দেয়। কোনো কোনো দিক থেকে দশকুমার কাদম্বরীর চাইতেও রসোজ্জ্বল।

প্রায় প্রতিটি কাহিনীতেই পুরুষকার ও বীর্যবত্তা, স্বকার্য-সাধনের জন্য নব নব পন্থার আবিষ্কার, প্রণয়-প্রসঙ্গ এবং নারীর রূপ-বর্ণনায় উচ্চাঙ্গের কবিত্বশক্তির বিকাশ[১] দশকুমারে পরম আস্বাদ্যমানতা সঞ্চার করে দিয়েছে। গল্পলোভী পাঠকের কাছে দশকুমারের আকর্ষণ অসামান্য—এর প্রতিটি অধ্যায় রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়বার যোগ্য। 'কাদম্বরী'র সৌন্দর্য বর্ণনায় ও বিস্তারে—'দশকুমারে'র মহিমা চরিত্র-নির্মাণে, ঘটনা-বৈচিত্র্যে এবং গতিতে। ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রমুখ অপ্রাকৃত উপকরণ এতে যথেষ্টই আছে, কিন্তু কর্মযোগী পুরুষের কৃতিত্বকে তা আচ্ছন্ন করেনি। তৎকালীন সমাজের বস্তুনিষ্ঠ চিত্রণে, বর্ণনার সুমিতিতে, বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে ও লোকচরিত্রের সম্যক অভিজ্ঞতায় দশকুমারের প্রতিটি পাতা হর্ষ এবং বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

দশকুমারের মধ্যে সবচাইতে চমকপ্রদ অপহারবর্মার কাহিনী। ভারতীয় কথা-সাহিত্যে এই অপহারবর্মা একটি অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব—শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকে শর্বিলক চরিত্রের মধ্যেই মাত্র এঁর সমধর্মী আর একজনকে পাওয়া যায়[২]। অদ্ভুতকর্মা পুরুষ অপহারবর্মা। ঋষি মরীচি এবং বিরূপ বসুপালিতের নিগ্রহকারিণী পরম ধূর্তা গণিকা কামমঞ্জরীর নিঃশেষ দুর্গতি করেছেন তিনি, উদারক ধনমিত্রের সঙ্গে মিলন ঘটিয়েছেন কুলপালিকার, চৌর্যশাস্ত্রকর্তা কর্ণীসুতের মন্ত্র গ্রহণ করে দুঃসহাসিক অপহরণের নগরীকে নির্ধন করেছেন, কামমঞ্জরীর ভগ্নী রাগমঞ্জরীকে লাভ করেছেন; চাতুর্যের দ্বারা কারাধ্যক্ষক কান্তকের অন্তক হয়েছেন, রাজকুমারী অম্বালিকাকে পত্নীরূপে পেয়েছেন এবং পরিশেষে চণ্ডবর্মার বিনাশ ঘটিয়ে রাজবাহনকে রক্ষা করেছেন।

স্বার্থসিদ্ধির জন্য,' দুরাত্মাকে দমন করবার প্রয়োজনে, বুদ্ধি ও চাতুর্য ব্যতীত অপর কোনো নীতিশাস্ত্রের দাসত্বই বীরপুরুষ করেন না—তস্করব্রতধারী অপহারবর্মার কাহিনীর প্রতিপাদ্যও এই। কোনো সাধু

১। উপহারবর্মা তাঁর পরকীয়া নায়িকা, বিকটবর্মার মহিষী কল্পসুন্দরীর রূপ এই ভাষায় বর্ণনা করেছেন:

'ভামিনি ননু বহু অপরাধম্ ভবত্যা চিত্তজন্মনো যদ্ অমুষ্য জীবিতভূতাম্ রতিম্ আকৃত্যা কদর্থিতবতী ধনুর্যষ্টিম্ ভ্রূলতাভ্যাম্ ভ্রমরমালাময়ীম্ জ্যাম্ নীলালকদ্যুতিভির্ অস্ত্রাণ্যপাঙ্গবীক্ষিতবৃষ্টিভির্ মহারাজনধ্বজপটাংশুকম্ দশনচ্ছদময়ূখজালৈঃ প্রথমসুহৃদম্ মলয়মারুতম্ পরিমলপটীয়সা নিঃশ্বাস পবনেন পরভৃতরুতম্ অতিমঞ্জুলৈঃ প্রলাপৈঃ পুষ্পময়ীম্ পতাকাম্ ভুজযষ্টিভ্যাম্, দিগ্বিজয়ারম্ভপূর্ণকুম্ভমিথুনম্ উরোযুগলেন ক্রীড়াসরো নাভিমণ্ডলেন সন্নাহ্যারথমণ্ডলম্ উরুযুগলেন লীলাকর্ণকিশলয়ম্ চরণতল-প্রভাভিঃ।"

এর উপযুক্ত বাংলা অনুবাদ সম্ভব নয়—বোধ করি তার প্রয়োজনও নেই।

২। শর্বিলকের সঙ্গে এই সাদৃশ্যে, বাস্তবনিষ্ঠার সাম্যে এবং কাব্যাদর্শের একটি শ্লোক দশকুমারে থাকায় অধ্যাপক পিশেল্ প্রমুখ কেউ কেউ অনুমান করেছিলেন, 'মৃচ্ছকটিক' রচয়িতা ছদ্মনামী দণ্ডী স্বয়ং। অবশ্য সে মত প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ব্যক্তিই অপহারবর্মার অবলম্বিত কর্মপ্রণালীর সমর্থন করবেন না ; কিন্তু মানুষের ধূর্ততা ও কৌশল যে কতদূরে যেতে পারে এবং সত্যিই যে 'সাহসে শ্রীঃ প্রতিবসতি'—তার চূড়ান্ত নিদর্শন অপহারবর্মা চরিত। 'ডন জুয়ান'-বৃত্তির সমজাতীয় দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত বিশ্ব-সাহিত্যেও খুব সুলভ নয়।

উপহারবর্মার কাহিনীও অনুরূপ দুর্নীতির আশ্রয়ে কার্যসিদ্ধির আর একটি চমৎকার নমুনা। মিথিলার দুরাচারী রাজা বিকৃত-দর্শন বিকটবর্মার সর্বনাশ সাধনের জন্য উপহারবর্মা যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা আরো নিন্দনীয়। কুট্টিনীর সাহায্যে তিনি বিকটবর্মার মহিষী কল্পসুন্দরীকে স্বামিবিমুখিনী করেছেন, নিজে কল্পসুন্দরীকে আয়ত্ত করেছেন, তারপর কূটতার জাল বিস্তার করে বিকটবর্মার নিধন ঘটিয়ে, ছদ্ম বিকটবর্মা হয়ে, একসঙ্গে রাজার অবরোধ-লক্ষ্মী এবং রাজলক্ষ্মীকে অধিকার করেছেন।

নিজের নীতিহীনতার সম্পর্কে গুরুপত্নীগ্রাহী চন্দ্রের নজির নিয়েছেন উপহারবর্মা, কল্পসুন্দরীর ব্যভিচারের সমর্থনে গণেশের স্বাপ্নাদ্য আদেশ ব্যবহার করেছেন। তাতে তাঁর অপরাধের ক্ষালন হয় না। কিন্তু চাতুর্যের পরাকাষ্ঠা হিসাবে উপহারবর্মার ব্যক্তিত্বটিও অপহারবর্মার মতোই অসাধারণ। বিশেষ করে যে-ভাবে হত্যার পূর্বে তিনি বিকটবর্মার গোপন কথা জেনে নিয়েছেন, বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে তুলনারহিত।

মন্ত্রগুপ্তের কাহিনীতেও অন্ধ্ররাজ জয়সিংহের নিধন, শক্তি ও চতুরতার আর এক দৃষ্টান্ত। অপহৃতা কলিঙ্গনন্দিনী কনকলেখাকে জয়সিংহের হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে এবং বলা বাহুল্য নিপাত করতে হবে জয়সিংহকেও। অতএব মন্ত্রগুপ্ত সাজলেন একজন জটাচীরধারী সন্ন্যাসী—ছদ্ম শিষ্যের দল ঢক্কা-নিনাদে তাঁর মহিমা প্রচার করতে লাগল। কনকলেখার চিত্তজয়ের দুর্বাসনায় জয়সিংহ এসে কপট তাপসের শরণ নিলেন। মন্ত্রগুপ্ত বললেন, উপযুক্ত শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপের পর রাজাকে ডুব দিতে হবে সরোবরের তলায় ; সেখান থেকে রাজা যখন উঠে আসবেন—তখন তিনি ধারণ করবেন সম্পূর্ণ অভিনব কান্তি আর সেই রূপ দেখেই রাজনন্দিনী কনকলেখা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করবেন।

মূঢ় জয়সিংহ তাপস-নির্দিষ্ট পন্থায় জলে ডুব দিলেন, সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি গুপ্ত সুড়ঙ্গপথে জলতলে নামলেন মন্ত্রগুপ্ত। জলগর্ভেই রাজাকে হত্যা করে তাঁর দেহ সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে রেখে স্বমূর্তিতে মন্ত্রগুপ্ত উপরে উঠে এলেন, আর তৎক্ষণাৎ তাঁকেই নব-কলেবরধারী জয়সিংহ বলে কল্পনা করে সামন্ত ও সৈন্যবৃন্দ বাদ্যোদ্যমে হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়ে নিয়ে গেলেন রাজপ্রাসাদে। কৌশলী মন্ত্রগুপ্ত রাজকন্যা কনকলেখা এবং কলিঙ্গ ও অন্ধ্রের যুগ্ম রাজত্বলাভ করলেন।

দশকুমারের প্রতিটি কাহিনীতেই অভিনবত্ব বিদ্যমান—প্রত্যেকটি উপাখ্যানই মৌলিকতায় ভাস্বর। বিশ্রুতের গল্পে নট-বিটের প্ররোচনায়

রাজার বুদ্ধিনাশের যেমন বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক শঠতাও কতদূরে যেতে পারে তার বিশদ বৃত্তান্ত উপস্থিত করা হয়েছে। এ যেন চাণক্য-পন্থার বাস্তব উদাহৃতি। দণ্ডনীতি যোগে অশ্মকরাজ অনন্তবর্মার রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন, সেই দণ্ডনীতি প্রয়োগেই 'শঠে শাঠ্যং' সমাচরণ করেছেন বিশ্রুত, সিংহাসনে বসিয়েছেন বালক রাজপুত্র ভাস্করবর্মাকে, জায়ারূপে প্রাপ্ত হয়েছেন রাজনন্দিনী মঞ্জুবাদিনীকে। ভারতীয় রাজনৈতিক কূটতার দৃষ্টান্তস্থল বিশ্রুতের কাহিনী। দশটি কুমার সত্যিই 'বিবুধদ্বেষিণাং কালদণ্ডঃ।'

পৌরুষ এবং কূটতার দুগ্ধে তণ্ডুলে দণ্ডী যে চরু তাঁর পাঠকবৃন্দের জন্য পরিবেষণ করেছেন, সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্যত্র তার স্বাদ অলভ্য পূর্বেই সে-কথা বলেছি। দণ্ডী বিধাতৃ-বিধানকেই প্রাধান্য দেননি—পুরুষকারকে জয়মাল্য পরিয়েছেন; সংহিতার অনুবর্তন করেননি—জীবন-সত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন; কল্পলোক অল্প-স্বল্প রচনা করলেও তাঁর সাহিত্য প্রধানত বস্তুভূমক; এবং যদিও কথাসরিৎ-সাগরের একটি উপগল্প মিত্রগুপ্ত প্রসঙ্গে উপস্থিত করে 'ধূমিনী'র মাধ্যমে দেখিয়েছেন—'কিং ক্রূরং? স্ত্রীহৃদয়ং'—তবুও তাঁর সাহিত্যে নারী-নিন্দন নগ্নভাবে উপস্থিত হয়নি, পুরুষও যে কী শঠতার দ্বারা কুলবধূকে পথে নামিয়ে আনে—'কলহ-কণ্টক নিতম্ববতী'র গল্পে তা পরিবেষিত হয়েছে। সমাজচিত্রণে সন্ন্যাসী-কবি দণ্ডী অপক্ষপাত।

উইলসনের অনুকূলেই সিদ্ধান্ত করা যায়, দশকুমার চরিত ভারতীয় কথা-সাহিত্যের শেষ দিগন্ত এবং তারপরেই সূর্যাস্তের তামসী। দশকুমারে একাধারে সেই অস্তকিরণের বর্ণসম্ভার এবং অন্ধকারের ম্লানিমা। পরম্পরাগত গল্প-কথনের চরম সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা, সেই সঙ্গে গল্প-সাহিত্যেরও সমাপ্তি। আর এদিক থেকে এর ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম:

"The work may be considered of historical value, as adding contemporary testimony to the correctness of the political position of a considerable part of India, as derived from other sources of information. A brief sketch of the substance of the stories will best illustrate the light which they are calculated to reflect upon the social and political conditions of India during probably the first ten centuries of our era."[১]

দশকুমার চরিত পরবর্তীকালের অনেক লেখককেই অনুপ্রাণিত করেছিল। বিনায়ক এবং অপ্পয্যমন্ত্রী দশকুমারের সংক্ষিপ্ত কাব্য রূপায়ণ করেছিলেন। অপ্পয্যমন্ত্রীর রচনাতে বেশ কৃতিত্ব আছে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত করার জন্যে গল্পের সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিকশিত হতে পারেনি।

অপ্পয্যমন্ত্রীর গ্রন্থের নাম 'দশকুমার কথাসারঃ'। তাঁর আরম্ভ এই রকম:

১। Das'akumar Charita, H. H. Wilson, intr, P—7.

"শ্রীবাগ্দ্মাপরাঃ শান্তামেকবীরাং মহেশ্বরীম
রম্যসাহিত্যসৌভাগ্য সম্যক্ সিধ্যর্থমর্থয়ে।
শ্রীগণেশ্বরমারাধ্য শ্রীমদপ্পয্যমন্ত্রিনা
দশানাঞ্চ কুমারাণাং কথাসারো বিরচ্যতে"—

দশকুমার নীতিস্খলিত রক্তসন্ধ্যার রম্যসাহিত্য—উপদেশের ভান থাকলেও রসকাহিনীই পরিবেষণ করে গেছে। আর এইখানেই র‍্যান্যাসাঁসপূর্ব ইতালীয় সাহিত্যের সঙ্গে তার ভাব-সংযোগ ঘটেছে। তাই কথাসাহিত্য পরিক্রমায় দশকুমার থেকে আমাদের একেবারে দেকামেরনে পদক্ষেপ করতে হয়।

আরো দু-একটি বইয়ের আলোচনা করে ভারতীয় গল্প-সাহিত্যের কাছ থেকে আমরা বিদায় নেব।

এর পরেই স্মরণীয় 'শুকসপ্ততি'। আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীতে হেমচন্দ্র (অথবা চিন্তামণি ভট্ট) এই গ্রন্থটির সংকলন করেছিলেন। জনৈক শুকপাখিরূপী শাপভ্রষ্ট, মদনবিনোদের ব্যভিচারপ্রয়াসিনী পত্নী প্রভাবতীকে সুপথে আনবার জন্যে সত্তরটি গল্প শুনিয়েছিলেন। নানা ধরণের কৌতুককাহিনী কিছু কিছু থাকলেও স্ত্রী-চরিত্রের অসংযম, ছলনা এবং নীতিহীনতাই এর অধিকাংশ গল্পের বক্তব্য, রচনাভঙ্গিতে ব্যঙ্গাত্মক তীক্ষ্নতা। পূর্বচলিত রীতি ও সংস্কারের অনুবর্তন মাত্র নয়—এর মধ্যে নারীবিদ্বেষী একটি ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি।

শুকসপ্ততি

"What lifts '*The Enchanted Parrot*' from the rest is that here the comments are no longer broad generalities of impersonal proverbs, but have the distinct individual charm of modern cynic and woman hater"—এবং "These stories suggest Boccaccio."[১]

মাত্র suggest Boccaccioই নয়—পরম বিস্ময়ের সঙ্গে অনুসন্ধানী পাঠক লক্ষ্য করবেন যে শুকসপ্ততির দু'একটি গল্প একেবারে অবিকৃত ভাবেই দেকামেরনে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সে-কথা পরে আলোচ্য। ১৯১১ সালে রেঃ বি এইচ্ ওরথাম এই বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। সম্প্রতি রুশ ভাষায় এর একটি বিস্তৃত সটীক সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে।

'শুকসপ্ততি'র সূচনা এই:

'অস্তি চন্দ্রপুরং নাম নগরম্। তত্র বিক্রমসেনো নাম রাজা বভুব। তস্মিন্নগরে হরিদত্তো নাম শ্রেষ্ঠী। তস্য ভার্যা শৃঙ্গারসুন্দরী নাম্নী। তৎপুত্রো মদনবিনোদ নামা বভুব। তস্য পত্নী প্রভাবতী।' এই মদন-বিনোদের চরিত্র ছিল অতি কুৎসিত, দ্যূতক্রীড়া, মৃগয়া, সুরাপান এবং বারনারীই ছিল তার প্রধান আকর্ষণ। জামাতার কুমতি দেখে তার শ্বশুর

১। Lin-yutang, the Wisdom of India, p—396

সোমদত্ত শ্রেষ্ঠী হরিদত্তকে একজোড়া শুকসারী উপহার দেন এবং মদনের শয়নকক্ষে তাদের রক্ষা করতে অনুরোধ জানান। জ্ঞানী শুকের উপদেশে মদনবিনোদ অসৎপথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয় এবং কুলধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘকালের জন্যে বাণিজ্যযাত্রা করে।

মদনবিনোদের অনুপস্থিতিতে এবং সখীদের কুপরামর্শে মদনপত্নীর চিত্তবিকার ঘটে। বাসনা-পীড়িতা প্রভাবতী একদা রাত্রিকালে 'নরান্তরস্বাদং বিজ্ঞাতুং' গৃহত্যাগে প্রস্তুত হয়। শারিকা তাকে বারণ করলে প্রভাবতী তার 'গলমোটন পূর্বং' বিনাশে উদ্যত হয়, শারিকা উড়ে পালায়। সুতরাং চতুর শুক ব্যাপার দেখে অন্য পন্থা অবলম্বন করে। সে প্রভাবতীকে বলে, "যুক্তমিদং কর্তব্যমেব পরং দুষ্করং নিন্দিতং চ কুলস্ত্রীণাম্। কিন্তু তদা গম্যতাং যদি বিপরীতে সমায়াতে সতি তব বুদ্ধিরস্তি। যদি নাস্তি তদা পরাভবপদং ভবিষ্যসি।"

এই বলে শুক প্রভাবতীকে এক দুষ্টা নারীর কৌশলের কাহিনী বর্ণনা করতে আরম্ভ করে। রাত্রি প্রভাত হয়ে যায়, সেদিন আর প্রভাবতীর পক্ষে অভিসার যাত্রা সম্ভব হয় না। এর পর থেকে প্রতি রাত্রেই প্রভাবতী গৃহ থেকে বহির্গতা হতে গেলেই শুক এক একটি করে গল্পের প্রলোভন দেখাতে থাকে। যেমন ঃ

"যথেষ্টং গচ্ছ সুশ্রোণি যদি জানাসি দুঃকৃতে।
প্রত্যুত্তরং যথায়াতে যশোদেবীব সংকটে॥" (দ্বিতীয়া কথা)
"গচ্ছ দেবি কিমাশ্চর্য যত্র তে রমতে মনঃ।
নৃপবৎ যদি জানাসি পরিত্রাণাং ত্বয়াত্মনঃ॥" (তৃতীয়া কথা)
"যুক্তমেব বিশালাক্ষি পরং রন্তুং যদৃচ্ছয়া।
যদ্যায়াতে পতো বেৎসি ধনশ্রীরিব ভাষিতম্॥" (ষোড়শো কথা)

শ্লোক শুনেই প্রভাবতীর মন গল্পের জন্যে কৌতূহলী হয়ে ওঠে, শুকও তৎক্ষণাৎ কাহিনী আরম্ভ করে। তারপর 'কথাং শ্রুত্বা প্রভাবতী সুপ্তা'— তার আর কিছুতেই অভিসারে যাওয়া হয় না।

এমনি চতুরতার সঙ্গে উনসত্তর রাত—অর্থাৎ মদন স্বগৃহে ফিরে না আসা পর্যন্ত প্রতিটি রাত গল্পের ছলে ভোর করিয়ে দিয়ে শুক প্রভাবতীর সতীধর্ম রক্ষা করে। মদন এসে শুকের কাছ থেকে সব কথা জানতে পেরে প্রভাবতীর প্রাণনাশে উদ্যত হয়, কিন্তু শুক প্রভাবতীকে বাঁচায় এবং পরে শুক-সারী শাপমুক্ত হয়ে দেবলোকে চলে যায়।

আপাত-বিচারে উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু অধিকাংশ গল্পই নীতিবিবর্জিত, নারীর প্রতি ঘৃণায় কুটিল।

'শৃঙ্গিণাঞ্চ নদীনাঞ্চ নখিনাং শস্ত্রপাণিনাং
বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু'—

এই ধ্রুবপদকে অনুসরণ করে 'শুকসপ্ততি'র গল্পমালা অগ্রসর হয়েছে। ললনার ছলনা যে কত মারাত্মক হতে পারে, 'শুকসপ্ততি'র দ্বিতীয় গল্প

থেকেই তার উদাহরণ নেওয়া যাক ঃ

রাজকুমার রাজশেখরের পরমা রূপবতী ভার্যার নাম ছিল শশিপ্রভা। একদা বীর নামধেয় জনৈক যুবক তাকে দেখে রূপোন্মত্ত হল এবং কামনার জ্বরে জর্জরিত হয়ে শয্যা নিলে। কিন্তু রাজবধূর প্রতি তার অন্যায় বাসনা সফল হবে কী করে? সুতরাং পুত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে এগিয়ে এল তার কূটবুদ্ধি জননী যশোদেবী। একদিন প্রচুর সাজসজ্জা ক'রে একটি অনাহারক্লিষ্টা কুক্কুরী সঙ্গে নিয়ে যশোদেবী গিয়ে উপস্থিত হল রাজকন্যার কাছে। তারপর নির্জনে ভাব-গদ্‌গদ্‌-কণ্ঠে তাকে সম্ভাষণ করল।

শশিপ্রভা আশ্চর্য হয়ে বললে, তুমি কী চাও?

উত্তরে যশোদেবী এক অদ্ভুত গল্প শোনালো। বললে, পূর্বজন্মে তুমি, আমি আর এই কুক্কুরী তিনটি বোন হয়ে জন্মেছিলাম। কোনো প্রেমিক আমার কাছে প্রণয় যাঞা করলে আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হতাম, তুমি দ্বিধা করলেও বিমুখ হতে না আর আমাদের তৃতীয়া ভগ্নী (এই কুক্কুরী) সকলকে প্রত্যাখ্যান করত। ফলে এর এই রকম দুর্গতি হয়েছে[১]। প্রার্থীকে নিরাশ করা আর প্রেমিককে প্রত্যাখ্যান করা সমান পাপ। তুমিও এ-কথা মনে রেখে কোনো প্রণয়ীকে বিমুখ কোরো না, তা হলে জন্মান্তরে তোমার অদৃষ্টেও অনুরূপ দুর্গতি আছে।

বলা বাহুল্য, যশোদেবীর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। "ততঃ শশিপ্রভা সকণ্ঠগ্রাহং রুদিত্বা প্রাহ—মামপি কল্যাণি! পুরুষান্তরেণ যোজয়।"

কাহিনীটি শেষ করে শুক প্রভাবতীকে বলল, 'যশোদেব্যা মহদ্‌বুদ্ধ্যা নিজকার্যমনুষ্ঠিতম্‌—' তোমারও যদি অনুরূপ চাতুর্য থাকে, তা হলেই—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

'শুকসপ্ততি'র পঞ্চবিংশ কাহিনীটি ঃ

কুহাড় গ্রামে জরস নামে এক মহামূর্খ ব্রাহ্মণ বাস করত; তার স্ত্রী দেবিকা 'প্রভাকরো ব্রাহ্মণঃ ক্ষেত্রমধ্যে বিভীতক বৃক্ষসমীপে গুপ্তস্থানে মুদা রমতে।' এই নিয়ে গ্রামের ভেতরে লোকগুঞ্জন শুরু হলে ব্রাহ্মণ তা জানতে পারল—"তেন চ বৃক্ষারূঢ়েন তৎ তথৈব দৃষ্টম।" দেখে সক্রোধে ব্রাহ্মণ বললে, 'ধূর্তিকে! বহুদিনেভ্যোহদ্য সম্প্রাপ্তা।'

তাই শুনে দেবিকা দ্রুত তার প্রেমিককে বিদায় করল এবং স্বামী গাছ থেকে নেমে আসতেই জানালো ঃ "হে প্রভো, ঈদৃশ এব বৃক্ষঃ, অত্রারূঢ়ৈর্মিথুনং দৃশ্যতে।"

"তেন পতিনা উক্তম্‌—ত্বমারুহ্য অবলোকয়।

তয়া তথা কৃতম্‌। বৃক্ষারূহ্যা চ তয়া প্রোক্তং কপটেন।

'বহু দিবসেভ্যোহন্যাং নারীমভিগমন্দৃষ্টোহসি।'

১। "অনয়া তু নৈব। অতোহস্যাঃ শীলভাবাৎ কেবলং জাতিস্মরণমেব ন ভোগাঃ শুনিকা চ সঞ্জাতা।"

তেন মূর্খেণ জ্ঞাতম্—সত্যমিদম্। স চ তাং শান্তয়িত্বা গৃহং নিনায়।”

গল্পটির সঙ্গে ‘দেকামেরন’ এবং ‘ক্যান্টারবেরি টেল্‌সে’র আত্মিক যোগ আছে, কিন্তু সে আলোচনায় আমরা পরে আসব।

হিন্দু সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কী বিষ সেদিন প্রবেশ করেছিল, তার নৈতিক ভিত্তি কী ভাবে শিথিল হয়ে গিয়েছিল, এই ধরণের অসংখ্য গল্পের সমাবেশে শুকসপ্ততির পাতায় পাতায় তার নগ্ন পরিচয় মেলে। দশকুমার চরিতে যা রাজনৈতিক বা অন্য প্রয়োজনে কিছু পরিমাণে সমর্থিত হয়েছে, শুকসপ্ততিতে তা নিরঙ্কুশ দুর্নীতিরূপেই ধরা দিয়েছে। এই অন্ধকার স্বাভাবিক ভাবেই নব সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষা করছিল। তাই শুধু তলোয়ারের শক্তিতেই নয়—নতুনতর মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির প্রয়োজনেও সেদিন ইস্‌লামের আবির্ভাব ঐতিহাসিক সত্য হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতারও কী কুৎসিত পরিণতি ক্রমে ক্রমে ঘটতে আরম্ভ হয়েছিল, কথাসরিৎ এবং দশকুমার প্রভৃতির সর্বত্র অভিচারজীবিনী পরিব্রাজিকারা তার নিদর্শন রেখেছে।[১]

কিন্তু অবক্ষয়ী সাহিত্যের আর একটা দিকও আছে। মহৎ আদর্শ অনুপস্থিত বলেই তাতে বস্তুমূলকতা প্রাধান্য পায়—জীবন নিরাবরণ স্পষ্টমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। রচনার মধ্যে চাতুর্য ও নৈরাজ্যাত্মক ব্যঙ্গ—তীক্ষ্ন সিনিসিজ্‌ম্ তাকে স্বতন্ত্র আস্বাদ দান করে। এদিক থেকে ‘শুকসপ্ততি’ নিজ মহিমায় বিশিষ্ট। এর গল্পগুলিতে মাত্র কথা-কল্পনা নেই—রিয়্যালিজ্‌ম্ আছে—লেখার ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি সেই রিয়্যালিজ্‌মের অনুপূরক হয়ে উঠেছে।

ফার্সী ‘তুতিনামা’ (যার বাংলা অনুবাদ গোলোকনাথ, কাজী সফিউদ্দিন প্রভৃতি করেছিলেন) এই শুকসপ্ততি অবলম্বনেই রচিত। কিন্তু বর্তমানে আমরা যে ‘তুতিনামা’ পাই—তা ঠিক শুকসপ্ততিরই অনুবাদ নয়। এর সূচনাপর্ব অবশ্য শুকসপ্ততিরই অনুরূপ—এখানে মদনবিনোদ হয়েছে ‘ময়মন’ আর প্রভাবতী হয়েছে ‘খোজেস্তা’। মদন গল্পের শেষে প্রভাবতীকে ক্ষমা করেছে ভারতীয় আদর্শে আর ঐস্লামিক বস্তুতন্ত্রবাদী ময়মন “তৎক্ষণাৎ খোজেস্তাকে নষ্ট” করেছে। এ বইয়েরও বক্তা শুক।

‘তুতিনামা’ আদিতে সম্ভবত শুকসপ্ততির সম্পূর্ণ অনুবাদই ছিল।

১। “শুক-সপ্ততি”র আরো কিছু বিশেষত্ব আছে। এতে দেশজ ভাষার ব্যাপক ব্যবহার এবং রচনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য একে একেবারে আধুনিক কালের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। এর দু-একটি গল্প পরবর্তী কালের লোককথার মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এর ৪৬-৪৭ কাহিনীর উল্লেখ করা যায়। ব্রাহ্মণের ঝগড়াটে স্ত্রীর ভয়ে একসঙ্গে ব্রাহ্মণ ও ভূতের পলায়ন—ভূতকে ঠকিয়ে ব্রাহ্মণের রাজকন্যা লাভ—হিন্দুস্থানী উপকথার একটি উপাদেয় কাহিনী। ৫৫ সংখ্যকটিও অনুরূপ একটি লোককথা। জনৈক বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে ঠকাতে গিয়ে সর্বাগ্রে হাত দিয়ে একটি মই ধরল, এটিও সর্বজনবিদিত।

কিন্তু দুর্নীতিমূলকতার জন্যে চতুর্দশ শতকে এর সংস্কার সাধন করা হয় এবং অনেকগুলি গল্পকে বর্জন করে পঞ্চতন্ত্র কথাসরিৎ-সাগর প্রভৃতি থেকে বিভিন্ন বিষয়ী শিক্ষামূলক গল্প এতে যোজনা করে দেওয়া হয়। যেমন তুতিনামার দ্বিতীয় উপাখ্যানে তেবরস্থানের রাজা এবং তার বিশ্বাসী আত্মদানেচ্ছু প্রহরীর গল্প স্পষ্টতই 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র বীরবরের রূপান্তর—কেবল হিন্দু রাজলক্ষ্মী অপৌত্তলিক মুসলমানের কল্পনায় রাজার আয়ুর্দেবতায় পরিণত হয়েছেন। একাদশ উপাখ্যান 'কঙ্কণলুব্ধ পান্থকথা'রই ভিন্নতর রূপ। সপ্তদশ সংখ্যকটি অবিকৃত ভাবে নীলবর্ণ শৃগালের গল্প। বিংশতি ও একবিংশতি উপাখ্যান কথাসরিৎ এবং পঞ্চতন্ত্রের রকমফের। সপ্তবিংশতি গল্পে শৌণ্ডিকের 'সেনাপতিত্ব' প্রসঙ্গ (পতনে আহত হয়েছিল, অথচ ললাটের ক্ষতচিহ্নের জন্যে যোদ্ধা নাম রটে গেল) পঞ্চতন্ত্র থেকে সংগৃহীত। এরকম আরো বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

শুকসপ্ততির প্রসঙ্গে 'শুকবিলাসে'র কথা মনে আসে। কোনো অর্বাচীন মূল থেকে এর বাংলা রূপান্তর করেছিলেন নন্দকুমার কবিরত্ন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বিচিত্র রোমান্স এবং শুকপাখির প্রাজ্ঞতা এরও বিষয়বস্তু।

'শুকবিলাস'

এতে বিক্রমমহিষী ভোজরাজকন্যা যাদুবিদ্যাবতী ভানুমতীর কথা আছে, বিক্রম কি ভাবে সুকৌশলে নিজ শ্যালিকা তিলোত্তমার পাণিগ্রহণ করলেন, তার নাটকীয় বর্ণনা আছে; কমলিনী নাম্নী ছলনাময়ী রাজকুমারীর কথা আছে এবং বিক্রমের বেতাল কী ধূর্ততার সাহায্যে কমলিনীর প্রণয়ী গন্ধর্ব চিত্ররথকে জব্দ করেছিল, তার কৌতুককর বিবরণ আছে। আর আছে নারীর চপলতার এইরকম কাহিনী:

রাজকন্যা বাসনাসক্তা হয়ে বণিক্‌পুত্রকে বিবাহ করল। তারপর পত্নীসহ বণিক্‌পুত্র যাত্রা করল দূর বিদেশের অভিমুখে। যেতে যেতে শ্রেষ্ঠিনন্দন পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ল—আর সে পথ চলতে পারে না। তখন জলের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে রাজকন্যা এক গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে পরম রূপবান শৌণ্ডিক নিজের সুরার দোকানে বসে ছিল। তাকে দেখেই ভ্রমরীমনা রাজকন্যা তার কাছে আত্মসমর্পণ করল—তৃষ্ণাতুর স্বামীর কথা তার আর মনেই রইল না। বহু বিলম্বেও স্ত্রী ফিরে আসছে না দেখে ধীরে ধীরে ক্লিষ্ট বণিক্ সেই শৌণ্ডিকের দোকানে এসে পৌঁছুল। আর তৎক্ষণাৎ সেই শৌণ্ডিক ও রাজকন্যা খড়্গাঘাতে তাকে বধ করে দ্বিখণ্ডিত রক্তাক্ত দেহের সামনেই প্রেমলীলা করতে লাগল।

এই গল্পে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে, তার বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। দশকুমারে মিত্রগুপ্তের গল্পের ধূমিনী (এ কাহিনী কথাসরিৎ-সাগরেও অন্য ভাবে আছে) তবুও শেষ পর্যন্ত পাপের দণ্ড পেয়েছিল, কিন্তু স্বামিঘাতিনী রাজকন্যার পাপের কোনো বিচারক নেই—কোনো বিচারও নেই। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সেই রক্তসন্ধ্যা কী দুঃস্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল—এর মধ্যে তারই ভয়াবহ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কিন্তু এ ধিক্কার সত্ত্বেও মনে হয় এইখান থেকেই যেন ভবিষ্যতের ছোটগল্প সম্ভাবিত হয়ে উঠেছে। আদর্শ নয়—সত্য; কল্পনার কলহংসে স্বপ্নের আকাশে ডানা মেলে স্বর্গ-মর্ত্য পরিক্রমা করছে না—নেমে এসেছে বাস্তবের পঙ্ক-ভূমিতে, তীরবিদ্ধ তার বুক। সমাজমর্মের নগ্ন উদ্‌ঘাটন রয়েছে এদের মধ্যে—মনু-শাসিত লোকস্থিতি যে নিছক জ্যামিতিক পন্থা অনুসরণ করেই চলছে না—এতে আছে তারই সংকেত। পরে আধুনিক ছোটগল্পের আলোচনায় আমরা যে "Pointing finger"-এর কথা বলব, তার সূচনা এইখান থেকেই।

পরের কথা পরে। গল্পের আদিভূমি ভারতবর্ষ পার হয়ে তার আগে আমাদের পরিক্রমা করতে হবে আরব এবং মিশরে—'এক হাজার এক রাত্রি'র মায়া-মালঞ্চ অতিক্রান্ত হয়ে, তারপরে আমরা ইয়োরোপে প্রবেশ করব। ইতোমধ্যে ইয়োরোপ গ্রেকো-রোমান গল্পসাহিত্যের আস্বাদন করবে, পড়বে ইলিয়াড্-ওডিসি-বিউলফ্, মহাকথা, রোমাঞ্চিত হবে আত্তিলার বংশধরদের কণ্ঠে রুনহিলডের গাথায়[১]; শুনবে ত্রুবাদুর প্রেমগীতি, দান্তে মহাকাব্য রচনা করবেন আর বোক্কাচেচা-পেত্রার্কার ভাষায় "for the vulgar people" ভবিষ্যৎ পৃথিবীর গল্পসাহিত্যের সূর্যবীজ বপন করে চলবেন।

তিন

[আলিফ্ লয়লা ওয়া লয়লা : পারস্য উপন্যাস]

'দশকুমার-চরিত' ও 'শুকসপ্ততি'র সঙ্গে ভারতীয় গল্পকথার উপর যবনিকা নামল—মোটের উপর এই সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছুতে পারি। এইবারে নতুন ভাবে পটোন্মোচন হল বাগদাদ-কায়রো-আলেকজান্দ্রিয়ায়। নতুন গল্প এল ভ্রাম্যমান কথাকোবিদ্ 'রাভি' (Rawi)-র কণ্ঠে—আরবের বেদুয়িনের তাঁবুতে, পিরামিডের ছায়াতলে। এক হাজার এক রাত্রির তিন বৎসরব্যাপী অচ্ছেদ গল্পকাহিনী: আরব্য উপন্যাস। প্রেম, লালসা, ধর্ম, ঐশ্বর্য, স্বপ্ন, অ্যাড্‌ভেঞ্চার, জিন-মরিদ-ইফ্রিতের এক অপূর্ব জগৎ উদ্ভাসিত হল 'হাজার আফসানে'—'আলিফ্ লয়লা ওয়া লয়লায়'।

মরুভূমির এই মদির স্বপ্নকে প্রথমে ইয়োরোপে বহন করে নিয়ে যান মরক্কোর ফরাসী দূতাবাসের আঁতোয়ান গালাঁ (Antoine Galland)। এই আশ্চর্য মধুচক্রের আস্বাদ পেয়ে ভলত্যারের মতো যুক্তিবাদীও পর্যন্ত সেদিন নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছিলেন। তারপর একের পর এক রসভিক্ষু সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁদের মধ্যে সবচাইতে পরিশ্রমসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য

১। Volsunga Saga

সংস্করণ প্রকাশ করেন এডোয়ার্ড উইলিয়ম লেন (১৮৩৯-৪১)। লেন গল্পগুলিকে পরিমার্জিত ও শিষ্টজনোচিতরূপে প্রচুর টীকা-ভাষ্যসহ উপস্থিত করেন। লেনের প্রদর্শিত পথে যাত্রা করেন স্যার রিচার্ড বার্টন—তিনি ইয়োরোপীয় শালীনতার সংস্কার অতিক্রম করে আরব্য উপন্যাসের সামগ্রিক ও আক্ষরিক অনুবাদ প্রকাশ করেন। সেদিন রুচিবিলাসী ইংল্যাণ্ডে বার্টনের প্রকাশক ছিল না, তাই বারাণসী থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রাহকের জন্যে তাঁর বই মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। বইয়ের শীর্ষবাণীরূপে আত্মরক্ষার জন্যেই যেন বার্টন ব্যবহার করেছেন একটি আরব্য প্রবাদ : **"To the pure, all things are pure,"** এবং সেই সঙ্গে সাক্ষী মেনেছেন বোকাচ্চো, মার্শাল, রাবল্যা এবং ক্রিচটনের 'আরবের ইতিহাস'কে। রাশীকৃত প্রশংসা এবং তার চতুর্গুণ নিন্দার মধ্য নিয়ে বার্টন একাধারে অর্থ ও প্রতিষ্ঠার চরম সৌভাগ্যে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

আলিফ্ লয়লার কাহিনীচয় সংগ্রহে বার্টনের প্রয়াস এবং কর্মপ্রণালীকেও দস্তুরমতো রোমান্সের পর্যায়েই ফেলা যেতে পারে। ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী এই বার্টন বাঙালীর সুপরিচিত টেগার্টের পূর্বগামিরূপে, গোয়েন্দাবৃত্তির প্রয়োজনে, "গোঁড়া সীমান্ত উপজাতিদের মধ্যে দরবেশ সেজে পরিভ্রমণ করেছেন, ফিরিওয়ালার বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন।"[১] এই ছদ্মবেশ ধারণের অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি পাঠানরূপে মক্কা ও মদিনায় 'হজ' করেন—হারার ভ্রমণ করে আসেন। সমস্ত প্রাচ্য ভাষায় তাঁর এমনি অসামান্য অধিকার ছিল, পূর্ব পৃথিবীর মানুষের প্রতিটি দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার পর্যন্ত তিনি এত ভালো করে জানতেন যে তাঁর সহযাত্রীর দল কোনোদিন বিন্দুমাত্রও তাঁকে সন্দেহ করতে পারে নি। সন্দেহ হলে এই বিধর্মী অবশ্যই প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারতেন না। আর এই সুযোগ পেয়েই আরবের বাজারে, বেদুয়িনের আতিথ্য নিয়ে, মিশরের মরুভূমিতে 'রাভি'র মুখে তিনি শুনেছেন আরব্য উপন্যাসের কাহিনী—এক যুগের পরিশ্রমে সংকলন করেছেন এই মহাগ্রন্থ।

প্রাচ্য-প্রীতি এবং সাহিত্যপ্রাণতা ছাড়া এই আরব্য উপন্যাস সংকলনে বার্টনের কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। আরব জগতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের স্থায়ী ভিত্তিপত্তন করতে হলে ঐস্লামিক সাহিত্যের দিকেও দৃষ্টিক্ষেপ করা দরকার—ধুরন্ধর গোয়েন্দা বার্টন তা বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিলেন। তাই জোন্স-উইলসন-বুহ্লার-বেনফি-ম্যাকসমুলার প্রভৃতি অরিয়েন্টালিস্টদের আক্রমণ করে বার্টন বলেছেন :

'Never devotion to Hindu, and especially to Sanskrit literature, has led them astray from those (so called) "Semitic"

১। Tales from the Arabian Nights, Ed. by P. H. Newby Intr. P-X

studies, which are the more requisite for us as they teach us to deal successfully with a race more powerful than any pagans —the Moslems.'[১] ।

পরোক্ষ উদ্দেশ্য বার্টনের যা-ই থাক, তাঁর এবং লেনের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তাঁরা যেন কালের বালুস্তর সরিয়ে মরুভূমির গুপ্ত ভাণ্ডার আমাদের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তুতানখামেনের সমাধি আবিষ্কার করে স্যার এডোয়ার্ড কার্টার এবং লর্ড কার্নারিভন যে অমর গৌরবের অধিকারী, বার্টন এবং লেনের কৃতিত্ব তার সমপর্যায়ী। এঁদের পরে আরব্য উপন্যাসের আরো বিশ্বস্ত, নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু লেন ও বার্টন সেজন্য তাঁদের প্রাপ্য সম্মান থেকে কখনোই বঞ্চিত হবেন না।

আরবের মরুপ্রান্তরে এই গল্প-কল্পতরুর বীজ একদিন পূর্ব বায়ুর স্রোতে এই ভারতবর্ষ থেকেই উড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সোজা আরবে যায় নি। পারস্যের গোলাপকুঞ্জে এর প্রথম চারাটি মাথা তোলে—সেখান থেকে একে নিয়ে গিয়ে রোপণ করা হয় আরবের মরুদ্যানে ; আরব থেকে এর মূল সমুদ্র-তরঙ্গের তলা দিয়ে মিশরে গিয়ে আর একটি নবতরুরূপে জন্মলাভ করে। আধুনিক আরব্য উপন্যাস এই দুই তরুরই মিশ্র ফলসম্ভার।

পণ্ডিতেরা আরবী ও মিশরী গল্পকে দুটি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত করতে চেয়েছেন। নিকলসন বলছেন :

"The one belonging to Baghdad and consisting mainly of humerous anecdotes and love romances in which the famous Caliph 'Haroun Alraschid' frequently comes on the scene; the other having its centre in Cairo, and marked by a roguish ironical pleasantry as by the mechanic superstition"—[২] ।

কিন্তু আরবী-মিশরীর আগে আছে ফার্সী—তারও আগে ভারতীয় কথা-সাহিত্য। ভারত থেকে পারস্যে এসে প্রথমে গড়ে উঠেছে 'হাজার আফসান'—তার থেকেই আরবের 'আলিফ লয়লা'। ৯৮৮ খ্রীঃ অব্দে কিতাব অল্ ফিহ্রিস্ত) Kitab-al-Fihrist) এইভাবে এর উৎস নির্দেশ করেছিল :

"The first who composed fables and made books of them and put them by in treasuries and sometimes introduced animals as speaking them were the ancient Persians. Afterwards the Parthian kings, who from the third dynasty of the kings of Persia, showed the utmost zeal in this matter. Then

১। Burton, The Translator's forward, P—xxiii

২। R. A. Nicholson, A Literary Hist. of the Arabs. P—458

in the days of S'as'anian kings such books became numerous and abundant, and the Arabs translated them into the Arabic tongue, and then soon reached the hands of philologists and rhetoricians who corrected and embellished them and composed other books in the same style. Now the first book ever made on this subject was the book of thousand tales (Hazar Afsan...)" ১ ।

আরব্য উপন্যাস মূলে এক হাজার, না হাজার এক রাত্রির গল্প ? এক ব্যক্তির রচনা, না আরো বহুজনের হস্তক্ষেপ আছে তাতে ? আজো সে সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট মীমাংসা হয়নি। এদের বহু গল্পই ভারত ও পারস্যের সামগ্রী : যেগুলি মূলত অনারবীয়, তাদের লক্ষণ নির্দেশের নানা চেষ্টাও হয়েছে। লেন প্রায় ধরেই নিয়েছেন, গল্পের মধ্যে কবিতা বা গান থাকলেই সেগুলিকে আরব্য বলে চিহ্নিত করতে হবে।[২] কিন্তু 'তর্কজাল-বিজড়িত ঘনবাক্যবনে' প্রবেশ করে লাভ নেই। উপকরণ যেখানকারই হোক, তাকে আত্মসাৎ করে সম্পূর্ণ নিজস্বভাবে সৃষ্টি করে নেওয়ার কৃতিত্ব আরব জাতিরই—নানা পুষ্পোদ্যান থেকে বীজ আহরণ করে তাঁরা 'সুরভি কানন' নির্মাণ করেছেন। তার উপর আর কারো কোনো অধিকার নেই।

এই গল্পগুলি আরব জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে, মাত্র রূপান্তরিতই নয়—এরা জন্মান্তরিত হয়েছে। গঙ্গার তরঙ্গ এসে মিশে গেছে তাইগ্রীসের জলকল্লোলে, নিশাপুরের আলোকমালায় বোগদাদের পথে পথে জ্বলে উঠেছে রূপের দীপান্বিতা, বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত খলিফা হারুণ-অল-রশিদরূপে নবজন্ম লাভ করেছেন, তক্ষশীলার অভিমুখী সার্থবাহদল গতি পরিবর্তন করে ক্যারাভ্যান হয়ে যাত্রা করেছে আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে। মালবভূমির আকাশে সন্ধ্যার রক্তরাগ নামলে—গজাজিন পরিহিত শঙ্করের সান্ধ্য-নটন মহাকাল মন্দিরে সাঙ্গ হয়ে গেলে, পঙ্কজস্বুসুরভিত বাতাসে গৃহাঙ্গনে বসে যে গ্রামবৃদ্ধেরা 'উদয়ন কথা' শোনাতেন, তাঁরাই 'রাভি'তে পরিণত হয়ে মরু-নক্ষত্রের শীতল কঠিন আলোয় বেদুয়িনের তাঁবুতে শোনাতে এসেছেন 'সিন্দবাদ নাবিকের গল্প', 'সিন্ধুসম্ভবা জলনার এবং বদর বাসিমের কাহিনী' 'আর্দেশির আর হারণ-অল-নুফুসে'র রোমান্স, 'গরীব ও আজীব' নামে এক বিস্ময় ও রোমাঞ্চ মিশ্রিত দীর্ঘ উপন্যাস, 'ঘানিম-বিন-আয়ুব' আর জোবেদার ঈর্ষ্যাহতা 'কুত্-অল-কুলুবে'র ঘটনা-বিচিত্র অপরূপ প্রেমকথা।

আরব্য উপন্যাসে জীবজন্তুর গল্প আছে, কৌতুককাহিনী আছে, অদৃষ্টের লীলা আছে, ইসলাম ধর্মের খুঁটিনাটি বিবরণ ও বিশদভাবে তার মহিমা প্রচার আছে, প্রেম-লালসার ইতিবৃত্ত আছে আর স্বপ্ন আছে। যেমন

১। R. A. Nicholson, A literary History of the Arabs. P—457

২। Thousand and one Tales, Lane—Vol I, P—681

এতে অতি বাস্তব দৈনন্দিন জীবনগত আলেখ্যের অভাব নেই, প্রাত্যহিক ক্ষেত্রে মানুষের মূঢ়তা-মূর্খতা নিয়ে যেমন এর পাতায় পাতায় উচ্ছলিত কৌতুক, তেমনি রাজা-রাজকন্যা, জিন-ইফ্রিত-মন্ত্রসিদ্ধ আংটি, যাদুকর, যাদু-ই-গালিচা, মায়ানগরী—এরা সকলে মিলে এখানে যে কল্পজগৎটি তৈরি করেছে, তার তুলনা পৃথিবীর সাহিত্যে কোথাও নাই।

আলিফ্ লয়লার সূচনা যত আগেই হোক—এর সামগ্রিক রূপটি গড়ে উঠেছে মোটের উপর দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে। এই সময় সারা পৃথিবীতেই এক অপূর্ব রোমান্সের কাল। তখন মার্কো পোলো উপস্থিত হয়েছেন ঐশ্বর্য আর রহস্যভরা কুবলাই খানের অতিকায় রাজদরবারে—চীন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে পৌঁছেছেন পারস্যে; আবার তারই প্রেরণায় কতকাল পরে সান্তা মারিয়ার বিদ্রোহী নাবিকদের কোনোমতে আয়ত্ত করে আর্তদৃষ্টিতে ক্রিস্তোফার কলম্বাস সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছেন তটরেখার প্রত্যাশায়, দিক্-চক্রবালে অজয় তার আনন্দের বার্তা দিয়ে একটু একটু করে ফুটে উঠছে সান সাল্ভাদর। অপরিচয়ের ইন্দ্রজালে ঘেরা প্রাচ্য-পৃথিবীর হাতছানি—তারই আকর্ষণে ব্যবসা-বাণিজ্য-আবিষ্কারের দূরাভিযান: একদিকে ক্রমবিলীন প্যাগান সভ্যতার মায়া-কুহেলি, অন্যদিকে দিগ্বিজয়ী রাজপুত্রের মতো অসম-সাহসিক জয়যাত্রা—এই দ্বৈত-প্রবাহের সঙ্গমেই রোমান্সের তরঙ্গ-লীলা ফেনিল হয়ে উঠেছে। আরব্য উপন্যাসেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। যদিও পঞ্চদশ শতকে ইয়োরোপে 'আলহামরা'-স্রষ্টা মুরশক্তির মৃত্যুর ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ হয়েছে—'কোর্ট অব দি লায়ন্সে'র শুভ্র মর্মরে রক্তের ছাপ এঁকে দিয়েছে ক্রীশ্চান সৈন্যের বর্বর তরবারি, তবু প্রাচীভূমিতে তার মহিমার রাজছত্র তখনো শোভমান।

আরব আর সাহারার মরুভূমির মধ্য দিয়ে উষ্ট্রবাহিনী নিয়ে চলে বণিকেরা; যাযাবর বেদুয়িনেরা যাপন করে উদ্দাম জীবন; মরু-নগরীর উপরে রাত্রি নামে—সরাইখানায় রাতজাগা উটের পায়ের আওয়াজ আর খেজুর পাতার মর্মর নিশীথ-প্রহরীর মনে এক দুর্বোধ আতঙ্কের সৃষ্টি করে। কী রহস্যময়—কী বিচিত্র এই মরু-বিস্তৃতি! তৃষ্ণার্তের সামনে মরীচিকার হাতছানি বয়ে আনে—সে মরীচিকা হয় 'মায়ানগরী', সাইমুমের মৃত্যুবাত্যা ছুটে আসে আকাশ অন্ধকার করে—যেন সূর্যকে বিশাল ডানায় ঢেকে নেমে আসছে হিংস্র 'রুখ' পাখি; দিনের প্রচণ্ড উত্তাপ রাত্রির হিম-জর্জরতায় পরিণত হলে তাঁবুর মধ্যে জড়োসড়ো-হয়ে-থাকা মানুষ কান পেতে শোনে; সীমাহীন মরুশয্যার বুকে সারিবন্ধ বালিয়াড়ীর গায়ে বাতাস অদ্ভুত ধ্বনি তুলছে—যেন সলোমনের বন্দী-শিবির থেকে যুগান্তের পরে মুক্তি-পাওয়া ইফ্রিত-বাহিনী তালে তালে দামামা বাজিয়ে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। অতীত মিশরের ভগ্ন মন্দিরে আইসিস-ওসিরিস প্রহর জাগে, কালপুরুষের মতো সময় গোনে স্ফিংস আর কুটিল-কৌতুকে কোন কূট-প্রশ্নের কথা ভাবতে থাকে; পিরামিডের নিশ্ছিদ্র গর্ভে হাজার হাজার বছরের মমিরা চমকে জেগে উঠে

চকিত নিঃশ্বাস ফেলে, ওয়াণ্ডারিং জুয়েস্, মৃত্যুহীনা সালোমে অন্ধ বিদ্বেষের জ্বালায় পিশাচীর মতো বুঝি ক্লিয়োপাত্রার সমাধির সন্ধান করে বেড়ায়।

আবার আরব বণিকের জাহাজ চলে মাদ্রিদের উদ্দেশে, আসে কালিকটের বন্দরে, বংগাল-কি-খাঁড়ী বেয়ে পৌঁছোয় পর্তুগীজদের বহু-বাঞ্ছিত 'মহা-বন্দর' চট্টগ্রামে, মালয়-সুমাত্রা-যবদ্বীপে পাড়ি জমিয়ে জাহাজ উথাল্-পাথাল দুলে ওঠে চীন-সমুদ্রের কালান্তক ঝড়ে। অজানা সমুদ্র, অচেনা দ্বীপ, অপূর্ব জীবজন্তু, অপরিচিত মানুষ আর অপরিসীম বিপদ। প্রকৃতি আর অতীত—প্রলোভন আর অভিযান—গল্পের পর গল্পের কল্পজগৎ রচনা করে যায়। এই মনোভঙ্গি—এই নিসর্গ, এই পরিবেশ—এরা মায়া-রাত্রির মোহ-কাহিনীকে অবলীলাক্রমেই আহ্বান করে আনে। এমন কি ১৮৫২ সালেও আরবের মাটিতে দাঁড়িয়ে, দিনান্তিক আলোর দিকে চোখ মেলে বার্টনের মনে হয় ঃ

"I stood under the diaphanous skies, in an air as glorious as a ether, whose very breath raises men's spirit like sparkling wine. Once more I saw the evening star hanging like a solitaire from the pure front of the western firmament; and the afterglow transfiguring and transforming, as by magic, the homely and rugged features of the scence into a fairy land lit with a light which never shines on the other soils or seas."[১]।

রোমান্স্ আর রূপকথার সমস্ত ঐশ্বর্য সত্ত্বেও আরব্য উপন্যাসেরও মর্ম-বাণী হল নারী-চরিত্র বিনির্ণয়—তার ছলনা, তার পাপ, তার শঠতা, 'ব্রুটে'র প্রতি আসক্তির চিরন্তন অপবাদ প্রমাণের প্রয়াস। অবশ্য শেষ পর্যন্ত শহরজাদী নারীর মহিমা ও পবিত্রতার উজ্জ্বল প্রতীকরূপেই এক হাজার এক রাত্রির কাহিনীর উপরে যবনিকা টেনে দিয়েছেন, তবুও আরব্য উপন্যাস প্রহেলিকাময়ী স্ত্রী-চরিত্রের রহস্যোদ্ভেদেই বিভ্রান্ত।

বিশ্বাসহন্ত্রী দুই রাজমহিষী এবং ফলে সংসারবিরাগী দুই রাজভ্রাতাকে নিয়ে আরব্য উপন্যাসের কথামুখ (সংস্কৃত সাহিত্যে রাজা ভর্তৃহরির বৈরাগ্য স্মরণীয়)। শাহ্রিয়ার এবং শাহ্জমান ফকিরি নিয়ে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েছেন। পথে দেখা ভয়ংকর ইফ্রিতের সদাসতর্ক প্রহরায় বন্দিনী সুন্দরী নারীটির সঙ্গে। নিদ্রিত ইফ্রিতের পাশেই যথেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়ে মেয়েটি প্রমাণ করেছে, পুরুষ যতই প্রচণ্ড হোক—যতই প্রবল থাক তার সতর্কতা—ব্যভিচারিণী নারীর কাছে সে সব কত তুচ্ছ[২]।

১। Alf-Layla wa Layla : Richard F. Burton, Notes, Vol I, P—vi

২। অনুরূপ অন্ততঃ দুটি কাহিনী 'কথাসরিৎসাগরে' পাওয়া যায়। দশক লম্বক, ৬৩ তরঙ্গে শ্রীধরের উপাখ্যানে দেখা যায়, জলপুরুষ তার দুটি স্ত্রীকে মুখের মধ্যে রেখে পাহারা দিত, মাত্র বিলাসের প্রয়োজনে বাইরে আনত। সে ঘুমিয়ে পড়লে দ্বিতীয়া স্ত্রী

ইঙ্গিত-প্রণয়িনীর মুখেই আরব্য উপন্যাসের ধ্রুবপদ শোনা গেল : "বিশ্বাস কোরো না নারীকে ; বিশ্বাস কোরো না তাদের শপথকে, কারণ তাদের প্রেম বা বিরাগ নির্ভর করে তাদের কামনার উপরেই ; তাদের প্রণয় মিথ্যা—কারণ বিশ্বাসঘাতকতা লুকিয়ে রয়েছে তাদের বেশ-বাশের অন্তরালে ; ইয়ুসুফের কাহিনী স্মরণ রেখে সতর্ক থাকো, নিজেকে রক্ষা করো নারীর ছলনা থেকে—এ-কথা কি ভেবে দেখছ না যে নারীর সাহায্যেই আদমকে স্বর্গ থেকে উৎখাত করেছিল ইব্লিশ ?"[১]

উক্তিটি পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ ও শুকসপ্ততিরই প্রতিধ্বনি।

জ্ঞানবৃক্ষের ফল আস্বাদন করে দুই রাজাই নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন। তারপর দুজনেই প্রতি রাত্রে একটি করে স্ত্রী গ্রহণ করেন এবং পরদিন সকালে তাকে বধ করেন। শেষে শাহ্‌রিয়ারের রাজ্যে বিবাহযোগ্যা কন্যার অভাব ঘটল। অর্ধেক কন্যা এক রাত্রির বেগম হয়ে বেহেস্তে (অথবা দোজখে) প্রস্থান করেছে, বাকী অর্ধেক বাপ-মার সঙ্গে দেশ ছেড়ে পলাতকা। এই সংকট-মুহূর্তে কন্যা সংগ্রহের চেষ্টায় উজীর যখন চোখে অন্ধকার দেখছেন, এমন সময় এগিয়ে এলেন স্বয়ং উজীরেরই কন্যা শহরজাদী ('নাগরিকা')। এই শহরজাদী ছিলেন অত্যন্ত বিদুষী—"Persued the books, annals, and

একদা ব্রাহ্মণ যশোধরের প্রণয়ভিক্ষা করে। যশোধর তাকে তিরস্কার করলে সে বলে, আমি শত পুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়েছি, এই দেখ তাদের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী। যশোধর অবশ্য তার প্রস্তাবে সম্মত হয় নি।

দ্বিতীয় গল্পেও (দশম লম্বক, ৬৪ তরঙ্গ) জনৈক নাগ নিজের স্ত্রীকে অনুরূপভাবে বদন-বিবরে রক্ষা করত এবং সর্বদা দৃষ্টি রাখত। কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও তার অসতী স্ত্রী পতির নিদ্রাবকাশে ৯৯ জন পুরুষের সঙ্গলাভ করে। একজন পথিকের সঙ্গে শততম প্রণয়ের পরে সে ধরা পড়ে এবং তার প্রাণ বিনষ্ট হয়। এটি সম্ভবত প্রথম গল্পেরই রূপান্তর। আরব্য উপন্যাসের সূচনাসূত্র এখান থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। 'কথাসরিৎসাগরে' দুষ্টা স্ত্রীরা যথাযোগ্য শাস্তি পেয়েছে, কিন্তু ইঙ্গিত-নায়িকা ধরা পড়েনি। জলপুরুষের স্ত্রী বা নাগবধূ এই আরবীয় কাহিনীর মেয়েটির কাছাকাছিও যেতে পারে না—রাজভ্রাতাদের সান্নিধ্যলাভের পর তার প্রণয়ী সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৭২ জন। প্রসঙ্গত 'বন্ধনমোক্ষ জাতক'—ইতঃপূর্বে যা আলোচিত হয়েছে, দ্রষ্টব্য। মনে হয়, এ সবের একটি আদিবীজ সেখানেই বিদ্যমান। চীনেও অনুরূপ প্রাচীন গল্পের সন্ধান মেলে :

"In a certain Buddhist Parable, there is a Brahmin who conjures up a pot from his mouth, and in this pot are a girl and a screen. When the Brahmin falls asleep, the girl takes out a pot with a man from her own mouth and dallies with the man."

—Lu Hsun, A Brief History of Chinese Fiction, P. 58

১। Thousand and one Tales, B. W. Lane, Vol I, P. 9

legends of preceeding kings, and the stories, examples and instances of bygone men and the things." এ ছাড়াও অতীত ইতিহাসের হাজার বই তাঁর পড়া ছিল, "Studied philosophy and the sciences, arts and accomplishment ; and she was pleasant and polite, wise and witty, well-read and well-bread."[১]। এই সর্বগুণান্বিতা নারী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যেমন করে হোক, এই নৃশংস নারীমেধ বন্ধ করবেনই।

সেই রাত্রেই সময় কাটাবার ছলে তিনি ছোট বোন দুনিয়াজাদী ('বসুমতী')-কে শোনাতে শুরু করে দিলেন গল্প। ধীবর এবং সলোমনের মন্ত্রবন্দী জিনকে দিয়ে আরব্য উপন্যাসের কাহিনী আরম্ভ হল। কৌতূহলী রাজাও নিজের অজ্ঞাতে কখন শহরজাদীর মুগ্ধ শ্রোতায় পরিণত হলেন। গল্পের মধ্যে গল্প—আরো গল্পের চতুর বিন্যাস। সেই গল্পের জের চলতে লাগল রাতের পর রাত—শোনবার লোভে রাজাও নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারলেন না। কেটে চলল দিনের পর দিন—মাসের পরে মাস—যখন মারুফ আর ফতিমায় এসে এই বিশাল কথাসমূহ সমাপ্ত হল, তখন শহরজাদী রাজার তিন সন্তানের জননী। চরিতার্থতায় পরিতৃপ্ত শাহ্‌রিয়ার তাঁকে প্রধানা মহিষীর গৌরবে ভূষিত করলেন, দুনিয়াজাদী হলেন তাঁর অনুজ শাহ্‌জমানের সমাদৃতা বেগম। শাহ্‌রিয়ার এই অসামান্য গল্পসাহিত্যের ভাণ্ডারকে বহুমূল্য গ্রন্থে বন্ধ করে তাঁর রাজকোষের মণি-মাণিক্যের সঙ্গে সঞ্চয় করে রাখলেন।

কথাসাহিত্যের সৃষ্টির অন্তরালে দুটি মৌল-প্রেরণার কথা আমরা পূর্বে নির্দেশ করেছি। একদিকে তার গতিবেগ—যেখানে দিগ্‌দেশ পরিক্রমা করে অর্থ আর সৌভাগ্য আহরণের সাধনা ; আর একদিকে তার সামাজিক স্থিতিশীলতা—যার কেন্দ্রবিন্দু বিচিত্ররূপিণী নারী। রঙ্গে, রূপকথায়, লালসা-বাসনায়, আরব্য উপন্যাসেও এই দুটি মৌলিক সত্যেরই রূপায়ণ।

সিন্দবাদ নাবিকের সমুদ্র-যাত্রার সাতটি সর্বজনবিদিত কাহিনী[২]। এই বহির্মুখী গতি বাসনার অভিব্যক্তি। স্থান সেই বাগদাদ—কাল সেই হারুণ-অল্-রশীদের রাজত্বের যুগ। দরিদ্র শ্রমিক সিন্দবাদকে ধনী বণিক সিন্দবাদ দৈনিক এক হাজার করে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছেন আর একটি করে তাঁর বিচিত্র সমুদ্র-যাত্রার কাহিনী শুনিয়েছেন। এই গল্প পৃথিবীর অন্যতম বহুল-প্রচারিত রূপকথা—সিন্দবাদের সিন্ধুবিজয় একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ক্লাসিক সামগ্রী।[৩]

১। Burton—সূচনা পর্ব।

২। Burton, Vol. VI, P. 4—81.

৩। এ কাহিনীও ভারতবর্ষ থেকেই গেছে। লেনও সে কথা বলেছেন। অধ্যাপক

সত্যের সঙ্গে কল্পনার এমন মেল-বন্ধন বিশ্বসাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি দেখা যায় কিনা সন্দেহ। সমুদ্রের অতিকায় তিমিকে দ্বীপখণ্ড বলে ভ্রম করা হয়তো অসম্ভব নয়, কিন্তু বহু বছর ধরে জলের উপর একটানা ভেসে থাকবার ফলে মাছটির পিঠে গাছপালার পর্যন্ত জন্ম হয়েছে (প্রথম যাত্রা)—এমন কল্পনা আরব্য উপন্যাসের পক্ষেই সম্ভব। সামুদ্রিক অশ্বেরা জল থেকে উঠে এসে মর্ত্যের অশ্বিনীদের সঙ্গে মিলিত হয় এবং কাছাকাছি কোনো রক্ষক না থাকলে তাদের জলের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে—এ তথ্য যত অবৈজ্ঞানিকই হোক, স্থান-মাহাত্ম্যে আমাদের বিশ্বাস করতে ভালোই লাগে। 'রুখ্' (রক) পাখি হাতি ধরে এনে তার শাবকদের খাওয়ায় এবং সেই 'রুখ্' পাখির পায়ে পাগড়ী বেঁধে নির্বিঘ্নে বিশাল সমুদ্র পার হয়ে মণিসমাকীর্ণ অজগর উপত্যকায় পেঁছোনোও বর্ণনার গুণে আমাদের কাছে অতিশয় স্বাভাবিক বলে মনে হয়। সেই সর্পভূমিতে মাণিক লাভের আশায় ভেড়ার মাংস ছুঁড়ে দেওয়া এবং ঈগলের বাসা থেকে মাণিক্য-উদ্ধার, এ যেন অতিশয় বাস্তব ঘটনা (দ্বিতীয় যাত্রা)। গুহাবাসী সেই নরমাংসভোজী দৈত্যের গল্প ইউলিসিসের সামুদ্রিক অভিযানকে মনে করিয়ে দেয়। চতুর্থ যাত্রায় যারা নারকেলের তেল-মেশানো খাবার খাইয়ে অবকাশমতো ভোজনের উদ্দেশ্যে গৃহপালিত পশুর মতো নাবিকদের লালন-পালন করে, তারা অদ্ভুত হয়েও আফ্রিকা এবং ফিজি দ্বীপের নর-খাদকের সঙ্গে সত্য-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট। 'শেখ-অল-বহর' (Shaykh al Bahr) সাগরবৃদ্ধ (পঞ্চম যাত্রা) কল্পনা হয়েও এমন সাহিত্যিক সত্যতা লাভ করেছে যে তাকে আর অবিশ্বাস করা যায় না। ভারতবর্ষ সম্পর্কেও বেশ চমৎকার সংবাদ মেলে সিন্দবাদের প্রথম যাত্রায়ঃ

"They told that they were of various castes, some being called Shakiriya (ক্ষত্রিয় নিশ্চয়?) who are the noblest of their castes and neither oppress nor offer violence to any (!) and others Brahmans, a folk who abstain from wine. but live in delight and solace and merriment (!) and own camels and horse and cattle. Moreover, they told me that people of India are divided into two hundred and seventy two castes, and I marvelled at this with exceeding marvel."[১]

A. Semyonov-এর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে পাইঃ From India came the famous "Book of Sindbad the Sailor", which was also translated in Pehlevi language. During the epoch of the Semanids it was translated from Pehlevi language into modern Tajik."

—Ancient Ties between India and Tajikistan, A. Semyonov.

১। Burton, The First Voyage.

শেষোক্ত তথ্যটি বোধ হয় আজও আমাদের অনুধাবনযোগ্য।

সিন্দবাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্য থেকে দুটি বক্তব্যের সন্ধান মেলে। প্রথম কথা—দুঃখ-বিভীষিকা-মৃত্যু যতই থাকুক, মানুষ কোনোদিনই তাদের কাছে পরাভব স্বীকার করে না; একটি সংকট থেকে ত্রাণ পেয়ে পরক্ষণেই সে আর একটির মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। বিঘ্ন-বিপদকে এমনিভাবে বীরের মতো বরণ করতে পারলেই লক্ষ্মীলাভ হয়—মৃত্যুকে তুচ্ছ করতে জানলে তবেই মানুষ অপরিসীম সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে। আর দ্বিতীয় কথা হল, দৈব। যে কর্মযোগী, এই দৈব প্রতিক্ষণই তার অনুকূল; যে বীরব্রত, তার ললাটে অদৃষ্ট এই কথাই লিখে দিয়েছে যে দুর্ভাগ্যের আক্রমণ যতই করাল হোক—তার থেকে পরিত্রাণ সে পাবেই; লৌকিক বা অলৌকিক কোনো শক্তিই কখনো তাকে বিনষ্ট করতে পারে না।

পুরুষকারের মহিমাকে স্বীকৃতি দিয়েও এই দৈব-নির্ভরতা—এ প্রাচ্য মানসিকতারই বৈশিষ্ট্য। আরব্য উপন্যাসে (সমগ্র প্রাচ্য সাহিত্যেই—'দশ-কুমার' বিশেষভাবে স্মরণীয়) এই মনোধর্ম 'অ্যারাবিস্ট্' এবং 'অরিয়েণ্টা-লিস্ট্'-দের ভালো লাগেনি। কিন্তু প্রাচ্য-সাহিত্যের রসব্যঞ্জনা ইয়োরোপের পণ্ডিতদের রুচিনির্ভর নয়। ঘুঁটে-কুড়ুনির ছেলে যদি হঠাৎ রাজা হয়ে না ওঠে; মারুফ্ যদি চরম সংকটের মুখে জাদুকরা আংটি হাতে পেয়ে সমস্ত আপদ-বিপদের নিরসন ঘটাতে না পারে, তা হলে পূর্ব-পৃথিবীর মানুষ তৃপ্তি পায় না। ইয়োরোপীয় চিন্তায় দৈব গ্রীক-ট্র্যাজিডির সৃষ্টি করে, শৌর্যবীর্য রচনা করে রোমান্স্ আর শিভাল্রির কাহিনী; আর প্রাচ্য-জগতে এই দুইয়ের মিলনে গড়ে ওঠে আরব্য উপন্যাস—দশকুমার চরিত।

কৌতুক এবং নিছক রঙ্গমূলক কথার অভাবও আলিফ্ লয়লায় নেই। 'গোহো'র গল্পগুলি কখনো কখনো মাত্রাতিরিক্ত অশোভন, কিন্তু এই 'গোহো' চরিত্রটি একেবারে গোপালভাঁড়ের স্বশ্রেণীয়। জ্যোতিষশাস্ত্র-বিশারদ ধুরন্ধর নাপিতের পাল্লায় পড়ে উজীরকন্যার উদ্দেশে অভিসারযাত্রী যুবকের হাত-পা ভাঙার কাহিনী প্রহসনের অসামান্য উপকরণ। আবু হোসেনের এক দিনের বাদশাহী প্রবাদে পরিণত হয়েছে। কুব্জ এবং দর্জির গল্প অমর। রোম্যান্টিক স্বপ্নবিলাসের উপর তীব্র আঘাত আছে সেই মৌলবীর গল্পে—যে অচেনা পথিকের দু লাইন গান শুনেই অচিন্ প্রিয়ার প্রেমে পড়েছিল এবং কিছুদিন পরে আবার দু লাইন গান শুনে না-দেখা প্রেয়সীর মৃত্যুশোকে ফকিরের বেশ ধরেছিল।[১] ভারতীয় 'ব্রাহ্মণ শক্তু-কলসকথা' ক্ষৌরকারের পঞ্চম ভ্রাতার গল্পে নবরূপায়ণ লাভ করেছে, কিন্তু বলতে বাধা নেই দিবাস্বপ্ন-বিলাসী অল্-নশ্শর দেবশর্মা ব্রাহ্মণটির চাইতে বহুগুণে সুন্দর ও সরস হয়ে উঠেছে। কাচের বাসন বিক্রী করে অল্-নশ্শর ক্রমে ক্রমে লাখোপতি হবে, তারপর যেন নিতান্ত অনুগ্রহ করেই সে উজীর-এ আজম্-এর কন্যার পাণিগ্রহণ করবে। কিন্তু সে তখন এমন এক ঊর্ধ্বলোকে উঠেছে যে বিয়ের

১। Burton, Vol V, P. 127-28

পরেও সহজে উজীরকন্যাকে পাত্তা দেবে না। তার কল্প-কামনার এই বিবরণটি এতই অসামান্য যে অংশবিশেষ উদ্ধৃতির প্রলোভন দমন করা অসম্ভব। বার্টনের ইংরেজিই তুলে দিচ্ছি—অনুবাদের অনুবাদ করে লাভ নেই ঃ

'As she approaches me I leave her standing between hands and sit, propping my elbow on a round cushions purfled with gold thread, leaning lazily back, and without looking at her in the majesty of my spirit, so that she may deem me indeed a sultan and a mighty man. Then she says to me, "O my lord Allah upon thee, do not refuse to take the cup from the hand of thine handmaid, for verily, I am thy bondswoman." But I do not speak to her and she presses me, saying. "There is no help but thou drink it ;" and she puts it into my lips. Then I shake my fist in her face and kick her with my foot.[১]

সেই পদাঘাতের ফলে কাচের বাসনগুলো মাটিতে আছড়ে পড়ে টুকরো টুকরো, এবং উজীরকন্যা দূরে থাক—সেদিনের রুটির পথও বন্ধ হল। অনুরূপ আরো একটি গল্পও পাওয়া যায় ফকির এবং মাখনের পাত্রে[২]।

কথাসরিৎসাগরে বররুচিপত্নী উপকোশা কী চাতুর্য সহকারে তাঁর চারটি প্রণয়াকাঙ্ক্ষী—রাজসচিব, রাজপুরোহিত, বিচারপতি এবং বণিককে চূড়ান্ত লাঞ্ছনা করেছিলেন, প্রথম লম্বকের চতুর্থ তরঙ্গে তার উপাদেয় বৃত্তান্ত আছে। আরব্য উপন্যাসেও গল্পটি গৃহীত হয়েছে। এর নায়িকা অবশ্য উপকোশার মতো সাধ্বী নয়—সে তার কারারুদ্ধ প্রেমিককে মুক্ত করবার জন্য অনুরূপ কৌশলে কাজী, উজির, ওয়ালী সূত্রধার এবং স্বয়ং সুলতানকে পর্যন্ত কাঠের বাক্সে বন্দী করেছিল।[৩] মূর্খের গর্দভ-হরণের কাহিনী[৪] ছাগবাহী ব্রাহ্মণ ও প্রবঞ্চকদের গল্প থেকেই অনুভাবিত ; কিন্তু আরবের গল্প-কথক এটিকে আরো বিস্তৃত এবং সরস করে তুলেছেন। আরব্য গল্পটির সারাংশ এইরকম ঃ

একটি অতি সরল ব্যক্তি তার গর্দভের গলায় দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে। তাই দেখে কয়েকজন শঠ ঠিক করল, এই গাধাটা তার কাছ থেকে বাটপাড়ি করে নিতে হবে। একজন এসে গাধার গলার দড়িটি খুলে নিলে, অপর এক ধূর্ত সেই দড়ি নিজের গলায় জড়িয়ে লোকটির পেছনে পেছনে

১। Burton, vol I, P. 338

২। Ibid, vol ix, P. 40

৩। Ibid, vol vi, P. 172

৪। Ibid, vol v, p. 83-84

হাঁটতে লাগল। সরল ব্যক্তিটি এক সময় পেছনে তাকিয়ে নিদারুণভাবে চমকে উঠল ঃ তার গাধা কোথায়—এ যে মানুষ! ঠক তাকে বললে, 'চমকে যেয়ো না—আমিই তোমার সেই গর্দভ। আগে আমি মানুষই ছিলাম। কিন্তু মদ খেয়ে একদিন মায়ের গায়ে আমি হাত তুলেছিলাম। সেই পাপে এতদিন গাধা হয়ে কাল কাটিয়েছি—এইবার আমার শাপমুক্তি হয়েছে।' নির্বোধ সেই কথাই বিশ্বাস করল এবং না বুঝতে পেরে গাধারূপী লোকটির উপর এতকাল যে পীড়ন-অত্যাচার সে করেছে, তার জন্য ক্ষমা চেয়ে তাকে বিদায় দিলে।

কিছুকাল পরে আর একটি গাধা কিনতে সে হাটে গেল; গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক জায়গায় চোখে পড়ল, তার সেই পুরোনো গাধাটিই আবার দড়ি পরে সেখানে বিক্রীর জন্য এসেছে। দেখেই সে আঁতকে উঠে বললে, 'কী সর্বনাশ, এতদিন এত দুর্ভোগ সয়েও তোমার শিক্ষা হয়নি—আবার তুমি মদ খেয়ে মায়ের গায়ে হাত তুলে গাধা হয়ে গেছ? কিন্তু দোহাই ঈশ্বরের—আর আমি তোমাকে কিনতে যাচ্ছি না।'

এই সব রসগল্পের ফাঁকে ফাঁকে আছে নারী-চরিত্রের লীলাপ্রসঙ্গ। নাপিতের স্থূল মস্তিষ্ক এবং বিকলাঙ্গ দ্বিতীয় ভ্রাতাটিকে নিয়ে বৃদ্ধা দূতী, উজীরের লীলাচটুলা নন্দিনী আর তার সহচরীরা যে মারাত্মক 'practical joke'-এর অনুষ্ঠান করেছিল, তা রুচি ও শালীনতার সমস্ত মাত্রা উল্লঙ্ঘন করলেও আরব্য উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্যের অনুপূরক। জনৈক দরিদ্র বণিকের প্রেমে পড়েছিল খলিফা হারুন-অল্-রশীদের মহিষী জুবেদার জনৈকা সহচরী; অনেক দুঃসাহসিক কীর্তিকলাপের পরে দুজনের বিবাহও হল—কিন্তু গল্পটি সেখানেই শেষ হল না; বাসর-রাত্রে বিশেষ ধরণের মাংসের ঝোল (Cumin-ragout containing chicken's breasts) খেয়ে হতভাগ্য বণিক হাত ধুতে ভুলে গিয়েছিল বলে কুপিতা স্ত্রী তার হাত-পায়ের বুড়ো আঙুল কেটে তাকে শাস্তি দিলে—রাজসখীর সূক্ষ্ম রুচির মূল্য যে স্বামীর আঙুলের চাইতেও অনেক বেশি—সেটাই প্রমাণিত হল গল্পে।

নারী-চরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তা, তার ছলনা-প্রবঞ্চনার কাহিনী, "Ladies' love brutes"—এই সমস্ত সত্যের উপস্থাপনা আরব্য উপন্যাসের অগণিত গল্পে রয়েছে। উপক্রমণিকায় যার সূত্র, একের পর এক গল্পে তার ভাষ্যপ্রয়োগ। পাঠক মাত্রেরই সে-সব গল্প সুপরিচিত। রাজপুত্রকে মন্ত্রবলে পাথর করে যে ডাকিনী স্ত্রী কুষ্ঠরোগগ্রস্ত কুৎসিততম কাফ্রীর সেবা করত—তার সেই একটি গল্পেই নারী-সম্পর্কিত মনোভঙ্গির চরম রূপ পাওয়া যাবে।[১] নারী সম্বন্ধে চূড়ান্ত অশ্রদ্ধেয় উক্তি রামায়ণ থেকে মনু-বিষ্ণুশর্মা সর্বত্র বিদ্যমান—ইস্‌লাম বলেছে, 'স্ত্রীলোকের আত্মা নেই।' এই সব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

১। বিকলাঙ্গ পুরুষ এবং কুষ্ঠরোগীর প্রতি নারীর কুটিল আকর্ষণের একাধিক গল্প 'পঞ্চতন্ত্র' 'কথাসরিৎসাগরে'ও আছে।

এমন সমস্ত গল্প আরব্য উপন্যাসে আছে—রুচির দিক থেকে যাদের পুনর্বর্ণনা দুঃসাধ্য। এ সেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের আদিম সংশয় এবং ঘৃণারই অভিব্যক্তি।

আরব্য উপন্যাসে নারীকে নিয়ে কল্পনার ইন্দ্রধনু রচনা হয়েছে—কখনো কখনো পুরুষ-চরিত্রের চাইতে তারা অনেক বেশি সমুজ্জ্বল এবং প্রাণদীপ্ত। যাদুপুরীর রহস্যলোক থেকে মায়ার অবগুণ্ঠন টেনে তারা বেরিয়ে এসেছে, অতীন্দ্রিয় জগতের অন্ধকার পথে সোনার প্রদীপ হাতে তারা অগ্রচারিণী, তাদের সব সময়ে যেন বাস্তবে স্পর্শও করা যায় না। আরব কবির কল্পনায় এই নারী কখনো সন্ধ্যার মেঘমায়ায় অপরূপ—আবার কখনো বা বীভৎসতম পাপের প্রতিমূর্তি। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দুঃসহ ঘৃণা তাদের নিয়ে মধ্যে মধ্যে অবিশ্বাস্য বিভীষিকা রচনা করেছে; তারা ডাকিনীতন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে কখনো পিশাচের সঙ্গে শবদেহ আহার করে—কখনো মন্ত্রবলে স্বামী বা প্রেমিককে জন্তু-জানোয়ারে রূপান্তরিত করে—কখনো সমস্ত নীতিবোধকে বিকট ব্যঙ্গে বাতাসে উড়িয়ে দেয়।

ভারতীয়দের মতোই চিন্তাধারায় নারী সম্পর্কে দুটি পরস্পরবিরোধী স্রোত এসে মিশেছে আরব-সাহিত্যে। একদিকে সমুচ্চ ভাষায় স্তবস্তুতি, অন্যদিকে সমুদ্যত ধিক্কার; কখনো মুগ্ধ কবির দৃষ্টিতে সে ধ্যানসমুদ্র-সম্ভবা উর্বশী, কখনো বা 'নরকস্য দ্বারো'। শিল্পী তার বন্দনা রচনা করেন, ভ্রূকুটি-কুটিল প্রবীণ মৌলভী তারস্বরে আর্তনাদ করেন: 'সর্বনাশ—ওখানে সাক্ষাৎ মৃত্যু!'

"A Hadis attributed to Mohammed runs, They (women) lack wit and faith. When Eve was created, Satan rejoiced saying :—'Thou art half of my host, the trustee of my secret and my shaft wherewith I shoot and miss not!' Another tells us, 'I stood at the gate of heaven, and lo! most of its inmates were women'!" (Burton, vol x, Terminal Essays, p. 193)

আরব্য উপন্যাসের গল্পের পর গল্পে এই দ্বি-ধারার মিলন।

ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেছেন, আরব্য উপন্যাসে প্রেম নেই, কেবল লালসারই উচ্ছলতা বিদ্যমান। দেহাতিগ রাগরঞ্জন নেই—আছে স্থূল জৈব-বাসনার হিংস্র উল্লাস। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই সিদ্ধান্তের অনেকটাই অন্যায় অপবাদ। এ-কথা ঠিক যে আরব্য উপন্যাসে দেহলীলার বিবরণ কখনো কখনো অতিমাত্রায় নগ্ন, স্থানে-অস্থানে অকারণেই লালসাকে উত্তেজিত করা হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর কোন্ দেশের মধ্যযুগের সাহিত্য এ থেকে মুক্ত? প্রাচীন ক্লাসিকের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, আধুনিক ইয়োরোপীয় গল্পসাহিত্যের স্রষ্টা বোকাচ্চোর এমন রচনা আছে, যা বিকৃততম রুচিহীনতার নিদর্শন—অথচ বোকাচ্চোর গৌরব তাতে ক্ষুণ্ণ

হয়নি। র‍্যাব্‌ল্যা (Rabelais)-কে ফরাসী গদ্যের জনক বলা হয়—কিন্তু তিন-চারশো বছর ধরে তাঁকে কেন "Shelved" করে রাখা হয়েছিল? (এখন অবশ্য সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত চলেছে।) দেহ-সম্পর্কিত সুরুচিবোধ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই গড়ে উঠেছে। ইংরেজি সাহিত্যের আদিপুরুষ জিওফ্রে চসার থেকেও ন্যক্কারজনক উদ্ধৃতি আহরণ করা সম্ভব—রেস্টোরেশন যুগের সেডলি-উইচালী-কনগ্রেভের রুচিপ্রসঙ্গে যে কোনো ইংরেজ মাথা নত করবেন। এমন কি সেদিনও 'হিউমান কমেডি'র রচয়িতা বিশ্ববিখ্যাত বাল্‌জাক্‌ অকম্পিত লেখনীতে "Droll Stories" রচনা করে গেছেন।

আরো স্মরণীয় যে আরব্য উপন্যাস মাত্র গল্প-সংগ্রহই নয়। এ একাধারে আনন্দ ও শিক্ষার পূর্ণপাত্র; এতে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্বর্গে'রই সম্যক্‌ আরাধনা করা হয়েছে, কোনোটিই উপেক্ষিত হয়নি। প্রাচ্য-মানুষ যে কেবল বাসনা-পরবশ, তার যে চিত্তসংযম নেই—এই নিন্দার জবাবে আরব্য-কাহিনীর 'ঘনিম-বিন-আয়ুবের' গল্পটিই স্মরণ করা যেতে পারে। কুত্‌-অল্‌-কুলুবকে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করল ঘনিম—দুজনে গভীর-ভাবে পরস্পরের প্রতি আসক্ত হল। কিন্তু খলিফার প্রতি আনুগত্যে নিজের সমস্ত বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে ঘনিম, কুত্‌-অল্‌-কুলুবেরও চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে—তবু যন্ত্রণায় জর্জরিত ঘনিম যে অবিশ্বাস্য আত্মসংযমের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে—তা একমাত্র ঋষি-তপস্বীরই যোগ্য, তা ভারতীয় 'অসিধারা ব্রত'কে স্মরণ করিয়ে দেয়[১]। ভোগের উদ্দামতা এবং ত্যাগের বিশালতা, প্রাচ্য-চরিত্রে এই দুইয়েরই অসামান্য নিদর্শন মেলে—তাই কথাসরিৎসাগর এবং পঞ্চ-তন্ত্রের রাজা পরপত্নী উন্মাদিনীর রূপলালসায় দগ্ধ হতে হতে দেহত্যাগ করেন কিন্তু সমস্ত সুযোগ সত্ত্বেও ধর্মভ্রষ্ট হন না।

কাহিনী-বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে প্রাচ্যরীতিসুলভ নীতিশ্লোকের বিন্যাসও আরব্য উপন্যাসে আছে। তাদের দু'একটি অনুবাদ করে দেওয়া যাক।

গোপন কথাপ্রসঙ্গে:

> "গোপন কথা লুকিয়ে রেখো শুধুই নিজের তরে
> গোপন কি আর রয় সে-গোপন বললে পরের কানে?
> লুকিয়ে তুমি নিজেই যেটা রাখতে পারো নাকো
> কেমন করে ভরসা করো রাখবে সেটা পরে?"[২]

লোকচরিত্র সম্পর্কে:

> "ধনী সে যে রসাল-তরু—তার-ই পদতলে
> ফল কুড়োতে দলে দলে মানুষ এসে জোটে,
> ফলগুলি যেই ফুরিয়ে গেল, পাত্তাটি নেই কারো:
> অন্য কোনো তরুর খোঁজে অমনি তারা চলে।"।[৩]

১। Burton, Vol II, P. 45
২। Burton, Vol I, P. 87
৩। Lane, Vol I, P. 400

নীতিশ্লোক ছাড়াও আরব্য উপন্যাসের সৌন্দর্য ইতস্তত পরিকীর্ণ সুপ্রচুর গীতিকবিতায়। বস্তুত খ্রীষ্টীয় দশম থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত আরব জগতের প্রেম-কবিতা এবং সঙ্গীতের এমন মূল্যবান সুনির্বাচিত সংকলন অন্যত্র দুর্লভ। প্রচুর কামগীতি সত্ত্বেও এদের অনেকগুলিই আন্তরিকতায় এবং কবি-কল্পনার সৌন্দর্যে আধুনিক কালেও সমাদর লাভের যোগ্য। আগেই বলেছি, আরব কবিদের কল্পনায় নারী এক বিচিত্র ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কখনো সে দাসী, কখনো রাজরাজেশ্বরী; কখনো পিশাচিনী—কখনো দেবী। তাই আরব্য রাত্রির গল্পে নারীকে যত কুৎসিত করেই দেখানো হোক, গানে তার মহিমময়ী রূপকেই অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ইয়োরোপে মুর সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আরব্য সঙ্গীতের প্রভাব অনিবার্য ভাবেই ছড়িয়ে পড়ে এবং ত্রুবাদুর প্রেম-গীতিকার উপর প্রাচ্য-পৃথিবীর এই আবেগস্পন্দিত গীতিমালা এক নতুন প্রাণশক্তির সঞ্চার করে।[১] আরব্য উপন্যাসের পাতা থেকে এই সঙ্গীতের একটির অনুবাদ করে দিচ্ছি। আমার অনুবাদ দুর্বল এবং সে-ও ইংরেজি অবলম্বনে; মূলের সৌন্দর্য এতে সামান্যই পাওয়া যাবে, তবে এ থেকে আরব্য উপন্যাসের সঙ্গীত-রত্ন ভাণ্ডারের কিছু আভাস হয়তো মিলতে পারে ঃ

"চাঁদের মতন উদয় তাহার উদ্ভাসি' সারা নিশি
কুঞ্জবীথির শিরে শিরে তার রাতুল চরণ পড়ে ;
তারি' রূপালোকে সূর্য-কিরণ লভে নব-দীপায়ন
গুণ্ঠনহীন তার মুখছবি কৌমুদী ম্লান করে।
শতগুণ্ঠন সে মাধুরী হেরি' বিমুগ্ধ সংসার
লুটায় প্রণামে তারি দুটি কম-কর-পল্লবতলে,
তারি নয়নের অশ্রু-কণিকা ঝরে বাদলের মেঘে
চকিত-চপল কটাক্ষ তার বিজলী-শিখায় জ্বলে।"[২]

'উতাইয়া' নামে কোনো অজ্ঞাত কবির রচনা থেকে গানটি সংগ্রহ করেছেন গল্পকার। কিন্তু এই গানটির দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে—আরব্য উপন্যাসের লেখক নিছক 'Carnalist'-ই নন। নারীর এই রূপবর্ণনা, বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মী উর্বশীর এই অপরূপ ধ্যানচিত্র—এই আশ্চর্য

১। "The Provencial poetry, indeed, derives its origin from the Arabs, and drew constant inspiration from the Moorish Conquerors of Spain. Mysticism and delicacy of sentiment have in the poetry of troubadours an intimate relation whith Eastern poetry and mode of thought."—Early Italian Literature, E. Grillo, Vol. I, P. 16

২। Burton, Vol I, P. 11

উপলব্ধি— এ কি মাত্র লালসা থেকেই আসে? এ শুধু দেহজ-বাসনার পরিপোষকই নয়, এর গৌরব স্বতন্ত্র—এর মহিমা আধুনিক লিরিকের সম্ভাবনায়।

উপকরণ ভারতবর্ষের—উপচার সংগ্রহ পারস্য থেকে। 'পঞ্চতন্ত্র' 'কথা সরিৎসাগর', 'হাজার আফসান'—আরো কত জায়গায় যে এর ঋণ, সে কথা কেউ বলতে পারে না। শহরজাদীর বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে আরব্য রজনীর কথাকার তো স্পষ্টই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনি বহু উৎস থেকে তাঁর কাহিনী-সম্ভার আহরণ করেছেন। তা সত্ত্বেও, লেন ঠিকই বলেছেন, এ গল্প আরব জাতির সম্পূর্ণ নিজস্ব সামগ্রী—তারই জীবনের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি। খলিফার অন্তঃপুর থেকে দীনদরিদ্রের পর্ণকুটীরের রূপটি পর্যন্ত গল্প-কল্পনার ফাঁকে ফাঁকে সুতীক্ষ্ম বাস্তবতায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই মরুচারী মানব গোষ্ঠীর যে-কোনো সামাজিক ইতিহাসের চাইতেই এই বইটি অনেক বেশি মূল্যবান। তাই এই মহৎ বিশাল সাহিত্য সম্বন্ধে পি. এইচ. নিওবী বলেছেন ঃ

"The kind of life thus recorded has largely passed away and that within the past hundred years, but the deeper reality of which the tales treat, the temperament of the people, is unchanged and there is no better chart in existence of its deep and shallows."

আর এই আরব-রাত্রির কাহিনীই ভবিষ্যৎ-কালের উপন্যাস ও ছোটগল্পের ভিত্তি অনেকখানি রচনা করে দিয়েছে। ভল্‌ত্যারের 'জাদিগ', বোক্কাচ্চোর 'দেকামেরন', চসারের 'ক্যান্টারবেরি টেল্‌স্', অ্যাডিসনের 'দি ভিসন অফ্ মীর্জা' আর জনসনের 'আল্ নশ্‌কর' সর্বত্রই আরব্য রজনীর মোহকজ্জল বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

আরব্য উপন্যাসের পাশাপাশি 'Persian Tales' বা পারস্য উপন্যাসের কথা মনে আসে। একই হাজার আফসান থেকে উৎসারিত হলেও পারস্যের সংকলনটি আরব্য উপন্যাসের পরবর্তী এবং গল্পগুলিকে অভিনিবেশ সহকারে পড়লেই মনে হবে এগুলি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে এ-ভাবে গ্রথিত হয়নি। উপরন্তু আরো লক্ষণীয়, এ যেন আরব্য উপন্যাসের জবাব হিসেবেই সংকলিত। আরবের কাহিনীতে নারী-বিদ্বেষী পুরুষের মনকে সতীসাধ্বীর মহিমা দ্বারা বশীভূত করা হয়েছে আর পারস্যের গল্পে পুরুষবিমুখিনী রাজকন্যা পরিশেষে পুরুষের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন।

'পারস্য উপন্যাস'

শাহরিয়ারের মতোই এ-সব গল্পের শ্রোত্রী হচ্ছেন কাশ্মীরের রাজনন্দিনী ফরোখনাজ। ফরোখনাজ ছিলেন অসামান্যা রূপবতী এবং পুরুষের মতো শক্তিশালিনী। প্রতি সপ্তাহে তিনি সখিদল পরিবৃতা হয়ে অশ্বারোহণে মৃগয়ায় যেতেন। তাঁর অলৌকিক সৌন্দর্য দেখবার জন্যে পথে লোকের

এতই ভিড় হত যে রক্ষীরা অস্ত্রপ্রয়োগ করে জনতা নিয়ন্ত্রণ করত এবং তাতে বহু মানুষের প্রাণ যেত। অতএব সুলতান বাধ্য হয়ে কন্যার এই মারাত্মক মৃগয়া-লীলা বন্ধ করে দিলেন। ফলে ফরোখনাজ সমস্ত পুরুষজাতির উপরেই ক্রুদ্ধা হয়ে উঠলেন। এর মধ্যে একদিন আবার বিচিত্র একটি স্বপ্নও দেখলেন তিনি। যেন কোনো মৃগ ব্যাধের জালে বন্দী হয়েছে আর মৃগী তাকে প্রাণপণে মুক্ত করতে চাইছে। শেষে হরিণ মুক্তি পেল বটে কিন্তু হরিণী জালে জড়িয়ে পড়ল। অথচ হরিণীকে তখন উদ্ধার করা দূরে থাক —হরিণ উর্ধ্বশ্বাসে নিজের প্রাণ নিয়ে পলায়ন করল।

ফরোখনাজের মনে হল, এ স্বপ্ন আর কিছু নয়—পুরুষ-চরিত্রেরই প্রতীক। পুরুষ মাত্রেই এমনি হীন এবং স্বার্থপর। নিদ্রাভঙ্গে সেইদিনই তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন জীবনে কিছুতেই অধম পুরুষের পাণিগ্রহণ করবেন না।[১]

ইতোমধ্যে হিরাটের রাজা তাঁর সর্বগুণান্বিত পুত্রের জন্য ফরোখনাজকে প্রার্থনা করে বিবাহ-সম্বন্ধ উপস্থিত করলেন। কিন্তু কাশ্মীর-রাজকন্যা কিছুতে বিবাহে সম্মতা নন। তখন রাজার অনুজ্ঞায় ধাত্রী তাঁকে পুরুষের মহান প্রেম, আত্মত্যাগ, শৌর্যবীর্য ইত্যাদির গল্প শোনাতে লাগলেন। এই গল্পগুলি **Persian Tales**—পারস্য উপন্যাস। গল্পের শেষে এক ধর্ম-যাজকের উপদেশে এবং নিজের স্বপ্নের বিপরীত একটি চিত্রদর্শনে, ফরোখনাজের মতি পরিবর্তিত হল, তিনি বিবাহের বন্ধন স্বীকার করলেন।

গল্পগুলি আরব্য উপন্যাসের অনুরূপ এবং তুলনায় দুর্বল। বররুচিপত্নী উপকোশার গল্প আরব্য উপন্যাসের মতো পারস্য উপন্যাসেও রূপান্তরিত হয়েছে এবং উপকোশা হয়েছেন দামাস্কাসের বানু সওদাগরের পত্নী আরোয়া। ভারতীয় গল্পটির সঙ্গে আরবী গল্পের চাইতে ফার্সী গল্পটির সাদৃশ্য অনেক বেশি। তাই হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ পারস্যের পথ দিয়েই ভারতের গল্প আরবে গিয়ে পৌঁছেছিল।

পারস্য উপন্যাসের আর একটি গল্প বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। পঞ্চতন্ত্রের যে কৌলিক বিষ্ণুর ছদ্মবেশ ধরে রাজকন্য সুদর্শনার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, তারই অভিনব রূপান্তর মালেক ও সেরেনার কাহিনী। এখানে গরুড় যন্ত্রের পরিবর্তে মালেক ব্যবহার করেছে মন্ত্রপূত সিন্দুক এবং বিষ্ণুর

১। বার্টনের আরব্য উপন্যাসে 'আর্দাশির এবং হায়াৎ-অল-নুফাস'এর গল্পে অনুরূপ একটি স্বপ্নকাহিনী আছে।

'Presently, the pigeon fell into the net and struggled to get free; whereupon all the other birds flew away, and her mate, whom she had saved, fled with the rest and did not return to her." পরে শিকারীর হাতে কপোতী প্রাণ হারায় এবং হায়াৎ-অল-নুফাস পুরুষের প্রতি ঘৃণায় কুমারীব্রত গ্রহণ করেন।—Alf-Laylah, Vol VII, Page 226

পরিবর্তে সে নিয়েছে সাক্ষাৎ মহম্মদের ভূমিকা। হিন্দু সাহিত্যে দেব-দেবী নিয়ে রসিকতার অন্ত নেই, পুরাণের দেবতা-প্রসঙ্গ বহু জায়গাতেই শোভনতার সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করেছে—সুতরাং পঞ্চতন্ত্রের গল্পটি সেদিক থেকে গঙ্গাজলের মতোই পবিত্র। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে—বিশেষত হজরত সম্পর্কে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং গম্ভীর-চরিত্র মুসলমান অকম্পিত লেখনীতে গল্পটি কী করে লিখে গেলেন তা ভাবতেই বিস্ময় লাগে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত হিন্দু বিষ্ণু ভন্ড কৌলিককে ত্রাণ করেছিলেন—কিন্তু মুসলমান লেখক প্রবঞ্চককে নিষ্কৃতি দেননি—ঈশ্বরের ক্রোধ জ্বলন্ত অগ্নিরূপে তার অপরাধের সমুচিত দণ্ড দিয়েছে।

শিল্প হিসাবে পারস্য উপন্যাস আরব্য উপন্যাসের দীপ্তিতে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে; তবে তা থেকেও অলস গল্প কল্পনার আনন্দ নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যায়। আর এ ধরণের আনন্দ কোনোদিনই পুরোনো হয়ে যায় না।

কিন্তু প্রাচ্য পৃথিবীর গল্প বলা এইবার ফুরিয়ে গেল।

ভারতবর্ষের ভূমিকা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, আরব শক্তির দিগ্বিজয়ী ইতিহাসও ক্রমে ম্লান হয়ে এল ক্রীশ্চান শক্তির রুদ্ধ পুনরভ্যুদয়ে। স্পেন ও পর্তুগালের মিলিত আক্রমণে কিউটার দুর্গে ইস্‌লামী মহিমার শেষ চূড়োটি ভেঙে পড়ল ইয়োরোপে। সমুদ্রের বন্ধুর পথ বেয়ে বিশ্বজয়ে বেরুল ইয়োরোপ। ধীরে ধীরে এশিয়ার আলো নিবতে আরম্ভ করল।

প্রথমে বাণিজ্যিক অধিকার—তারপরে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা। নির্মম ভাবে লুণ্ঠন শুরু হল প্রাচ্যের উপর। জাহাজের খোলে ভর্তি হয়ে রওনা হল সোনা এবং ক্রীতদাস। 'স্কাল অ্যাণ্ড ক্রস্‌বোন্‌সে'র কৃষ্ণপতাকা জাহাজে উড়িয়ে জলদস্যুর উন্মাদ তাণ্ডব প্রাচ্য-বণিকের শেষ বহর ডুবিয়ে দিলে সমুদ্রে।

প্রাচী পৃথিবীর ব্যবসায়-বাণিজ্য চলে গেল প্রতীচ্যের হাতে। পূর্বদেশ হয়ে দাঁড়াল পাশ্চাত্ত্যের কাঁচা মাল সরবরাহের ঘাঁটি মাত্র। শিল্পবিপ্লব হল ইয়োরোপে। যন্ত্রের যুগ এল। 'রূঢ়' অঞ্চলের যে বিশাল ভূখণ্ডে প্রুশীয় রণোন্মাদ সামন্তেরা একদিন রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে—নতুন কলকারখানা দেখা দিল সেখানে। ভারতবর্ষের 'আগারিয়া' যখন বিধাতাকে অভিসম্পাত দিতে দিতে তার লোহা ঢালাইয়ের কাজ ফেলে গ্রামে গ্রামে মুখ লুকোলো, মস্‌লিনের শিল্পী শূন্য তাঁতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে অনভ্যস্ত হাতে যখন হালের বলদ জুড়তে লাগল, তখন লোহার ঝঙ্কার উঠল শেফিল্ডে, নতুন যুগের ভ্রমর-ধ্বনিতে গুঞ্জরিত হল ম্যাঞ্চেস-টারের স্পিনিং জেনী। ইতিহাসের নেতৃত্ব নিল ইয়োরোপ। অলিম্পাসপতি জুপিটারকে সরিয়ে দিয়ে কাল-দেবতা ভালকান্ বসলেন সিংহাসনে।

যন্ত্রের আবির্ভাবে দ্রুত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে লাগল। রাজা-প্রজার বদলে এল ধনিক-শ্রমিক—মাঝখানে মাথা তুলল বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত। সাহিত্যের উপর এতকাল গল্পের দাবি ছিল অগ্রগণ্য—এবার সেইখানে এল জীবনের দাবি। আগে বাস্তবকে ভোলবার

জন্যেই ছিল গল্পের উল্লাস, এখন এল বাস্তবকে আরো বেশি উদ্‌ঘাটিত করবার প্রয়োজন। নতুন যন্ত্রযুগের সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপে নতুন সাহিত্যের কমল দিকে দিকে তার শতপর্ণ বিস্তার করে দিল। সুতরাং এইবার গল্প শোনার পালা ইয়োরোপের কাছ থেকে।

প্রাচী পৃথিবী কি আর গল্প লেখেনি ?

ভারতবর্ষ কালিদাসের নামে উপহার দিয়েছে অর্বাচীন 'দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা'—যার মূল্য অতি সামান্য ; আর দিয়েছে বল্লাল সেনের বিরচিত 'ভোজ-প্রবন্ধ'—তাতে রাজা ভোজের দানশীলতার উন্মত্ত অতিশয়োক্তি পাওয়া যায়। তারপর ধর্মসাহিত্যের চর্চা করেছে। আরবে পারস্যে 'সহস্রাধিক এক রাত্রি'র জের টেনে লেখা হয়েছে হাতেমতাই, লয়লা মজনুন, গোলে বকাওলি, চাহার দরবেশ কিংবা শিরী ফরহাদ। জাপান তখনও জাগেনি ; আর "নিষিদ্ধ স্বর্গভূমি" চীনের মহাপ্রাচীরের অন্তরালে জাতকের গল্প লোককথা রূপকথার রঙিন ফানুস উড়ছে তখনও।

তাই আধুনিক ছোটগল্পের বন্দরে পৌঁছুবার জন্য এইবার আমাদের যাত্রা করতে হল ইয়োরোপে।

চার

ইয়োরোপ : অরোরার আলো

সিথেরার সমুদ্রের ওপর সেদিন আশ্চর্য এক সূর্যোদয় হল।

সূর্যের সাতটি রং যেন বিভক্ত হয়ে আকাশে রচনা করল এক অপূর্ব চন্দ্রাতপ, নীলিমায় লাগল ইন্দ্রনীল মণির দ্যুতি, একটা উন্মত্ত আবেগে সমুদ্র চঞ্চল আর মাতাল হয়ে উঠল। তরঙ্গে তরঙ্গে ফেটে পড়তে লাগল উচ্ছ্বসিত ফেনা—আকাশ, সমুদ্র, সাইপ্রাস দ্বীপের মর্মরিত বনভূমি কী এক সম্ভাবনার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

অকস্মাৎ কোন্ এক দেবতার রক্তধারায় সমুদ্র রাঙা হয়ে গেল আর সেই রক্তফেনপুঞ্জের মধ্যে আবির্ভূত হল শতদলের মতো বিচিত্রবর্ণ শুক্তি। সেই শুক্তির উপরে দাঁড়িয়ে কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি এক নারী—জন্ম-মুহূর্তেই পূর্ণবিকশিতা, স্ফুটযৌবনা। প্রভাতের কিরণচ্ছটাকে ম্লান করে দিয়েছে তার দেহের দীপ্তি—সমুদ্র বাতাসে বাতাসে চঞ্চল আলুলায়িত স্বর্ণকেশ নেমে এসেছে কেশরী-প্রতিম কটিদেশে, চরণে তরঙ্গের ফেনিলাঞ্জলি নিতে নিতে শুক্তিতে সে ভেসে চলেছে সাইপ্রাসের প্রত্যাশী তটভূমির দিকে। তার শ্রীঅঙ্গ থেকে স্খলিত জলবিন্দু শুক্তির উপর ঝরে ঝরে মুক্তায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে।

বিহ্বল, নির্বাক, রূপমুগ্ধ পৃথিবীর চোখের সামনে শুক্তি এসে লাগল সাইপ্রাসের তটে। সময়েরা সেই নারীকে অভ্যর্থনা করল, দেবনারীরা তার

নগ্নতা আবৃত করল বিচিত্র আচ্ছাদনে—তারপর কণ্ঠে দুলিয়ে দিলে স্বর্ণ-হার, মাথায় পরালো মুকুট, চতুর্দিকের আকুলিত দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে মরাল-চরণে সে চলে গেল দেবভূমি অলিম্পাসে।

এমনি ভাবেই জন্ম নিলেন পৃথিবীর রূপের রাণী—সিথেরিয়া সাইপ্রিনাঃ আফ্রোদিতে। 'আফ্রোদিতে'—অর্থাৎ 'ফেনোদ্ভবা'। সেই অপূর্ব জন্মক্ষণটিকে বতিচেল্লির তুলিকা অমর করে রেখেছে—ফ্লোরেন্সের উফিজি গ্যালারীতে আজও তা প্রতিটি সৌন্দর্য-প্রেমিকের পরম আকর্ষণ।

আফ্রোদিতের এই অপূর্ব আবির্ভাবের আলোকে গ্রেকো-রোমান গল্প-সাহিত্য সমুজ্জ্বল। সৌন্দর্যের ব্যঞ্জনায়—রোমান্সের মাদকতায়। ইয়োরোপীয় কথাসাহিত্যের সূত্রপাতে এই রোমান্সের অরোরা-দীপ্তি।

ভারতবর্ষের জাতক বা পঞ্চতন্ত্র যেন সাংসারিকতায়, অভিজ্ঞতায় ও বিচিত্র প্রজ্ঞায় অতি-প্রয়োজনীয়তার শিল্পায়ন। পরবর্তী কালে, অর্থাৎ বৃহৎ কথা আর দশকুমারে রোমান্সের পালা শুরু হয়েছে বটে, তা সত্ত্বেও গ্রেকো-রোমান কাহিনীর রস এবং রূপ আলাদা। মানব, প্রকৃতি এবং দেবলোকের এক ত্রিবেণী এই গল্পগুলিতে রচিত হয়েছে।

গোষ্ঠীগত আদিম একতার সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে কোথাও কোথাও গ্রীক-রোমক কাহিনীর আত্মীয়তা অনুভব করা যায়। টাইটান এবং দেবজন্মের কাহিনীতে কৃষ্ণ ও কংসকথা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে বলে আমার মনে হয়। গল্পটি এই কারণেই লক্ষ্য করবার মতো।

অতিমানব টাইটান-গোষ্ঠীর শেষ রাজা ছিলেন ক্রোনাস (**Cronus**)। প্রজার প্রয়োজনে, তাঁরই আদেশে অন্যতম টাইটান প্রমিথিয়ুস নিজের ক্ষুদ্র সংক্ষিপ্ত প্রতিচ্ছায়ারূপে মানবজাতির সৃষ্টি করলেন, ক্রোনাস প্রাণসঞ্চার করলেন প্রমিথিয়ুসের সেই পুতুলগুলিতে। পৃথিবীতে আবির্ভূত হল প্রথম মানুষ—এল "স্বর্ণযুগ"—**The Golden Age**।

পরম সুখে প্রজাপালন করতে করতে একদা ক্রোনাস্ পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন অপূর্ব সুন্দরী রিয়া (**Rhea**)-কে। রিয়ার যখন প্রথম সন্তান জন্ম নিল তখন ক্রোনাসের মনে পড়ল এক ভয়ঙ্কর দৈববাণী। তাঁর যদি কখনো সন্তান-সন্ততির জন্ম হয়, তা হলে তাদেরই কোনো একজন তাঁর চাইতেও শক্তিমান হয়ে উঠে ভবিষ্যতে তাঁকেই রাজ্যচ্যুত করবে।

ভয়ে ক্রোনাস্ নিজের পুত্রটিকে গিলে ফেললেন। দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম—সকলেরই ঘটল এক পরিণতি। ষষ্ঠ সন্তানের জন্মের পর গোপনে রিয়া তাকে ক্রীট দ্বীপে রেখে এলেন, তারপর একখণ্ড পাথরকে কাপড়ে জড়িয়ে নবজাত শিশুর মতো নিজের বুকে আঁকড়ে রাখলেন। ক্রোনাস এসে সেটিকেও কেড়ে নিয়ে কাপড় শুদ্ধই গলাধঃকরণ করলেন এবং ছলনাকে আরো সুনিশ্চিত করবার জন্যে তারস্বরে কাঁদতে বসলেন রিয়া॥

ক্রোনাস্ এবার নিশ্চিন্তে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন—আর ক্রীট্ দ্বীপে গোকুলে বাড়তে লাগলেন তাঁর সেই ষষ্ঠ সন্তান জিউস্ বা জুপিটার।

অরণ্য-পরীরা তাঁকে লালন করে চললেন—দুগ্ধদানে তাঁকে তাঁর প্রাণরক্ষা করল ছাগী আল্‌থিয়া বা আমাল্‌থিয়া (Amalthea)।

তারপর ঘটনাক্রমে ক্রোনাস একদা বেড়াতে বেড়াতে গেলেন ক্রীটে। তরুণ জুপিটারকে দেখেই তিনি নিজের পুত্র বলে চিনতে পারলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যার সংকল্প করলেন। কিন্তু জুপিটার ছিলেন বাপের চাইতেও চতুর। নিদারুণ ধূর্ততায় আপ্যায়নের ছলে মাদক পান করিয়ে পিতাকে সংজ্ঞাহীন করলেন এবং ক্রোনাসের বমনের মধ্য দিয়ে একে একে তাঁর ভ্রাতা-ভগ্নীরা বেরিয়ে এল। ভাই-বোনদের নিয়ে অবিলম্বে জুপিটার অলিম্পাস পর্বতে পালিয়ে গেলেন। এর পরের অধ্যায় দীর্ঘ—টাইটান ও দেবতার যুদ্ধকাহিনী, টাইটান-গোষ্ঠীর চির-পরাজয়—অলিম্পাস পর্বতের শিখরে জুপিটারের নেতৃত্বে দেবরাজত্বের প্রতিষ্ঠা।

গল্পটির শেষাংশ যাই হোক—প্রথম দিকের আখ্যানের সঙ্গে 'কৃষ্ণ-কংস কাহিনীর' সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। ক্রোনাস এবং কংসের নামগত নৈকট্য ছাড়াও দৈববাণীর ফলে পুত্র গ্রাস,দেবকীর কারাবাসই স্মরণ করায়; গোকুলে গোদুগ্ধে বর্ধিত কৃষ্ণ আর ক্রীটে ছাগদুগ্ধ-লালিত জিউস্‌ অত্যন্ত নিকট-সন্নিহিত।

রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণে গ্রীক লিজেণ্ডের অনুরূপ ধরণের গল্পকথা রয়েছে। সেসব গল্পে কাহিনী-রস আছে, বৈচিত্র্য আছে—তার সঙ্গে তত্ত্ব এবং নীতি-উপদেশও আছে। কিন্তু গ্রেকো-রোমান্‌ গল্পের সূক্ষ্ম সাংকেতিক ব্যঞ্জনা, তার প্রতীকধর্মিতা, তার অপরূপ মানব-রস যেন তেমন করে তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। 'রুরু-প্রমদ্বরা'র মতো ক্বচিৎ এক-আধটি কাহিনীই রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণে লভ্য।

'সাবিত্রী-সত্যবানে'র কাহিনী পাতিব্রত্যের আদর্শ। অনুরূপভাবে আমাদের অর্ফিউস ও ইউরিদিস্‌ (Orpheus and Eurydice)-এর কাহিনী মনে আসে।

জনৈকা মিউজের সন্তান অর্ফিউস্‌ ছিলেন অপূর্ব সুরসৃষ্টির অধিকারী। ইউরিদিস্‌ তাঁর রূপ এবং বীণার সুরে মোহিত হন এবং পরিণয়-দেবী হাইমেন (Hymen) এই দুজনকে দাম্পত্য-বন্ধনে বদ্ধ করেন। কিন্তু বিবাহের সময় একটি পরম দুর্লক্ষণ দেখা গেল। হাইমেনের হাতের মশালটিকে কোনো-মতেই জ্বালানো গেল না। বোঝা গেল, এই পরিণয়ের পরিণাম শুভ হবে না।

শেষ পর্যন্ত তা-ই ঘটল। একদিন ঘাসের মধ্যে থেকে একটি সাপ বেরিয়ে এসে ইউরিদিস্‌কে দংশন করল—স্বামীর পদপ্রান্তে মরণ-ঘুমে লুটিয়ে পড়লেন ইউরিদিস্‌।

কিন্তু অর্ফিউস্‌ হাল ছাড়লেন না, প্রিয়ার সন্ধানে যাত্রা করে তিনি শেষ পর্যন্ত পাতালে—মৃতের রাজ্যে গিয়ে পৌঁছুলেন। যমলোকের রাজা-রাণী হেডস ও পার্সিফোনের সামনে তাঁর বীণায় ঝঙ্কার তুললেন তিনি। তাঁর অনিন্দ্য সঙ্গীত-প্রার্থনায় পাতালপতি মুগ্ধ হলেন—ইউরিদিস্‌ স্বামীর সঙ্গে

মর্ত্যজীবনে ফিরে যাবার অনুমতি পেলেন।

একটি শর্ত রইল। ইউরিদিস্ পেছন পেছন আসবেন—কিন্তু যতক্ষণ পাতালের সীমা দুজনে পার না হবেন—ততক্ষণ অর্ফিউস্ পেছন ফিরে চাইতে পারবেন না; তা হলেই ইউরিদিস্‌কে চিরকালের মতো হারাতে হবে।

দুজনে ধীরে ধীরে আসছেন। সর্পাহত পা নিয়ে তখনো ভালো করে হাঁটতে পারেন না ইউরিদিস্। দুজনে যখন পাতালের তমসা-রাজ্য প্রায় পার হয়ে এসেছেন—পৃথিবীর মুক্ত আলো আর শ্যামল প্রান্তর যখন প্রায় চোখের সামনে, তখন ক্ষণিকের দুর্বলতায় অর্ফিউস্ পেছন ফিরে তাকালেন। সেই মুহূর্তেই আর্তরবে শেষ বিদায় জানিয়ে মৃত্যুর রাজ্যে চিরকালের মতো হারিয়ে গেলেন ইউরিদিস্।

আবার পাতালে যেতে চাইলেন অর্ফিউস—রক্ষীরা আর তাঁকে যেতে দিলে না। মরণান্তিক যন্ত্রণায় বীণা বাজিয়ে শোকের তুফান তুলে থ্রেসের পাহাড়ে বনে অর্ফিউস্ পাগলের মতো ঘুরতে লাগলেন। শেষে একদল নিষ্ঠুর দস্যুর হাতে তাঁর মৃত্যু হল—এইবার প্রিয়ার সঙ্গে মিলনে কোথাও তাঁর আর বাধা রইল না।

অর্ফিউসের এই মর্মভেদী কাহিনী কত কবি কত শিল্পীকে কালে কালে প্রেরণা দিয়েছে—বিরহের ও বেদনার এই অপরূপ ইতিহাস মানুষ-হৃদয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। ট্র্যাজিডী-ভীত ভারতীয় কাহিনীকারেরা বিরহ-মাধুর্যের সন্ধান পাননি—করুণ বিপ্রলম্ভকে সুখান্তক ও উপদেশগর্ভ করে 'সাবিত্রী সমানা ভব' আশীর্বাদ জানিয়েই চরিতার্থ হয়েছেন।

গ্রীক-রোমক কাহিনীর আর একটি সম্পদ তার মানবতাবাদ। জিউস্ বা জুপিটার, তাঁর রাণী হেরা বা জুনো—এঁরা মর্ত্যের মানবী-মানবকে নিয়ে বহু নিষ্ঠুর লীলার অভিনয় করেছেন। কিন্তু মানব-মমতায় গ্রেকো-রোমান্ কবিদের রচনা অশ্রুসিক্ত প্রতিবাদে উদ্দীপ্ত। এই পর্যায়ের কাহিনীর মধ্যে সবচাইতে স্মরণীয় জিউস এবং প্রমিথিয়ুসের কাহিনী। জিউসের কঠিন নির্দেশ অগ্রাহ্য করে আপোলোর রথচক্র থেকে মর্ত্যের মানুষকে আগুন দিয়েছিলেন প্রমিথিয়ুস। ক্রুদ্ধ জিউসের আদেশ হল হেপিস্তান (ভালকান) কঠিনতম শৃঙ্খল দিয়ে ককেসাসের এক নির্জন চূড়ায় প্রমিথিয়ুসকে বেঁধে রাখবেন আর প্রতিদিন জুপিটারের ঈগল এসে তাঁর যকৃৎ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। সারাদিন এই যন্ত্রণা তাঁর চলবে, রাত্রে নতুন যকৃৎ সৃষ্টি হবে—পরের প্রভাতে আবার আসবে ঈগল। এই দণ্ড চলবে অনন্তকাল।

কিন্তু প্রমিথিয়ুস জানতেন—যে সন্তানদের হাতে তিনি আগুন তুলে দিয়ে অমিত শক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন, তারা তাঁকে ভুলবে না—পিতৃকৃত্য তারা করবেই। বহু শত বৎসর পরে প্রমিথিয়ুসের আশা সফল

হয়েছিল—মানুষ ভোলেনি তাঁর আর্তকণ্ঠের শেষ আবেদন।[১] তাঁর সন্তান হার্কিউলিস্‌ এসে ভাল্‌কানের বজ্রশৃঙ্খল ভেঙে তাঁকে মুক্তি দিয়েছিল।

এ-কাহিনী মানবতার মহত্তম গৌরবেরই ইতিহাস। তাই ঈস্‌কাইলাস রচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রীক ট্র্যাজেডী **'Prometheus Bound'**, ফরাসী বিপ্লবের অগ্নিসম্ভব শেলী রচনা করে গেছেন **"Prometheus Unbound"**.

প্রকৃতির বিচিত্র বিষয়বস্তু অবলম্বনেও পৌরাণিক কাহিনীকারেরা স্বপ্নময় কথাসম্ভার রচনা করে গেছেন। প্রকৃতি নিয়ে ভারতীয় পুরাণে বা লোক-কথাতেও কিছু কিছু গল্প আছে—কিন্তু গ্রেকো-রোমান সাহিত্যের সঙ্গে যেন তার তুলনা হয় না। আমাদের সাহিত্যে প্রকৃতি এনেছে তত্ত্ব ও দর্শন—রোমান-গ্রীক কল্পনায় ঢেলে দিয়েছে সৌন্দর্যের শিহর। ইয়োরোপই যথার্থভাবে প্রকৃতির রূপলক্ষ্মীকে আবিষ্কার করেছে, আমাদের পক্ষে তা সামান্যই সম্ভব হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে প্রকৃতির ইন্দ্রজাল পটভূমিকে স্বপ্নময় করেছে, কিন্তু জীবনের সহানুভূতিতে একাত্মতা রচনা করেনি। কালিদাসের 'মেঘদূত' প্রকৃতি-সৌন্দর্যের এক স্বতন্ত্র জগৎ, কিন্তু সেখানেও কবি বলে দিয়েছেন, 'কামার্তাঃ হি প্রকৃতি কৃপণ'—তার চেতন-অচেতনের ভেদ নেই!

আপোলো এবং দাফ্‌নের কাহিনী অন্য প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ইকো এবং (Echo and Narcissus)-এর সর্বজনবিদিত উপাখ্যানটি এই উপলক্ষে মনে আসছে। নিজের রূপে মুগ্ধ নার্সিসাস জলের দিকে তাকিয়ে এক দৃষ্টিতে প্রতিবিম্ব দেখছে আর তিলে তিলে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর মুখে। ইকো বৃথা তাকে কেঁদে ডাকছে কিন্তু নার্সিসাসের তা শোনবার মতো মনের অবস্থা নয়। শেষ পর্যন্ত মরণ এসে নার্সিসাসকে মুক্তি দিল—প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে সে বললে, "বিদায়।" পাশ থেকে কাতর কণ্ঠে ইকোও বললে, "বিদায়।" আজও সারা পৃথিবীতে প্রতিধ্বনি হয়ে ইকোর কণ্ঠস্বর বেদনায় মূর্ছিত হয়ে পড়ে।

হার্কিউলিস্‌ আর পার্সিয়ুসের দুঃসাহসী অভিযান; ভেনাস এবং আদোনিস—কিউপিড্‌ এবং সাইকির রোমান্স্‌ সর্বকালের সাহিত্যের সম্পদ। এ-সব ছাড়াও অন্ধকবি মিলিগেনাস্‌ হোমারের দুটি অমর মহাকাব্য—

১। ' 'Tis Zeus who driveth his furies
To smite me with terror and madness,
O mother Earth, all honoured,
O Air, revolving thy light
A common boon unto all,
Behold what wrong I endure.'
—Aeschylus, Prometheus Bound, Tsran. P.E. More.

ইলিয়াড আর অডিসি অসংখ্য পার্শ্বকাহিনী দিয়ে প্রথম গল্পকথার অক্ষয় ভাণ্ডার সাজিয়েছে।

দুটি প্রাচীন রূপোজ্জ্বল সভ্যতা চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে ঈজিয়ানের তরঙ্গে, টাইবারের জলস্রোতে। কিন্তু শিল্পী সাহিত্যিক পাঠকের কাছে তারা মৃত্যুহীন আনন্দলোক। 'শতেক যুগের মানুষ' তাতে শত লক্ষ চিত্তকে অভিসারে পাঠাচ্ছে—শুধু একা কীট্‌সই চ্যাপমানের হোমার পড়ে অনুপ্রাণিত হন্‌নি।

হোমারের মহাকাব্য ও গ্রেকো-রোমান গল্পসাহিত্য ইয়োরোপীয় নাটক-কাব্য-কবিতার আদি জননী। ঈস্‌কাইলাস্‌-সফোক্লিস্‌-ইউরিপিডিস্‌ থেকে আরম্ভ করে শেক্‌সপীয়ারের ভেনাস ও অ্যাডোনিস, সুইন্‌বার্ণের অ্যাটালাণ্টা পর্যন্ত সর্বত্র এর বিচিত্র বিস্তার। ইতালীয় রানাসাঁসে মানবতার যে মহা উদ্বোধন, তাতে শিল্পীরা কেন যে বিশেষ ভাবে গ্রীক-রোমক পুরাণ-কাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তার উত্তর খুঁজতে আমাদের বেশিদূর যেতে হবে না। ছোটগল্পের বিকাশের ইতিহাসে, ব্যঞ্জনা-সুরভিত প্রতীকতায় এবং হৃদয়াবেগসমৃদ্ধ বাসনা-বেদনার অভিব্যক্তিতে এই কাহিনীগুলি পরম আনন্দের সঙ্গে স্মরণীয়।

ইয়োরোপীয় কথাসাহিত্যের সূচনায় আরো একটি প্রধান প্রেরণা আছে। সেটি হল 'The Holy Bible'—বিশেষ করে এর 'Old Testament' অংশটি।

"Thus the heavens and the earth were finished, and all host of them"—ইহুদী ও খ্রীষ্টীয় মতে ঈশ্বর বিশ্বসৃষ্টির প্রথম পর্যায় সমাপ্ত করলেন।

তারপরে জল-মাটির পালা; জল আর মাটিও যখন তৈরী হয়ে গেল, তখন নিজের হাতে ঈশ্বর গড়লেন একটি কাদার পুতুল। তার নাসারন্ধ্রে দিলেন জীবনের নিঃশ্বাস—জন্ম হল সর্বাদিমানব আদমের।

ইডেনের পরিপূর্ণ স্বর্গোদ্যানে পরম আনন্দে দিন কাটতে লাগল প্রথম মানুষের। কোথাও কোন অভাব নেই—কোনো কিছুতেই বাধা নেই। কেবল একটি ক্ষেত্রে মাত্র ঈশ্বরের নির্দেশ ঃ

"But of tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it; for in the day that thou estest thereof thou shalt die."

হয়তো আজ পর্যন্তও ঈশ্বরের সেই স্বর্গোদ্যানে আদিম মানুষ পরম আনন্দে স্বেচ্ছাবিচরণ করে বেড়াতে পারতেন; দুঃখ থাকত না, বেদনা শোক ব্যাধি মৃত্যু কিছুই থাকত না। কিন্তু স্রষ্টা নিজেই একটা নিদারুণ ভুল করে বসলেন। নিঃসঙ্গ আদমকে দেখে তাঁর করুণা হল। ভাবলেন ঃ "I will make him an help-mate for him"।

তারপর ঈশ্বরের মোহন-মন্ত্রে এক নিবিড় গভীর সুপ্তি নামল আদমের

উপর। আদি মানুষ যখন অতল ঘুমে সমাচ্ছন্ন, তখন ঈশ্বর তাঁর পঞ্জরের একখানি অস্থি খুলে নিলেন। আর সেই পঞ্জরাস্থি দিয়েই নির্মাণ করলেন প্রথমা মানবী।

আদম বললেন, "This is now my bone of bones, and flesh of my flesh : She shall be called woman, because she was taken out of man.

Therefore, shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife : and they shall be one flesh."[১]

সৃষ্টির একেবারের প্রথম দিন থেকে মানব মানবীর ইতিহাসের এইভাবেই আরম্ভ। তারা "one flesh"—তাদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু এমন যে অভিন্নসত্তা, দেহেমনে যে এমন আত্মজন, মানুষের দুর্গতির ইতিহাসও তাকে দিয়েই আরম্ভ। শয়তানের প্ররোচনায় এই নারীই জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়ালো আদমকে—তারপর ঈশ্বরের আদেশে বিতাড়িত হয়ে নামতে হল পৃথিবীর মাটিতে—লাঙল ঠেলে শুরু হল আদমদের জীবন-সংগ্রাম। প্রথম নারী হল আদি মাতা ঈভ, এল জন্মধারা—শুরু হল মানুষের দুঃখের ইতিহাস—আর আকাশ জুড়ে ঘুরতে লাগল ঈশ্বরের খরধার অগ্নিময় তরবারি—যেন মানুষ কোনোদিন কখনো অমৃত ফলের সন্ধান না পায়।

এই গল্প রূপক। এর মধ্যে বহু তত্ত্বই আছে। কিন্তু সব তত্ত্বকে ছাপিয়ে উঠেছে 'জাতক'-'পঞ্চতন্ত্রে'র মর্মধ্বনি—নারী পুরুষের অন্তরতমা—অথচ নারীই পুরুষের মৃত্যুরূপিণী।

বাইবেলের গল্পে প্রধানত কৃষি-সভ্যতা এবং তৎকালীন জীবনধারার অকৃত্রিম পরিচয় ফুটে উঠেছে। এর খণ্ড খণ্ড কাহিনীগুলি একটি বিশেষ ভূগোলভূমি এবং মানবগোষ্ঠীর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বার্তা বহন করে। গ্রেকো-রোমান্ গল্প-সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করে বলা যায়—একটি নাগরিক সভ্যতাদীপ্ত রোমান্টিক্ কল্পনার দীপালোকে উজ্জ্বল, আর একটি কৃষিজীবী মানুষের জীবনসংগ্রাম, আত্মপ্রতিষ্ঠা, গোষ্ঠী ও জাতি বিরোধ এবং পারিবারিকতার রূপায়ণ। অলৌকিকতা যা-ই থাক, ওল্ড্ টেস্টামেন্টের প্রধান অংশটি মাটি আর মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ। ডেভিডের রূপকথা আছে, স্যামসন এবং ডেলাইলার রোমান্স্ এক-আধটু নেই তা-ও নয়—কিন্তু জোসেফের গল্পে, রুথের কাহিনীতেই এর যথার্থ অভিব্যক্তি।

'রুথে'র উপাখ্যানটি তো অপূর্ব—এটিকে অবলম্বন করে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ চমৎকার একটি কবিতা লিখেছেন। ভিক্টর ইয়ুগোও রচনা করেছেন আরো অসাধারণ একটি কবিতা : 'Booz Endormi'[২]। রুথের স্বামীর বংশের

১। Genesis,[২]

২। "Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une Moabite
S'etait couchée aux pieds de Booz, le sein nu,

প্রতি আনুগত্য, তার শান্ত নম্রতা, তার চরিত্র-মাধুর্য ভারতীয় নারীত্বের সমশ্রেণীয়।

"And she went down unto the floor, and did according to all that her mother-in-law bade her.

And when Boaz had eaten and drunk and his heart was merry, he went to lie down at the end of the heap of corn, and she came softly, and uncovered his feet, and laid her down.

And it came to pass at midnight, that the man was afraid and turned himself; and, behold, a woman lay at his feet.

And he said, who art thou? And she answered, I am Ruth thine handmaid : for thou art a near kinsman—"

কৃষিজীবী সভ্যতার পটভূমিতে ওল্ড টেস্টামেণ্ট লোকজীবনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে উজ্জ্বল হয়ে থাকলেও রোমান্সই সাহিত্যের প্রধান ভূমিকা জুড়ে থাকল এবং গ্রীস ও রোমের অক্ষয় ভাণ্ডার থেকেই লেখকেরা উপকরণ আহরণ করে চললেন। আর এই উপকরণের আধুনিকতম শিল্পায়ন ঘটল রোমক কবি ওভিদের হাতে—তাঁর 'রূপান্তরের কাহিনীমালায়', The Metamorphoses-এ।

"When this disguise I carry shall be no more,
And all the treacherous years of life undone,
And yet my name shall rise to heavenly music,
The deathless music of the circling stars.
As long as Rome is the eternal city
These lines shall echo from the lips of men.
As long as poetry speak truth on the earth.
That immortality is mine to wear–"

'Metamorphoses' শেষ করে এইভাবে নিজের কাব্যের মহিমা স্মরণ করেছিলেন ওভিদ, আশা করেছিলেন, তাঁর কাব্য শাশ্বত নগরীর রোমের মতোই চিরন্তন হয়ে থাকবে। ওভিদের এই আত্মশ্লাঘার মধ্যে নিছক অহং-এর তাড়নাই ছিল না, 'Art of Love' লিখবার অপরাধে (?) সম্রাট অগস্টাসের কোপদৃষ্টিতে নিগৃহীত নির্বাসিত কবি যেন এর মধ্য দিয়েই কিছুটা মানসিক সান্ত্বনাও খুঁজে পেয়েছিলেন।

Espérant on ne sait quel rayon inconnu,
Quand viendrait du re´veil ia lumie´re subite"—

—Hugo, 'Booz Endormi"

'Metamorphoses' বা 'পরিবর্তনের ইতিহাস' গ্রেকো-রোমান কাহিনীর ভিত্তিতেই রচিত। কিন্তু পাবলিয়াস ওভিদিয়াস নাসো (তাঁর কোনো পূর্ব-পুরুষ ছিলেন দীর্ঘনস) যে কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৩ শতাব্দী) তখন রোমের নৈতিক ও ও সামাজিক জীবনে প্রাচীন মূল্যবোধগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ছে। ওভিদের পরিণত যৌবন তখন দিকে দিকে দেখছে যৌবনের বিদ্রোহ—বৃদ্ধ সম্রাট অগস্টাস রোষকশায়িত নেত্রে লক্ষ্য করছেন—তাঁর নিজ দৌহিত্রী জুলিয়াই এই যৌবন-মধুচক্রের মক্ষিরাণী।

ওভিদ, 'রূপান্তরের কাহিনী'

তখন ভার্জিল আর হোরেসের জয়জয়কার। কিন্তু ওভিদ তাঁর জায়গা খুঁজে নিয়েছিলেন নব যৌবনের দলেই। ভার্জিলের ঈনিড্ নয়, তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল প্রোপেরতিয়াসের প্রেমের কবিতা। ওভিদের 'Amores' রচিত হলে স্বভাবতই চাঞ্চল্য জাগল। আর অগস্টাস সন্দেহ করলেন, তাঁর দৌহিত্রীর উদ্দাম উচ্ছৃংখলতার জন্য দায়ী ওভিদের নীতিহীন রচনাবলী : 'Amores', 'Art of love', 'Cure for Love' কিংবা Confessions of Women'।

ফলে রোম থেকে বহু দূরে কৃষ্ণসাগরের বিষণ্ণ তটে তাঁর নির্বাসন এবং রোমে বসে রচিত তাঁর শেষ গ্রন্থ এই 'Metamorphoes'। এই বইয়ের যত্রতত্র অগস্টাসের প্রশংসার মধ্য দিয়ে ওভিদ বার বার সম্রাটের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন—("Long life to our Augustus here on earth")—যদিও তা ফলপ্রসূ হয়নি।

আজ ওভিদের পরিচয় এই 'Metamorphoses' (এবং কিছুটা Heroic Epistles)-এর উপরেই ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে। প্যাগান যুগের মহিমা না থাকলেও রোম আজ পর্যন্ত বেঁচে রয়েছে—আর ওভিদ মহান কবিদের পংক্তিতে আসন না লাভ করলেও সাহিত্য-পাঠকের প্রীতিতে এখনো অভিষিক্ত হচ্ছেন। তাঁর 'Metamorphoses' অসংখ্য মহৎ স্রষ্টাকে প্রভাবিত করেছে—বোক্কাচ্চো থেকে শেক্স্পিয়ার পর্যন্ত অনেকেই তার মধ্যে রয়েছেন।

ওভিদের এই সুরচিত বইখানি পড়তে পড়তে একালের পাঠক সার্থক ছোটগল্প পঠনের রোমাঞ্চ অনুভব করবেন। পনেরোটি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত বইটিতে গ্রীক সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে সীজার পর্যন্ত রয়েছেন। ট্রোজান যুদ্ধের কাহিনীও বাদ পড়েনি। দেবতার অভিশাপে, ব্যর্থ প্রেমের বিড়ম্বনায়, ঈর্ষা-হীনতা-ক্ষুদ্রতায় বা নিয়তির নির্দেশে মানুষ গাছপালা-জীবজন্তু-নদী-পর্বতে রূপান্তরিত হল—একটির পর একটি গল্পের দ্বারা তাই দেখানো হয়েছে। রাজা ক্যাড্মাস এবং তাঁর দৈবাবড়ম্বিত পরিবারের কাহিনীই এর সবচাইতে বেশী অংশ জুড়ে রয়েছে।

আশ্চর্য ওভিদের বর্ণনা—আশ্চর্য তাঁর নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টির নৈপুণ্য। পুরাণের চরিত্রগুলি রক্ত-মাংস-মানবতা নিয়ে এর পাতায় পাতায় নব-জীবন লাভ করেছে। সূর্যের বালক-পুত্র ফীটন্ অসম দুঃসাহসের সঙ্গে পিতার

অগ্নিরথ নিয়ে পৃথিবী পরিক্রমা করতে চেয়েছিল। কিন্তু আপোলোর চারটি উন্মাদ অশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে—সে শক্তি তার কোথায়? রথের বন্য অশ্বেরা তার লাগামের শাসন ভেঙে যথেচ্ছ ছুটে যেতে লাগল—সারা পৃথিবীতে প্রলয় দেখা দিল, সমুদ্র শুকিয়ে গেল—যেখানে যেটুকু সবুজ ছিল, নিঃশেষে তা দগ্ধ হয়ে গিয়ে উড়তে লাগল পিঙ্গল ভস্মরাশি। শেষে ফীটনের মৃত্যু এবং তার শোকাচ্ছন্না ভগিনীদের বৃক্ষে রূপান্তরিতা হওয়ার পর কাহিনীর সমাপ্তি। রহস্যময় আকাশের হিংস্র রাশিমণ্ডলের বর্ণনা ওভিদের ভাষায় এই রকম:

"Then in quick terror he saw sky's scattered islands,
Where monsters rise: Scorpion's arms and tail
Opening closing across two regions of
The Zodiac itself, he saw the creature
Black, shining with poisoned sweat, about to sting
With arched and poisoned tail. Then Phaeton'
Numbed. chilled, and broken dropped the reins."[১]

ওভিদের মানবীয় চেতনা গ্রীক পুরানের গল্পকে নবীন তাৎপর্যে ভূষিত করেছে। আরাক্নি এবং নায়োবির (Book VI) উপাখ্যান দেবতা ও মানবীর দ্বন্দ্বের কাহিনী। আরাক্নি নিজের বয়ন-নৈপুণ্যে অত্যন্ত গর্বিতা হয়ে উঠেছিল—এমন কি শিল্পদেবী প্যালাস (মিনার্ভা)-কে পর্যন্ত সে গ্রাহ্য করত না। ক্রুদ্ধা মিনার্ভা তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেন, কিন্তু জিততে পারলেন না। তাঁর অভিশাপে আরাক্নি মাকড়শায় পরিণত হয়ে সারাজীবন জাল বুনে চলল।

সাতটি বীরপুত্রের জননী রাজরাণী নায়োবি, দেবী লাতোনা (আপোলো-জননী)-কে পুজো করতে চাননি—আত্মগর্বে তিনি লাতোনাকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। লাতোনার ক্রোধ চূড়ান্ত হিংস্র রূপ নিল। আপোলোর তীরে এক-একটি করে নায়োবির সাত পুত্র লুটিয়ে পড়ল মৃত্যুশয্যায়—কন্যারাও বাদ পড়ল না। আর চোখের সামনে এই দানবীয় হত্যাকাণ্ড দেখে নায়োবি পাষাণ হয়ে গেলেন।

দুটিই পুরাণের প্রচলিত কাহিনী, কিন্তু ওভিদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দেবতার চরিত্র এখানে নিষ্ঠুর আর কুৎসিত হয়ে উঠেছে—মানুষের মহত্ত্বই দেখা দিয়েছে সমুজ্জ্বল রূপে। নায়োবির কাহিনী আমাদের চাঁদ সদাগরের ইতিবৃত্ত স্মরণ করায়।

তেরেয়ুস কর্তৃক ফিলোমেলার ধর্ষণ ও জিহ্বাচ্ছেদ এবং প্রোক্নির প্রতিশোধ গ্রহণ যেন এক দুঃস্বপ্নের বিবরণ। বিশ্বাসঘাতক বর্বর স্বামী তেরেয়ুসের পাপের শাস্তি দেবার জন্যে নিজ সন্তানকে স্বহস্তে বধ করেছে

১। Metamorphoses, Book II, Trans. by Horace Gregory

প্রোক্‌নি, তারপর তার মাংস রান্না করে খাইয়েছে স্বামীকে। ওভিদের বর্ণনায় এবং ঘটনা-বিন্যাসে এই আখ্যান নরকের আতঙ্ক বয়ে আনে :

"So
He sat as on a throne for a state banquet
And eagerly ate flesh of his own flesh :
Blind as he was to what his wife had done,
'Bring Itys here', he called ; and she, bright with
Mad joy to be first to let him know
His fate, cried out, 'You have the boy inside.'
Again he turned to ask her where he was,
And as he called a third time, Philomela,
Spotted with blood of Itys, her wild hair
Flying, leaped up to him, tossing the boy's
Blood-dabbled head into his face ; at no time
Had she the greater need for words of joy
She felt at serving him. Then with a cry,
The Thracian tyrant kicked away the table,
And hailed the snake haired furies from Hell's pit.
Now, if he could. he'd cut his breast in two
And from it tear the body of his son—"

এই বীভৎস ঘটনার তুলনা যেমন অপ্রাপ্য, তেমনি ওভিদের বর্ণনায় এর নিষ্ঠুরতা পরিপূর্ণ ভয়াবহতা নিয়ে দেখা দিয়েছে। পাপের এমন নিদারুণ দণ্ডবিধানের কথা প্রেতলোকের অধীশ্বর প্লুটো পর্যন্ত কোনোদিন কল্পনা করতে পারতেন না। মহাকাব্য রচনার প্রতিভা ওভিদের ছিল না—সে শক্তির শেষ দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়েছিল ভার্জিলে। কিন্তু উপন্যাস রচনায় সিদ্ধিলাভ না করেও যেমন ছোটগল্পে চিরন্তন কীর্তি রেখেছেন চেকভ আর মোপাসাঁ, তেমনি রোমক-গ্রীক প্রাচীন কাহিনীর মহিমোন্নত গিরিশিখর থেকে এক-একটি করে কথা-কাব্যের নির্ঝরিণী বইয়ে এনেছেন ওভিদ, তীক্ষ্ণ মনস্তাত্ত্বিকতায়, দ্রুত বর্ণনার তীব্রতায় এবং সংক্ষিপ্ত আয়তনের মধ্যে চরিত্র ও ঘটনার ক্ষিপ্র সংঘাতে আধুনিক ছোটগল্পের রীতি-পদ্ধতিই যেন 'Metamorphoses'-এ স্পষ্টাঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

গ্রীক-ট্র্যাজিডীর বিষয়বস্তুকে নতুনভাবে শিল্পিত করবার মধ্যেই তাঁর এই বিশিষ্টতা—এই আধুনিকতার পরিচয় মেলে।

'সোনালি পশমে'র বিখ্যাত নায়িকা 'মিদিয়া'কে অবলম্বন করে ইউরিপিদিস তাঁর অপূর্ব ট্র্যাজিডী রচনা করেছেন—কিন্তু গল্প-লেখকের সংহত তীক্ষ্ণতা নিয়ে তার এক অভিনব রূপায়ণ করেছেন ওভিদ (Book VII)। মিদিয়া এখানে এক ভয়ংকরী ডাকিনীর রূপ নিয়েছে, তার ক্রূর

কুটিল চরিত্র, তার যাদুবিদ্যার বর্ণনা ম্যাকবেথের ডাকিনীদের পূর্বসূচনা। বৃদ্ধ শ্বশুরের পুনর্জীবন এবং নবযৌবন ফিরিয়ে আনতে গিয়ে মিদিয়ার মৃত-সঞ্জীবনী নির্মাণের প্রক্রিয়া এই রকম ঃ

"Meanwhile in a bronze pot her liquor simmered
Steamed, leaped, and boiled, the white scum
foaming hot :
There she threw roots torn from Thessalian valleys,
Seeds, flowers, plants, and acid distillations ··
Wings of the weired scritch owl and his torn breast
Bowels of werewolf which shudder and twist
Into a likeness of mad human faces,
The scaled skin of a thin-hipped water-snake,
Liver of long-lived deer, foul eggs,
And battered head of a crow that outlived
Eight generations—"

গ্রীক-রোমান পুরাণ ও নাটকের একেবারে শেষ সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছেন ওভিদ—শাশ্বতী নগরী রোমের প্যাগান গরিমার পশ্চিম দীপ্তিতে তাঁর বিকাশ। পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাব ছোটগল্প সন্ধি-লগ্নের শস্য, বিগত এবং অনাগতের মধ্যভূমিই তার সবচাইতে উর্বর ক্ষেত্র। ওভিদের 'Metamorphoses'ও সন্ধিযুগের রচনা—তাই তাঁর হাতে পুরাণ-কাহিনী ছোটগল্পের নীহারিকার ভেতরে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

জীবনের একটা প্রধান অংশই রোমের নরদানব সম্রাট নীরোর অন্তরঙ্গ সহচররূপে কাটালেন পেত্রনিয়াস। সেই অসংযত উদ্দাম জীবনযাত্রার অপরিহার্য পরিণতিরূপে শেষে দেখা গেল, অন্যের চক্রান্তে নীরোর বিদ্বেষ-দৃষ্টিতে পড়েছেন তিনি—আত্মহত্যা ছাড়া তাঁর আর কোন পথই সামনে নেই। সেদিন তিনি শেষবারের মতো পান-ভোজনের এক বিরাট আসর বসালেন নিজের বাড়ীতে—একটির পর একটি রক্তবাহী ধমনীকে ছিন্ন করে ধীর মৃত্যুর ভূমিকা রচনা করলেন, তারপর নীরোকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর শেষ দলিল। এনকোলপিয়াস নামে একটি চরিত্রের বহুবিধ অ্যাডভেঞ্চারের মধ্য দিয়ে তৎকালীন রোমক সমাজের ব্যঙ্গাত্মক ভাস্বর ছবি ফুটে উঠল তাতে। পড়ে ক্ষিপ্ত নীরো যখন পেত্রো-নিয়াসকে ধরে আনতে পাঠালেন, তখন তিনি আর ইহলোকে নেই—নীরোর সৈন্য অক্ষম ক্রোধে তাঁর প্রাসাদ ধ্বংস ও লুণ্ঠন করে চলে গেল। এই হল পেত্রোনিয়াসের বিখ্যাত 'Satire'-এর উৎসকথা। আজ এর সামান্য খণ্ডাংশ মাত্র পাওয়া যায়। অশ্লীলতা এবং গ্রাম্যতার জন্য পেত্রোনিয়াস বহুনিন্দিত, কিন্তু সেই সঙ্গে সমকালীন জীবনের বস্তুনিষ্ঠ চিত্রণের জন্যে একালের সমালোচকের কাছে তিনি সম্বর্ধিতও। লেখক হিসেবে তাঁর স্থান নগণ্য—

পেত্রোনিয়াস

কিন্তু তাঁর কর্কশ ও স্থূল বাস্তবতা ভবিষ্যতের জীবন-সন্নিহিত সাহিত্যের সূচক।

পেট্রোনিয়াসের বই কতগুলি খণ্ড খণ্ড ঘটনার সমষ্টি, অধিকাংশই বিলুপ্ত এবং এই ঘটনাগুলির মধ্যে কোনো সংযোগসূত্র থাকলে তা-ও নিশ্চিহ্ন। কিন্তু এনকোলপিয়াস, গিতন, বৃদ্ধ কবি এবং প্রিয়াপাসের এক মোহিনী নারী-পুরোহিত (Circe) এই বইটির প্রধান আকর্ষণ। পেট্রোনিয়াসেই র‍্যাবল্যার গাঁরগাঁতুয়া এবং পাঁতাগ্রুয়েলের মুখবন্ধ।

নারীচরিত্রের বর্ণনায় এবং ধিক্কারে পেট্রোনিয়াস ভারতীয় পঞ্চতন্ত্র ও শুকসপ্ততির স্বজন। তাঁর একটি বাণী এই ঃ

> "Femina nulla bone est, et si bona contigit ulla
> Nescio quo fato nes mala facta bona est."

পেট্রোনিয়াসের প্রায় এক শতাব্দী পরে আপুলিয়াসের আবির্ভাব। জাতিতে রোমান, শিক্ষা এথেন্সে এবং কার্থেজে। দার্শনিক ও পণ্ডিত

লুসিয়াস আপুলিয়াস

আপুলিয়াসের খ্যাতি প্রধানত তাঁর Metamorphoses অথবা 'The Golden Ass'-এর জন্যে। তরুণ দার্শনিক লুসিয়াস সোনালি গর্দভে পরিণত হয়ে যে সমস্ত অ্যাডভেঞ্চারে পড়েন, তার কতকগুলি চমৎকার বিবরণ আছে বইতে। তা ছাড়া 'কিউপিড এবং সাইকি'র অপূর্ব কাহিনীটিও এতে নতুন করে শুনিয়েছেন আপুলিয়াস। 'The Golden Ass'-এ সমস্ত ধরণের গল্পই আছে, মহৎ বিবরণ, উদ্ভট কাহিনী, লালসার ইতিবৃত্ত, ভয়াবহ বিবরণ—দ্রুতগতি ছায়াছবির মতোই এতে বিন্যস্ত। এই কারণে কারো কারো মতে আপুলিয়াস আধুনিক ছোটগল্পের অন্যতম প্রথম পথিকৃৎ। বইখানির ভাষায় ত্রুটি আছে, রচনার সর্বত্র স্বচ্ছ নয়, বহু জায়গায় শব্দপ্রয়োগ দুর্বোধ্য—তবু সব মিলিয়ে 'The Golden Ass' মৌলিকতায় প্রদীপ্ত, উপাদেয় একটি গল্প-সংকলন।

পেট্রোনিয়াস এবং আপুলিয়াস—এই দুইজনেই 'Don Quixot' এবং 'Gil Blas'-এর পূর্বসূচনা।

বারলাম ও জোসাফট—এই দুইজন গ্রীসীয় সন্ন্যাসী আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে গ্রেকো-রোমান ধর্মজগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু পরম বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে বারলাম ও জোসাফটের কাহিনী প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বুদ্ধের ইতিবৃত্ত। ভারতের গৌতম বুদ্ধ কেমন করে রোমক ধর্মজগতে প্রবেশ করলেন, কবেই বা খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীদের তালিকাভুক্ত হলেন, আজ পর্যন্ত সে রহস্যের কোনো সুস্পষ্ট মীমাংসা হয়নি।

বারলাম ও জোসাফট

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে দামাস্কাসের সেণ্ট জন সর্বপ্রথম বারলাম ও জোসাফটের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে যান। সেটি মোটামুটি এই ঃ

সেণ্ট টমাস ভারতের বহু নাগরিককে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিলেও রাজা

আবেনের (Abbener) ছিলেন ঘোরতর ক্রীশ্চান-বিরোধী। নিঃসন্তান রাজা বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্র লাভ করলে জ্ঞানীরা ভবিষ্যৎবাণী করেন, তাঁর এই পুত্র তুচ্ছ রাজসুখে কালাতিপাত করবে না—আরো মহত্তর রাজ্য—অর্থাৎ ধর্মজগৎ অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

ছেলেবেলা থেকেই রাজকুমার জোসাফট ছিলেন ভাবুক এবং আত্মমুখী। শঙ্কিত রাজা তাকে বন্ধ-নগরীর বিশাল রাজপ্রাসাদে বন্দী করে রাখলেন—তাঁর সঙ্গী রইল তরুণ বন্ধুবান্ধব এবং শিক্ষকের দল। বাইরের কারো সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের উপায় রইল না—দারিদ্র্য, ব্যাধি, জরা এবং মৃত্যুর সঙ্গে যাতে কোনো উপায়েই তাঁর পরিচয় না হয়—রাজা সে সম্পর্কে সব রকম ব্যবস্থাই করলেন।

তারপর অনেক কষ্টে পিতার অনুমতি সংগ্রহ করে জোসাফট একদা তাঁর প্রাসাদের বাইরে আসতে পান এবং তারপরেই দেখতে পান—'জরাজজ্জরম্ ব্যাধিতম্ কালকতম্'। সিদ্ধার্থের মতোই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, তা হলে এই জীবন? এই জরা-ব্যাধি-মৃত্যুই তবে মানুষের অনিবার্য পরিণাম? এর হাত থেকে জীবের পরিত্রাণের কি কোনো পথই নেই?

জোসাফটের অশান্ত চিত্তে যখন ঝড় উঠেছে, তখনই ছদ্মবেশে এলেন ধার্মিক সন্ন্যাসী বারলাম, তিনি গোপনে খ্রীষ্টধর্মের দীক্ষা দিলেন জোসাফটকে। রাজার ক্রোধে পড়বার আগেই বারলাম পালিয়ে গেলেন—আর আবেনের বহু চেষ্টা করেও পুত্রের মতিগতি ফেরাতে পারলেন না। তখন আনলেন থিউদাস (Theudas) নামে এক যাদুকরকে। রাজপুত্রের সঙ্গীদের সরিয়ে দিয়ে থিউদাস আমদানি করলেন লাস্যময়ী সুন্দরী নারীর দল—কিন্তু একেবারে মারং সসেনং! জোসাফট অবিচলিত। শেষ পর্যন্ত ধার্মিক পুত্রের প্রভাবে রাজা আবেনের স্বয়ং খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করলেন।

পিতার মৃত্যুর পর পুত্র গৃহত্যাগ করে তপস্যায় গেলেন। সেখানে বনের মধ্যে ধর্মগুরু বারলামের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটল। কিছুদিন পরে বারলামও দেহরক্ষা করেন—জোসাফট সুদীর্ঘকাল ধরে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে থাকেন।

শুধু যে এই কাহিনীই বুদ্ধের জীবন থেকে আহরণ করা হয়েছে তা নয়, বারলাম ও জোসাফটের মূল আখ্যান অসংখ্য উপগল্পে আকীর্ণ এবং সেগুলি জাতক, দিব্যাবদান প্রভৃতিতে লভ্য। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সূত্রপথে গৌতম বুদ্ধের কাহিনী সমুদ্রচারী আরবেরা মিশরে নিয়ে গিয়েছিল বলে মনে হয় এবং খুব সম্ভব খ্রীষ্টীয় প্রচারকেরা সেখান থেকে এটিকে আহৃত ও রূপান্তরিত করে গ্রীসে এবং রোমে নিয়ে প্রচার করেছিলেন।

ধর্ম ও নীতিমূলক কাহিনী সংগ্রহরূপে ইয়োরোপীয় সাহিত্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য যে গ্রন্থটি তার নাম 'Gesta Romanorum'—'গেস্তা রোমানো-

রাম'। নামগত অর্থ 'রোমানদের কার্যকলাপ।' সংক্ষেপে বইটি 'গেস্তা' নামেই পরিচিত। এই বই উপদেশাত্মক গল্পমালার বৃহত্তম ইয়োরোপীয় সংকলন; একে একাধারে ভারতীয় 'পঞ্চতন্ত্র' এবং 'জাতকে'র সঙ্গে তুলনা করা যায়।

গেস্তা রোমানোরাম

রেভারেন্ড চার্লস্ সোয়ান এবং অধ্যাপক উইনার্ড হুপার এর আধুনিকতম প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশ করেছেন, তাতে মোট ১৮১টি গল্প স্থান পেয়েছে। 'আনন্দদায়ক নীতিকথাসমুচ্চয়' এই পরিচয়ে গেস্তা ইয়োরোপে নব পঞ্চতন্ত্রের মতোই সমাদৃত হয়েছে।

'গেস্তা'র রচয়িতা, রচনার স্থান এবং কাল—সবই অনিশ্চিত। ক'টি পাঠান্তরও আছে। কেউ কেউ মনে করেন এর জন্মস্থান জার্মানী, কারো কারো মতে ইতালী। কিন্তু যেখানেই রচিত হোক—বইটির ভাষা লাতিন। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে অথবা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বই-খানির জন্ম হয়। লেখক বা সংকলক বিতর্কমূলক, অতএব অজ্ঞেয়। 'গেস্তা রোমানোরাম' সর্ব ইয়োরোপীয় এবং সর্বজনীন।

'পঞ্চতন্ত্রে'র দু-একটি গল্পের প্রভাব 'গেস্তা'য় আছে বটে, কিন্তু চরিত্রধর্মে জাতকের সঙ্গেই এর সাদৃশ্য বেশি। জাতকে যেমন যে কোনো প্রাণিমূলক বা সামাজিক কাহিনীকে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে, ঠিক সেই ভাবেই 'গেস্তা'তেও ইতিহাস-পুরাণ-লোককাহিনী বিবৃত করে তার ওপরে খ্রীষ্টধর্মের প্রতীকী তাৎপর্য আরোপিত হয়েছে। 'জাতকে'র "সমবধান" এবং 'গেস্তার' "প্রয়োগ" একই বস্তু।

বৌদ্ধ শ্রমণদের মতোই 'গেস্তা'র রচয়িতা খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসী (অথবা সন্ন্যাসীরা) উপলব্ধি করেছিলেন যে, পরিচিত লোকপ্রিয় গল্পের সঙ্গে উপদেশ যুক্ত করে দিতে পারলে তা অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী এবং লোকশিক্ষার অনুকূল হবে। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা যে কোনো কাহিনীকেই তাঁদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। মূল গল্পটি বলা হয়ে গেলে তারপরে দ্বিতীয় শিরোনামা এসেছে 'প্রয়োগ' (Application)। এই 'প্রয়োগ' আর কিছুই নয়—গল্পে একটি ধর্মীয় তাৎপর্য বিন্যাস করা। কখনো কখনো এই 'প্রয়োগ' হাস্যকর এবং কষ্টকল্পিত, কখনো বা চমৎকার প্রাজ্ঞতা এবং বুদ্ধির পরিচায়ক।

'গেস্তা'র উৎস বহুমুখ। সোয়ান এবং হুপার তাঁদের ভূমিকায় বলেছেন ঃ

"Oriental, legendary and classical fables, hightened by circumstances of a strong romantic cast, form the basis of this singular composition. But the authorities cited for classical allusions are usually of the lower order. Valerius, Maximus, Macrobius, Aulus Gellius, Pliny, Seneca, Boethius, and occasionally OVID, are introduced; but they do not always

contain thc relation which they are intended to substantiate; and it is invariably much disguised and altered."[১]

এ ছাড়া 'বারলাম ও জোসাফট' এবং পেত্রাস আলফনসাসের 'Clericali Disciplina'র কাছেও বইখানি ঋণী।

উত্তরকালীন ইয়োরোপীয় সাহিত্যকে 'গেস্তা' বহুলভাবে প্রভাবিত করেছে—অগণিত লেখক এই গ্রন্থের কাছ থেকে উপকরণ আহরণ করেছেন। জন গাওয়ার, জিওফ্রে চসার, শেক্‌স্‌পীয়র, লীড্‌গেট এবং আরো বহুজন 'গেস্তা'র বীজ আশ্রয় করে কাব্য নাটকের পুষ্পিত সম্ভার সর্বকালের পাঠককে উপহার দিয়েছেন। শত শত বছর ধরে 'গেস্তা' অতুলনীয় জনপ্রিয়তার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। 'গেস্তা'র দু-একটি সংক্ষিপ্ত গল্প উদ্ধার করে এর বৈশিষ্ট্যের কিছু পরিচয় নেওয়া যাক।

কাহিনী : তিন
যথার্থ বিচার প্রসঙ্গে

এক সম্রাট ঘোষণা করেছিলেন যে, কোনো নারী যদি দুশ্চরিত্রা হয়, তা হলে তাকে গভীর পার্বত্য-গহ্বরে নিক্ষেপ করে বধ করা হবে। এই অপরাধে অভিযুক্তা এক মহিলাকে যথানিয়মে গর্তে ফেলেও দেওয়া হল, কিন্তু দৈবক্রমে মেয়েটির কোনো আঘাতই লাগল না। অতএব প্রহরীরা তাকে আবার বিচারসভায় নিয়ে এল। যখন দ্বিতীয়বার তাকে গহ্বরে ক্ষেপণ করার আদেশ দেওয়া হল, তখন মেয়েটি প্রার্থনা জানিয়ে বলল, "প্রভু, আপনার এই আদেশ ন্যায়বিরোধী, কারণ এক অপরাধে কাউকে দুবার দণ্ড দেওয়া যায় না। ব্যভিচারিণীরূপে একবার আমাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং আমাকে রক্ষা করেছেন। অতএব আবার আপনি আমাকে মৃত্যুর ভেতরে ঠেলে দিতে পারেন না।" বিচারক বললেন, 'ঠিকই বলেছ, তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হল।' এইভাবে সেযাত্রা মেয়েটি রক্ষা পেয়ে গেল।

প্রয়োগ

হে প্রিয় (My beloved), এই সম্রাট হচ্ছেন ঈশ্বর—যিনি বিধান দিয়েছেন যে কেউ যদি আত্মাকে (এই আত্মা খ্রীষ্টের সঙ্গে পরিণীত) কোনো গুরুতর পাপের দ্বারা কলুষিত করে—তাকে কোনো উঁচু পাহাড়ের চূড়ো, অর্থাৎ স্বর্গ থেকে ফেলে দেওয়া হবে। এই ভাবেই পিতা আদমের পতন হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর পুত্রের (খ্রীষ্টের) যন্ত্রণাবরণের মধ্য দিয়ে আমাদের রক্ষা করে

১। Gesta Romanorum, Trans. from Latin and Ed. by Swan and Hooper, Dover publications, Inc, Intr, P. XXXI

আসছেন। মানুষ যখন পাপ করে, ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ তাকে শাস্তি দেন না, কারণ তাঁর করুণা অনন্ত; "তাঁর করুণাতেই আমরা রক্ষা পাই"—সোজা অতল নরকে নিক্ষিপ্ত হই না।

কাহিনী : আটান্ন
প্রেমের একনিষ্ঠতা প্রসঙ্গে

কোনো রাজার এক পরমাসুন্দরী কন্যা একজন উদারহৃদয় ডিউকের সঙ্গে বিবাহিতা হন এবং তাঁদের কয়েকটি চমৎকার সন্তানও হয়। কিন্তু হঠাৎ ডিউক মারা যান। তারপর ডিউকের বন্ধুরা তাঁর বিধবা পত্নীকে পুনর্বার বিবাহ করবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে থাকেন। কিন্তু মহিলাটি উত্তর দেন : 'আমি আর বিবাহ করব না। আমার স্বর্গীয় স্বামী এতই মহান এবং দয়ালু ছিলেন, তিনি আমাকে এত বেশি ভালবাসতেন যে আমার মনে হচ্ছে—তাঁর বিচ্ছেদে আমি বেশিদিন বাঁচব না। যদি এমন অসম্ভবও হয়, তাঁকে আমি ভুলতেও পারি, তা হলেই বা কী হবে? না-হয় আবার বিবাহ করলাম, কিন্তু আমার দ্বিতীয় স্বামীরও যদি এইভাবে মৃত্যু হয়? তখন দ্বিতীয়বার এই শোক আমায় সহ্য করতে হবে—আমার দুঃখের ভার যেমন ছিল তেমনিই থেকে যাবে। আর এই দ্বিতীয় স্বামী যদি মানুষ হিসেবে পাষণ্ড হয়, তা হলে আমার সেই সদয় মহান স্বামীর স্মৃতি প্রতি মুহূর্তে আমাকে যন্ত্রণায় জর্জরিত করতে থাকবে। সুতরাং প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি যেমন আছি, তেমনিই থাকব।'

প্রয়োগ

হে প্রিয়, রাজা হচ্ছেন ঈশ্বর; রাজকন্যা হচ্ছে 'আত্মা'; যাঁর সঙ্গে তার পরিণয় হয়েছিল তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট।

কাহিনী : একশো চৌদ্দ
নরক থেকে মুক্তি প্রসঙ্গে

কোনো এক রাজার রাজত্বকালে জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি বাজারে বিক্রী করবার জন্য প্রতিদিনই জঙ্গলে কাঠ কাটতে যেত। একদিন যখন সে তার গাধাটি নিয়ে এইভাবে কাঠ সংগ্রহ করতে গেছে, তখন জঙ্গলের ঝোপঝাড়ের ভেতরে হোঁচট খেয়ে সে একটা গভীর গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়ল। অনেক চেষ্টা করেও গর্তটা থেকে সে ওপরে উঠতে পারল না।

এই গর্তের তলাটা জুড়ে বাস করত বিকটাকার এক ড্রাগন। গর্তের

ওপরদিকে থাকত কতগুলো সাপ আর ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় ছিল একটা গোল পাথর। ড্রাগন প্রতিদিন ওই পাথরটা চাটত আর তারপরে সাপগুলোও পাথরটাকে চেটে যেত।

হতভাগ্য কাঠুরে ব্যাপারটা দেখে চিন্তা করতে লাগল: 'এই গর্তে তো আমার অনেকদিন কেটে গেল। এখন মনে হচ্ছে, অনাহারেই আমি মারা পড়ব। অতএব ড্রাগন এবং সাপগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দেখি, কী হয়।'

এই ভেবে পাথরটা একটু চেটেই দেখল: কী চমৎকার! পৃথিবীর যত সুখাদ্যের স্বাদ সেই পাথরে, আর একটু চাটতেই তার পেট একেবারে ভরে গেল, শরীরে নতুন বল এসে গেল। এইভাবেই দিন চলছিল, হঠাৎ এল দারুণ ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত। সাপগুলো গর্ত থেকে উঠে পালালো, ড্রাগনটাও উড়ে যাবার উপক্রম করল। নিরুপায় কাঠুরে 'যা থাকে অদৃষ্টে' ভেবে ড্রাগনের ল্যাজ চেপে ধরল। ড্রাগন আকাশে উড়ল, কাঠুরে পড়ে গেল বনের ভেতরে।

পথ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একদল বণিকের সঙ্গে দেখা। তারা কাঠুরেকে রাস্তা দেখিয়ে দিল। নিজের শহরে ফিরে কাঠুরে তার এই অপূর্ব অভিজ্ঞতার বিবরণ রাষ্ট্র করল সকলের কাছে। এর কিছুদিন পরে সে মারা যায়।

প্রয়োগ

হে প্রিয়, এই রাজা হচ্ছেন আমাদের স্বর্গস্থ পিতা ; এই দরিদ্র কাঠুরে—এ হল সাধারণ মানুষ—যে স্বাভাবিক নিয়মেই অরণ্যে অর্থাৎ সংসারে প্রবেশ করে থাকে। গর্তটা হল ভয়াল পাপের গহ্বর। ঝড়-বজ্রপাত হচ্ছে 'স্বীকারোক্তি'—যার ফলে সাপরূপী পাপেরা এবং ড্রাগনরূপী শয়তানেরা পালিয়ে যায়। ড্রাগন হচ্ছে শয়তান, বণিকেরা হল ধর্মযাজকের দল।

তাৎপর্য প্রয়োগ ভালোই, কিন্তু খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীরা গোল পাথরটির কোনো ব্যাখ্যা দেননি, এবং শেষ পর্যন্ত শয়তানের ল্যাজ ধরেই কেন গর্ত থেকে বের হতে হল, তারও অর্থ সুস্পষ্ট নয়। ইতিহাস, লোককথা, পুরাণ কিংবা কিংবদন্তী—যে কোনো উপকরণকেই এইভাবে আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে গেলে এসব অসুবিধে কিছু দেখা দেবেই। ধর্মপ্রাণেরা 'গেস্তা'র তাৎপর্য থেকে যথোচিত শিক্ষালাভ করবেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু সাহিত্য-পাঠক এর বিচিত্র গল্প-সংগ্রহ থেকে প্রচুর আনন্দের উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবেন।

এই তিনটি গল্প থেকেই 'গেস্তা রোমানোরামে'র চরিত্র অনুধাবন করা যাবে এবং 'জাতকে'র সঙ্গে তার চরিত্র-সাধর্ম্যও বোঝা যাবে। বহু ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাকেই 'গেস্তা'য় এইরকম আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে ভূষিত করা হয়েছে, এগুলিও বেশ উপভোগ্য। ১৩৫ নম্বর গল্পে দুর্ভাগিনী লুক্রেশিয়ার কাহিনীটি বর্ণনা করা হয়েছে। সেক্সটাসের দ্বারা অপবিত্র হয়ে লুক্রেশিয়া নিজের গ্লানি মোচনের জন্য বক্ষে তলোয়ার বিদ্ধ করে আত্মহনন

ঘটিয়েছিলেন।[১] এই সকরুণ সুপরিচিত গল্পটিকে এইভাবে 'প্রয়োগে'র সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

"হে প্রিয়, লুক্রেশিয়া হচ্ছে আত্মা ; সেক্‌স্‌টাস্‌ হচ্ছে শয়তান ; টাকুইঁ-উনের প্রাসাদ হল মানবহৃদয়—যেখানে সে (শয়তান) ওই ভাবে প্রবেশ করে। আর তলোয়ারটি (লুক্রেশিয়ার) হল পরিতাপ।"

যদিও ধর্মপ্রচারের জন্যই 'গেস্তা' বিশেষভাবে রচিত এবং প্রধানভাবে এতে ধার্মিক সন্ন্যাসীরই হস্তক্ষেপ জাজ্বল্যমান, তা হলেও যে কথা বলেছি, বিশুদ্ধ কথারসের জন্যই মধ্যযুগীয় সাহিত্যের এটি অন্যতম স্মরণীয় গ্রন্থ। আমরা পূর্বেই দেখেছি—ইয়োরোপীয় সাহিত্যের এটি একটি অমূল্য ভাণ্ডার, 'গাই অব্‌ ওয়ারউইকে'র (কাহিনী সংখ্যক ১৭২) রোমান্স থেকে শুরু করে চসার, শেক্‌স্‌পীয়র, শিলার, পার্নেল ইত্যাদি বহু লেখকেরই আহরণক্ষেত্র এইখানে।

'গেস্তা রোমানোরাম' একই সঙ্গে ইয়োরোপীয় 'পঞ্চতন্ত্র' এবং 'জাতক'—হয়তো এর সঙ্গে 'কথাসরিৎসাগর'কে যুক্ত করে দিলেও অন্যায় হয় না।

এই সমস্ত খণ্ড রচনা ছেড়ে দিয়ে ইয়োরোপে ক্রমশ বৃহত্তর রোমান্স্‌ এবং অভিযানের কাহিনী জন্ম নিচ্ছিল। ইয়োরোপের বিশালতম রূপকথা—দৈত্যদানব সংহারের মহাকাহিনী, স্যাক্‌সন জাতির বিউউল্‌ফের উত্তরাধিকার থেকে পরে রোমান্সের পর রোমান্স জন্ম নিতে লাগল। 'জ্যাসন এবং সোনালি পশমে'র গল্পেই সম্ভবত নাইট এরান্টির প্রথম অঙ্কুর। ক্রুজেডের পরে হত্যা, রক্তপাত ও যুদ্ধজয়ের রোমান্স্‌ ক্রমশ শান্ত ও সংহত রূপে খ্রীষ্টীয় মহিমায় অনুরঞ্জিত হল। ফ্রান্স থেকে ইংল্যাণ্ডে এল রাজা আর্থারের গল্পমালা—পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্যার টমাস ম্যালোরী তাঁর **'Morte d' Arthur'**-এর সাহায্যে **'Arthurian cycle'**কে ইংরেজ জাতির নিজস্ব সম্পদে পরিণত করলেন।

রাজা আর্থার

রাজা আর্থার ও তাঁর মহিষী গুইনিভিয়ারের বৃত্তান্ত, ল্যান্সেলটের প্রতি গুইনিভিয়ারের আসক্তি, আর্থারের শোকাবহ মৃত্যু (টেনিসনের বিখ্যাত কবিতা) ; স্বর্গীয় পানপাত্র (The Holy Grail)—যার মধ্যে খ্রীষ্টের রক্ত সংরক্ষিত এবং শুদ্ধচিত্ত নাইট পার্সিভ্যালের কথা ; স্যার গাওয়ান, সবুজ পোশাক পরা নাইটের গল্প—এগুলি সর্বকালের পাঠকের অফুরন্ত আনন্দের উৎস। বিশেষ করে টেনিসনের **'Idylls of the King'** এদের অমর করে রেখেছে। ওভিদ যেমন গ্রীক-রোমক পুরাণের গল্পকে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছিলেন, টেনিসনের ভূমিকাও ঠিক তাই।

শার্লামেনের গল্পগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

কিন্তু আর্থার বা শার্লামেনের কথা আমাদের আলোচ্য নয়। এদের মধ্যে

১। শেক্‌স্‌পীয়রের বিখ্যাত কবিতা এই গল্পের কাছ থেকে মাত্র ঋণীই নয়—একেবারে আক্ষরিক ভাবেই ঋণী।

স্যার ওয়ালটার স্কট আর আলেকজান্দার দ্যুমার জন্যে আয়োজন রচিত হচ্ছে। নাইট-এরাণ্ট্রির গল্পে বিপন্ন-ত্রাণ, শৌর্যবীর্য এবং খ্রীষ্টভক্তির যে সমন্বয় সাধিত হয়েছে, তা পরবর্তী রোমান্সেরই বীজবপন।

এসব ছাড়া ফ্রান্সের 'Contes De'vots', ক্যাথলিক 'Mary Stories' ইত্যাদি নীতিগল্পও ছিল। পঞ্চতন্ত্র এবং বারলাম-জোসাফট ছাড়াও ভারতবর্ষ থেকে 'Sept Sages' বা সপ্তঋষির কাহিনীও ইয়োরোপে গিয়ে পৌঁছেছিল। কোনো ভারতীয় দার্শনিক "Named Sendebad, who was contemporary with king Kuru, and was the author of a work entitled, 'The story of the Seven Vizirs, the tutor, the young-man and the wife of king'।[১] তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে ইয়োরোপে 'Fabliaux'-এর বীজ বপন করলেন। গ্রীক রোমান্স্ 'Syntipus' থেকে স্পেনীয় 'Eaugnos e´ Assayamientos de las Mugeres' এবং হিব্রু 'Parables of Sendebar' পর্যন্ত এক নতুন পর্যায়ের সাহিত্য বিকশিত হল। পারস্যে ক্রীসাসের রাজসভা থেকে ঈশপ ইতোমধ্যেই 'পঞ্চতন্ত্র' আহরণ করে নিয়েছিলেন—জীবজন্তুর মাধ্যমে নীতিশিক্ষাদানেচ্ছু এই ফেব্‌ল সাহিত্য দেখা দিল : "By a shrewd device animals take the part otherwise assigned to men, and so the humour of the force of the moral are increased, its sting diminished।"[২]

কিন্তু এই বহু-বিচিত্র সাহিত্যের নীহারিকা থেকে ছোটগল্প তখনো মুক্তি নেয়নি। তার আত্মপ্রকাশে তখনো বেশ কিছু বিলম্ব ছিল। ক্যান্‌বির ভাষায় : "In the fourteenth century, it is sometimes hard to separate from romance; in the seventeenth, it runs to the novel; in the eighteenth it blends with the sketch of manners and of characters.[৩]

নভেল্লার আবির্ভাব

ছোটগল্পের পূর্ণ আত্মবিকাশ যখনই ঘটুক, ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতালীতে ভারতীয়, গ্রীক রোমান এবং কেল্‌টিক গল্প-কাহিনীর প্রভাবে একজাতীয় সংক্ষিপ্ত গদ্য রচনার আবির্ভাব হল। এর মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয় একটি লাতিন পুঁথির ভগ্নাংশ—"The Diciplina Clericalis", রচয়িতা পিয়েত্রো আলফন্সো (Pietro Alfonso); 'গেস্তা রোমানোরাম' এর কাছে ঋণী, তা আগেই বলা হয়েছে। এ ছাড়াও পাওয়া গেল "Il Libro dei Sette Savi" (অর্থাৎ 'Sept Sages) যা সম্পূর্ণ ভাবেই মূল ভারতীয় ভাষা থেকে অনূদিত।

'I Conti di Antichi Cavaliere' নামে আর একটি সংগ্রহও এ

১। Thousand and one Tales, E. Lane, Vol 8, P. 688

২। The Short Fables in English, H. H. Canby, P. 62

৩। Ibid. P. 301

সময়ে পাওয়া যায়। মোট কুড়িটি গল্প আছে এই সংকলনে। ক্রুজেডের মুসলিম রাজা মহৎ চরিত্র সালাদীনকে আশ্রয় করে এতে 'Cycle of Saladino' আছে—গ্রেকো-রোমান ইতিহাস আছে, শার্লামেন এবং আর্থারের গল্পও আছে।

এই 'Novellino' সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য 'Le Conte Novelle'—বুদ্ধি ও বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল।

"The unknown author, writing in the thirteenth century draws his subjects from the most diverse sources—from biblical history and legends, from classical antiquity, from the stage cycles of Brittany, from mythology and from animal fables. He also relates several anecdotes concerning the historical figures of the Middle Age, throws a clear light on the matters of everyday life of his time."[১]

কিন্তু সবচাইতে বিশিষ্ট ও বৃহত্তম সংকলন হল 'Dal Novellino'—দুশোর ওপর গল্প আছে এতে। এগুলির ইংরেজি অনুবাদ পাওয়া যায় না, মূল গল্পগুলির কিছু নমুনা দেওয়া হল ঃ

Dell Vendetta Ke Fece D'uno Barone
Di Carlo Magno

Carlo Magno essendo ad oste sopra i Saracini, Venne a morte, facie testamento, intra ll' altre cose guidic'o suo cavallo sue arme a' poveri. Quelli si tenne e non ubbidio Carlo a torno a llui e disse : "Otto generationi di pene m' ai satte sofferire in Purgatorie per die, per lo Cavello e ll arme ke ricievesti ; ma gratia del singnogie mio, io ne vo purgato in cielo, e tu lla camperraiarmarmente". Che', udenti centomela genti, venne ue trono da cielo et andonne con lui in abisso. (Dal Novellino)

গল্পে সারাসেন জাতির রাজ-অধিরাজ কার্লো ম্যাগনো বা শার্লামেনের মহিমার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। মৃত্যুকালে তিনি তার যথাসর্বস্ব কি অস্ত্র-শস্ত্র এবং অশ্ব পর্যন্ত বিক্রয় করে তার লব্ধ অর্থ দরিদ্রদের দান করতে বলেছেন। তাঁর সহচরেরা এতে আপত্তি করলে শার্লামেন জানিয়েছেন, এই অস্ত্র এবং অশ্বাদির জন্য আটজন্ম তিনি নরকবাস করেছেন ; এইবার এগুলি দান করে দিয়ে তিনি নরকের হাত থেকে নিষ্কৃতি চান।

অধিকাংশ 'Novellino' বা ছোটগল্প এই রকম সংক্ষিপ্ত এবং

১। Early Italian Literature, Earnest Grillo, Vol II, p. XXX

নীতিগর্ভ। রূপকথার ধরনেও দুটি একটি লেখা হয়েছে। যেমন: "A uno re nacque un figlinolo. I savi strologi providero k'elli stesse anni dieci ke nnon il sole. Allora il fecie notricare e guardare in tenebrose spelonke Dopo il tempo detto lo facie trarre furoi, et innauzi a llui facie mettere molte belle donzelle, ……e dettloli le donzelle essere domini —"। অর্থাৎ কোনো রাজার একটি পুত্র জন্ম নিলে দৈবজ্ঞরা জানালেন, দশ বছর পর্যন্ত এ সূর্যের মুখ দেখবে না। রাজার আদেশে কুমারকে একটি অন্ধকার গুহায় সশস্ত্র প্রহরায় রাখা হল। কিছুদিন পরে রাজপুত্র বাইরে মুখ বাড়াতেই কয়েকটি সুন্দরী বালিকাকে দেখতে পেলেন…হঠাৎ সেই সুন্দরীরা একদল দানবে পরিণত হল, ইত্যাদি।

ইয়োরোপে যখন এইভাবে রোমান্স-ফেবল-নভেলার প্রস্তুতি-পর্ব চলছে, তখন উত্তর চীন থেকে মাথা তুলছিল এক দুর্ধর্ষ তাতার জাতি। মঙ্গোলিয়ার দিগ্‌বিস্তীর্ণ তৃণপ্রান্তরে অশ্বপালন করে যারা জীবিকা নির্বাহ করত, তাদের মধ্যে আবির্ভাব ঘটল চেঙ্গিস্‌ বা জেঙ্গিস খানের। চীন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে চেঙ্গিস পিকিং দখল করলেন, তুর্কীস্থান ও পারস্য হয়ে, ভারতবর্ষের মাথার উপর দিয়ে, দক্ষিণ রাশিয়া, হাঙ্গেরী, সাইলেসিয়া পর্যন্ত রক্তের বন্যা বইয়ে দিলেন তিনি—ঘোড়ার ক্ষুরে ক্ষুরে এক দেশের নরমুণ্ড আর এক দেশে গড়িয়ে গেল। লক্ষ শবের জয়স্তম্ভ তুলে বিশাল মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হল।

এই বংশের অন্যতম হলেন কোল্‌রিজের স্বপ্ন-নায়ক "Kublai Khan in Xanadu"। চীনের সম্রাট। বিরাট তাঁর দরবার, বিপুল তাঁর ঐশ্বর্য। তাঁরই মহিমচ্ছায়ায় একদিন গিয়ে পৌঁছুলেন ভেনিসের পরিব্রাজক নিকোলো, পোলো, মাতেয়ো পোলো আর তরুণ মার্কো পোলো। কুবলাই খাঁর অনুগ্রহ লাভ করলেন মার্কো, তিন বছর থাকলেন 'ইয়াংচাউয়ে'র শাসনকর্তা, ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করলেন, তারপর দেশে ফিরে গেলেন।

তাঁর বিচিত্র ভ্রমণ-কথা, তাঁর অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, দেশ-বিদেশের অভিনব কাহিনী—সেদিন ইতালীয়দের বিস্ময়ে কৌতূহলে চকিত করে তুলেছিল। তারপর ভেনিস আর জেনোয়ার জলযুদ্ধে মার্কো হলেন জেনোয়ার কারাগারে বন্দী, আর সেই বন্দীশালায় রাস্তিসিয়ানোর কাছে তিনি বিবৃত করলেন তাঁর অপরূপ কথা—রাস্তিসিয়ানো সে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করলেন কালি-কলমে। মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—'লক্ষ লক্ষ টাকার কথা'—'Il Milione' পৃথিবীর সামনে আত্মপ্রকাশ করল। কিভাবে তাঁরা কুবলাই খাঁর দরবারে পৌঁছেছিলেন, এই রকম তার বিবরণ ঃ

"Furono due nobils cittadini di Vinegia, ch' ebbe nome I'uno messer Matteo I'altro messere Nicolao, i quali andrao al Gran Cane signore di tulli i tartari, e le molta novitadi che

trovaro si diranno piu innanzi, E quali guinti che furo alla terra il Grande Cane, sentends la loro venuta, fecesegli venire innanzi, e fecene, grando allegrezza e festa, pero che nonavea mai piu' veduto niuno eatino—"

সত্যে, কল্পনায়, স্বপ্নে, বাস্তবে এই কাহিনী ইয়োরোপের নেশা ধরালো —দুশো বছর পরে এরই টানে ভেনিসের বন্দর থেকে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছিলেন খ্রীস্তোফার কলম্বাস। সেই আলোর ইশারায় বীরেরা বেরুল জয়যাত্রায়—শিল্পী বেরুলেন মানস-ভ্রমণে।

এই শিল্পীদেরই একজন অভিনিবেশ সহকারে পড়েছিলেন মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, তাঁর মনের মধুচক্র ভরে নিচ্ছিলেন গ্রীক-রোমক পুরাণকথা থেকে, পেত্রোনিয়াস-আপুলিয়াস গেস্তা রোমানোরাম থেকে, বাণিজ্য-বাতাসে এবং পর্যটকের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে-আসা প্রাচ্য পৃথিবীর নানা কাহিনী থেকে। ইতালীয় নভেলার শীর্ণ ঐতিহ্যকে দুরন্ত প্লাবনে পরিপূর্ণ করে দেবার জন্য আর ছোটগল্প লেখকরূপে পৃথিবীর অগ্রনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করবার জন্য, নিঃশব্দ প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি।

এই শিল্পী—গিয়োভানি বোক্কাচ্চো।

পাঁচ

তিন চূড়া : বোকাচ্চো, চসার ও রাবল্যা

"O all enjoying and all-blending sage,
Long it be mine to con thy mazy page,
Where half conceal'd the eye of fancy views
Fauns, nymphs, and winged saints, all gracious to thy muse!
Still in thy garden let me watch their pranks,
And see in Dian's vest between the ranks
Of the trim vines, some maid that half believes
The vestal fires of which her lover grieves
With that sly satyr peeping through the leaves—"

—Coleridge, The Garden of Boccacchio

ফ্লোরেন্স-আর্ণোর স্বপ্নবিভোর কোলরিজের কল্পনা যাঁর উদ্যানে অভিসার করে বেড়িয়েছে, সেই গিয়োভানি বোক্কাচ্চো (ইংরেজী মতে John Boccace) কাব্যের চর্চা করছিলেন, লিখে চলেছিলেন রোমান্স। এমন সময় তাঁর জীবনে আবির্ভাব ঘটল নায়িকা ফিয়ামেত্তার। অভিজাত-নন্দিনী ছলনাময়ী ফিয়ামেত্তা তাঁকে বঞ্চনা করলেন, অন্তর-যন্ত্রণায় বোক্কাচ্চো রচনা

করলেন 'Filostrato'—যা থেকে ট্রলয়াস আর ক্রেসিডার প্রেরণা পেয়েছিলেন জিওফ্রে চসার। ইতোমধ্যে ইতালীতে মহামারী ব্ল্যাক্ ডেথের ভয়াল দুঃস্বপ্ন দেখা দিল, সেই মৃত্যু-তরঙ্গে ফিয়ামেত্তা হারিয়ে গেলেন। ব্যক্তিজীবনেও তখন বোক্কাচ্চোর দুর্গতির পালা চলছিল। মহামারীর প্রভাব, ফিয়ামেত্তার মৃত্যু, ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য—সব কিছু মিলে মনোভঙ্গিতে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল বোক্কাচ্চোর। বাস্তবের মাটিতে নামলেন তিনি, আঁকতে চাইলেন জীবনের ছবি, আশ্রয় করলেন গদ্য, লিখলেন 'দেকামেরন'। ছোট-গল্পের পূর্ণ আলোকোৎসবে এতদিন ধরে চলছিল দীপ সাজানোর পালা—বোক্কাচ্চো এইবার তাতে অগ্নিবিন্যাস করলেন।

তখন ইতালীয়, তথা ইয়োরোপীয় রান্যাসাঁসের প্রাগুষা। আর্নোর শিল্পশালার দ্বারে সবেমাত্র করাঘাত শুরু হয়েছে। দান্তের কবিকল্পনা তখন ইন্‌ফার্নোর তামসী জগতের পরপ্রান্তে জ্যোতির্ময়ী বিয়াত্রিচের সন্ধানে মুক্তপক্ষ, তখন লরার উদ্দেশে ধ্বনিত হচ্ছে বিভোর-প্রেমিক পেত্রার্কের সনেট। সেই সময়, সেই স্বর্গ-নরক পরিক্রমা আর ভাব-বিহ্বলতার যুগে, সাধারণ জীবনের এই সরল কাহিনী, এই 'সহজ সুরে সহজ কথা' কেমন লেগেছিল বলা যায় না, কিন্তু সাহিত্যের মহিমক্ষেত্রে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত তাঁরা এই সর্বজনের বস্তুকে খুব প্রীতির দৃষ্টিতে দেখেননি। দেকামেরন রচনার প্রায় বাইশ বছর পরে বোক্কাচ্চোর পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু পেত্রার্ক লিখেছেন ঃ

The book you have composed in our maternal tongue probably during your youth, has fallen into my hands, I do not know by what chance. I have seen it but, if I should say I had read it, I should lie. The work is very long, and it is written for the Vulgar, that is to say, in prose."[১]

বিনীত শিষ্যের মতো বোক্কাচ্চো পেত্রার্কের উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন ইতোপূর্বেই। পণ্ডিত, বয়োজ্যেষ্ঠ পেত্রার্কের নির্দেশে তিনি ইতর-রুচি-সুলভ (!) গদ্য-সাহিত্যের পথ ছেড়ে ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্যের মৃত-জগতে প্রবেশ করে প্রায় অস্থি-বিদ্যার চর্চা করতে লাগলেন। দান্তে-পেত্রার্কের যুগকে ইতালীয় সাহিত্যের দুর্দিন বলা হয়; দুর্দিন যে নিঃসন্দেহ, তার প্রমাণ সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্র থেকে শবের জগতে বোক্কাচ্চোর নির্বাসন। বিনিময়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠা বোক্কাচ্চো অবশ্যই পেয়েছিলেন—ফ্লোরেন্সে দান্তে অধ্যাপকের পদ প্রথম অলংকৃত করেছিলেন তিনি। কিন্তু পাণ্ডিত্যের তমোগর্ভে ইয়োরোপের গদ্য কথাসাহিত্যের প্রথম স্রষ্টার এই অপমৃত্যু যে কতখানি শোকাবহ, সে প্রসঙ্গে স্যার ওয়াল্‌টার র‍্যালে বলেছেন ঃ

"The greatest novelist of the modern world was taken in hands by a scholar and in conformity with academic usage

১। **Boccaccio, (Some Authors), Sir Walter Raleigh.**

was made to pursue researches into the genealogy of the ancient gods."[১]

'আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক' প্রাচীন পুঁথির টীকা-ভাষ্য রচনায় ব্যাপৃত হলেন। তাঁর স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবণতা থেকে অপসারিত হয়ে প্রবেশ করলেন ক্ল্যাসিক্যাল গবেষণার শ্বাসরোধী অন্ধকূপের ভিতর।

তবু দেকামেরনে তিনি যা দিয়ে গেছেন—সারা পৃথিবী তার কাছে কৃতজ্ঞ। বোক্কাচ্চো ঠিক একালের ছোটগল্প লেখেননি—সে আশা করাও যায় না। 'দশকুমার', 'নরবাহন দত্তের গল্প' বা আরব্য রাত্রির স্রোতঃপ্রবাহে দেকামেরনের গল্পগুলি উপন্যাস, রোমান্স, ছোটগল্পের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। তাঁর রচনা থেকে দেশে দেশে নাট্যকার,, কবি, কথাসাহিত্যিক প্রেরণা পেয়েছেন, প্রলুব্ধ হয়েছেন শেক্‌স্‌পীয়রের মতো ব্যক্তিত্ব, কীট্‌স লিখেছেন তাঁর আশ্চর্য কবিতা **"Isabell"**। বোক্কাচ্চো, রেন্যাসাঁস্ সাহিত্যের গঙ্গোত্রী প্রবাহ।

মহামারীর অতি বাস্তব, অতি ভয়ঙ্কর বর্ণনার মধ্যে দিয়ে দেকামেরন আরম্ভ হয়েছে। এই বর্ণনাটির তুলনা নেই—এটি লেখবার জন্য পৃথিবীর যে কোনো প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকই গর্ব অনুভব করতে পারতেন। এই 'কালো মৃত্যু'র দুর্লগ্নে সাতটি তরুণী এবং তিনজন তরুণ গ্রামাঞ্চলে একটি শূন্য প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছিল। অবসর বিনোদনের জন্যে তারা দশজনে দশ দিন ধরে প্রত্যেকে যে একটি করে গল্প বলেছে—তাদেরই সংকলন এই শত গল্প ঃ দেকামেরন।

তা সত্ত্বেও শিল্পী বোক্কাচ্চোর নিজস্ব কৃতিত্ব অসীম। কী বিপুল সম্ভার তিনি সাজিয়ে দিয়েছেন এদের মধ্যে। এই দশ দিনে দশজন পর্যায়ক্রমে রাণী বা রাজা হয়েছে এবং প্রথম দিনটি বাদে অন্যান্য প্রত্যহ রাণী বা রাজা পূর্ব-ভাগেই গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন করে দিয়েছে। ফলে গল্পগুলি যথেচ্ছভাবে বর্ণিত হয়নি, তারা সুকৌশলে বিভিন্ন পর্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। দেকামেরনে একটা সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ আছে। যেমন দ্বিতীয় দিনে, **"Under the governace of Filomena is discoursed of those who after being baffled by divers chances have won at last to a joyful issue beyond their hope."**

দৈব, চাতুর্য, ব্যর্থ প্রেম, সফল প্রেম, উপস্থিত বুদ্ধি, নির্বোধ স্বামীকে চতুরা স্ত্রীর ছলনা, নর-নারীর পারস্পরিক শাঠ্য, প্রত্যেকের প্রিয় গল্প এবং অন্যান্য নানা বিষয়ক রম্যকথা—মোটামুটি এইভাবে দেকামেরন বিভক্ত। অদৃষ্টের বিচিত্র লীলায়, শঠতায় ও বুদ্ধিমত্তায়, প্রেমে ও বাসনায়, লোকচরিত্রের বিচিত্র প্রকাশে, নাটকীয় সৌন্দর্যে এবং সর্বোপরি গল্প রচনার অনায়াস কৌশলে দেকামেরনের রত্ন-ভাণ্ডার উত্তরকালের অগণিত সাহিত্য-পাঠকের লুব্ধ-দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সরল অথচ রসসিক্ত তাঁর ভাষা, কৌতুকে রঞ্জিত, প্রতিভায়

১। Raleigh. Some Authors.

উজ্জ্বল। 'C'est une grande habilete´ que de savoir cacher son habilete´—শিল্পকে প্রচ্ছন্ন করে রাখাই যে শ্রেষ্ঠ শিল্প, দেকামেরন পড়লেই তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কাহিনীগুলিকে বিবৃতির গণ্ডী থেকে মুক্ত করে যদি আর একটু উপযুক্তভাবে বিন্যস্ত করতে পারতেন বোক্কাচ্চো, যদি আর কিছু প্রাণধর্মী সংলাপ প্রয়োগ করতে পারতেন, যদি রুচিকে আর একটু নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন তিনি, তা হলে অতি বড় ছিদ্রান্বেষী সমালোচকও তাঁকে জয়মাল্য দিতে বাধ্য হতেন।

বোক্কাচ্চোর চাতুর্যের নিদর্শন হিসেবে প্রথম দিনের নবম গল্পটিই স্মরণ করা যাক। গল্পটি মোটামুটি এই: তীর্থযাত্রার পথে একটি ভদ্রমহিলা সাইপ্রাসে এসে উপস্থিত হন। সেখানে স্থানীয় কয়েকটি দুর্বৃত্ত তাঁকে কুভাষা প্রয়োগে অপমান করে। তিনি রাজার কাছে বিচার প্রার্থনার অভিলাষ জানালে জানতে পারেন যে রাজা অতিশয় কাপুরুষ এবং মেরুদণ্ডহীন; কেউ যদি স্বয়ং রাজাকেই অপমান করে তাহলে তাকেও দণ্ড দেবার মতো সাহস নাকি রাজার নেই।

শুনে ভদ্রমহিলা রাজার কাছে ছুটে গেলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, প্রভু, অন্যের দ্বারা অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হয়েও আপনি কি ভাবে সেটি নির্বিচার-চিত্তে সহ্য করেন তার কৌশলটি আমাকে শিখিয়ে দিন। তাহলে আমিও এই অপমানের জ্বালা ভুলতে পারব।

মহিলার এই কথায় ভীরু নির্জীব রাজার যেন চৈতন্যোদয় হল, সহস্র ধিক্কারের চাইতেও অনেক বেশি ফলপ্রসূ হল এই নির্দয় ব্যঙ্গের আঘাত। তৎক্ষণাৎ রাজশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হলেন তিনি, মহিলার অসম্মানকারী দুরাচারদের দণ্ড দিলেন এবং উত্তরকালে কঠিন হাতে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

গল্পটি ছোট, কিন্তু উজ্জ্বল।

বোক্কাচ্চোর কথাসম্ভার থেকে প্রহসন, নাটক, রোমান্স, উপন্যাস, ছোট গল্প—সব কিছুরই উপকরণ পাওয়া যায়। একটি চমৎকার প্রহসনের উপাদান দ্বিতীয় দিনের পঞ্চম কাহিনী থেকে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাক:

বণিক আন্দ্রুচ্চো নেপলসে এসে একটি জুয়াচোর মেয়ের পাল্লায় পড়ল। মেয়েটি একটি অদ্ভুত গল্প তৈরি ক'রে—বোন বলে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে নিমন্ত্রণের ছলে আন্দ্রুচ্চোকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এল, তারপর সর্বস্বান্ত করে সুকৌশলে আবর্জনার স্তূপের মধ্যে ফেলে দিলে। সারা গায়ে বীভৎস দুর্গন্ধ—নিঃস্ব আন্দ্রুচ্চো যখন পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছে, তখন দুজন চোরের সঙ্গে তার দেখা। সেদিন নেপলসের মৃত আর্চবিশপকে সমাধিস্থ করা হয়েছে, আর আর্চবিশপের আঙুলে রয়েছে অতি মূল্যবান একটি চুনীর আংটি। এই দুই চোর আংটিটি চুরি করতে চলেছে। নিরুপায় আন্দ্রুচ্চো তাদের সঙ্গেই যোগ দিলে। পথে একটি কুয়োয় নেমে গা-ধোয়া এবং দুজন নৈশ-প্রহরীর ভূতের ভয়ে পালানোর কৌতুক-কাহিনীর পরে তারা গিয়ে বিশপের সমাধিতে পৌঁছুল। সমাধি-গহ্বরের ঢাকনা খুলে চোরেরা

আন্‌দ্রুচ্চোকেই ভিতরে নামিয়ে দিলে চুনীটি তুলে আনবার জন্যে। আন্‌দ্রুচ্চো জানত, আংটিটি ওদের দিলেই ওরা তাকে ভিতরে ফেলে পালিয়ে যাবে। সুতরাং আংটি সে দিতে রাজী হল না। চোরেরা তখন রাগ করে সমাধি-গর্তের ঢাকনা আটকে দিয়ে চলে গেল। ভয়ে আতঙ্কে আন্‌দ্রুচ্চো যখন মুমূর্ষু, সেই সময় গীর্জার একদল পুরোহিতও সেই চুনীটি চুরি করতে এসেছে। ঢাক্‌না খুলে যেমনি তাদের একজন সেই গর্তে পা নামিয়েছে, অমনি তলা থেকে আন্‌দ্রুচ্চো তার পা চেপে ধরল। মৃত বিশপ ভূত হয়ে পা টেনে ধরেছে মনে করে লোকটা দানবিক চিৎকার করে উঠে দৌড় লাগাল —সঙ্গীরাও ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে পথ পেলো না। ঢাকনার মুখ খোলা পেয়ে পরমানন্দে উঠে পড়ল আন্‌দ্রুচ্চো—পরে চুনীটি বেচে যে দাম সে পেয়েছিল, তা তার অপহৃত অর্থের চাইতে অনেক বেশি।

মূল গল্পটির রস এবং সৌন্দর্য এ থেকে কিছুই বোঝানো গেল না। আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপের গল্প একটু মনে আসে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে এই কাহিনীর বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। যেমন উপভোগ্য এর বর্ণনা, তেমনি উচ্ছ্বসিত কৌতুক এবং তারও বেশি নাট্যগুণের সমন্বয়। দান্তের ঊর্ধ্বগতি যে-যুগে ইনফার্নোর তামস-লোকে পাঠকের শ্বাস রুদ্ধ করে আনছে, আর পাণ্ডিত্য ও কবি-কল্পনার এক সীমাবদ্ধ বৈদগ্ধ্যের জগৎ রচনা করেছেন পেত্রার্ক, সেই-কালে বোক্কাচ্চোর গল্প জল-মাটি-জীবনের আস্বাদ—পুলকিত সূর্যগাহন। বোক্কাচ্চো রান্যাসাঁসের প্রথম প্রভাত-কণ্ঠ, তিনি মানুষ আর রৌদ্রালোকের শিল্পী।

ওয়ালটার র‍্যালে খুব সুন্দর করে বলেছেন, বোক্কাচ্চোর অভিধানে মূর্খের জন্যে কোনো ক্ষমা নেই। নির্বোধদের সর্বত্রই বিধ্বস্ত করেছেন তিনি। আধুনিক রুচির দিক থেকে এই ধরণের অধিকাংশ গল্পই কিছু অশালীন বলে বোধ হবে—কিন্তু তাৎস্থানিক এবং তাৎকালিক মন নিয়ে, সাম্প্রতিক রুচিবোধকে একটু সংকুচিত করে, লেখকের রসচক্রে আসন পাতলে—"He promises everybody a good time."[১]

সমাজের নরনারী, রাজা, সামন্তবৃন্দ, ধর্মযাজক—এদের প্রত্যেকের সংগুপ্ত ব্যাধিকে যেন রঞ্জন-রশ্মি দিয়ে দেখতে পেয়েছেন বোক্কাচ্চো—নিষ্করুণ ব্যঙ্গের দ্বারা তাদের উপরে অস্ত্রোপচার করেছেন। এইখানেই তিনি সার্থক বস্তুতান্ত্রিক। ফরাসী মতে, ব্যঙ্গাত্মক উদ্‌ঘাটন রিয়্যালিজ্‌মেরই নামান্তর—সেদিক থেকে বোক্কাচ্চো সফলতম শিল্পী।

বিশেষভাবে ধর্মযাজক, গীর্জা এবং 'নানারি'গুলিকে তিনি নির্দয়তম

১। "The entire Decameron, like other great things in literature, may be read with delight and a sound conscience by anybody who has brain enough to know his right hand from his left."

—Macy, The story of the World's Literature, P, 205

আঘাত দিয়েছেন। মধ্যযুগে গীর্জা ও সেবিকা-ভবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে পাপ প্রবেশ করেছিল, তথাকথিত ধর্মসংরক্ষকের দল ধর্মের নামে যে ব্যভিচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল—বোক্কাচ্চো স্পষ্ট ভাষায় সে সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"Fraiars of old were very pious and worthy men, but those who nowadays style themselves friars and would be held such have nothing of the monk but the gown !"[১]

এই থেকেই প্রিন্সেস্ মার্গুইর‍্যাৎ প্রেরণা পেয়েছিলেন 'হেপ্তা-মেরনের', বাল্জাক লিখেছিলেন "Droll Stories", ফরাসী বিপ্লবের বৈতালিক এন্সাইক্লোপিডিস্টরা চার্চের বিরুদ্ধে বজ্রপাণি হয়ে উঠেছিলেন।

ধর্মযাজকদের এবং সেবিকাদের চরিত্র নিয়ে অনেক ক'টিই গল্প লিখেছেন বোক্কাচ্চো। চতুর্থ দিনের দ্বিতীয় গল্পে দেখা যায়, ফ্রা আল্বার্তো নামীয় ধর্মযাজক সেন্ট্ গেব্রিয়েলের ছদ্মবেশ ধরে মাদাম লিসেত্তার কাছে অভিসারে যাচ্ছে। গল্পটির সঙ্গে পঞ্চতন্ত্রের সেই বিষ্ণুরূপী কৌলিকের কাহিনীর কিছু মিল আছে। কিন্তু সেকথা নয়। তথাকথিত ফ্রায়ার-অ্যাবট-বিশপেরা দুর্নীতি ও দুষ্প্রবৃত্তির কোন্ স্তরে নেমেছিলেন—এই গল্পটি থেকেই তা বোঝা যাবে। সপ্তম দিনের তৃতীয় গল্পে ফ্রা রাইনাল্দোর চাতুর্য সহকারে আত্মরক্ষা এবং প্রেমিকার প্রাণরক্ষার বিবরণ এরই আর এক দিক।[২] তৃতীয় দিনের প্রথম গল্পে মাসেত্তোর মূক-বধির সেজে অভিনয়ের কাহিনীতে কন্ভেন্টের সন্ন্যাসিনীদের নৈতিক শিথিলতার একটি কুৎসিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

কৌতুক এবং লালসার কাহিনীই বোক্কাচ্চোর একমাত্র উপজীব্য নয় ; প্রেম, আত্মত্যাগ, পুরুষকার এবং শৌর্যবীর্যের নানা মনোরম বৃত্তান্তও তিনি শুনিয়েছেন। তাদের উদারণ দেওয়া অসম্ভব, উদাহৃতির প্রলোভন দমন করা আরো শক্ত। তৃতীয় এবং চতুর্থ দিনের অনেক ক'টি গল্প থেকেই পূর্ণাঙ্গ রোমান্স এবং উপন্যাসের সৃষ্টি হতে পারে। দশম দিনের স্যালাদিনের কাহিনী থেকে একটি অতিকায় উপন্যাস গড়ে তোলা সম্ভব।

প্রেমের জন্যে আত্মত্যাগের একটি মহান কাহিনী চতুর্থ দিনের প্রথম গল্পটি। স্যালার্নোর যুবরাজ তানক্রেদের কন্যা ঘিস্মোন্দা রাজপরিবারের পরিচারক গিস্কার্দোর প্রেমে পড়ে। গিস্কার্দোর রূপ, গুণ, বিদ্যাবুদ্ধি সবই ছিল, ছিল না কেবল বংশমর্যাদা। তাই দুজনের মধ্যে গোপন-প্রণয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হল। কিন্তু যথাকালে তানক্রেদ সব জানতে পারলেন এবং পারিবারিক অবমাননার ক্রোধে নির্মমভাবে গিস্কার্দোকে হত্যা করে তার উৎপাটিত হৃৎপিণ্ড পাঠিয়ে দিলেন ঘিস্মোন্দার কাছে। ঘিস্মোন্দা জলে

১। The Dacameron, Trans. by John Payne, Part I, P. 208

২। 'হিতোপদেশে'র সমুদ্রদত্ত বণিক ও লাবণ্যপ্রভার কাহিনী স্মরণীয়।

এবং অশ্রুতে অভিষিক্ত করলেন তাঁর বল্লভের হৃৎপিণ্ড, তারপর সেই জলের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত করে পান করলেন। অনুতপ্ত তানক্রেদ্ যখন ছুটে এলেন, তখন ঘিস্মোন্দা সেই হৃৎযন্ত্র বক্ষে ধারণ করে পরলোকে যাত্রা করেছেন। চতুর্থ দিনের পঞ্চম গল্পে দুর্ভাগিনী 'লিসাবেত্তা'র প্রায় অনুরূপ কাহিনীটি করুণ ও ব্যর্থ প্রেমের বেদনায় বিশ্বসাহিত্যে স্থানলাভ করেছে। প্রেমিকের ছিন্ন মুণ্ডটি সামনে নিয়ে অনাহারে অনিদ্রায় লিসাবেত্তা পলে পলে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছে।

কীট্সের যে ইসাবেলার কথা আমরা আগেই বলেছি, 'লিসাবেত্তা'র গল্পটিই তার উপকরণ। কীট্স্ তাঁর দীর্ঘ গাথা কবিতাটির নাম দিয়েছেন **Isabella or the Pot of Basil (A story from Boccaccio)**। **"Eloquent and famed Boccaccio"**—কে মুগ্ধ অভিনন্দন জানিয়ে কীট্স্ এই মর্মচ্ছেদী কাহিনীকে অপূর্ব কাব্যরূপ দিয়েছেন। লোরেন্‌জোর ছিন্নমুণ্ড সম্মুখে নিয়ে ইসাবেলার আত্মত্যাগের করুণ ছবিটি কীট্সের কলমে এই রকম ফুটেছে :

> **"And so she pined, so she died forlorn,**
> **Imploring for her Basil to the last.**
> **No heart was there in Florence but did mourn**
> **In pity of her love, so overcast.**
> **And a sad ditty of this story born**
> **From mouth to mouth through all country**
> **pass'd ;**
> **Still it the burthen sung—'O cruelty,**
> **To steal my basil pot away from me."**
>
> **(Isabell, LXIII)**

'শুকসপ্ততি'র আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলেছি, 'দেকামেরনে'র সঙ্গে বইখানির সম্পর্কে অতি ঘনিষ্ঠ। যে রহস্যময় পথ বেয়ে বুদ্ধ-কাহিনী বারলাম ও জোসাফটে রূপান্তরিত হয়, সেই পথেই শুকসপ্ততির অনেক গল্প বহুগ্রাহী বোক্কাচ্চোর ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে 'দেকামেরনে' পরিবেষিত হয়েছে। 'জরস ও দেবিকা'র যে গল্পটি 'শুকসপ্ততি' থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেটিকে প্রায় হুবহু পাওয়া যাবে 'দেকামেরনের' সপ্তম দিনের নবম গল্পে। 'শুকসপ্ততি'র ১০ সংখ্যক গল্পটিও তাই। ১৩ সংখ্যক গল্পটি দেকামেরনের সপ্তম দিনের চতুর্থ কাহিনীতে একেবারে আক্ষরিক ভাবেই লভ্য। কৌতূহলী পাঠকের জন্যে 'দেকামেরনের' কিছু অংশ, এবং 'শুকসপ্ততি'র সংস্কৃত গল্পটি তুলে এখানে দেওয়া হল।

শুকসপ্ততি :

অস্তি বিদিশা নাম পুরী। তস্যাং জনবল্লভো নাম বণিক্। তস্য ভার্যা মুগ্ধিকা নাম চপলা স্বৈরিণী। যদা চ তথাতিশয়েন বিদূষিতোঽয়ং তদা

বন্ধনাং কথয়ামাস যদিয়ং বহিঃশায়িনী।

যদা চ তৈরেবমুক্তা তদা তয়াপ্যুক্তম্—অয়মেব বহিঃশায়ী সদৈব। মাং মুধাপবাদয়সি।

ততস্তৈর্মিলিত্বা নির্বন্ধঃ কৃতং "যঃ কোঽপি অদ্যপ্রভৃতি বহিঃশায়ী সোঽপরাধী"। এবং নির্বন্ধে কৃতেঽপি সা সুপ্তং পতিং বিহায় বহির্গতা। তস্যাং চ বহির্গতায়াঃ স পতির্দ্বারং দত্ত্বা সুপ্তঃ। যদা চ বহিঃ ক্রীড়াং কৃত্বা সমাগতায়াঃ স পতি দ্বারং নোদ্‌ঘাটয়তি তদা সা কূপে দৃশদং (প্রস্তরং) ক্ষিপ্ত্বা দ্বারদেশ এব স্থিতা। পতিরপি কূপে পতিতা ভবিষ্যতীতি জ্ঞাত্বা-দ্বারমুদ্‌ঘাটয় বহিঃ নির্গতঃ। তদা সা দ্বারং পিধায় মধ্যে স্থিতা। সোঽপি চ বহিঃ স্থিতো 'হা প্রিয়ে' এবং বদন্মহতা শব্দেন রোদিতুমারব্ধঃ। সাপি বিগোপকভয়াদ্‌বহির্নিগত্য পতিং মধ্যে নিনায়। ততস্তন্মিথুনং পরস্পরং নির্বন্ধং চকার। যদদ্য-প্রভৃতি ময়া ত্বয়া চ বিসংবাদো ন বিধেয়ঃ।

বোক্কাচ্চো সংক্ষিপ্ত এবং বিবৃতিমূখ্য এই গল্পটিকে বিস্তৃত ও সাহিত্য-রসায়িত করেছেন। তোফানোর স্ত্রী ঘিতা অভিসার থেকে ফিরে এলে (ইংরাজি অনুবাদই তুলে দিলাম, পাঠকেরা মার্জনা করবেন):

"She finding the door bolted, was exceedingly uneasy, and tried several times to force it open. Which after Tofano had suffered for some time, he said, 'Madam, you give yourself trouble to no purpose, for here you shall not come: go back, if you please, for you shall enter no more within these doors." ঘিতার অনেক মিনতিতেও যখন তোফানো দরজা খুলল না, তখন ঘিতা বললে, 'আমি কুয়োয় ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করব, পাড়ার লোকে বলবে, মাতাল হয়ে তুমি আমায় খুন করেছ। তোফানো তবু নির্বিকার। তখন "The night being so dark they could scarcely see one another, she ran towards the well, and taking up a great stone that lay by the well-side, and crying aloud, 'God forgive this act of mine!' she let it fall into the well. The stone made a great noise when it came to the water. Tofano hearing, firmly believed that she had thrown herself in, and taking the rope and the bucket, he ran to help her. But she, who stood concealed by the side of the door, seeing him go towards the well, got into the house, and made all fast, while she went to the window and—"

তারপর স্ত্রীর স্বাভাবিক বিজয়—তার চিৎকারে পল্লীবাসিদের আগমন, মাতাল ও দুশ্চরিত্র বলে প্রতিবেশিদের হাতে তোফানোর নিদারুণ প্রহারলাভ—'এমন পাষণ্ডের ঘরে থাকা অনুচিত' বলে স্ত্রীর সক্রোধে পড়শীদের সঙ্গে চলে যাওয়া। শেষকালে অনেক সাধ্যসাধনা করে তোফানো ঘিতাকে ঘরে

ফিরিয়ে আনল এবং "promising never more to be jealous, and giving her leave for the future to do as she would."

বোক্কাচ্চোর গল্প 'শুকসপ্ততি' থেকে গৃহীত বটে, কিন্তু কথাশিল্পীর কলানৈপুণ্যে এটি অনেক বেশি রসসমৃদ্ধ—এর স্বাতন্ত্র্যও সহজেই চোখে পড়বার মতো।

পেত্রার্কের প্রভাবে পড়ে পরবর্তীকালে দান্তে-অধ্যাপক হয়েছিলেন বোক্কাচ্চো—জীবন-রসিক কথাসাহিত্যিক মৃত জগতের নীরক্ত গবেষকে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু অধ্যাপকের ভূমিকা যেমনই হোক, অন্তরধর্মের দিক থেকে বোক্কাচ্চো ছিলেন পেত্রার্কের ভাষায় "the vulgar"-এর বাণী-মুখ, তিনি ছিলেন জনগণের শিল্পী। অর্থ, প্রতিপত্তি, সামাজিক আভিজাত্য—সব কিছুর ঊর্ধ্বেই যে মানবতার প্রতিষ্ঠা—এই সত্য তিনি জানতেন। পৃথিবীর কথাসাহিত্যে তিনিই প্রথম হিউম্যানিস্ট্ শিল্পী—মানব-ধর্মের সপক্ষে তিনিই প্রথম উদাত্ত-কণ্ঠ। তানক্রেদ্ যখন অবমানিত বংশমর্যাদার ক্ষোভে গিস্কার্দোর প্রাণনাশে দৃঢ়-সংকল্প, তখন ঘিস্মোন্দার তেজ ও কারুণ্যমিশ্রিত ভাষণটি এই মানবতার এক দৃপ্ত অভিব্যক্তি। তার অংশ-বিশেষ এই রকম ঃ

We all get our flesh from one same stock and that all our souls were by one same created with equal faculties, equal powers and equal virtues. Worth is what that first distinguished between us, who were all and still born are equal ; wherefore those who had used the greatest sum thereof were called noble and the rest abode not noble ·· Look among all thy gentlemen and examine into their worth, their usances and their manners, and on the otherhand consider those of Guiscardo ; if thou wilt consent to judge without animosity, thou wilt say that he is most noble and these thy nobles are all churls."[১]

এইখানেই বোক্কাচ্চোর মহত্ত্ব। আধুনিক কালের প্রথম ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই সাহিত্যে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জাতি, শ্রেণী, আভিজাত্য—সব কিছুর শীর্ষে তিনি মানুষকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই জীবনবোধে, গল্প-রচনার অসামান্য কৌশলে, ইতালীয় নভেল্লার সূচনাকে পূর্ণ বিকশিত করে মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সংকেতকে সাহিত্যের খাতে প্রবাহিত করে দিয়ে—গিয়োভানি বোক্কাচ্চো চিরস্মরণীয় হয়েছেন। মুক্ত-মানবতার যে বন্দনা উত্তরকালে রনাসাঁসের প্রাণলক্ষণ হয়ে উঠেছিল, বোক্কাচ্চোতেই তার সর্বাদি উদ্বোধন। তাঁর সম্পর্কে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের এই কথা কয়টিই যথেষ্ট ঃ

১। The Decameron, Payne, P. 256

"The secret of Boccaccio is no hidden talisman; it is the secret of air and light. A brilliant sunshine inundates and glorifies his tales. The secne in which they are laid is as wide and well-ventilated as the world. The spirit which inspires them is an absolute humanity, unshamed and unafraid."[১]

বোক্কাচ্চোর অনুসরণে পরে অনেকগুলি নভেলা সংগৃহীত হয়। এদের মধ্যে Giovanni Florenetine-এর 'Il Pecorone' ('গর্দভ'—নির্বোধ পুরুষ আর ধূর্তা নারীর কাহিনী); Straperola-র 'Piacevoli Notti' (খুশির রাত) এবং 'Tarlton's News out of Purgatorie' ইত্যাদি কিঞ্চিৎ উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দণ্ডী-প্রসঙ্গে আমরা 'ভোজ-প্রবন্ধে'র একটি শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করেছি। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এবং তার তাৎপর্য অত্যন্ত উপাদেয়। মহারাজ ভোজের সভায় ভুকুণ্ড নামে এক কুম্ভিলক (চোর)-কে বিচারের জন্য ধরে আনা হয়। ভোজরাজ তাকে তিরস্কার করলে এই শ্লোকে চোর তার জবাব দিয়েছিল :

"ভট্টির্নষ্টো ভারবীয়োঽপি নষ্টো,
ভিক্ষুর্নষ্টো ভীমসেনোঽপি নষ্টো ;
ভুকুণ্ডোঽহং ভূপতিস্তং হি রাজন
ভ স্বাপংক্তোবন্তকঃ সন্নিবিষ্টঃ।"

অর্থাৎ ভট্টি, ভারবী, ভিক্ষু (দণ্ডী) ও ভীমসেন (ধাতুপাঠ, ভৈম-ব্যাকরণ ইত্যাদি প্রণেতা) চুরি দ্বারা নষ্ট ; অতএব ভ, ভা, ভি ভী, ও ভু (ভুকুণ্ড)-র অন্তে তুমি ('ভূ'-ভূপতি) আছো বলে—তুমি চোরের যম—চোর-চক্রবর্তী। শুনে কাব্যানুরাগী এবং পরম গুণগ্রাহী ভোজরাজ ভুকুণ্ডকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

জাতক থেকে হয়তো নিয়েছেন পঞ্চতন্ত্র, পঞ্চতন্ত্র থেকে নিয়েছে কথা-সরিৎসাগর ; ভারতবর্ষ থেকে নিয়েছে হাজার আফসান, হাজার আফসান থেকে আলিফ-লয়লা ; অনেকের কাছ থেকেই বোক্কাচ্চো ; আর সকলের কাছ থেকে নিয়েছেন নিয়েছেন চোর-চক্রবর্তী—জিওফ্রে চসার। কিন্তু সর্ব-গ্রাহী হয়েও ভোজরাজ যেমন তাঁর রাজগৌরবে সমাসীন, যেমন বোক্কাচ্চে বহুঋণী হয়েও মহিমধন্য, তেমনি বহুজনের কাছ থেকে গ্রহণ করে চসারও ঐশ্বর্যে এবং শক্তিতে মহতো মহীয়ান।

চসার সম্পর্কে এমার্সন এক জায়গায় বলেছেন যে সাহিত্যের ইতিহাসে

১। 'Some Authors'

তাঁর মতো তস্কর আর নেই।[১] কিন্তু তা চসারের অগৌরব নয়। উত্তম প্রতিভা চিরকালই মহত্তম অধমর্ণ। 'রাজতরঙ্গিণী'তে কহ্লন বলেছেন : "পরকাব্যেষু কবয়ঃ, পরদ্রব্যেষু চৌরাঃ"—সুতরাং চসারের স্বপক্ষে সমর্থনের অভাব নেই। এমার্সনের ভাষাতেই বলা যায় : "Thought is the property of him who can entertain it, and of him who can adequately place it. A certain awkwardness marks the use of borrowed thoughts ; but as we have learned what to do with them, they become our own" ; চসারও ঠিক তাই করেছেন, তাঁর রচনায় কোথাও দুর্বল শিল্পীর শঙ্কিত "awkwardness" ধরা পড়ে না।

চসারের আবির্ভাবের সূচনা করেছিলেন উইলিয়ম ল্যাংল্যাণ্ড—তাঁর 'Piers Plowman'-এর রূপক কাহিনীতে। ম্যালভার্ন হিলে এক বসন্ত প্রভাতে নিদ্রিত কবি যে প্রতীকী স্বপ্ন দেখেছিলেন—তারই বিবরণ আছে এই বইতে। বইটিতে খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের প্রচারণাই মুখ্য, তা হলেও জায়গায় জায়গায় উল্লেখযোগ্য বাস্তবতা আছে। চসারের সমসাময়িক জন গাওয়ার পরিণত বয়সে যে 'Confessio Amantis' লেখেন—তাতেও চসারের মতোই গল্পমালা সাজানো হয়েছে। গাওয়ারের গ্রন্থ চসারের 'ক্যান্টারবেরি টেল্‌সে'র চাইতে আয়তনে অনেক বড়, কিন্তু মহিমায় চসারের সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না।

জিওফ্রে চসার ইংরেজি সাহিত্যের জন্মদাতা। গাওয়ারের মতো সারা জীবন লাতিন ও ফরাসী ভাষার চর্চা করে পরিণত বয়সে তিনি অনুগ্রহ করে ইংরেজি লেখেননি। তিনিই সেই খাঁটি ইংরেজ—যিনি প্রথম ইংরেজি ভাষাকে সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছেন, ইংল্যাণ্ডের আত্মাকে প্রকাশ করতে পেরেছেন। তাই সমালোচকের ভাষায়, "He is as large as the land and as old as the nation !"[২]

চসার মহান্‌ প্রতিভারূপে শ্রেষ্ঠ অধমর্ণ—এ কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর ঋণ কার কাছে কতখানি এসব গবেষণা ছাড়াও দেখছি : 'ক্যান্টারবেরি টেল্‌সে'র 'The Squire's Tale'টি হুবহু আরব্য উপন্যাসের গল্প ; বোক্কাচ্চোর 'তেসিদে' থেকে তিনি নিয়েছেন নাইটের গল্পের প্যালামন এবং আরসাইটের-এর কাহিনী, মে এবং জানুয়ারীর গল্প নিয়েছেন শুকসপ্ততির উৎসসম্ভাত দেকামেরনের সপ্তম দিনের নবম গল্প থেকে ; মিলারের গল্পটি

১। "Chaucer, it seems, drew continually, through Lydgate, Caxton, from Guido di Colonne......Then Petrach, Boccaccio and the... poets are his benefactors...and poor Gower he uses as if he were only a brick-klin or stone-quary, out of which he builds his house."—Shakespeare ; or the Poet.

২। G. K. Chesterton, Chaucer.

বোক্কাচ্চোর নবম দিনের সপ্তম উপাখ্যান ; সতী গ্রিসেলডার অনুপম কাহিনীটি দেকামেরনের সর্বশেষ গল্প। আরও বহু জানা-অজানা উৎস থেকে তিনি অকাতরে ঋণ গ্রহণ করেছেন ; কিন্তু তাঁর নিজস্ব ভঙ্গ—কবিতার সরল-স্বচ্ছন্দ বিন্যাস, মানবচরিত্রের সৃষ্টিতে তাঁর বিশিষ্ট কৌশল—তাঁকে অনন্যতা দিয়েছে। কবিতার মাধ্যমেই তিনি ইংরেজি ছোটগল্পের দ্বার মুক্ত করে দিয়েছেন। যে কাজ ইতালিতে বোক্কাচ্চো করেছিলেন গদ্য ভাষায়—ইংলণ্ডে তাই করেছেন চসার—দি ক্যান্টারবেরি টেলসে। বহুঋণী চসার সম্বন্ধে তাই উচ্ছ্বসিত ভাষায় ড্রাইডেন বলেছিলেন, **'Our coutryman carries the weight and yet wins the race at disadvantage।"**[১] বোক্কাচ্চোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় চসার বিজয়ী হয়েছেন কিনা সে প্রশ্ন উত্থাপন না করেই বলা যাক—তাঁরা দুজনেই স্ব স্ব গৌরবক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, বোক্কাচ্চোর বিশালত্বের পাশে চসারের চরিত্র-রচনার কৃতিত্ব নিজ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল।

ক্যান্টারবেরি টেলসের একটুখানি মুখবন্ধ আছে। 'দি ট্যাবাড" সরাই-খানা থেকে একদল তীর্থযাত্রী চলেছে ক্যান্টারবেরির উদ্দেশে। মাথার উপর প্রথম সূর্যের আলো—দুপাশে অর্ধ-বাস্তব, অর্ধ-কাল্পনিক প্রাকৃতিক পরিবেশ। তারই মধ্য দিয়ে সার বেঁধে চলেছে তীর্থ-পথিকেরা। চসার নিজে তো আছেনই, আর আছে সমাজের সর্বস্তরের লোক—নাইট থেকে শুরু করে ধর্মযাজক, ধর্মযাজিকা, মিলার-পার্ডনার-স্কোয়ার কিংবা ওয়াইফ্ অফ্ বাথ কেউই বাদ নেই। সরাইওলাও সঙ্গে আছে এবং কথা হয়েছে পথের বিরক্তিকর একঘেয়েমি কাটাবার জন্য সকলকে এক একটি করে গল্প বলতে হবে ; আর সবচাইতে ভালো গল্পটি যে বলতে পারবে, ফিরতি পথে সরাইওলা তাকে পরিতৃপ্তি-সহকারে ভোজ খাওয়াবে।

আসা এবং যাওয়ার পথে তাই প্রত্যেকে এক-একটি করে গল্প শুনিয়েছে। এদের কটি যে চসাসের মৌলিক তা জোর করে বলা শক্ত, উৎস সন্ধান করলে দেখা যাবে, হয়তো প্রায় সবগুলিই পরের ভাণ্ডার থেকে সংকলিত। সে যুগে পরম্পরাগত গল্প-কাহিনীকে আত্মীকরণ করবার যে পদ্ধতি চলিত ছিল, চসার তারই অনুসরণ করেছেন মাত্র। আরব্য উপন্যাসের মতোই, মধু যেখানকারই হোক—মধুচক্র গঠনের কৃতিত্ব নিশ্চয়ই চসারের। মধ্যযুগীয় গল্পের সমস্ত কটি ধারাই এদের মধ্যে বিদ্যমান। সুরসাল কাব্যনৈপুণ্যে চসার এদের নবীনায়িত করে তুলেছেন। রোমান্স, অ্যাডভেঞ্চার, ধর্মশিক্ষা, লাম্পট্য এবং চরিত্র-চিত্রণের এমন মূল্যবান সংকলন ইংরেজি সাহিত্যে এর পূর্বে আর পাওয়া যায়নি।

ক্যান্টারবেরি টেলসে চরিত্র-সৃষ্টিই হল সম্পদ। এ যেন চিরকালের সর্বশ্রেণীর মানুষের চিরন্তন পরিচয়। ব্লেক বলেছেন,

"The characters of Chaucer's Pilgrims are the characters

১। English Critical Essays, XVI—XVIII Cent ; P. 195

which compose all ages and nations."[১]

রোমান্স, রূপক গল্প, নীতি উপদেশ এবং নারী—বিভিন্ন চরিত্রের আশ্রয়ে প্রায় পঁচিশটি গল্পে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের এই প্রধান ধারাগুলিকে চসার ফুটিয়ে তুলেছেন। নাইটের গল্পটি যেমন 'প্যালামন-আরসাইট-এমিলি'র ত্রিকোণকে আশ্রয় করে ক্লাসিকের এক গম্ভীর বিরাট জগৎকে সৃষ্টি করেছে, তেমনি 'The Nun's Priest's Tale'-এর অহংকারস্ফীত মোরগ চ্যান্টিক্লিয়ার আর তার মানিনী স্ত্রী পারটেলটের গল্প আমাদের পঞ্চতন্ত্রকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[২] আবার মিলার এবং রীভের গল্পে রঙ্গ-ব্যঙ্গের সঙ্গে লালসার উচ্ছৃংখল কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যত্র কেরানীর গল্পে তপস্বিনীতুল্যা সাধ্বী গ্রিসেলডার যে কাহিনীটি উপস্থিত করা হয়েছে (যা প্রাচীন লাতিন বা বোকাচ্চো থেকে গৃহীত) সেটি প্রায় হিন্দু-পুরাণের সাবিত্রী-দময়ন্তীর পাতিব্রত্যের পর্যায়ে পড়ে। অন্যদিকে 'বণিকের গল্পে' তরলচিত্তা পত্নী মে-র নির্বোধ অন্ধ স্বামী জানুয়ারীকে ছলনার যে আখ্যানটি বোকাচ্চোর আশ্রয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, তার অনুরূপ পঞ্চতন্ত্র আরব্য-উপন্যাস ইত্যাদি সর্বত্রই বিদ্যমান।[৩] পুরাণকর্তা বা রাভির প্রতিধ্বনি যেন এইভাবেই চসারের মুখেও আমরা শুনতে পাই :

> "Don't take a wife", he said, from a desire
> To make economics and spare expense.
> A faithful servant shows more diligence,
> In guarding your possessions than a wife.
> For she claims half you have throughout her life ;
> and if you're sick, as God may give me joy,
> Your friend, even an honest serving boy,
> Do more than she, who's watching for a way
> To corner your possessions night and day,
> And if you take a wife into your bed
> Your'e very likely to be cuckolded.[৪]

নারী সম্পর্কে এ ধরণের অশ্রদ্ধার উচ্ছ্বাস ইতিপূর্বে অনেকগুলিই আমরা উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু ক্যান্টারবেরি টেলসের লেখক এইখানে এসেই

১। English Critical Essays, IX Cent. P.78

২। গল্পটি মধ্যযুগীয় ফরাসী সাহিত্যের 'Reynard the Fox' থেকে গৃহীত এবং 'Reynard the Fox'-এর প্রেরণা সম্ভবত ভারতীয়।

৩। 'শুকসপ্ততি'তে এই গল্পের প্রথম অঙ্কুর—দেবিকা ও জরস স্মরণীয়। তারপরে নানা রূপে নানা ভাষায় দেশে দেশে এটি ছড়িয়েছে। প্রচারের দিক থেকে এই গল্পটি আন্তর্জাতিক।

৪। Nevil Coghill Edition, Penguin.

থামেননি ; নারীজাতি সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ থেকে ইয়োরোপে নাইট্-এরাণ্টি এবং শিভাল্রির জন্ম হয়েছিল, সেই মনোভাব থেকে একটু পরেই এসেছে নারীর উদ্দেশে মুক্তকণ্ঠ বন্দনা। 'সীমান্তবর্গের ইন্দ্রাণী' স্ত্রী, 'প্রজনার্থং মহাভাগাঃ' জায়া এবং 'গৃহদীপ্তয়ঃ' কল্যাণী বধূর অপরূপ স্তুতি শুনিয়েছেন চসার :

"And he created Eve
Here lies proof of what we all believe,
That woman is man's helper, his resort.
His earthly paradise and his deport.
So plint and virtuous is she
They cannot but adide in unity.
One flesh they are ; one flesh as I suppose
Has but a single heart in joys and sorrows."[১]

এবং এ-হেন স্ত্রী সম্পর্কে মানুষের এইভাবেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত :

"That every man who's worth a leak should fall
Down on his knees in gratitude for life
To God for having given him a wife
Or else pray God that He vouchsafes to send.
A wife to him, to last him till the end."

'ক্যাণ্টারবেরি টেল্সে' পরবর্তী ইংরেজী সাহিত্যের সমস্ত সম্ভাবনার প্রথম মুকুল। রমন্যাস, উপন্যাস, নাটক এবং ছোট গল্প। চসার যেন ইংল্যাণ্ড এবং ইংরেজি সাহিত্যের প্রাণপুরুষ, তার আদিম সত্তা। তাই ইংল্যাণ্ডের (এবং বিশ্ব-সাহিত্যেরও) উপন্যাস-নাটক-ছোটগল্প যা কিছু নিয়েই আলোচনা করা যাক—চসারের ঐতিহাসিক ভূমিকাটি সেখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। তাঁর সম্পর্কে অপূর্ব ভাষায় জি. কে. চেস্টারটন বলেছেন :

"We might begin to see spread out titanic outlines of such a prehistoric or primodiral Anak or Adam, with our native hills for his bone and our native forests for his beard ; and see for an instant a single figure outlined against the sea and a great face staring at the sky."[২]

ফ্রান্সে নাভারের রানী মার্গুইর‍্যাৎ বোকাচ্চোর অনুসরণে তাঁর 'হেপ্তামেরন' রচনা করেছিলেন। কিন্তু বোকাচ্চো এবং চসারের পাশে যার নাম স্মরণীয়—তিনি ফরাসী গদ্যের যথার্থ জন্মদাতা ফ্রাঁসোয়া রাবল্যা (Rabelais)। জন

১। Nevil Coghill Ed.

২। Chaucer, G. K. Chesterton.

মেসির ভাষায় : "A wise man and a gigantic laughter !" বিশ্ব কথাসাহিত্যের অগ্রদূত মহান্ ত্রয়ীর অন্যতম তিনি। ভল্‌ত্যার তাঁকে 'Drunken philosopher' বলে চিহ্নিত করেছেন—বস্তুত রাব্‌ল্যা জীবন-সুরার মদ্যপ—তাঁর 'মাতলামির দর্শন' মুক্তবুদ্ধি মানবতাবাদের বাণী।

চার খণ্ডে রচিত মহাকায় 'Gargantua et Pantagruel' (গারগাতুঁয়া) এবং পাঁতাগ্রুয়েল) রাব্‌ল্যাকে খ্যাতি যা দিয়েছে, নিন্দা দিয়েছে তার চতুর্গুণ। রাব্‌ল্যার মৃত্যুর পর বইখানির পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হয়। তিনশো বছর ধরে এই স্বয়ংসিদ্ধ লেখকটি মদ্যপ এবং ইতর রুচির শিল্পী ব'লে ধিকৃত হয়েছেন। গারগাঁতুয়া, পাঁতাগ্রুয়েল এবং পানুর্ঝের কাহিনী যে কোনো সম্ভ্রান্ত গ্রন্থাগারের পিছনে লুকিয়ে রাখতে হয়েছে। তলস্তয়ের 'ক্রুইট্‌জার সোনাটা'র মতো (!) আদি-রস-সন্ধানীরা সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখ ঢেকে রাব্‌ল্যার গ্রন্থ সংগ্রহ করেছে। কারণ যত্রতত্র : "The book is frankly obscene !"

সাহিত্য-শিল্পের ইতিহাসে বিস্ময়কর অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। রাব্‌ল্যা সম্পর্কিত মনোভাবও তার অন্যতম নিদর্শন।

এর জন্যে ফ্রাঁসোয়া রাব্‌ল্যা নিজেও অনেকখানি পরিমাণেই দায়ী। বোক্কাচ্চোর এবং চসারের শতাধিক বর্ষ পরবর্তী হয়েও তাঁর রচনায় শৃঙ্খলার অভাব, কাহিনী এগিয়ে চলেছে খামখেয়ালি ভঙ্গিতে, গল্পকে থামিয়ে দিয়ে শুরু হয়েছে অনাবশ্যক বিবৃতি ; আবার শিশুসুলভ উৎকল্পনার আতিশয্যে, স্থূল-সূক্ষ্ম কৌতুক ও ব্যঙ্গে এবং চার্চের প্রভাবমুক্ত দীপ্তবুদ্ধি মানবতার প্রতিষ্ঠায় গারগাঁতুয়া পাঁতাগ্রুয়েলের মূল্যনির্ণয়ে সমালোচক বিভ্রান্ত হয়ে ওঠেন। জন কাউপার পাউয়িস তাঁর বিদগ্ধ আলোচনার মাধ্যমে সম্ভবত রাব্‌ল্যার যথার্থ পরিচয়টি প্রকাশ করতে পেরেছেন। তাঁর মতে "He is the most purely *childish* writer in the world."[১]

রাব্‌ল্যার গ্রন্থপঞ্চক কোনো কাল্পনিক দৈত্যবংশের কাহিনী। গারগাঁতুয়ার জন্ম, পারী নগরীতে তার শিক্ষালাভ (এখানে 'পারী' নামের উৎপত্তি সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ একটি উদ্দাম কৌতুক-বৃত্তান্ত আছে) ; ফ্রায়ার জাঁ (John) নামে একটি অপূর্ব চরিত্রের পাদ্রীর সাহায্যে পিতৃশত্রু রাজা পিক্রোশলকে পরাস্ত করা ; গ্রন্থের প্রধান নায়ক পাঁতাগ্রুয়েলের জন্ম—তার বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষালাভ এবং মহাপণ্ডিত হয়ে ওঠা।

পানুর্ঝ (Panurge) নামে একটি মহা-ধুরন্ধরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই পাঁতাগ্রুয়েল কাহিনীর আসল রস জমে উঠেছে। শয়তান হিসেবে পানুর্ঝ অদ্বিতীয়—তার সমতুল্য চরিত্র পৃথিবীর সাহিত্যে আর কুত্রাপি পাওয়া যাবে না। বিদ্যায় বুদ্ধিতে সে অসাধারণ—লাতিন-গ্রীক-হিব্রু-জার্মান-স্পেনীয়-ইংরেজী তার মুখে খইয়ের মতো ফোটে। সম্রস্যাটা

১। Rablais, J. C. Powys, P. 308

দেখা দিল তখনই, যখন পানুর্ঝের মনে প্রশ্ন জাগল তার বিয়ে করাটা উচিত কিনা।

পাঁতাগ্রুয়েল বললেন, 'অবশ্যই করা উচিত।'

কিন্তু পানুর্ঝ তার নিজস্ব পদ্ধতিতে নানা কুতর্ক শুরু করে দিলে। অতএব একটা সদুত্তরের জন্য যেতে হল দার্শনিক ত্রুইয়োগাঁর কাছে। কিন্তু কোনো দার্শনিকই কোনো প্রশ্নের শেষ উত্তর দেন না—সুতরাং মীমাংসা হল না। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, তা হলে এবার জাহাজ সাজিয়ে—সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে, বিখ্যাত 'সিবিল' (Sibylle de grande renom'ee) রাণী বাকবুকের কাছে গিয়েই তাঁর উপদেশ সংগ্রহ করা যাক।

অতএব সমুদ্র-যাত্রা এবং পরম কৌতুকময় এক সুদীর্ঘ অভিযান। রহস্যময় আফ্রিকা পার হয়ে, 'উত্তমাশা অন্তরীপ' ছাড়িয়ে, 'গল্পকথা'র ভারত আর মহাচীনের পাশ দিয়ে যেতে হবে রাণী বাকবুকের রাজ্যে। এই অভিযানটি পাঁতাগ্রুয়েল কাহিনীর পরম সম্পদ। ঝড়-তুফানের বর্ণনা, বিচিত্র দেশের সরস বিবরণ, ফাঁকে ফাঁকে উপগল্প। যেমন—'শয়তান' অল্প বয়েসে কি ভাবে কৃষকদের কাছে জব্দ হয়েছিল, অথবা কি ভাবে ভেড়া-ব্যবসায়ী অহংকারী দ্যাঁদ্নো (Dindenault) পানুর্ঝের কৌশলে সব ভেড়াগুলো সমুদ্রে হারাতে বাধ্য হল। দ্যাঁদ্নোর দুর্গতির বিবরণটি তো কৌতুক তার চাতুর্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে বিশ্ব-সাহিত্যেই ক্লাসিক হয়ে আছে।

অবশেষে বাকবুকের রাজ্যে পৌঁছুনো, তার রহস্যময় পাতাল-প্রাসাদে প্রবেশ, বিবিধ ক্রিয়াকলাপ এবং 'ওর‍্যাক্লে'র বাণী শোনা গেল ঃ 'ত্রিংক!' এই 'ত্রিংকে'র তাৎপর্য আর ব্যাখ্যা করবার দরকার নেই। বাকবুকের কাছ থেকে 'স্বর্গীয় বোতলের' (অবশ্যই সুরার) উপদেশ আহরণ করে সদলবলে পানুর্ঝ পাঁতাগ্রুয়েল-ফ্রায়ার জাঁ ইত্যাদির স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন।

আপাতদৃষ্টিতে রাব্ল্যা মদ্যপের মন্ত্রগুরু—বেপরোয়া আনন্দ-সম্ভোগের শিল্পী। কিন্তু আগেই বলেছি, এই বহিরঙ্গের অন্তরালে এমন একটি খরশাণবুদ্ধি রসিকের উপস্থিতি—যিনি বোকাচোর মতো যাবতীয় নির্বুদ্ধিতার পরম শত্রু; এমন একটি মানব-প্রেমিক দার্শনিকের অবস্থান—যিনি বিশ্বকল্যাণের প্রবক্তা। প্রথম র‍্যান্যাসাঁসের অনুপ্রেরণায় তিনি এক অভিনব বুদ্ধিসিদ্ধ দর্শন প্রতিষ্ঠা করে গেছেন—যার নাম 'Pantagruelism' এবং এই দর্শনের ভিত্তিতে একদা পৃথিবীর নানা দেশে বিশিষ্ট বুদ্ধিবাদী-দের নিয়ে রাব্ল্যাইয়ান সোসাইটি গড়ে উঠেছিল।

রাব্ল্যার অবদানকে স্বীকার করে নিয়েও জিওফ্রে ব্রেরেটন তাঁর ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে 'গারগাঁতুয়া-পাঁতাগ্রুয়েল'কে "monstrous" বলে চিহ্নিত না করে পারেননি। অবশ্য দৈত্যবংশের গল্প হিসেবে অন্য অর্থে এই বিশেষণ বইটির প্রাপ্য, কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন সমালোচকেরা প্রায় সকলেই রাব্ল্যা সম্পর্কে বিরূপ। অপরপক্ষে জন কাউপার পাওয়িস তাঁকে "Prophet"-এর গৌরবে ভূষিত করেছেন। রাব্ল্যার দার্শনিক স্বরূপ বিচার

আমাদের অধিকার-সীমার বাইরে—তাঁর কথাসাহিত্যিক সত্তাটিই আমাদের দ্রষ্টব্য।

কথাসাহিত্যে সর্বাগ্রে আমরা তিনটি বস্তুর প্রত্যাশা করে থাকি। কাহিনী, চরিত্রায়ণ ও বাগ্‌বিভূতি। কাহিনী গঠনের নৈপুণ্যে বোকাচেচা 'greatest novelist', চরিত্র-সৃষ্টির মহিমায় চসার অনন্যপূর্ব এবং বাগ্‌-বৈদগ্ধ্যে রাবল্যা তাঁর পূর্ব এবং সমকালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই মহান ত্রয়ীর রচনা থেকে ভবিষ্যৎ কালের কথাসাহিত্যের এই ত্রিবিধ প্রধান উপকরণ আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করতে পেরেছি।

গ্রন্থারম্ভে পাঠকের কাছে কবিতায় এই নিবেদন রাবল্যা জ্ঞাপন করেছেন ঃ (ইংরেজি উদ্ধৃতি মার্জনীয়) ঃ

> "Sweet friends, of this my book make free ;
> Away with scrupulosity !
> No lousy plague here shall you take :
> So be not squeamish for God's sake !
> No polished art with me you'll find
> But laughter that can heal the mind.
> You grieve : and if my argument
> Can comfort you I am content.
> To laugh at fate through life's short span
> Is the prerogative of man."[১]

গ্রন্থ-রচনা সম্বন্ধে এইভাবেই নিজের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন রাবল্যা। 'হাসির উচ্ছ্বাসে ক্ষণস্থায়ী জীবনের বুদ্‌বুদ্‌তুল্য মুহূর্তগুলিকে উড়িয়ে দাও—তোমাদের কাছে তারই উপকরণ আমি সাজিয়ে দিলাম'। উদ্দাম কৌতুক, সুরা-দেবতার আরাধনা, খোসখেয়ালী গল্প, মধ্যে মধ্যে পারিপার্শ্বিক সমাজ, ধর্ম ও লোকচরিত্রের উপর তীব্র কশাঘাত—গীর্জা-পরিত্যাগী চিকিৎসক রাবল্যা যেন লাফিং গ্যাস সহযোগে দুরারোগ্য প্রাচীন সামাজিক ক্ষতগুলির উপরে তাঁর শল্যপ্রয়োগ করে গেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, চার্চ থেকে বেরিয়ে এসে ফ্রান্সের অন্যতম প্রথম কৃতী অস্ত্র-চিকিৎসকরূপে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর কালে ক্লোরোফর্ম ছিল না—লাফিং গ্যাসও নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হয়নি—কিন্তু সাহিত্যের মাধ্যমে হাসির উৎস মুক্ত করে দিয়ে সমাজ-চিকিৎসায়ও তিনি কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।[২]

১। Powys, P. 138

২। "Rablais had been a monk and was later a physician and he had no respect for gowns and degrees...His huge laugh, as Gargantuan as his gigantic hero, puts prudery out of countenance ; he is a cure for hypocricy and for the blues, if those diseases of mind and soul can be cured."—J. Macy, The Story of the World's Literature, P. 211

রাবল্যার গল্প একাধারে উদ্দাম এবং রূপক। মূল কাহিনীর সঙ্গে কিছু কিছু উপগল্পও আছে। তা হলেও গল্পরচয়িতা হিসাবে বোক্কাচো বা দণ্ডী, আলিফ্ লয়লাকার বা চসারের সঙ্গে তাঁর কোনো তুলনাই চলে না। রাবল্যা ভালো গল্প লিখতে পারেননি—সে চেষ্টাও তাঁর বিশেষ ছিল না। উপন্যাসের ভঙ্গি নিয়েছেন, কিন্তু উপন্যাস হয়নি—হয়েছে খেয়ালী রচনা।

কিন্তু তির্যক পর্যবেক্ষণে এবং মন্তব্যের চমৎকারিত্বে রাবল্যা গল্প-সাহিত্যের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ আমাদের দিয়ে গেছেন—সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাঁর বাণী-বৈদগ্ধ্যের কয়েকটি ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া যাক:

ধর্মযাজকদের সম্বন্ধে গারগাঁতুয়ার বাপ গ্রাঁদগুজিয়ে বলেছেন:

"These devils are worse than others, for the plague only kills our bodies while these imposters poison our souls."

পুলিসের সার্জেন্ট এমন ভয়ংকর বিষাক্ত বস্তু যে স্বয়ং শয়তান পর্যন্ত তাকে হজম করতে পারে না—খেলে তারও মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে:

"As for the fourth (chain) it was carried away by devils to bind Lucifer who had at that time broken his chains because of a cholic which caused him unusual torment for having devoured for the breakfast thef ricasse´ed soul of a police sergeant."

আপোলোর আশ্রিত, রাজহংস নামক প্রাণীটি সারাজীবন কর্কশ আওয়াজে কর্ণপীড়াই জন্মায়; কেবল মৃত্যুর আগে সে অপূর্ব সঙ্গীত করে—যাকে বলা যায় 'Swan Song'। কবিদের অবস্থাও ঠিক তাই। জীবনভোর দুঃশ্রাব্য কদর্য কবিতা লিখবার পর অন্তিম সময়ে তারা কেবল মধুর সঙ্গীতই শোনায় না—দস্তুরমতো Prophet-ও হয়ে ওঠে: "As they approach their end, inevitably become prophet and chant by Apollonian inspiration predictions of future events." মন্তব্যটির মধ্যে যে গূঢ়ার্থ নিহিত আছে এবং বহু কবি-সাহিত্যিক সম্বন্ধেই তা যেভাবে প্রযোজ্য—আশা করি সে তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করা রসিকের কাছে অনাবশ্যক।

পাঁতাগ্রুয়েলের চন্দ্র পরিদর্শনের উদ্দেশ্য:

"He visited the regions of the moon to know for truth whether the moon was still entire or whether the women had three quaters of it in their heads."

হীরের খনি থেকে এক একটি করে তুলে দেখানোর চেষ্টা বিড়ম্বনা। রাবল্যার গ্রন্থ-পঞ্চকের পাতায় পাতায় এরা পরিকীর্ণ। ফরাসী উইট্ এবং হাস্যরস কেন সমস্ত পৃথিবীকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিল, রাবল্যার রচনা থেকেই তার উত্তর পাওয়া যাবে। সামান্য যে কটি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে—তাদের প্রত্যেকটিই জর্জ বার্ণার্ড শ কিংবা অস্কার

ওয়াইল্‌ডের যোগ্য। ফরাসী গদ্যের জন্মদাতার হাতেই যেন ফরাসী জাতির আন্তর ও সাহিত্যিক ধর্মটি নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর বার্ণার্ড শর বাচন-কলার উৎস সন্ধানে যাত্রা করলে শেষ পর্যন্ত পাঠকের সম্ভবত রাব্‌ল্যার গোমুখীতেই এসে পৌঁছুতে হবে।

দান্তের নরক বর্ণনা এবং ম্যান আণ্ড্ সুপারম্যানের নরক-কল্পনার মাঝখানে রাব্‌ল্যাকে দাঁড় করালে কেমন হয়?

পাঁতাগ্রুয়েলের অনুচর এপিস্তেমো মরে নরকে গিয়েছিল, শয়তান শিরোমণি পানুর্যের্র সম্পূর্ণ অভিনব মৌলিক চিকিৎসায় সে পুনর্জীবন লাভ করেছে। নরকে গিয়ে এপিস্তেমো দেখে এসেছে যে যারা সেখানে গেছে, তারা মোটের উপর বেশ আরামেই আছে। যেমন:

আলেক্‌জাণ্ডার দি গ্রেট্ পুরোনো জুতো সেলাই করেন এবং সামান্য রোজগারে তাঁর কায়ক্লেশে দিন কাটে।

জারাক্‌সেস (Xerexex) পথে পথে ভিনিগার ফিরি করেন।

রমুলাস্ লবণ-চুরির ব্যবসা করে থাকেন।

নুমা পেরেকের ফিরিওলা।

ইউলিসিস্ ঘাস ছাঁটাই করেন।

নেস্টর আবর্জনা সাফ করেন।

হ্যানিবল মুরগীর চাষ করেন।

ট্রাজান ব্যাং ধরার জীবিকা নিয়েছেন।

পোপ আলেকজাণ্ডার ইঁদুর-শিকারী—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

রাজা আর্থার থেকে ট্রয়ের মহাযোদ্ধা আকিলিস্ পর্যন্ত নরকের বিচিত্র পেশায় কেউ বাদ পড়েননি। ঐতিহাসিক মহিলারাও অনুরূপ স্বাচ্ছন্দ্যেই রয়েছেন; যেমন ক্লিয়োপাত্রা পেঁয়াজ বিক্রি করেন, হেলেন চাকরাণীদের জন্যে এম্‌প্লয়মেণ্ট্ অফিস খুলেছেন, দিদো ব্যাঙের ছাতা বেচে থাকেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এপিস্তেমো দুঃখ করে বলছে, অমন সুখের নরক থেকে তাকে ফিরিয়ে আনা হল কেন? সে তো চমৎকার ছিল সেখানে।

রাব্‌ল্যার বই থেকে ইয়োরোপীয় কথাসাহিত্য আরো একটি বস্তু লাভ করেছে। সে হল সংলাপ। সংলাপ ব্যতিরেকে সাহিত্য গতি পায় না। উপযুক্ত সংলাপ-বিন্যাসের অভাবেই দেকামেরনের অনেক উপাদেয় কাহিনী ক্লান্তিকর বিবৃতি মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। এই দিক থেকে রাব্‌ল্যা বিশ্বসাহিত্যের পথিকৃৎ। প্লেটো কিংবা ক্যাটোর গুরু-শিষ্য-সংবাদকে অনেকে এই গৌরব দিয়ে থাকেন (যেমন ক্যানবি), কিন্তু এঁরা অন্যায়ভাবে রাব্‌ল্যাকে তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন বলে আমার মনে হয়।

উইটে সমুজ্জ্বল সুতীক্ষ্ন সংলাপ 'গারগাঁতুয়া পাঁতাগ্রুয়েলের' অন্যতম আকর্ষণ। অতি সামান্য রাজা পিক্রোশল বিশ্বজয়ের চূড়ান্ত দিবাস্বপ্ন দেখছেন। এই প্রসঙ্গে অমাত্যদের সঙ্গে তাঁর কথালাপ একটি অনবদ্য সামগ্রী।

অমাত্যেরা বলছে:

'ইতালী জয় হয়ে গেল। নেপল্‌স্‌, ক্যালাব্রিয়া, অ্যাপুলিয়া আর সিসিলি একেবারে বিধ্বস্ত। মাল্‌টা তো পায়ের তলায়। এর আগে যদি রোড্‌সের খোশমেজাজী নাইটেরা লড়তে চেষ্টা করে—তাদের দুর্গতির অন্ত থাকবে না।'

'আমি বরং লরেটে যেতে চাই।'—পিক্রশোল মন্তব্য করলেন।

'না—না—না, এখন নয়। সে ফেরবার সময় হবে। আমরা ক্যাণ্ডিয়া, সাইপ্রাস, সাইক্লোড্‌স জয় করে মোরিয়া আক্রমণ করব।…আর ঈশ্বর জেরুজালেমকে রক্ষা করুন, সোল্‌ডান তো মহারাজের শক্তির কাছে অতি তুচ্ছ।'

'আমি—আমি—আমি'—রাজা বললেন, 'আমি নতুন করে সলোমনের মন্দির তৈরী করাব।'

'না—না—না, ঠিক এখুনি নয়।'—সামন্তেরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'একটু দাঁড়ান। অত ব্যস্ত হবেন না মহারাজ। অক্টোভিয়াস্‌ অগস্টাস্‌ কী বলেছিলেন—মনে আছে তো? "ধীরে বন্ধু—ধীরে।" আগে আপনাকে এশিয়া মাইনর, ক্যারিয়া, লিসিয়া, প্যামফিলিয়া মাইসিয়া, বিথীনিয়া—একেবারে ইউফ্রেতিস্‌ পর্যন্ত জয় করতে হবে……'

তারপর আরবের প্রশ্ন উঠতেই—

'হায় ভগবান!'—রাজা আর্তনাদ করে উঠলেন: 'আমরা গেলাম। হায়! হায়! হায়! এবারে আমরা শেষ হয়ে গেছি!'

'সে আবার কি?'—অমাত্যেরা সমস্বরে প্রতিবাদ করল।

'মরুভূমিতে আমরা জল কোথায় পাব? লোকে বলে, জুলিয়ান অগস্টাস্‌ সসৈন্যে মরুভূমিতে তৃষ্ণায় প্রাণ হারিয়েছিলেন।'

উদ্ধৃতির আর প্রয়োজন নেই—এই নমুনাটুকুই যথেষ্ট। পিক্রশোলের বিশ্ববিজয় কতদূর পর্যন্ত পেঁছেছিল সম্ভবত তার বিবরণ অনাবশ্যক। আসল কথা, বোকাচ্চোর ঘটনা এবং চসারের চরিত্রকে রাব্‌ল্যা ভাষা দিয়েছেন। পূর্বগামী দুজন অস্থি-মাংস বিন্যাস করেছিলেন—রাব্‌ল্যা তাতে প্রাণ-সঞ্চার করেছেন। পানুর্ঝের সঙ্গে পাঁতাগ্রুয়েলের প্রথম পরিচয়, গ্রুইয়োগাঁর সঙ্গে সংলাপ, দ্যাঁদ্‌নো প্রসঙ্গ—সর্বত্রই এই প্রতিভার স্বর্ণদীপ্তি। আধুনিক ছোটগল্প লেখক যখন চতুর সংলাপ এবং উদ্ধৃতিযোগ্য মন্তব্যের ছটায় তাঁর কাহিনীকে উদ্ভাসিত করে তোলেন—তখন বহুকালের কুসংস্কারে উপেক্ষিত ফ্রাঁসোয়্যা রাব্‌ল্যাকে তাঁর কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা উচিত।

মহৎ শিল্পীর মহত্তম পরিচয় তাঁর মানবতাবাদে—তাঁর কল্যাণবাণীতে। তথাকথিত 'বেপোরোয়া ও মদ্যপের শিল্পী'—আপাত বিচারে এপিকুরিয়ান রাব্‌ল্যা, পিক্রশোলের পরাজিত বাহিনীর বন্দী অধিনায়কদের কাছে গারগাঁতুয়ার মুখে যে ভাষণটি দিয়েছেন, তার কিছু অংশ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। রাব্‌ল্যার যথার্থ মহত্ত্ব এর মধ্যেই পরিস্ফুট হবে। ন্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে এবং বিশ্বমানবতার সমর্থনে সম্ভবত এইটিই সর্বাদি উদ্দীপ্ত কবিকণ্ঠ:

"Remonstrate with your king and make him see what you

yourself now see ; and moreover when you come to advise him to think of *what's good for everybody and every nation and not only for particular classes and races*[১] for I assure you that things can reach such a point that their precious individual and national welfare he makes so much of liable to be engulfed in universal ruin."

মনে হয়, ষোড়শ শতকে নয়—পারমাণবিক বোমাভীত এই আধুনিক কালেই শান্তির স্বপক্ষে ইস্তাহার রচনা করেছেন মানবতাবাদী ফ্রাঁসোয়া রাব্ল্যা।

আর এইখানেই তিনি "Prophet"।

ছয়

উনবিংশ শতাব্দী : আধুনিক ছোটগল্পের আবির্ভাব

কথা (Fable) ও নবগল্প (Noevelle বা Novella-এর এই অনুবাদ আমরা করতে পারি) ইয়োরোপীয় কথাসাহিত্যের দ্বার মুক্ত করে দিলে। গ্রেকো-রোমান অপরূপ কথা, কিউপিড আর সাইকির গল্প, অভিজাত সমাজের চিত্তরঞ্জিনী ত্রুবাদুর সঙ্গীত, ভক্তিমূলক কাহিনী ইত্যাদির সীমা পার হয়ে বোক্কাচ্চোর কৃতিত্বে ইয়োরোপে নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি হল। চরিত্র রচনায় পথ দেখালেন চসার—সংলাপে রাব্ল্যা।

বোক্কাচ্চোর Novelle বা নবগল্প বস্তুতান্ত্রিক জীবনমূলক সাহিত্যের ভিত্তি পত্তন করল বটে, কিন্তু দেকামেরনে প্রাচীন রোমান্সধর্মী কাহিনীরও অভাব ছিল না। ফলে পূর্ববর্তী রোমান্টিক্ ঐতিহ্য এবং দৈনন্দিন জীবনমুখ্যতা—এই দুটি উৎস থেকে ইউরোপের সাহিত্যের দুটি স্বতন্ত্রনামী কথাপ্রবাহের আবির্ভাব ঘটল। একটি নভেল সাহিত্য, একটি রোমান্টিক সাহিত্য। স্পেন থেকে আর একটি নতুন ধারা এল, তার নাম 'পিকারেস্কা' (Picaresca), রোমান্সের রাইট-এরান্ট্দের বিপরীত তার নায়ক হল 'Rogue' (picaro), উচ্ছৃঙ্খলতাই হল 'পিকারো'র উপজীব্য। উত্তরকালে বায়রণের 'ডন জুয়ান' কাব্য 'পিকারো'র একটি মার্জিত অভিব্যক্তি দেখিয়ে গেছে।[২]

Novelle থেকে এল Novel—আধুনিক কালে যে অর্থে তাকে আমরা জানি। নবগল্প হল উপন্যাস। যে সমস্ত চরিত্র ও ঘটনা বাস্তব, অথবা

১। ইটালিক্স আমার।

২। "By novella must be understood the novel of manners, called picaresca (from picars, a rogue or 'picaroon') because of the social status of the heroes of these fictions, and this kind of novel is quite an invention of the Spaniards."

বাস্তব হওয়া অসম্ভব নয় তাদের ভিত্তি করে—একাধিক প্লটের জটিল জাল বুনে উপন্যাসের রূপ তৈরি হল। আর রোমান্স্ সাহিত্য হল মুক্ত-কল্পনার বিস্তার—সম্ভব-অসম্ভবের জগতে স্বেচ্ছাবিহার, রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার উদ্দীপনা। 'রিয়্যালিস্টিক' ও 'রোম্যাস্টিক'—এই কথা দুইটিও এইভাবেই প্রথম চিহ্নিত হয়ে গেল। ইংরেজি সাহিত্যে ফিল্ডিঙের 'জোসেফ অ্যানড্রুজ', 'টম জোন্স' এই রিয়্যালিস্টিক নভেলের প্রতিনিধি, স্যার ওয়ালটার স্কটের 'ওয়েভারলি নভেল্স্' রোমান্টিক সাহিত্যের পরিপূর্ণ রূপ। তারপর জেন অস্টেন, এমিলি ব্রন্টি, আলেকজান্দার দুমা, ভিক্তর ইয়ুগো, স্তাঁদাল, ফেন্নাব্যার, ডিকেনস্, থ্যাকারে—এমিল্ জোলা, তুর্গেনিভ—তলস্তয়, গোয়্টের 'Sorrows of Weather,' প্রভৃতি—রিয়ালিস্টিক এবং রোমান্টিক্ উপন্যাস এক শতক থেকে আর এক শতকে এগিয়ে চলল।

আর ছোটগল্প ?

তাকে আরো বহু পার হয়ে সার্থক রূপ নিতে হল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। বর্তমান কালে Novelle বা Novella সঞ্জাত যে ছোটগল্প আমরা পাই, ঊনিশ শতকেই ছিল তার উপযুক্ত জন্মক্ষণ। মাঝখানের দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যহীন পথ-পরিক্রমা সংক্ষেপে শেষ করে বিভিন্ন দেশের মধ্যে দিয়ে, এইবার আমরা সেইখানেই পৌঁছুতে চেষ্টা করব।

দেকামেরনের প্রভাব প্রধানতঃ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল ফ্রান্সে। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফাঁসোয়ার সহোদরা নাভারের রাণী মাগুইর‍্যাং বোকাচ্চোর প্রত্যক্ষ অনুসরণে রচনা করলেন 'হেপ্তামেরন' (Heptameron)—দশ দিনের একশো গল্পের পরিবর্তে সাতদিনের বায়াত্তরটি গল্পের সমাহার। এর পরে আসেন রাব্ল্যা। কিন্তু রাব্ল্যার প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে।

'হেপ্তামেরনে'র গল্পও শুরু হয়েছে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভূমিকা দিয়ে। 'পিরানিজ' অঞ্চলের একটি 'বাথে' ইয়োরোপের নানা দেশের নর-নারী একসঙ্গে সমবেত হয়েছে। হঠাৎ প্রবল বৃষ্টি নামল—সে বর্ষণে চারদিক প্লাবিত হয়ে মহা অনর্থের সূত্রপাত ঘটল। একদল ফরাসী নর-নারী নানা দুর্বিপাক ও দস্যুর উপদ্রব পার হয়ে শেষে নোত্রদাম দ্য সেরাঁসের গীর্জায় এসে আশ্রয় পেল। কিন্তু 'গাবে' নদীতে তখনো প্রবল জলোচ্ছ্বাস চলেছে - সে বন্যা প্রশমিত না হলে তারা কেউ নিজেদের গন্তব্য-স্থানে পৌঁছুতে পারবে না। আর 'গাবে' নদীর উপর যদি সেতু বাঁধতে হয়, তা হলে অন্তত দিন দশেক সময় লাগবে। সুতরাং প্রতিদিন দুপুর বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত তারা 'গাবে' নদীর ধারে একটি শ্যামল প্রান্তরে মিলিত হয়ে গল্প বলতে শুরু করল। সপ্তম দিনে সেতু বাঁধার খবর এলে আকস্মিকভাবে গল্পকথনের ওপর যবনিকা পড়ল—তৎক্ষণাৎ সবাই ব্যস্ত হয়ে স্বদেশে যাত্রা করল। 'হেপ্তামেরন' এই সাত দিনের গল্প।

নাভারের রাণী বোক্কাচেচোর পদচিহ্ন নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করেছেন, কিন্তু নিজের মৌলিকতাও বিসর্জন দেননি। গল্পগুলিতে প্রেম ও লালসাই মুখ্য এবং বোক্কাচেচোর মতোই সামসময়িক জীবনের অমিতাচারের রূপ ও ধর্মযাজকদের ভণ্ডামি মার্গুইর‍্যাৎ নির্মমভাবে উপস্থিত করেছেন। বোক্কাচেচোর প্রতিভা তাঁর নেই, কোনো কোনো গল্প কল্পনাতীতরূপে কদর্য এবং অপাঠ্য, তবু সাহিত্যের ইতিহাসে 'হেপ্তামেরন' উপেক্ষার সামগ্রী নয়। বোক্কাচেচোর রিয়্যালিজ্‌ম্‌ এই গল্পগুলিতে আরো বাস্তব রূপ পেয়েছে—সমকালীন ফরাসী-সমাজ এতে রক্ত-মাংস নিয়ে দেখা দিয়েছে। কখনো কখনো লেখিকা চরিত্রগুলির পরিচয় পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন রাখেন নি এবং একেবারে নিজের নিকট-সান্নিধ্য থেকে তাদের উপস্থিত করেছেন। যেমন ২৮শ সংখ্যক কাহিনী এইভাবে আরম্ভ হয়েছে ঃ

"When king Francis I was in Paris with his sister, the Queen of Navarre, she had a secretary who was not a man to lose anything for want of picking it up—"

বোক্কাচেচোর ধারার সঙ্গে রাবল্যাইয়ান কৌতুকের মিশ্রণে দীর্ঘকাল ধরে এগিয়ে চলল ফরাসী গল্প। এর মধ্যে আবির্ভূত হলেন 'Essais'-এর বিখ্যাত স্রষ্টা মতেন (Michel Eyquem de Montaigne)। মতেন তাঁর অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির বাস্তব দর্শন রচনা করে দিয়ে কথাসাহিত্যে অন্তর্মুখী আত্মকথার দ্বার মুক্ত করে দিলেন—তাঁর রচনায় সর্বপ্রথম লেখক নিজের সঙ্গে কথা কইলেন। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে মতেনের প্রত্যক্ষ দান না থাকতে পারে, কিন্তু অনুভূতির তীব্র প্রকাশে, হৃদয়ের অনুসন্ধানে তিনি যেন ভাবী গল্প লেখকদের মর্মমুখিতায় অনুপ্রাণিত করলেন।[১] ফরাসী লেখকেরা বোক্কাচেচো, রাবল্যা এবং মতেনের নির্দেশ গ্রহণ করলেন, জা-পিয়ার্‌ কামু্‌, সেগ্রে ইত্যাদি পার হয়ে গল্প এসে পেঁছুল ফরাসী বিপ্লবের পূর্বক্ষণে।

অষ্টাদশ শতকে ভলত্যার (Voltaire) ছদ্মনামধারী ফ্রাঁসোয়া মারী আরুয়ে ফ্রান্সের আকাশে আবির্ভূত হলেন। ক্ষুরধার বুদ্ধিমান, দিগ্বিজয়ী দার্শনিক, অপদার্থ রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের চরম শত্রু ভলত্যার তাঁর নাটক এবং দর্শন ছাড়া কথাসাহিত্যেরও আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই সময় আঁতোয়ান গালাঁর আরব্য উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করেছে। তারই বহিরঙ্গ

১। "His reflections and judgement always arise from a concrete human experience and are pinned to the paper with the sharp points of real facts and living characters. The Essays are a vast gallery in which men and women of all kinds display themselves for our enjoyment and edification"—L. G. Crocker, Selected Essays of Montaigne, Introduction.

পৃথিবীর অন্যতম স্মরণীয় স্রষ্টা ভাবী ছোটগল্পের কতগুলি মৌল উপকরণকে কি ভাবে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, Montaigne-এর পাতা ওলটালেই তা বোঝা যাবে।

গ্রহণ করে ভল্‌ত্যার লিখলেন, 'Zadig', তাঁর তীব্র চাবুক চালালেন বিখ্যাত 'Candide' 'Princess of Belylon' 'Micronmigs' এবং 'L' Inge'nu'তে। উদ্দেশ্যমূলক ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা সত্ত্বেও উপন্যাসিকা Candide সাহিত্য হিসাবেই স্মরণীয়।

ভল্‌ত্যারের প্রভাবে বিখ্যাত এন্‌সাইক্লোপিডিস্ট-দের আবির্ভাব ঘটল। 'সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিশ্বপঞ্জী'—এই পরিচয়ের ছদ্মবেশে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ফরাসী বিপ্লবের সমিধ-আহরণে প্রবৃত্ত হল। ক্ষিপ্ত রাজশক্তি সাময়িক ভাবে এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার কণ্ঠরোধ করলেও ইতিহাসের রথচক্রকে সেদিন রোধ করবার সাধ্য কারোই ছিল না; দ্যনি দিদরো (Denis Diderot)-র নেতৃত্বে রাজতন্ত্র ও ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত ক্রোধ ও ঘৃণা উচ্ছ্বলিত হয়ে পড়ল এনসাইক্লোপিডিয়ার পাতায় পাতায়।

সামন্তচক্রের মধ্যগত পাপ এবং বিকৃতি, ধর্মগুরুদের ধর্মহীন যথেচ্ছা-রিতাকে উদ্ঘাটন করেছিলেন বলেই গিয়োভানি বোক্কাচেচা সেদিন ইতর জনসাধারণের শিল্পী বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন—"Artist for the vulgar people"; রাব্‌ল্যা তাঁর মুক্ত-বুদ্ধির দ্বারা এ দুটি সম্প্রদায়কে আরো নগ্নভাবে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। নাভারের রানী মার্গুইর্‌যাৎ রাজসহোদরা হয়েও নিজ সমাজের সত্যরূপ প্রকাশনে দ্বিধা করেন নি; এন্‌সাইক্লো-পিডিস্ট্‌রা দর্শন ও বিজ্ঞানের সাহায্যে এই ঘৃণাকে আরো তীব্র ও যুক্তিসিদ্ধ করে তুললেন। পুরোহিতদের প্রধান উপজীব্য ধর্ম এবং দেবতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে এন্‌সাইক্লোপিডিস্টদের অন্যতম অলবাশ (Baron d' Holbach) বললেন, "যদি একেবারে গোড়াতে ফিরে যাই, তা হলে দেখতে পাব দেবতাদের জন্মই হয়েছে মানুষের স্তূপীকৃত অজ্ঞতা থেকে।··· মানুষের অন্ধতাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করবার জন্যই প্রথা এদের সম্মান করে, অত্যাচার এদের রক্ষা করে।"

দিদ্‌রো তাঁর বক্তব্যের কোথাও কোনো আড়াল রাখলেন না। সুস্পষ্ট নির্ভুল কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন ঃ

"Men will never be free till the last king ls strangled with the entrails of the last priest!"

এন্‌সাইক্লোপিডিয়ায় যা তত্ত্বের মাধ্যমে উদ্‌ঘোষিত হয়েছে—দিদ্‌রো তাকে কথাসাহিত্যেও রূপ দিতে চেষ্টা করলেন। তাঁর হাতে গল্প-লেখকেরও কলম ছিল, ভোল্‌ত্যারের অনুসরণে তাঁরও রচনায় শ্লেষের চাবুক সমুদ্যত। তাঁর সার্জন এবং ৪৬ নম্বর শবের গল্পটি স্মরণ করলেই এই ব্যঙ্গের রূপ খানিকটা বোঝা যাবে। গল্পটি সংক্ষেপে এইরকম ঃ

"অস্ত্রোপচারক চিকিৎসকের একটি শবদেহের প্রয়োজন ছিল। তারই অনুসন্ধানে তিনি হাসপাতালে এলেন।

৪৬ নম্বরের রোগীটির তখন প্রায় অন্তিম অবস্থা। অসহ্য যন্ত্রণায় সে অহর্নিশ মৃত্যুকামনা করছে। হাসপাতালের রক্ষী জানালো, ডাক্তার তাঁর

প্রয়োজনীয় শব দু-ঘণ্টার মধ্যেই পেয়ে যাবেন। কারণ ওই রোগী প্রায় হয়ে এসেছে।

ডাক্তার একটু ভাবনায় পড়লেন। একদিনের জন্যে তাঁকে বাইরে যেতে হচ্ছে। দু ঘণ্টার মধ্যে যদি রোগীটি মারা যায় তাহলে তাঁর ঠিক সুবিধে হবে না—আরো বেশ কিছুক্ষণ তাকে বাঁচিয়ে রাখা চাই। ঘণ্টা ছয়েক বাদে মরলেই তার চলবে।

অতএব ৪৬ নম্বরের মৃত্যুমুখী রোগীকে খানিকটা জোরালো ওষুধ খাইয়ে ডাক্তার চলে গেলেন।

ফল হল অপ্রত্যাশিত। ওষুধ খেয়েই রোগী ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ঘণ্টা ছয়েক পরে ঘুম থেকে জেগে উঠল—তখন মৃত্যুর কথা দূরে থাক—সে প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে।

ডাক্তার ফিরে এসে দেখলেন, বাঞ্ছিত শবটি বিছানায় উঠে নিশ্চিন্তে বসে আছে।

হাসপাতালের রক্ষী রাগ করে বললে, স্যার, দোষ আপনারই। কেন ওই জোরালো ওষুধটা খাওয়াতে গেলেন? নইলে কখন মরে গিয়ে আপনার জন্য চমৎকার একটি শব তৈরি হয়ে থাকত!

ডাক্তার ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন, কী আর করা! আবার নতুন রোগীর জন্যেই অপেক্ষা করা যাক।''

গল্পটি এই। আপাতত খুব নিরীহ কৌতুক বলে ভ্রম হলেও এর মধ্যে সমাজ ব্যবস্থার একটি বিশেষ রূপ উদ্যত তর্জনীতে নির্দেশিত হয়েছে। ব্যাধিজর্জর মানুষটিকে সামান্য চিকিৎসাতেই বাঁচিয়ে তোলা যায়—অথচ সেজন্য কারো কিছুমাত্রই দায়িত্ব নেই—সামান্যতম চেষ্টাও নয়। নির্বোধ লোকটা অকারণে বেঁচে উঠেই মহা অপরাধ করেছে, কারণ ডাক্তারের শব-ব্যবচ্ছেদের সাধু উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হল না। এর রূপকথাটিও উপেক্ষার যোগ্য নয়; আসলে সাধারণ মানুষ, উপরতলার বুদ্ধিবিলাসীদের শব-ব্যবচ্ছেদের উপকরণ হিসেবেই প্রশস্ত—তার বেঁচে থাকাটা নানাদিক থেকে অবাঞ্ছিত বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

বারুদের স্তূপ এইভাবে তৈরি হচ্ছিল। তাই এন্‌সাইক্লোপিডিস্টদের আবাহন-মন্ত্র শেষ হতে না হতেই 'Marseillaise'-এর সঙ্গীতে ফ্রান্সের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। পূর্বসীমান্তে সমবেত বৈদেশিকদল এবং দেশত্যাগী অভিজাতদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রয়াসে পলায়নপর রাজা ষোড়শ লুই সপরিবারে ধরা পড়লেন বিক্ষুব্ধ ক্ষিপ্ত জনসাধারণের হাতে। নব প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের ক্ষমাহীন ক্রোধ নেমে এল বিচারের আকারে—গিলোটিনের ফলকের আঘাতে ষোড়শ লুইয়ের ছিন্ন মুণ্ড গড়িয়ে গেল।

রক্তস্রোতে রক্ত-কমলের মতো বিকশিত হয়েছিল ফরাসী বিপ্লব, রক্তের বন্যাই তাকে ভাসিয়ে নিলে। ইউরোপের 'মুক্তিদাতা'র ভূমিকায় নেমে 'নেপোলেঁয়' শেষে সম্রাট হয়ে সিংহাসনে বসলেন—আবার রাজতন্ত্রের শৃঙ্খলে

বাঁধা পড়ল ফ্রান্স। কিন্তু সারা পৃথিবীর স্নায়ু এই বিপ্লবের তা স্পন্দিত হয়ে উঠল।

ইংল্যান্ডে নব-রোম্যান্টিক্ কবিরা ফরাসী বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় স্বৈরতান্ত্রিক শাসন এবং অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে রুদ্রকণ্ঠে ধ্বনি তুললেন। তাঁরা মাত্র সৌন্দর্যময় পরম বিস্ময়ের দিকেই শূন্যচারী কল্প-বিহঙ্গকে ভাসিয়ে দিলেন না, চার্টিস্ট আন্দোলনের পূর্বনায়করূপে তাঁরা কেউ কেউ সক্রিয় ভূমিকাও গ্রহণ করলেন। শেলীর "Queen Mab" সেদিন শ্রমিকদের হাতে হাতে ইস্‌তাহারের মতো ঘুরতে লাগল—দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর বজ্রবাহিনী বাণী :

"Nature—no !
Kings, priests and statesmen blast the human flower
Even its tender bud : their influence darts
Like subtle poison through the bloodless veins
Of desolate society—"

এ ফরাসী বিপ্লবেরই মর্মধ্বনি। এবং শেলীর শেষ প্রত্যাশা : "শীত যদি এসে থাকে, তবে বসন্ত কি বহুদূরেই পড়ে থাকবে ?"

বসন্ত বহুদূরেই পড়ে থাকবে কিনা এ প্রশ্নের মীমাংসা না করেও বায়রণ জানতেন, সেই বসন্তকে আহ্বান করে আনা দরকার—সে মাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের চক্রাবর্তে আপনিই এসে উপস্থিত হবে না। 'ডন জুয়ান' রচনার আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সৈনিক কবি বায়রণ লিখেছেন :

"To remove the cloak, which the manners and maxims of the society threw over their secret sins, and shew them to the world as they really are···It was time to unmask the spacious hypocracy, and shew it in its native colours."

উনিশ শতকের ছোটগল্পের সঙ্গে ইংল্যান্ডের এই রোমান্টিক্ সাহিত্যের একটা মর্মসম্বন্ধ রয়েছে। একই যন্ত্রণায় জর্জরিত, একই প্রত্যাশায় উদ্দীপ্ত, একই ঘৃণায় উত্তিক্ত হয়ে তাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন। ভবিষ্যতের স্বপ্নে আচ্ছন্ন-দৃষ্টি আশাবাদী পার্সি বিশী শেলী যেন আন্তন চেকভের ভূমিকা, ক্ষুব্ধ-ক্ষিপ্ত জর্জ গর্ডন বায়রণ যেন গী-দ্য-মোপাসাঁর পূর্বপুরুষ।

কিন্তু সে প্রসঙ্গ পরে আলোচ্য।

ফরাসী বিপ্লব ব্যর্থ হল। লক্ষ্যভ্রষ্ট বিপ্লবের প্রতিনিধিরূপে স্তাঁদাল (Henry Beyle) উপস্থিত করলেন তাঁর 'লাল-কালো' (Le Rouge et le Noir) উপন্যাসের নায়ক জুলিয়েঁকে। উপন্যাসটি রাজনৈতিক। জুলিয়েঁর উদ্‌ভ্রান্ত জীবন এবং শেষ পর্যন্ত মাতিলদের হাতে তার ছিন্ন মুণ্ড যেন সে যুগের বুদ্ধিজীবীরই পরিণামস্বরূপ। আর এই সময় সাহিত্যে দেখা দিলেন অঁরে-দ্য-বালজাক্।

বালজাক্ একটি আশ্চর্য চরিত্র। রাশি রাশি বই লিখেছেন, বস্তু-বৈচিত্র্যের সন্ধানে ছুটোছুটি করেছেন, বিভ্রান্ত হয়েছেন অর্থ ও সামাজিক মর্যাদার জন্য, আর রেখে গেছেন অমর পিতৃহৃদয় 'পিতা গোরিয়া'—, নির্মল পবিত্র একটি 'গ্রাম্য ডাক্তার'।

এক আশ্চর্য মধ্যবিন্দুতে দুলেছেন বালজাক্। তাঁর মধ্যে 'Christianity and Profanit'y-র অবিরাম দ্বন্দ্ব। তাঁর সম্পর্কে জর্জ সেন্ট্‌সবেরি সিদ্ধান্ত করেছেন :

"As a Frenchman, as a man with a strong 18th century tincture in him, as a student of Rabelais, as one not too much given to regard nature and fate through rose coloured spectacles, as a product of more or less godless education (for his school-days came before the neo-catholic revival) and in many other ways, he was not exactly an orthodox person. But he had no ideas foreign to orthodoxy; and neither in his novels, nor in his letters nor elsewhere, would be possible, to find a private expression of unbelief."

'মারাত্মক চামড়া' ("La Peau de chagrin") নামে বাল্‌জাকের যে ছোট উপন্যাসটি আছে তা যেন একাধারে তাঁর আস্তিক্য-নাস্তিক্যের মধ্যকেন্দ্রে অবস্থিত, তাঁর জীবন ও কামনার রূপক কাহিনী। মন্ত্রপূত চামড়াটির গায়ে সংস্কৃতে লেখা ছিল : 'যে এটি কিনবে, তার প্রত্যেক ইচ্ছাই পূর্ণ হবে; কিন্তু প্রতিটি ইচ্ছাপূর্তির সঙ্গে সঙ্গেই একটু একটু করে ছোট হয়ে হয়ে যাবে চামড়া, আর মৃত্যু এগিয়ে আসবে তিলে তিলে।' জুয়াড়ী রাফায়েল এই চামড়া কিনে ঐশ্বর্য, প্রেম, অর্থ—সবই পেলো, পেলো না কেবল শান্তি। এর মধ্যে একদিকে অলৌকিকতায় আস্থা, অন্যদিকে রয়েছে দুর্ভাগ্যের অভিশাপের কাছে আত্মবলিদান। অদ্ভুত আতঙ্কে, অসহ্য যন্ত্রণায় মৃত্যুর মধ্যে সে তলিয়ে গেল। উপন্যাসটি উত্তরকালে স্টিভেনসনের বিখ্যাত গল্প "The Imp in the Bottle" এবং ডাবলু-ডাবলু জেকব্‌সের "The Monkey's Paw"কে প্রেরণা দিয়েছে।

কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা—ইভলীন হান্‌স্কা-র প্রণয়-প্রত্যাশী প্রতীক্ষমাণ বালজাক্ যেন দুরাশার "Peau de chagrin"এর কাছেই পলে পলে আত্মবিক্রয় করেছেন। এই মনোভঙ্গিই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গল্প "Facino Cane"তে—যেখানে অন্ধ বেহালাবাদক সারাজীবন সোনার স্বপ্ন দেখে ক্রমাগত পাপ আর ব্যর্থতার মধ্যে পরিক্রমা করেছে।

অষ্টাদশ শতকীয় মননে—প্রাচীন অভিজাত তন্ত্রের প্রতি মোহে—"ধর্ম ও অবিশ্বাসে দোলাদলচিত্ত", ব্যক্তিজীবনে বিকেন্দ্রিত বালজাক, তবু "On the side of the angels"এই (তাঁর নিজেরই ভাষায়) অবস্থান করতে চেয়েছেন। সেইজন্য রাব্‌ল্যা এবং হেপ্তামেরনের প্রভাবে তিনি "Droll

Stories" লিখেছেন।[১] রোম্যাণ্টিক্ প্রেরণায় লিখেছেন 'মরু-বাসনা" ('Une Passion dans la De'sert'); 'El Verdugo' গল্পে একটি স্পেনীয় সামন্ত পরিবারের করুণ পরিণাম, ফরাসী অধ্যক্ষের আদেশে জ্যেষ্ঠপুত্রের হাতে মার্কুইস্ বংশের আত্মদান তাঁর আভিজাত্য মোহেরই নিরিখ; 'Un E'pisode de la Terreur'—ফরাসী বিপ্লবের রক্তমাখা দিনগুলির এক দারুণ ইতিবৃত্ত—ষোড়শ লুইকে গিলোটিনের খড়্গাঘাতে যে ছিন্নশির করেছিল, সেই ঘাতকের অনুতাপ ও অন্তর্যন্ত্রণার ইতিহাস তাতে বিবৃত; আবার "Jesus Christ en Flanders" বিশ্বাস ও ভক্তির চন্দনে বিচর্চিত।

নৌকায় ধর্মপ্রাণ পাদ্রী রয়েছেন, রয়েছে ধনিক, আছে লোভী বণিক, আছে সমাজের উঁচুস্তরের মানুষ। তারা খ্রীষ্টকে জায়গা দিল না, তিনি এসে স্থান নিলেন দরিদ্রের দলে। উপরতলার মানুষেরা শাস্ত্র জানে, পুঁথি জানে, তর্ক-বিতর্ক সবই জানে। কিন্তু হঠাৎ প্রচণ্ড তুফান উঠল সাগরে। সেই সংকট মুহূর্তে কেউ খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস রাখতে পারল না—কেবল একটি গ্রাম্য সরল শিশুক্রোড়ে রমণী ছাড়া। তাই সকলে যখন সে তুফানে ডুবে মরল—তখন খ্রীষ্টের কল্যাণ-বাহু এই মেয়েটিকেই রক্ষা করল; মেয়েটির অনুসরণে সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে পার হতে পারল কৃষক, পার হল সৈনিক—পুরুষকারের বলে কোনোমতে প্রাণ পেল মাঝি। আর—"ফ্ল্যাণ্ডার্সেই শেষবারের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন যীশুখ্রীষ্ট।"

এই অনিশ্চিত মানসিকতার জন্যই বিচিত্র রসের অসংখ্য গল্প লিখতে পেরেছেন বালজাক্। যেন নিজের মনের মধ্যে কোথাও দাঁড়াবার জায়গা পাননি বলেই বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান করে গেছেন, তাঁর সমকালের মধ্যে বাস করেও ইতালীয় নভেলা আর রাবল্যার জগতে ফিরে যেতে চেয়েছেন। Droll Stories (Contes Droliques)-এর পরীক্ষামূলক রচনায় তিনি হয়তো সাফল্য লাভ করেছেন, কিন্তু 'রাজার প্রণয়িনী' বা 'সন্ন্যাসী আমাদর' জাতীয় রুচিহীনতা একালের পাঠক-মনকে পীড়িত করে। যাই হোক, ছোটগল্পের জন্ম যে যন্ত্রণা থেকেই—বালজাকের সাহিত্যই তার প্রমাণ। বস্তু-বৈচিত্র্য এবং তীব্রতায় তাঁর গল্প উত্তরকালে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। তাঁর সব চেয়ে ভক্তশিষ্য হলেন স্টিভেনসন।

তবে বালজাকের গল্প আঙ্গিক হিসাবে দুর্বল, ছোটগল্পের একমুখিতা তিনি সর্বত্র রক্ষা করতে পারেন নি, তাঁর রচনায় 'নভেলা' তখনো ছোটগল্পকে নিজস্ব রূপে মুক্তি দেয়নি; তার জন্য নবীনতর সাধকের প্রয়োজন ছিল।

বালজাকের এই মানস-চাঞ্চল্যের পাশে বলিষ্ঠ রোমান্টিক আন্দোলন নিয়ে এলেন ভিক্টর ইয়ুগো। তাঁকে অনুসরণ করলেন 'Repressed

---

১। Droll Stories-এর The Sermon of the Merry Vicar of Mendor গল্পটিতে রাব্ল্যাকে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে আনা হয়েছে। বালজাক্ ঋণ গোপনের চেষ্টা করেননি। আসলে রাজা ও গীর্জাকে ব্যঙ্গ করার প্রেরণায় প্রাচীন রচনা-পদ্ধতির একটা বিচিত্র পরীক্ষা বালজাক্ এই বইতে করেছেন।

Romantic' প্রস্পের মেরিমে (Prosper Merimee')। বালজাকের শিল্পগত অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করলেন মেরিমে, ছোটগল্প যে আঙ্গিকের দিকে থেকে অনেক পরিচ্ছন্ন হতে পারে—তার মধ্যে যে কাব্যধর্মী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা যায়—মেরিমের লেখাতে তা এইবারে পরিস্ফুট হল। একদিক থেকে তাঁকে আধুনিক ছোটগল্পের প্রথম সফল রূপকার বলা যেতে পারে। গল্পলেখক হিসাবে তিনি অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিলেন।

জীবনের অত্যন্ত ছোট ঘটনাকে আশ্রয় করেও কি ভাবে গল্পের রস জমিয়ে তোলা যায়—মেরিমে প্রথম তার পথ দেখালেন। তাঁর "নীল ঘর" নামে কৌতুকমিশ্রিত রোমান্টিক কাহিনীটি স্মরণযোগ্য। দুটি তরুণ-তরুণী বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে একটি ছোট হোটেলের রোমান্টিক নীল ঘরটিতে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু তাদের বাসররাত্রির স্বপ্ন বার বার বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে অবাঞ্ছিত উপদ্রবে। শেষ পর্যন্ত একটা কাল্পনিক হত্যাকাণ্ডের ভয়ে নায়কের যখন শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম, তখন ভ্রান্তি-বিলাসের অবসান এবং আনন্দিত উপসংহার।

কিন্তু শুধু স্নিগ্ধ কোমলতাই নয়, মেরিমের উপন্যাস এবং গল্পসাহিত্যে কখনো কখনো মানুষ চরিত্রের নির্মমতা ও জীবনের নিষ্ঠুরতা প্রায় নিয়তির মতো দেখা দিয়েছে। হিংসা ও রক্তপাতের যেসব দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত কাহিনী তিনি রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে 'কলবাঁ' 'কারমেন' এবং 'মাতেও ফালকন' (Metteo Falcone) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'কারমেন' অবলম্বনে পরে বিশ্ববিখ্যাত একটি অপেরা রচিত হয়েছে। তাঁর 'La Venus d'Ille' ('দ্বীপের ভেনাস') অলৌকিক রসের এক দারুণ কাহিনী।

নিষ্ঠুর গল্প হিসেবে 'মাতেও ফালকন' বিশ্বসাহিত্যে সুপরিচিত হয়ে আছে। মাতেও ফালকনের বাড়ীতে এক পলাতক দস্যু এসে আশ্রয় নিয়েছিল। তার সন্ধানে এল পুলিশ। মাতেও তখন বাড়ী ছিল না, পুলিশের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে তার বালকপুত্র ফর্তুনাতো দস্যুকে তাদের হাতে ধরিয়ে দিলে।

হোক বালক, হোক নির্বোধ, বিশ্বাসঘাতকের জন্য কোনো ক্ষমা মাতেওর নেই।

"ফর্তুনাতো, ওই বড় পাথরটার পাশ গিয়ে দাঁড়া।"—বাপের আদেশ পালন করল ফর্তুনাতো, বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে, তারপর মিনতি করতে লাগল, "আমাকে হত্যা কোরো না—বাবা আমায় মেরে ফেলো না।" প্রার্থনা উচ্চারণ কর্, তোর"—বজ্রকণ্ঠ বেজে উঠল মাতেয়োর। গুলিভরা বন্দুক সঙ্গে এনেছিল মাতেয়ো—এইবার তুলে ধরল ছেলের দিকে, বললে, "ঈশ্বর তোকে ক্ষমা করুন।"

মেরিমের সাহিত্য-সম্ভার বেশি নয়, কিন্তু ফরাসী গল্পসাহিত্যে তাঁর অবিস্মরণীয় ভূমিকা রয়েছে। আধুনিক গল্পের যাঁরা অগ্রনায়ক তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেরিমের নাম উচ্চারণ করতে হয়।

এই সময় আবির্ভূত হলেন ফরাসী রিয়্যালিজমের গুরু—ন্যাচারা-

লিজ্‌মের উদ্গাতা ফ্লোব্যার (Gustave Flaubert) তাঁর স্বনামধন্য 'মাদাম বোভারী'কে নিয়ে। "We desire the anarchy and the autonomy of art".[১] 'রেভ্যু' পত্রিকার এই মুখবন্ধ যেন ফ্লোব্যারেরও শিল্পবাণী।

ফ্লোব্যারকে ঘিরে সেদিন অসাধারণ এক সাহিত্যিক পরিমণ্ডল। তাতে তুর্গেনেভ আছেন, জোলা আছেন, গোতিয়ে (Theophile Gautier) আছেন, জর্জ সাঁদ্ (Sand) আছেন, দোদে (Daudet) আছেন— রাজনীতিক চেতনাদীপ্ত বলিষ্ঠ নেতা ইয়ুগোর সঙ্গেও সশ্রদ্ধ যোগাযোগ রাখেন ফ্লোব্যার। আর আছেন গী-দ্য-মোপাসাঁ—ফ্লোব্যারের ভাষায় "My disciple"—শুধু শিষ্যই নন, পরম প্রিয়শিষ্য।

মোপাসাঁ

'Half-hearted Romantic' হলেও রোম্যান্টিসিজ্‌মের প্রভাবমুক্ত বাস্তব জীবনের সত্য প্রকাশ এবং শিল্প-সুন্দরের সাধনা—এই সেদিন ফ্লোব্যারের বাণী। তাঁর শিষ্য মোপাসাঁ সেদিন জীবন উদ্‌ঘাটনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, কিন্তু সুন্দরের স্পর্শলাভ তাঁর অদৃষ্টে ঘটেনি।

দুর্ভাগ্য বালজাক্ অর্থ ও খ্যাতির দুর্বাসনার শিকার, মোপাসাঁ স্বোপার্জিত ব্যাধি ও 'Melancholia'-য় অভিশপ্ত। ফ্লোব্যার তাঁকে বার বার এই আত্মপীড়ন থেকে মুক্ত হতে বলেছেন; বলেছেন সংযত হও, নারী আর উন্দামতার হাত থেকে নিয়ন্ত্রণ করো নিজেকে। কিন্তু নিজের স্বচ্ছন্দ বুদ্ধিচর্চার শান্তিপূর্ণ গ্রাম্য পরিবেশ থেকে, প্যারিসিয়ান মোপাসাঁর অন্তর্যন্ত্রণা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা বোধ হয় ফ্লোব্যারের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। আর যে অসংযম চিরকাল শিল্পী-সাহিত্যিকের করুণ অপমৃত্যুর ইতিহাস রচনা করে, মোপাসাঁরও সেই দারুণ পরিণতি থেকে বুঝি অব্যাহতি ছিল না!

তৃতীয় নেপোলেয়ঁর ফ্রান্স (বিশেষভাবে পারী) তখন একটি চূড়ান্ত রাজনৈতিক ও আত্মিক পরাভবের মধ্যে অবলীন। 'সাম্য-স্বাধীনতা-সৌভ্রাত্র' রাজতন্ত্রের অভ্যুদয়ে বহুকাল আগেই কর্সিকানের পদমূলে আত্মবিসর্জন দিয়েছে। তারপর দুর্বিপাক আর দুর্গতি। একদিকে অভিজাত সম্প্রদায়ের নৈতিক অধঃপাত সম্পূর্ণ হয়েছে (মোপাসাঁর 'Bel-Ami' যার পরিচয়), অন্যদিকে তার বিশাল রাষ্ট্রিক মহিমা নবজাগ্রত জার্মানের রুদ্রনায়ক বিস্‌মার্কের হাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। পারীর পতন ঘটেছে, অবশেষে ফ্রাঙ্কফোর্ট চুক্তিতে আল্‌সাস্ এবং লোর‍্যান জার্মানীকে তুলে দিয়ে লজ্জায় গ্লানিতে ফ্রান্স মুখ লুকিয়েছে—মার্সেলিসের গান ডুবে গেছে সীন নদীর জলে।

এই রাজনৈতিক ও মানসিক দুর্গতির মুহূর্তে, ব্যাধিগ্রস্ত বিষণ্ণ মোপাসাঁর অভ্যুদয়। স্কুলের ছাত্রের মতোই দিনের পর দিন তাঁকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন ফ্লোব্যার—কিন্তু মোপাসাঁর মনের অন্ধকার ঘুচিয়ে

১। F. Steegmuller, Flaubert and Madam Bovary, P. 266

বিশুদ্ধ শিল্পভূমিতে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। মোপাসাঁ রিয়্যালিজমকে ছাপিয়ে ন্যাচারালিজমের মধ্যে পা দিয়েছেন—কখনো কখনো জোলাকেও পর্যন্ত অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর গল্পসাহিত্যে এই কালের তিক্ত, ক্ষিপ্ত ও নীতিধর্মহীন মনোভাবের অভিব্যক্তি। ছোটগল্পকে বলা হয়ে থাকে "Pointing finger"—মোপাসাঁর গল্প সবচাইতে নিষ্ঠুর "Pointing finger"।

পরাজিত ফরাসীর রক্তাক্ত হৃদয়ের জ্বালা এবং উচ্চতর সমাজের প্রতি অসহ্য ঘৃণা নিয়ে মোপাসাঁ তাঁর প্রথম গল্প লিখলেন "চর্বির গোলা"—(Boule de Suif)। গল্পটির উপকরণ তিনি পেয়েছিলেন তাঁরই এক আত্মীয়ের (Charles Cord'homme) বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই; এই গল্পের 'Corundent'এর ভূমিকাটিও তাঁরই। "The heroine of the original anecdote is supposed to have been a Rouen courtesan named Adrienne Legay" এবং মোপাসাঁর সঙ্গে তার পরিচয়ের নানা কাহিনী শোনা যায়। মোপাসাঁর জননী (Laure de Maupassant) লিখেছেন: "The poor women died recently in poverty. Some say she killed herself, lacking the courage to endure her wretchedness any longer. I was told too late of her circumstances; otherwise I should have helped her. Some people would have looked at me askance for having anything to do with a creature of that kind, but I would have done my duty. After all, there was a sublime hour in the life of that girl. And my son owned her something."[১]

একটি পতিতা দুর্ভাগিনী সম্পর্কে এই অনুকম্পা শুধু কৃতজ্ঞতাজাত নয়—এর মধ্যে কর্তব্যবোধের প্রেরণা অনুরণিত। আদ্রিয়্যান লেগায় বিয়াত্রিচে অথবা লরা অবশ্যই নয়—কিন্তু মোপাসাঁর শিল্প-জীবনের নবদিগন্ত যে মুক্ত করে দিয়েছিল, তার কথা আমরাই কি কখনো ভুলতে পারি?

মোপাসাঁর প্রধান দুটি বক্তব্য এই প্রথম গল্পেই যেমন উদ্ভাসিত হল, তেমনি বোঝা গেল পৃথিবীতে সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকের পদধ্বনি বেজে উঠেছে। গুরু ফ্লোব্যার এই লেখাটি পড়ে মোপাসাঁকে যে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, তা গল্পসাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই মহামূল্যবান চিঠিখানির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক:

'I have been longing to tell you that I consider *Boule de Suif a masterpiece.* Yes, youngman, nothing more nor less than a masterpiece. The idea is quite original, magnificently

১। F. Steegmuller, Maupassant, P. 104-105

worked out and excellent in style. The setting and the characters are brought before one's eyes, and the psychology is grand. I am delighted with it, in short ; and two or three times I laughed aloud.

"That little tale will *live*, I promise you. What a grand bunch your bourgeois are. Not a single failure. Corundet is immense and life-like. The nun pitted with smallpox is perfect, and the count with his 'my dear child' and the ending. The poor girl crying with her friend sings the Marseillaise ; that is grand too. I should like to hug you for a quarter of an hour on end. I *am* pleased with it, I enjoyed it, and I admire it."[১]

এর পরে অবশ্য নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারে ফ্লোবেয়ার গল্পটিকে কিছু কিছু সংশোধন করতে বলেছেন। কিন্তু সমগ্রভাবে গল্পটি তাঁকে যে কতখানি নাড়া দিয়েছিল—চিঠিটির উচ্ছ্বাসের মধ্যেই তার পরিচয় আছে। ফ্লোবেয়ার ঠিকই বুঝেছিলেন, এ গল্প অমরত্ব লাভ করবে। একটি সাধারণ মেয়ের মর্যাদাকে জার্মান পশুদের হাতে সঁপে দিয়ে যে ভদ্রনামিক কাপুরুষেরা নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করেছিল, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও বাস্তবতায় তাদের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়ে মোপাসাঁ একটি চিরন্তন নিয়মের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

গণিকাদের প্রতি গী-দ্য-মোপাসাঁর শরৎচন্দ্র বা কুপ্রিনের মতো একটি সহজাত সমবেদনা ছিল। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, নারীকে এই নরকের জীবিকা গ্রহণ করতে হয় সমাজের শোষণে—সে পুরুষের লোভ ও নীচতার নিরুপায় শিকার। এই কারণে তাঁর বহু গল্পে গণিকা বা পদস্খলিতা নারী বিশিষ্ট মহিমায় মণ্ডিত হয়েছে। নারীর এই অমর্যাদার প্রতিবাদেই হয়তো তার প্রতি তিনি মুক্তকণ্ঠে ছাড়পত্র দিয়েছিলেন একটি চিঠিতে :

"I consider (in prose) that a woman is a *sovereign* with the right to do only what she wishes, to obey all her caprices, impose all her fancies, and tolerate nothing that would be a burden or a bore."

মেরিনের হাতে গল্পসাহিত্যের যে কলারীতি নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল, তারও সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছেন মোপাসাঁ—রচনা হিসাবেও 'Boule de Suif' অসামান্য। স্টিগমুলারের ভাষায় :

১। Letters of Gustave Flaubert, Ed. by Rumbolt, Trans. by Cohen, P. 231-32

"Maupassant made it into the first of his characteristic work of art. The beauty and power of *Boule de suif* are the result of the successful combination—by means, of course, of technical narrative skill—of two themes, both close to Maupassant's heart : the theme of the humiliation of a woman, already fruitful in *le papa de Simon*, the theme of humiliation of France."[১]

ফ্লোব্যার আধা-রোমান্টিক—জোলা প্রচ্ছন্ন-রোম্যান্টিক। মোপাসাঁ প্রায় মোহমুক্ত। এই "sense of humiliation", ফরাসী জাতির স্বদেশ ও নারীর এই অবমাননা, তাঁর 'সিমর বাবা' (Le Papa de Simon) বা এই ধরণের দু-একটি গল্পে শেষ পর্যন্ত মহিমোজ্জ্বল হয়ে উঠলেও তাঁর সমগ্র গল্প-সাহিত্য মোটের উপর দুঃখবাদে অভিষিক্ত, তিক্ততায় জর্জরিত, 'আয়রনি' আর প্রকৃতির পরিহাসে কুটিল। প্রুশীয় সৈন্য অধিকৃত আল্‌সাস লোর‍্যানের পটভূমিতে তাঁর কয়েকটি দেশপ্রেমাত্মক আদর্শনিষ্ঠ গল্প আছে, যথা 'মাদমোয়াজ্যাল্‌ ফিফি', 'দ্রাক্ষাকুঞ্জে'র সেই বিখ্যাত উপাখ্যান আছে, আছে সেই বিকৃতমস্তিষ্কা নারীটির কথা—বর্বর প্রুশীয়ানরা যাকে অরণ্যের মধ্যে মৃত্যুর হাতে ফেলে দিয়ে এসেছিল ; রচনা করেছেন 'La Mere Sauvage'—পুত্রহন্তা জার্মানদের ওপর যে মা দারুণ প্রতিশোধ নিয়েছিল। কিন্তু 'Boule de Suif' যে ঘৃণার তাড়নায় সূচিত হয়েছিল, 'একটি উম্মাদের আত্মকথায়' তার ভয়ঙ্কর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তখন অর্ধচেতন অবস্থায় তিনি 'Le Horla'র বিভীষিকা দেখেছেন ; লিখেছেন 'Qui Sait' ('কে জানে')।

নীতি বা সমাজবোধকে তিনি কী পরিমাণে পরিহাস করেছেন, তার নিদর্শন রয়েছে তাঁর 'গয়না' (Les Bijoux) প্রমুখ ছোটগল্পে ; কামনার খরশাণিত রূপ ফুটিয়েছেন তাঁর 'মারোক্কা'য়, আর স্বনামধন্য 'নেকলেস্‌' (La Parure) গল্পটিতে জীবন সম্পর্কে তাঁর বিকট ব্যঙ্গ বীভৎস অট্টহাসির মতো ধ্বনিত হয়েছে।

জীবনের শেষ দিনগুলিতে মহত্তর মানবতার দিকে তাঁর শিল্পী চেতনা আকৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। "He craved for affection like a neglected child, frowning and shrinking. Love, he realized, was not lust but sacrifice of self, deep joy and poetic delight. But this realization came too late and to his lot fell only regrets and pangs of conscience."[২]

এই ভাঙনের যুগে মোপাসাঁর হাত দিয়ে যে আধুনিক ছোট গল্প

১। Maupassant, Steegmuller, P. 102

১। K. Paustovsky, The Golden Rose. P. 192

বিকশিত হল—তার বক্ষের উপর যেন একটি আগ্নেয় জিজ্ঞাসাচিহ্ন জ্বলজ্বল করছে। এই জিজ্ঞাসা—সমাজকে, মানুষকে, বিশ্বনীতিকে। মোপাসাঁ এবং চেকভ—এই দুজন শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার লেখনীতেই যেন ভবিষৎ ছোটগল্পের মর্মপ্রেরণা প্রকটিত হল।

অসংখ্য সুখ্যাত-কুখ্যাত ছোটগল্পকে একপাশে সরিয়ে রেখে মোপাসাঁর একটি স্বল্প-পরিচিত সংক্ষিপ্ত গল্পকে পুনর্বিবৃত করা যাক। গল্পটির নাম 'Coco'—একটি বুড়ো ঘোড়ার কাহিনী। উনিশ শতকীয় ছোটগল্পের চরিত্র এবং তার রীতির একটি প্রতিনিধিত্বমূলক উদাহরণ বলা যেতে পারে এটিকে ঃ

ধনী কৃষক ল্যুকার একটা ঘোড়া বুড়ো হয়ে গেল। মাল টানতে পারে না, চাষের কাজে লাগে না। অনাবশ্যক বাহুল্য মাত্র। সকলেই বলেছিল, একে আর পুষে কী লাভ, কিন্তু ল্যুকা তার মায়া কাটাতে পারে না, এককালে ঘোড়াটা তো অনেক করেছিল তার জন্যে।

তখন তাকে চরাবার ভার দেওয়া হল একটি পনেরো বছরের কিশোর রাখাল জিদরের ওপর।

কিন্তু একটি অল্পবয়সী ছেলের কতক্ষণ আর এ-ভাবে ভালো লাগে একটা বুড়ো ঘোড়ার দেখাশোনা করতে? সবাই তাকে ঠাট্টাও করত। জিদর বিরক্ত হয়ে নানা অত্যাচার করত ঘোড়াটার উপর। শেষে এক জায়গায় এনে বেঁধে রাখল ঘোড়াকে—যার চারপাশে অনেক ঘাস ছিল।

এরপর থেকে সে রোজ ওই একই জায়গায় ঘোড়াটাকে এনে বেঁধে রাখত, প্রাণীটা খুঁটে খুঁটে ঘাস খেত। কিন্তু কিছুদিনের ভিতর একটা ভারী মজার জিনিস লক্ষ্য করল জিদর। ঘোড়াটার চারপাশে যা ঘাস ছিল, তা সে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে—এখন আর সে মুখের কাছে ঘাস পাচ্ছে না; তাই শরীরটাকে যতদূর সম্ভব টান-টান করে, জিভটাকে সামনে যতখানি সম্ভব বাড়িয়ে দিয়ে ঘাসের গোছা ছিঁড়ে নিতে চেষ্টা করছে।

দেখে জিদরের ভারী কৌতুক বোধ হল। দড়িটা বাড়িয়ে না দিয়ে, বরং আরো একটু ছোট করে দিলে সে।

এইবারে ক্ষুধার্ত কোকোর যন্ত্রণা তীব্রতর হয়ে উঠল। চারদিকে তার সবুজ ঘাসের দোলা—অপরিমিত খাদ্যের সমারোহ, অথচ তা থেকে একটি গ্রাসও তার পাবার উপায় নেই। যত সে চেষ্টা করে, ততই নিষ্ঠুর দড়ির টান তাকে বাধা দেয়—ব্যথায় কাতর করে, আর বাঁচবার জন্যে তার সেই উন্মাদ চেষ্টা দেখে ছেলেটা আনন্দে হাসতে থাকে।

এক দিন—দু দিন—তিন দিন। ক্ষুধায় জর্জরিত জন্তুটা মর্মছেঁড়া যন্ত্রণায় অপরিমেয় অথচ অপ্রাপ্য খাদ্যের দিকে শুকনো কালো জিভটা বাড়িয়ে দেয়, রুগ্ন বুকের পাঁজর থর-থর করে কাঁপে, শূন্যদৃষ্টি নিরুপায় চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। জিদর ভাবে মরুক, একটা অকর্মা বুড়ো ঘোড়ার বেঁচে থেকেই বা কী লাভ?

তারপর—চারদিকে অফুরন্ত খাদ্যের আয়োজন থাকা সত্ত্বেও না খেতে

পেয়ে বুড়ো ঘোড়াটা মরে গেল।

বুড়ো ঘোড়া কোকো মরে গেল। কে আর টানাহেঁচড়া করে তাকে? ওইখানেই মাটিতে পুঁতে দেওয়া হল তার শব। তারও পরে নামল বর্ষার ধারা। জান্তব দেহের সারে আর বৃষ্টির জলে কোকোর কবরের উপর রাশি রাশি সতেজ আর শ্যামল ঘাসের জন্ম হল।

"Et l' therbe poussa drue, verdoyante, vigoreuse, nourrire par le pauvre corpse."

এই তো গল্প। কিন্তু এটি কি শুধুই গল্প? জীবন আর জগতের চূড়ান্ত নির্দয়তায়, ক্ষুধিতের প্রতি সংসারের মর্মঘাতী পরিহাসে, সমাজ-ব্যবস্থার উপর তীব্রতম ধিক্কারে এই গল্পটি কেবল যে আশ্চর্য শিল্প-সফলতা লাভ করেছে তাই নয়—একদিক থেকে বলতে গেলে এই হল আদর্শ ছোট-গল্পের রূপ। বিন্দুতে সিন্ধুর অভিব্যক্তি, গোষ্পদে আকাশের প্রতিবিম্ব, অণোরপি অণীয়ানের সাহায্যে মহতোহপি মহীয়ান সত্যের অভিব্যঞ্জনা।[১]

এই গল্পেই আমরা সত্যিকারের গী-দ্য-মোপাসাঁকে পাই।

ঘৃণায় ক্ষোভে, বিষাক্ত আত্মক্ষয়ে যে মোপাসাঁ উন্মাদের দিনপঞ্জী লিখেছেন এবং শেষ পর্যন্ত অকালমৃত্যুতে হারিয়ে গেছেন, তাঁর ছোটগল্পের আর একটি দিকও ছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রলয়-লগ্নে বাস্তিলের কারাগার যারা ভেঙেছিল, তারা প্যারিসিয়ান ব্যভিচারবিলাসী অভিজাত সমাজ নয়; তারা এসেছিল শ্রমিকের অন্ধকার কোটর থেকে, এসেছিল নরম্যাণ্ডীর বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্র থেকে। দেখা গিয়েছিল, নাগরিক জীবনের এই ক্লেদজর্জর মানুষ ছাড়াও 'La France'-এর এমন আরো অনেক সন্তান আছে—যারা সুস্থ, স্বাভাবিক, প্রাণদীপ্ত। তারা মাটির কাছাকাছি বাস করে—জীবনকে সহজ সরল ভাবে গ্রহণ করতে পারে, মনোবিকলনের জটিল গোলোক-ধাঁধায় তারা পদে পদে উদ্‌ভ্রান্ত হয় না।

এদের নিয়েও মোপাসাঁ কিছু গল্প লিখেছেন। এইসব গল্পে পারীর শ্বাসরোধী বিষাক্ততা নেই—সূর্যালোকিত মুক্ত প্রান্তরের প্রাণৈশ্বর্য আছে। 'সিমর বাবার গল্প', 'চাষার মেয়ের গল্প', 'ভবঘুরে'। চাষার মেয়ের গল্পটি (Histoire d'une fille du ferme) মোপাসাঁর জীবন-প্রীতির একটি স্নিগ্ধ ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

একটি সরল গ্রাম্য মেয়ে, দুর্বৃত্তের ছলনায় ভুলে শিশুর জননী হল। লোকটা মেয়েটিকে বিপদে ফেলে পলায়ন করল। এসব বর্বরেরা চিরকাল যেমন করে থাকে। বিপন্ন জননী নিজের লজ্জায় মরমে মরে গেল, তার শিশুটি বড় হতে লাগল অনাথাশ্রমে। মধ্যে মধ্যে যায় সে শিশুটিকে দেখে আসতে—দিয়ে আসে তাকে খাদ্য পোশাক ইত্যাদি।

১। "If life is pathetic or funny or brutal or indecent, it is life and not Maupassant who seems to be responsible."—Macy, The Story of the World Lit, P. 414

এর মধ্যে আর একজন কৃষক তার অনুরাগী হল—বিবাহের প্রস্তাবও করল। মেয়েটি তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করতে পারল না, অথচ বলতেও পারল না নিজের অতীত কাহিনী। দুজনে মিলিত হল দাম্পত্য-জীবনে। কিন্তু তাদের আর সন্তান হয় না। একটি শিশুর জন্যে স্বামীর অন্তর হাহাকার করে—তার মনের শান্তি মুছে যায় দিনের পর দিন ; শেষে তার মনে হয়, স্ত্রী নিশ্চয় বন্ধ্যা—নইলে এ দুর্ভাগ্য কেন হবে! স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে ধীরে ধীরে নেমে আসতে থাকে ব্যবধানের কালো ছায়া।

যখন স্বামীর মনোযন্ত্রণা দুঃসহ হয়ে উঠল, তখন সে জানতে পারল স্ত্রীর গোপন রহস্য। জানল, অনাথ আশ্রমে তার সন্তান বড় হচ্ছে।

ক্রোধ নয়—বেদনা নয়, আনন্দে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। পরম চরিতার্থতায় তখনি স্ত্রীকে নিয়ে ছুটে চলল শিশুটিকে আনতে ঃ

'সত্যি কী সুখী, কী সুখী আমি! আমি শুধু এটা কথার কথাই বলছি না—আমি সত্যিই আজ আনন্দিত, ভারী আনন্দিত!'

'সংকেত'—যে গল্পে কুলমহিলা বারবধূ জীবনের স্বাদ নিচ্ছেন কিংবা 'কর্তার কী করে রাজ-সম্মান লাভ হল' ইত্যাদি বিকট কৌতুকের গল্পে মোপাসাঁ যে-সমাজকে বিদ্রূপের চাবুক হেনেছেন—নরম্যাণ্ডির কৃষকেরা তাদের দলের নয়। এই সাধারণ শ্রমিক-কৃষাণের জীবনেই মোপাসাঁ সেদিন নব-জীবনের অংকুর দেখেছিলেন ; কিন্তু সেই অবক্ষয়ী নাগরিকতায়, মনো-ব্যাধির আচ্ছন্নতায় মোপাসাঁ তাদের পূর্ণ মহিমা দেখতে পেলেন না, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পকার হতাশার অন্ধকারেই শেষ পর্যন্ত তলিয়ে গেলেন।

তা সত্ত্বেও মহান মোপাসাঁর মহিমা চিরকাল জেগে থাকবে। তাঁর সম্পর্কে ঋষি তলস্তয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি এই ঃ

"Next to Victor Hugo, Maupassant is the best writer of our time. I am very proud of him and rank him above all his contemporaries."

যদিও ফরাসী দেশে কল্পনাতীত জনপ্রিয়তা অর্জিত হয়েছে, ত্রিশ চল্লিশটি পর্যন্ত মুদ্রণ হয়েছে একটি গ্রন্থের, তবুও মোপাসাঁর জীবিতকালে তাঁর গল্পের সামান্যই ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছিল। পরে নানা ধরণের অনুবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। কোনো কোনো সংকলনে এমন কিছু কিছু গল্প তাঁর নামে প্রকাশ করা হয়—যা তিনি কখনোই রচনা করেননি। এম. ওয়ালটার ডান(M. Walter Dunne) এ বিষয়ে সবচাইতে বড় অপরাধী। 'ডান সংগ্রহ' শীর্ষক মোপাসাঁর বিপুল সংকলনটিতে অন্তত এই রকম পঁয়ষট্টিটি গল্পের সন্ধান দিয়েছেন মোপাসাঁর জীবন ও সাহিত্যের সবচাইতে প্রামাণ্য লেখক ফ্রান্সিস স্টিগমুলার। এই গল্পগুলির অনেক কটিই কুৎসিত ও পঙ্গু—সম্ভবত প্রথম জীবনে Gaulois বা Gil Blas পত্রের সঙ্গে জড়িত থাকার সময় যেসব বেনামী ও উগ্র গল্প মোপাসাঁ এবং মোপাসাঁর বন্ধুচক্র

কর্তৃক রচিত হয়েছিল, তাদেরই একটা বৃহৎ অংশ পরে তার নামেই চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। অশ্লীল সাহিত্যের রসায়ন যুগিয়ে পাঠকের বিকৃত রুচিকে আকৃষ্ট করাই হয়তো ছিল এই জালিয়াতির মুখ্য উদ্দেশ্য।

মৃত্যুর আগে নিজের ভ্রান্তি মোচনের বাসনা মোপাসাঁর জেগেছিল, কিন্তু সে সুযোগ তিনি আর পাননি। তাঁর নিজের কথাই তাঁর জীবনে শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে উঠল :

"I entered literary life like meteor, and I shall leave it like lightning !"

অনিবার্য ভাবেই এই উক্তি মোপাসাঁর মর্মসঙ্গী একজন ইংরেজ কবিকে মনে পড়িয়ে দেয়। তিনি হলেন জর্জ গর্ডন বায়রন।

মোপাসাঁর পাশাপাশি ফ্রান্সে আরও একটি ছোটগল্প লেখক সেদিন নিজ স্বাতন্ত্র্যে দেখা দিয়েছিলেন। তিনি আলফঁস দোদে (**Alphonse Daudet**)। দোদে মনোধর্মে হয়তো ন্যাচারালিস্ট্ এমিল জোলার শিষ্য; কিন্তু তাঁর ছোটগল্পে আর এক জগতের সংবাদ মেলে। এমন প্রকৃতি-প্রেম এবং কাব্যসৌন্দর্য এই সব রচনায় প্রকটিত হয়েছে যে তিনি 'ঐন্দ্রজালিক' বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। সংযত পরিচ্ছন্ন আঙ্গিকও দোদের বিশেষত্ব। মোপাসাঁর শ্বাসরোধী গল্পের পাশে দোদের গল্পগুলি যেন আমাদের স্বস্তি ও মুক্তি এনে দেয়। নিজ পল্লী-অঞ্চলের বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর গল্পে একটি অনন্য সৌন্দর্য ছড়িয়ে রেখেছে। '**Letters de Mon Moulin**' এক চমৎকার গল্প-সংগ্রহ।

দোদে

ফরাসী ছোটগল্পের ইতিহাসে আলফঁস দোদে মোপাসাঁর মতো অত তীব্র উজ্জ্বলতায় ভাস্বর নন। ব্যক্তিজীবনেও তিনি সুখী, সহজ, অজাতশত্রু। কবিবন্ধু মিস্ত্রালের মতোই তাঁর স্থানীয় প্রভাঁস, চারদিকের জীবনযাত্রা, ছোট সুখ ছোট ব্যথা, গভীর দেশপ্রেম—সব তাঁর সাহিত্যে তিনি অপরূপ করে ফুটিয়ে তুলেছেন; তাঁর গল্পে এবং উপন্যাসে কবির স্বপ্নভূমি প্রভাঁস রূপে আর চেতনায় স্পন্দিত।

দোদের সরস উপন্যাস 'তারতার্‍্যাঁ দ্য তারাসক' (**Tartarin de Tarascon**) ডিকেন্সের 'পিকউইক পেপার্স'-র মতোই বিশ্বখ্যাত; তাঁর করুণ রোম্যাণ্টিক উপন্যাস 'সাফো' (**Sapho**) একদা অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আর তাঁর ছোটগল্পগুলো নিজস্ব সৌন্দর্যে এবং বৈশিষ্ট্যে সাহিত্য-পাঠকের কাছে চির-স্মৃত হয়ে থাকবে। প্রকৃতি এবং জীবনের যে আশ্চর্য ঐকতান দোদের ছোটগল্পে বেজেছে, তা রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিকেই মনে পড়িয়ে দেয়। গল্পকার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যদি অন্য কোনো লেখকের চিত্ত-সংযোগ সন্ধান করতে হয়, তাহলে তিনি নিঃসন্দেহেই আলফঁস দোদে বলে আমি মনে করি।

রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র রীতিতে তাঁর ছোট্ট কাব্যময় কাহিনী— 'প্রান্তরের বুকে ছোট ম্যাজিস্ট্রেট' (**Le Sous-Prefet Aux Champs**)-

এরই একটি মনোরম উদাহরণ। এই অপরূপ রচনাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করার প্রলোভন জাগে। দুপুরবেলা ছোট ম্যাজিস্ট্রেট রাজকীয় বেশেবাসে সেজে, গাড়ী চেপে, জরুরী সরকারী কাজে চলেছিলেন। যেতে যেতে মাঠের ভেতরে একটি ছোট বন যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। একটু বিশ্রাম এবং সেই সঙ্গে সরকারী বক্তৃতাটিও মুখস্থ করার জন্য তিনি সেই বনের মধ্যে গিয়ে বসলেন। কিন্তু গাছের ছায়া, পাখিরা, ফুলের দল আর ঝর্ণার শব্দ সবাই যেন তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল, প্রকৃতি তাঁকে টেনে নিলে নিজের ইন্দ্রজালের ভেতর, এবং "ছোট ম্যাজিস্ট্রেট শুয়ে পড়লেন ঘাসের ওপর, পোশাক খুললেন, চিবুতে লাগলেন ভায়োলেট ফুলের ডাঁটা" আর "M. Le Sous-Prefet Faisit des vers"—কবিতা লিখতে লেগে গেলেন তিনি।

প্রকৃতি আর জীবনকে এই রকম অপূর্ব ছন্দে মিলিয়েছেন তিনি, তাঁর "নক্ষত্রেরা" (Les Etoiles) গল্পে। এক আশ্চর্য রাত্রিতে নিঃসঙ্গ রাখালের নির্জন আশ্রয়ে অবস্থাচক্রে এসে পড়েছে তারই মনিব-কন্যা, রাখালের স্বপ্ন-লোকচারিণী স্তেপান্যাৎ। এই দুটি তরুণ-তরুণী রাত্রির মুক্ত আকাশের তলায় বসে দেখছে আকাশের নক্ষত্রদের—রাখাল মেয়েটিকে শোনাচ্ছে নানা কিংবদন্তী, শুনতে শুনতে তার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে স্তেপান্যাৎ। আর রাখাল ভাবছে, দূরে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল, সবচেয়ে সুন্দর তারাটি বুঝি কক্ষপথ হারিয়ে তারই কাঁধে মাথা রেখে ঘুমুবার জন্য পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসেছে।

দোদের গল্পগুলো নানাদিক থেকেই আধুনিক ছোটগল্পের চরিত্র-পরিচয় বহন করছে। কাহিনীর বিস্তার বড়ো কথা নয়, একটি মুহূর্ত, একটি চিন্তা, একটি অনুভবই তাঁর উপকরণ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, এদিক থেকে স্বদেশী মোপাসাঁর চাইতেও বিদেশী চেকভের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য বেশি।

কত সহজ জিনিস নিয়ে—কোনো ক্লাইম্যাক্স তৈরি না করেও যে কত গভীর গল্প হতে পারে, তার প্রমাণ তাঁর 'ফোটোগ্রাফার' (La Photographe)-এর গল্প। কোনো ঘটনা তৈরী করা হয় নি, একটি ফোটোগ্রাফার পরিবারের দুঃখ-অভাব-আশা-আনন্দের নিছক একটি রেখাচিত্র রচনাটিকে যেমন করুণ, তেমনি গভীর করে তুলেছে। ঠিক এই ধরনের গল্প 'পঙ্গপাল' (Les Sauterelles)। 'পলায়ন' (La Fuite) গল্পে স্কুল-পালানো ছোট্ট ছেলে জাক তার মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য পায়ে হেঁটে অচেনা দূর গ্রামের দিকে রওনা হয়েছিল ; রাত্রির পথ, তার ভয়, তার ক্লান্তি, তার অভিজ্ঞতা—সব মিলে অতি সহজ বাস্তব যে কী অপূর্ব রসে, সৌন্দর্যে, মমতায় ভরে উঠেছে—গল্পটি পড়বার আগে তা কল্পনাও করা যায় না। এই হল আদর্শ ছোটগল্প—জীবন আপনিই কাহিনী হয়ে ওঠে, জোর করে গল্প তৈরী করবার প্রয়োজন পড়ে না।

ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের যে যন্ত্রণায় একটির পর একটি নিষ্করুণ বিষাক্ত গল্প রচনা করেছেন মোপাসাঁ, ঠিক সেই একই অন্তর্দহন থেকে দোদেও কতগুলি চমৎকার গল্প উপহার দিয়েছেন। মোপাসাঁর গল্পে অভিযানকারী জার্মানদের প্রতি একটা কটু ঘৃণা বার বার উদ্‌গীর্ণ হয়েছে—যেমন তাঁর 'ডুয়েল' ইত্যাদি। কিন্তু দোদের গল্পে ঘৃণার চাইতেও বেশি উজ্জ্বল উদার স্বদেশ প্রেম ; আদর্শ বিশ্বাসে এবং মর্যাদাবোধে তাদের মধ্যে একটা ধ্রুপদী মহিমা বিদ্যমান।

যুদ্ধের পটভূমিতে দোদের অনেক ক'টিই বিখ্যাত গল্প আছে, যেমন 'পতাকাবাহক' (Le Porte-Drapeu), যেমন 'শিশু গোয়েন্দা' (L'Enfant Espion)। কিন্তু এই পর্যায়ে আমার মনে হয়, তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'তিন দাঁড়কাক' (Les Trois Corbeaux) এবং 'শেষ ক্লাস' (La Derniere Classe)। প্রথম গল্পটিতে প্রায় রূপকের আশ্রয়ে একজন মুমূর্ষু সৈনিকের পুনরুত্থান বর্ণিত হয়েছে—মৃত্যুর মধ্য থেকে তার ফিরে আসা সমস্ত ফরাসী জাতিরই নতুন অভ্যুদয়—একটি শস্যের শিসে, প্রথম অরুণোদয়ের আভাস সেই নবীন দিনের বাণী—পলাতক তিনটে হিংস্র দাঁড়কাক ইয়োরোপের তিন আক্রমণ-কারী শক্তির প্রতীক। 'শেষ ক্লাস' গল্পটির তুলনা নেই। আল্‌সাস-লোর‍্যান চলে যাচ্ছে জার্মানদের হাতে, কাল থেকে স্কুলে আর ফরাসী ভাষা পড়ানো হবে না, স্কুল মাস্টার মসিয়ো হামেলের আজই ফরাসীর শেষ ক্লাস। কারুণ্যে, গভীরতায়, মাতৃভাষার প্রতি নিবিড়তম শ্রদ্ধায় এবং দেশভক্তির দীপ্তিতে এই গল্প সর্বকালের জন্য সম্পদ হয়ে থাকবে। অদূরে যখন জার্মান সৈন্যের পদধ্বনি :

Alors, il se tourna vers le tableau, prit un morceau de craie, et, appuyant de toutes ses forces, it écrivit aussi gros qu'il put :

"VIVE LA FRANCE !"

'তারপর সে (হামেল) ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে ঘুরল, তুলে নিলে একটা খড়ির টুকরো, তারপর নিজের সব শক্তি প্রয়োগ করে, যতখানি বড়ো করে সম্ভব, লিখল :

"ফ্রান্স চিরজীবী হোক।"

এই অসাধারণ গল্পে ফ্রান্সের উদ্দেশে যে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে, তা নিছক আবেগের উচ্ছ্বসিত প্রকাশই নয়—এ এক অমোঘ মন্ত্র, যা মৃতকে অমৃত দান করতে পারে।

দোদেও সমাজ-সচেতন কথাকার—তাঁর সাহিত্যেও সে-যুগের জিজ্ঞাসা-চিহ্ন বারে বারে সমুদ্যত। কিন্তু তিনি আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন নিসর্গের বুকে, জীবনের প্রতি বিশ্বাসের জোরে কখনো 'উন্মাদের ডায়েরী' লেখার কথা চিন্তাও করেননি। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ করেছেন—যথা 'মসিয়ো সেগ্যাঁর ছাগল' (La Chevre De M. Seguin কিন্তু তা কাব্যনিষিক্ত, সুন্দর। কিন্তু দুর্ভাগা মোপাসাঁ সে সুযোগও পাননি, 'En Canot' (নৌকার উপর)-এর

মতো গল্পে রাত্রির অন্ধকারে এক ভীতিগ্রস্ত নিঃসঙ্গ মাঝির কাছে প্রকৃতির দুর্বোধ কুটিল আতঙ্কময় রূপ তাঁর স্নায়ুকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। মোপাসাঁর কাছে পারী তিলে তিলে বিষপান—প্রকৃতি এক হিংসাগূঢ় অশরীরী আতঙ্ক ; আর ন্যাচারালিস্ট্ হয়েও নৈসর্গিক সৌন্দর্যে, প্রাণ-মমতায় দোদের দৃষ্টি মগ্ন হয়ে গেছে।

এ ছাড়া উনিশ শতকের ফরাসী গল্পকে কিছু কিছু সমৃদ্ধ করেছেন শার্ল নদিয়ে (Nodier), ন্যারভাল (Nerval), দোরেভিয়ি (D' Aurevilly)। এ ছাড়া শার্ল বোদল্যার, স্তঁদাল, জোলা এবং ফ্লোবেয়ারও কিছু গল্প লিখেছেন। জুল্ রেনার (Jules Re'nard) ও মার্সেল সোয়ব (Marcel Schwob) ছোট গল্প লিখে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। সোয়বের 'La Lamp de Psyche' এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য।

বিংশ শতাব্দী ফ্রান্সে প্রধানত উপন্যাসের কাল। আধুনিক পৃথিবীর একদল শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক এ-যুগে ফরাসী সাহিত্যকে উদ্ভাসিত করেছেন। রোম্যা রোলাঁ, আঁদ্রে জিদ, আনাতোল ফ্রাঁস, মার্সেল প্রুস্ত, পল মোরাঁ (Morand), দুয়ামেল (Georges Duhamel), জুল রোম্যা (Jules Romains), আঁদ্রে মালরো (Malreux), আলব্যার কামু (Camus) এবং জাঁ পোল্ সার্ত্র ইত্যাদি। উপন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে এরা গল্প লিখেছেন —কিন্তু গল্প-সাহিত্যের একান্ত চর্চায় বিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সে বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখা যায় না—মার্কিন সাহিত্যের মতো স্মরণীয় কোনো বিশিষ্ট গল্পকারও ফ্রান্সে অনুপস্থিত।

পুশকিন

রুশিয়ায় আবির্ভাব হল পুশকিনের। গোর্কীর ভাষায় তিনি হলেন "The beginning of all beginnings।" শুধু তিনি 'রুশ কাব্যের জনক'ই নন—সেদিনের 'সার্ফডমে'র বিরুদ্ধেও তিনি মন্দ্রিতকণ্ঠে প্রতিবাদ তুলেছিলেন। কবি জানতেন, "The day desired will come !" তাই সাইবেরিয়ার হিমজর্জর অন্ধকার খনিতে যে নির্বাসিতেরা দুঃখের প্রহর যাপন করছে, তাদের ডাক দিয়ে বলেছিলেন ঃ

> "The heavy hanging chains will fall
> The walls will crumble at a word ;
> And Freedom greets you in the light,
> And brothers give you back the sword."[১]

কবি-নাট্যকার আলেক্‌জান্ডার পুশ্‌কিন কয়েকটি গল্পও লিখেছিলেন। তাঁর রোমাঞ্চকর 'ইশ্‌কাপনের বিবি' (The Queen of Spades)-র সঙ্গে গল্পরসিক পাঠকমাত্রেরই পরিচয় আছে। 'তুষার ঝড়' (The Snow Storm) নিয়তির অদ্ভুত লীলার বৃত্তান্ত। ঝড় ও দুর্যোগের মধ্যে বিবাহের পাত্র-বদলের ফলে যে বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল—তারই নাটকীয় পরিণতি

১। Message to Siberia, Trans. by Max Eastman

দেখানো হয়েছে গল্পে। 'পোস্টমাস্টার' একটি মর্মস্পর্শী কাহিনী। নিরীহ, ভদ্র এবং অতিথিবৎসল পোস্টমাস্টারের কন্যাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল একজন অভিজাত সামরিক কর্মচারী। গৃহত্যাগিনী মেয়েটিকে ফিরে পাওয়ার জন্য পোস্টমাস্টারের ব্যাকুলতা এবং সুগভীর দুঃখে অতিরিক্ত মদ্যপান করে তার মৃত্যু—নিবিড় সমবেদনার সঙ্গে তা ফোটানো হয়েছে। সাধারণ মানুষের জন্য পুশ্‌কিনের অকৃত্রিম মমতা গল্পটিতে রূপায়িত।

শৃঙ্খলিত ভ্রাতাদের হাতে তলোয়ার তুলে দেবার আসল দায়িত্ব নিলেন নিকোলাই গোগোল। পুশ্‌কিন যদি কাব্যের জনক হন, তা হলে গল্পের জনয়িতা বলা যেতে পারে গোগোলকেই।

গোগোল

তারাস বুল্‌বা (Taras Bulba)-য় কশাকদের স্বাধীনতা-কামনাকে ভাস্বর করে ফুটিয়ে তুললেন গোগোল। কিন্তু তাঁর কলমে ভল্‌ত্যারের বিষাক্ত ছুরির ধারও ছিল। দেশের সমস্ত কুপ্রথা ও ব্যর্থতার প্রতিমূর্তি রূপে দেখা দিল সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ নাটক 'ইন্‌স্‌পেক্‌টর জেনারেল'। এই দুঃসহ ব্যঙ্গনাট্যটির আঘাতে জর্জরিত হয়ে একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী মন্তব্য করেছিলেন: "He is an enemy of Russia and should be sent in Siberia in chains." তার পরে এল তাঁর 'মৃত আত্মারা' (Dead Souls) এবং প্রখ্যাত সমালোচক চের্নিশেভ্‌স্কি অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, "He awakened in us a consciousness of ourselves."

সেণ্ট পিটার্সবার্গের মানুষদের নিয়ে লেখা গল্পগুলি গোগোলের বিশিষ্ট সৃষ্টি। নিম্নস্তরের কেরানী এবং কারুজীবীর জীবনযাত্রা নিয়ে রচিত এইসব কাহিনীতে গোগোল তৎকালীন হৃদয়হীন আমলাতন্ত্র আর শোষিত পীড়িত মানুষের যে সমস্ত ছবি এঁকেছেন তাদের স্থান রুশ-সাহিত্যে চিরকালীন। এদের মধ্যে 'ওভারকোট' বা 'দি ক্লোক' অমরত্ব লাভ করেছে।

বহিরঙ্গের দিক থেকে এই গল্পটি ভৌতিক রূপক আশ্রয়ী। কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রিতে সাঁকোর উপরে এক দীনতম কেরানীর মৃত আত্মা এই কাহিনীর নায়ক। বহু দুঃখ আর উপবাসের পর সে একটি গরম কোট তৈরী করিয়েছিল। কোট তৈরী করানোর প্রথম দিনেই রাত্রির অন্ধকারে এই সাঁকোর উপর একদল দুর্বৃত্ত তার সেই কোট কেড়ে নিয়ে গেল। বহুদিনের বহু অনাহার আর স্বপ্ন দিয়ে গড়া কোটটা খোয়া যাওয়াতে কেরানী প্রায় পাগলের মতো হয়ে উঠল—সে বিচার চাইতে গেল স্বয়ং সম্রাটের কাছে। বলা বাহুল্য, বিচার তো পেলোই না, পেলো চরম উপেক্ষা—বীভৎস অপমান। শোকে ক্ষোভে অচিরেই তার মৃত্যু হল। কিন্তু তার অপমানিত প্রবঞ্চিত আত্মার মৃত্যু নেই—সেই অন্ধকার সাঁকোর উপরেই চলে তার রাত্রিযাপন। একদিন সুযোগ পেয়ে স্বয়ং মহামান্য সম্রাটের গা থেকেও তাঁর বহুমূল্য কোটটিকে সে খুলে নিতে পেরেছে, এইটুকুই তার সান্ত্বনা।

অসাধারণ এই গল্প; অসামান্য এর মানবিক আবেদন, সুতীব্র এর শ্লেষ,

এর মর্মে মর্মে বহমান সুগভীর কারুণ্য। তাই দস্তেয়ফস্কি গল্পটিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন, "All of us are born of Gogol's Overcoat।"

এই বেদনাই অন্যভাবে দেখা দিয়েছে পৃথিবীর অন্যতম মহান লেখক ঋষি তলস্তয়ের রচনায়। লিও তলস্তয়ের 'সংগ্রাম ও শান্তি' (War and Peace) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসরূপে চিহ্নিত হয়েছে, 'পুনরভ্যুত্থান' (Resurrection) এবং 'আনা কারেনিনা' ক্লাসিকের গৌরবে সমুত্তীর্ণ। অভিজাত বংশের সন্তান তলস্তয় তাঁর স্বশ্রেণীর প্রতি কী মনোভাব পোষণ করতেন, তাঁর সাহিত্যে তা প্রত্যক্ষ। তাঁর অভিনব সৃষ্টি 'The Kreutzer Sonata'য় এক জায়গায় তলস্তয় বলছেন ঃ

তলস্তয়

"Peasants and working men have need of children; however hard it is to feed them, they have need of them, and so their conjugal life is justified. But we upper classes have children without any need of them, they are only an extra care and expense."[১]

সুতরাং এই সাধারণ শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যেই তলস্তয় আগামী ইতিহাসের উত্তরাধিকারকে প্রত্যক্ষ করেছেন। আশৈশব তিনি দেখেছেন 'Serfdom"-এর মহিমা—দেখেছেন কৃষক-মজুরের কদর্য দুর্গতির রূপ। তাই উচ্চারণ করেছেন তাঁর বেদমন্ত্র ঃ 'পবিত্র হও', 'মুক্ত হও'—'অহিংসার অস্ত্র দিয়ে হিংসা এবং বর্বরতাকে জয় করো।'

তাঁর যুগ—তাঁর পরিবেশ, জারের রুশিয়ার সামন্তচক্রের মদমত্ততা—এর মাঝখানে শান্তির এই ললিত বাণী সেদিন হয়তো উপহাসযোগ্য বলেই মনে হত ; শিকার থেকে ফিরে এসে যে জমিদারেরা কৃষকের মুণ্ডচ্ছেদ করে তপ্ত রক্তে পদ-প্রক্ষালন করতেন, তাঁদের বংশধরেরা তলস্তয়ের এই বাণীকে সেদিন হয়তো সকৌতুকেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তলস্তয় জানতেন, ইতিহাসের চাকা ঘুরতে আরম্ভ করেছে ; দানবিক যুগের সমাপ্তি হয়ে মানবিক যুগ সমাসন্ন।

কৃষক দরিদ্র শ্রমজীবীর জীবন নিয়ে তলস্তয় যে-সব গল্প লিখেছেন, ভক্তি ও পবিত্রতায় তারা অভিষিক্ত। তারা প্রায়শঃ নীতিমুখ্য, কিন্তু মহত্তম মানববাদী শিল্পীর রচনাগুণে তাদের রসমূল্যও স্বীকারযোগ্য। লোভের পরিণাম তিনি দেখিয়েছেন—'মানুষের কতখানি জমি দরকার' (How Much Land does a Man Require) রূপক গল্পে, 'দুই তীর্থযাত্রী' (Two Pilgrims) গল্পে জেরুজালেম-পথিক দুটি বন্ধুর কাহিনীতে দেখিয়েছেন—সত্যিকারের তীর্থপুণ্য লাভ হয় মানুষের সেবায় ও কল্যাণেই ; ভক্তি ও মানবতাবাদের স্রক্‌ এবং চন্দনে চর্চিত এই গল্পটি মানুষকে উদ্বোধিত

১। The Kreutzar Sonata, Chapter XVIII, Trans. by Margaret Wettlin.

করে। 'মানুষ কিসে বাঁচে' (What Men live by) এই ভক্তি-বিশ্বাসেই নিষিক্ত। 'বোকা ইভান' (Ivan the fool)-এ ঘোষিত হয়েছে 'Devil's gold'-এর শেষ পরিণাম এবং খ্রীষ্টীয় 'মিলেনিয়ানে'র অস্রহীন, শোষণহীন সমাজে সর্বাত্মক শ্রম ও কর্ষণার ভবিষ্যদ্বাণী। আর তাঁর 'Where Love Is' ('যেখানে প্রেম, সেইখানেই ঈশ্বর') চির-কল্যাণের ধ্রুব-নক্ষত্রের মতোই ভাস্বর।

'Where Love Is' গল্পের দরিদ্র চর্মকার মার্তিন আভদিচ বাস করে এবং কাজ করে একতলার একটি ছোট ঘরে—যার একটিমাত্র জানলা—এবং তার মধ্য দিয়ে পথচারী মানুষের শুধু পা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। ধনী ও দরিদ্রের বিভিন্ন পায়ে তার নিজের হাতে তৈরী করা জুতো দেখেই সে তৃপ্তি বোধ করে।

একদিন রাত জেগে বাইবেল পড়ছিল সে। তার চোখের সামনে খ্রীষ্টের বাণী যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মানবপুত্র ধনী ফারিসিকে বলছেন ঃ

"Thou gavest me no water for my feet ··Thou gavest me no water...My head with oil thou didst not anoint"—

কৃপণ ধনীর কাছে খ্রীষ্ট আসেন না···তিনি দরিদ্রের মুক্তিদাতা। দরিদ্রই তাঁকে মাত্র অকাতরে সব দিতে পারে—প্রেমে, প্রীতিতে, সেবায়। পড়তে পড়তে মার্তিন ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ কানের কাছে যেন কার কণ্ঠস্বর বেজে উঠল ঃ 'মার্তিন, কাল সকালে পথের দিকে তাকিয়ে থেকো—আমি তোমার কাছে আসব।'

খ্রীষ্ট আসবেন! আসবেন তারই কাছে! আশায়, বিশ্বাসে সকাল থেকে মুহূর্ত গণনা করে চলল মার্তিন।

এল বৃদ্ধ সৈনিক স্তেপানোভিচ্। যে পথের তুষার পরিষ্কার করে—শীতের সকালে হিম আর ক্লান্তিতে যে অবসন্ন ; মার্তিন তাকে দিলে গরম চা—দিলে কিছুক্ষণ উত্তপ্ত ঘরের আশ্রয়। এল শিশুকোলে দীন-দরিদ্রা একটি মেয়ে—পথ থেকে ডেকে তাকেও কিছুটা চা আর উত্তাপের আতিথ্য দিলে সে। ফলওয়ালীর ঝুড়ি থেকে একটি ক্ষুধিত রাস্তার ছেলে আপেল চুরি করে পালাচ্ছিল, ফলওয়ালী তাকে ধরে পুলিশে দিতে যাচ্ছিল—খ্রীষ্টের ক্ষমার কথা শুনিয়ে দু-জনেরই হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে দিলে মার্তিন।

দিন কেটে গেল। মার্তিন প্রতীক্ষা করেই আছে। কিন্তু খ্রীষ্ট তো এলেন না।

রাত নামল। আবার আলো জ্বালিয়ে বাইবেল পড়তে বসেছে মার্তিন। হঠাৎ ঘরের কোণের পুঞ্জছায়া থেকে অস্পষ্ট ভাবে ভেসে এল কার কণ্ঠ ঃ 'মার্তিন!'

'কে—কে তুমি ?' উত্তর এল, 'আমি—এই তো আমি।'

ছায়ার মধ্যে যেন বেরিয়ে এল ঝাড়ুদার স্তেপানোভিচ্, এল শিশুকোলে ভিখারিণী মেয়েটি, দেখা দিলে ফলওয়ালী এবং রাস্তার সেই ছেলেটি। মৃদু হেসে তারা মিলিয়ে গেল।

বাইবেলের পাতা খুলল মার্তিন। আর পাতার একেবারে উপরেই দেখতে পেল :

"For I was an hungered, and ye gave Me meat : I was thirsty, and ye gave Me drink : I was a stranger, and ye took Me in."

আর পরের পাতায় :

"Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren ye have done it unto Me."

গল্পটি পড়তে পড়তে রোমাঞ্চ হয়—চোখে জল আসে। একবার পড়লে সারা জীবন কাহিনীটিকে ভুলতে পারা যায় না। এর মধ্যে শুধু খ্রীস্টের আদর্শের কথাই নেই—মনুষ্যত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণীই এই গল্পে প্রকাশিত হয়েছে, আর ধরা দিয়েছে ঋষি তলস্তয়ের জীবন-তপস্যার পরমতম সত্যোপলব্ধিটি।

তলস্তয়ের এই গভীর ক্রীশ্চান-বিশ্বাস ও মানবতাবাদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন বলেই বোধ হয় আন্তন চেকভও মানুষ সম্বন্ধে এতখানি আশাবাদী হতে পেরেছিলেন—সমালোচকের ভাষায় : "The greatest optimist as regards the future !"

আন্তন চেকভের আবির্ভাব হয়েছিল এক ধারে 'ওভারকোট' এবং 'হোয়ার লাভ ইজ'-এর মিলনে।

পৃথিবীর গল্প-সাহিত্যে একটি নামেই চেকভ পরিচিত—"The Master' এবং এ-নাম একমাত্র তাঁকেই মানায়। চেকভ হচ্ছেন সেই শিল্পী—যাঁর হাতের ছোঁয়ায় এক টুকরো পাথর ভাস্কর্য হয়ে ওঠে, ছেঁড়া রঙিন কাগজ ফুলের রূপ পায়, একটুখানি তার থেকে সেতারের ঝঙ্কার ওঠে। "Everything in nature has a meaning"—চেকভ এ-কথা নিজেই বলেছেন। জগতের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে তিনি অর্থ খুঁজে পেয়েছেন—চলস্রোতের প্রত্যেকটি তরঙ্গ তাঁর কাছে সমুদ্রের সন্ধান বয়ে এনেছে।

চেকভ

গল্পের জগতে তাঁর নাম উচ্চারিত হয় মোপাসাঁর পাশেই। অথবা মোপাসাঁর উপরে। মোপাসাঁর সম্পদ বৈচিত্র্যে, চেকভের মহিমা গভীরতায়। মোপাসাঁ আগুন জ্বালিয়েছেন আর সে আগুনে যেমন আবর্জনা পোড়াচ্ছেন, তেমনি ভাবে নিজেও দগ্ধ হচ্ছেন ; অন্যদিকে চেকভের হাতে রয়েছে একটি 'বুল্‌স্‌-আই' লণ্ঠন—তা যার ওপরে গিয়ে পড়ছে তাকে উদ্ভাসিত করে দিচ্ছে, আর মনে করিয়ে দিচ্ছে—যারা আমাদের অতি কাছের—প্রতিদিনের পরিচিত, তাদের সম্বন্ধেই আমরা কতটুকুই বা জানি !

এঁরা দুজনেই সমসাময়িক। দুজনেরই জন্ম এবং মৃত্যু প্রায় কাছাকাছি সময়ে। কিন্তু ফ্রান্স এবং রুশিয়ার সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের রূপ তখন এক নয়। হতাশা আর পরাজয়বাদের যে পঙ্কের মধ্যে মোপাসাঁর বুদ্ধিজীবী মন নিষ্ফল আর্তনাদ করেছে, চেকভের ভিতর যে ব্যর্থতার কান্না তেমন ভাবে

মাথা খুঁড়ে মরে না। মোপাসাঁ উন্মাদের দিনপঞ্জী লিখে আত্মহত্যা করেন, চেকভ তাঁর ছয় নম্বর ওয়ার্ডকে আরো বীভৎসভাবে ফুটিয়ে বলেন এ কখনোই শেষ কথা নয়—এ অবস্থাকে বদলাতেই হবে। কারণ, বিফল-বিপ্লবের রিক্ততা চেকভের সম্মুখে নেই—তাঁর দৃষ্টিপথে এক সম্ভাব্য বিপ্লবের পূর্বাভাস: নার্দিজম-নিহিলিজমের মধ্য দিয়ে বোল্‌শেভিজমের স্বর্ণ-দিগন্ত।

উনিশ শতকের অষ্টম ও নবম দশকে রুশিয়ার অবক্ষয়শীল সামন্ততন্ত্রে, বুদ্ধিজীবী মনের সংশয়, আশাবাদ এবং লোভ, 'কুলাক্'দের হাতে কৃষিশ্রেণীর নির্মম শোষণ—এরা পূর্ণ নৈপুণ্য এবং তীক্ষ্নতায় চেকভের রচনায় রূপায়িত হয়েছে। আবার সেই সঙ্গে মানব-হৃদয়ের বিচিত্র রহস্য, তার বাসনা-বেদনার অভিব্যক্তি, তার স্বপ্ন – চেকভের অন্তর্দৃষ্টিতে সবই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আমরা বলতে পারি, মেরিমে-মোপাসাঁ-দোদে-চেকভ-পো—এই শিল্পিপঞ্চকের হাতেই উনিশ শতকের ছোটগল্প স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আজীবন রুগ্ন চেকভ ছাত্রজীবনেই সাহিত্য-চর্চা শুরু করেছিলেন কৌতুক গল্পের মাধ্যমে। সাহিত্যিক প্রেরণা এবং অর্থাগমের প্রয়োজন দুই-ই ছিল এই লেখাগুলির নেপথ্যে। ১৮৮৪ সালে তাঁর Stories of Melpomena এবং ১৮৮৫ সালে Motley Stories নামে দুখানি লঘু গল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে চেকভ স্বমহিমক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হন। মানব-হৃদয়ের গভীরে তাঁর সঞ্চার আরম্ভ হয়, তরল কৌতুকের মধ্যে বেজে ওঠে মহাজীবনের সমুদ্রধ্বনি, তাঁর নিষ্ঠুর ন্যাচারালিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি করুণায় আর্দ্র হয়ে আসে।

কিন্তু এই লঘুতার চর্চাও চেকভের সাহিত্য সাধনায় একেবারে ব্যর্থ হয় নি। তাঁর গভীর-গম্ভীর গল্পগুলি থেকে থেকে কৌতুকের বিদ্যুচ্ছটায় চকিত হয়েছে, তাঁর ব্যঙ্গ বাণ একেবারে নির্ভুল লক্ষ্যে গিয়ে মর্মস্থান বিদ্ধ করেছে। তাই 'ছয় নম্বর ওয়ার্ডে'র শ্বাসরোধী বিভীষিকার পাশাপাশি আসতে পেরেছে শাণিত হাসিতে সমুজ্জ্বল 'বহুরূপী' গল্পটি।

চেকভ পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। নাট্যকার এবং গল্পলেখক হিসেবে যত কৃতিত্বই তিনি অর্জন করুন, চিকিৎসকতার প্রতিই ছিল তাঁর পক্ষপাত। **'Medicine is my lawful wife and literature is my mistress'**—একবারে এই সকৌতুক মন্তব্য তিনি করেছিলেন। কিন্তু কথাটির আরো গূঢ়-গভীর তাৎপর্য আছে। চিকিৎসা-বিদ্যার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তাঁর শিল্পদৃষ্টিকে বিজ্ঞান-প্রবুদ্ধ করে তুলেছিল; জীবনে যেখানে ব্যাধি—যা কিছু ক্ষত, কিছু তাঁর সন্ধিৎসু অভিজ্ঞ চোখকে অতিক্রম করে যায় নি। বৈজ্ঞানিক চেকভ যেমন অসংকোচে ব্যাধির স্বরূপ উন্মোচন করেছেন, তেমনি তাঁর নিরাময়ের নির্দেশ দেওয়ারও প্রয়াস পেয়েছেন। এ সম্পর্কে চেকভ নিজেই বলেছেন:

"আমার সাহিত্য-কর্মের উপর চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে, সে সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহমাত্র নেই ; এর দ্বারা আমার পর্যবেক্ষণের গন্ডি প্রসারিত হয়েছে এবং লেখক হিসাবে আমার জ্ঞান যে কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে একমাত্র কোনো ডাক্তারই তার যথার্থ মূল্যটি বুঝতে পারবেন।……বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে আমার পরিচয় সব সময় আমাকে সতর্ক রেখেছে, যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি সম্পর্কে সচেতন থেকেছি, আর যেখানে তা সম্ভব হয়নি, সেখানে আমি আদৌ লিখিই নি।"

এই সচেতনাই চেকভের শিল্পকর্মের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর অভিজ্ঞতার গন্ডী বহু-বিস্তৃত—শাখালিন দ্বীপপুঞ্জের ধিক্কৃত বন্দীশিবির থেকে পার্বত্য অশ্বচোর সম্প্রদায়, সাধারণ কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও অভিজাত সমাজ—সর্বত্র তাঁর বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ এবং শিল্পচেতনার অবাধ সঞ্চরণ। উপকরণ তিনি দুহাতে সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু শিল্পবোধের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ তাঁর প্রধানাংশ সাহিত্যেই সমুপস্থিত।

লেখক হিসেবে কখনো তিনি অসাধারণ নির্মম। 'ছয় নম্বর ওয়ার্ডে'র ডাক্তার ইয়েফিমিচকে যখন রুশ ব্যুরোক্রেসির হিংস্রতা উন্মাদে পরিণত করে—নিকিতার নিষ্ঠুর আক্রমণে যখন ডাক্তারের মৃত্যু হয়—তখন পাঠক যেন সম্মুখে প্রেতলোকের বিভীষিকা দেখতে পান ; 'তন্দ্রাতুরা' (Sleepy) গল্পের দরিদ্র চাকরাণী তেরো বছরের ভারকা যখন ঘুমোবার অসহ্য প্রয়োজনে একটি শিশুকে গলা টিপে হত্যা করে, তখন স্নায়ু যেন বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম করে ; 'ঘোড়া চোর' (The Horse Stealers) এক নৈরাজ্য-লোকের কাহিনী, সেখানে নীতি-ধর্ম-মনুষ্যত্বের যেন পরিপূর্ণ সমাপ্তি ঘটেছে মনে হয়। এইসব কারণে সমালোচকদের কাছ থেকে চেকভকে বহু নিন্দাবাদ সইতে হয়েছে ; অনেকেই বলেছেন, তিনি প্রকৃতিবাদী, তাঁর দৃষ্টি নৈরাশ্যগ্রস্ত, জীবনের সমস্ত মূল্যবোধকেই তিনি অস্বীকার করেছেন।

বস্তুত, চিকিৎসক চেকভ সমাজে এবং জীবনে এমন অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি প্রত্যক্ষ করেছিলেন—যা তাঁকে বেদনায় জর্জরিত করে তুলেছিল, অথচ যার প্রশমনের কোনো উপায় তাঁর জানা ছিল না। অক্টোবর (নভেম্বর) বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র সূর্যোদয় তিনি দেখে যেতে পারেন নি—কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তাঁর অনাগত পদক্ষেপ তিনি শুনেছিলেন। ওই নীতিহীন, নৈরাশ্যধর্মী 'ঘোড়া চোর' গল্পের শেষে এইভাবেই তাঁর জিজ্ঞাসাকে তিনি উদ্যত করে ধরেছেন :

"The world is created well-enough, only why and with what right do people, thought Yergunov, divide their fellows into the sober and the drunken, the employed and the dimissed, and so on? Why do the sober and wellfed sleep comfortably in their homes while the drunken and hungry must wander about country without a refuge? Why was it

that if any one had not a job and did not get a salary he had to go hungry, without clothes and boots ?"

(শ্রীমতী গার্নেটের অনুবাদ)

আপাতদৃষ্টিতে যদি চেকভকে নৈরাজ্যবাদী মনে হয়, তা হলে উদ্ধৃতিটি থেকেই তাঁরই মানসিক প্রবণতার যথার্থ স্বরূপটি উপলব্ধি করা যাবে। পৃথিবীর সাহিত্যের দুর্ভাগ্য, চেকভ দীর্ঘজীবী হননি, মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়েসে, ১৯০৪ সালে তাঁর দেহান্ত ঘটেছে। স্বাভাবিক স্বাস্থ্য থাকলে ১৯১৮ সালে, তারও পরে—চেকভের পূর্ণতর বক্তব্য এবং সত্যতর জীবন-সমীক্ষার পরিচয় মিলত। প্রাক্-বিপ্লব এবং উত্তর-বিপ্লব মাক্সিম গোর্কীর গল্প-সাহিত্য অনুধাবন করলেই এর সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

অসংখ্য গল্প লিখেছেন চেকভ এবং তাদের অধিকাংশই বিশ্ববিখ্যাত। তাঁর 'কুকুরের সঙ্গে মহিলাটি' (The Lady with the Dog), 'দি বিশপ', উপন্যাসিকা 'আমার জীবন' (My Life), 'বল্লভা' (The Darling), 'একটি নীরস গল্প' (A Dreary Story), 'দি কোরাস গার্ল', 'চুম্বন' (The Kiss), 'শিক্ষিকা' (The School Mistress), 'স্তেপ্' (Steppe) ইত্যাদি পৃথিবীর অসংখ্য ভাষায় বার বার অনূদিত হয়েছে। অপেক্ষাকৃত লঘু ধরণের ব্যঙ্গাত্মক গল্প—যেমন 'কেরানীর মৃত্যু' (The Death of a Clerk), 'বহুরূপী' (The Mask) প্রভৃতিও বহুল-পঠিত—বহুতরভাবে ভাষান্তরিত। পৃথিবীর সাহিত্যে পাঠকের কাছে চেকভ আজ অসপত্ন মর্যাদার অধিকারী।

পুরোপুরি বৈপ্লবিক, গণসংগ্রামের বাণীমুখরিত গল্প চেকভের কাছ থেকে আমরা পাই না। 'তিনি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মনের শিল্পী, অতিরিক্ত পরিমাণে মন্ময়তাবাদী, তাঁর গল্প থেকে জীবনের কোন কল্যাণময় অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় না'—এ ধরণের সমালোচনাও চেকভের প্রতি কিছু কিছু বর্ষিত হয়েছে। কিন্তু আজ সর্বত্র, সর্বতোভাবে চেকভের মহিমা স্বীকৃত। অদূরাগত বিপ্লবের প্রত্যক্ষ পরিচিতি তেমনভাবে তাঁর গল্পে পাওয়া যায় না বটে—কিন্তু নিরাবৃত স্পন্দমান জীবনের সন্ধান অবশ্যই মেলে। সে জীবন কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, অভিজাত—সকলের। বৈজ্ঞানিক চেকভ তাঁর চিকিৎসকের চোখ দিয়ে সমাজের সমস্ত স্তরগুলিকে নির্ভুলভাবে দেখতে চেয়েছেন, নির্ভীকভাবে উপস্থাপিত করেছেন। আভিজাত্যের এবং ব্যুরোক্রেটিক্ শাসন-ব্যবস্থার তিনি নির্মম সমালোচক, মধ্যবিত্ত-মননের দোলাচল-বৃত্তি তাঁর সুপরিজ্ঞাত—তাঁদের কামনা-কল্পনা-বেদনা-বাসনার স্পন্দন অপরূপ সুষমা দিয়ে সুরাভিত ব্যঞ্জনায় তিনি প্রকাশ করেছেন ; দরিদ্র নিঃস্ব জীবনের ব্যর্থ বঞ্চিত রূপ তাঁর গল্পে করুণায় আর্দ্র হয়ে দেখা দিয়েছে। 'At Christmas Time' গল্পের ভাসিলিসা, 'Sleepy'র ভারকা, অবসরপ্রাপ্ত স্কুলমাস্টার সকলেই তাঁর সুহৃদয়ে বেদনার অনুরণন জাগিয়েছে। এমন কি পতিতা "কোরাস গার্ল" পাশাও সেই বেদনার অংশভাগিনী হয়েছে :

'Pasha lay down and began wailing aloud. She was already regretting her things which she had given away so impulsively, and her feelings were hurt. She remembered how three years ago a merchant had beaten her for no sort of reason, and she wailed more loudly than ever."

(শ্রীমতী গার্নেটের অনুবাদ)

'আয়োনিচ্' (Ionitch) জাতীয় গল্পে অভিজাত সমাজের কঠোর সমালোচনা ফুটে উঠেছে। কিন্তু চেকভের 'নিউ ভিলা' (The New Villa) গল্পটিকে নানা কারণেই আমার অসাধারণ বলে মনে হয়। অবরুৎচোনাভো গ্রাম থেকে দু মাইল দূরে একটা বিরাট নতুন পুল তৈরি হচ্ছে—তার তত্ত্বাবধানে এসেছে এঞ্জিনিয়ার কুৎচেরভ। তার স্ত্রীর এই গ্রামটি ভালো লাগল এবং স্ত্রীর অনুরোধে এঞ্জিনিয়ার একটি সুন্দর বাড়ীও করল এখানে। কিন্তু গ্রামের সাধারণ মানুষের অধিকাংশই তাদের প্রীতির চোখে দেখল না। কুৎচেরভ এবং তাঁর স্ত্রী গ্রামবাসীদের সঙ্গে যথাসাধ্য প্রীতি ও হৃদ্যতার সম্বন্ধ রচনা করতে চাইল—বিনিময়ে পেল শত্রুতা আর বিদ্বেষ। শেষ পর্যন্ত বাড়ী বিক্রী করে তাদের চলে যেতে হল।

কেন যেতে হল ? তার উত্তরে ভলোদ্কা বিষণ্নভাবে বলেছে : "We lived without a bridge, and did not ask for one·········and we did not want it ··"

গল্পটিকে মাত্র গ্রাম্য-মানুষের সংস্কৃতিহীন তুচ্ছচিত্ততার নমুনা হিসাবেই গ্রহণ করলে ভুল করা হবে। ওই পুলটির প্রতীকের আশ্রয়েই গল্পটির মর্মবাণী প্রকাশ করা হয়েছে। মার্কস্‌বাদের শিক্ষা হয়তো চেকভের ছিল না, কিন্তু তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন, করুণা ও সহানুভূতির সেতু দিয়ে ধনিক এবং দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে আর সেতু-রচনা করা চলবে না ; শ্রেণী-সমন্বয়ী ঔদার্যবাদের অধ্যায় শেষ পাতায় এসে পৌঁছেছে—এখন অন্যভাবে হিসেব-নিকেশ করার দিন।

এই ব্যঞ্জনা-গভীরতা চেকভের রোমান্টিক গল্পগুলিকে আশ্চর্য সুন্দর ও মধুর করে তুলেছে। তাঁর 'চুম্বন' বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প—রিয়াবোভিচের সেই অপূর্ব সাধারণ অভিজ্ঞতা, তার কল্প-কামনা, শেষ পর্যন্ত শান্ত দার্শনিক বিষাদে তার পরিণতি—সমস্ত তত্ত্ব-তাৎপর্যের সীমা ছাড়িয়ে অনুভূতিকে যেন সঙ্গীতের রাজ্যে উত্তীর্ণ করে দেয়। 'ডার্লিঙে'র ওলেঙ্কা এক অপরূপ নারী—তার হৃদয় একটির ওর একটি প্রেম ও ভালোবাসার অবলম্বন খুঁজে বেড়ায়। হানভের ভাবনায় 'স্কুল মিস্ট্রেস্' মারিয়া চারদিকের শূন্যতার মধ্যে যে আলো-উত্তাপ-প্রাণ-প্রেমের স্পন্দন অনুভব করে—গল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

সমাজের ক্ষত-বিকৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে, কঠিন আত্মসমালোচনায়, বঞ্চিত পীড়িতজনের প্রতি অকৃত্রিম মমতায়, ব্যঙ্গ ও কৌতুকের দীপ্তিতে, রোমান্টিক

ভাব-পরিমণ্ডলের সার্থক সৃষ্টিতে, মনস্তত্ত্বের ওপর অসামান্য অধিকারে এবং জীবনের সর্বাঙ্গীণ পরিচয়ের অধিকারে চেকভের গল্পগুলি আজও নবীন, আজও বিশ্বের বিস্ময়। তাই এখনো পৃথিবীর অধিকাংশ গল্প-লেখকই তাঁকে গুরুপদে বরণ করেন, তাঁকে সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ জানান : "The Master।"

চেকভের কাছে সমাজে ও জীবনে অসঙ্গতি ও মিথ্যাচার কিভাবে ধরা দিয়েছে, তার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর "মুখোস" (The Mask) গল্পটিকে মনে করা যেতে পারে। একজন মাতাল ধনপতি মুখোস পরে বুদ্ধিজীবীদের বীভৎস অপমান করেছে—ব্যাঙ্কের ম্যানেজার থেকে আরম্ভ করে কাউকেই সে গ্রাহ্য করছে না। যতক্ষণ মুখোস ছিল, ততক্ষণ তার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সবাই তীব্র প্রতিবাদ তুলেছে ; কিন্তু যেই সে মুখোস খুলে ফেলল, সঙ্গে সঙ্গেই সকলের প্রতিবাদও থমকে গেল, তখন অপমানকারী কোটিপতি পাতিগোরভের একটুখানি অনুগ্রহ পাওয়ার আশায় উক্ত লাঞ্ছিত বুদ্ধিজীবীরাই কুকুরের মতো ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলে।

এ-গল্পে মাত্র ধনপতিই মুখোস খোলেনি—চেকভ তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদেরও মুখাবরণ খুলে দিয়েছেন ; যারা বিদ্যা-বুদ্ধি ও আত্মসম্মানের অহমিকাকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে—তারা যে বস্তুত কতখানি মেরুদণ্ডহীন, কী পরিমাণে অনুগ্রহলোলুপ—চেকভ তা নগ্নভাবে দেখিয়েছেন এখানে :

"He shook hand with me," boasted Zhestyakov, in high glee. "So It's all right, he is n't angry." "Let's hope so!" Sighed Yevstrat Spidonich. He's a scoundrel, a bad lot but —he's our benefactor. You've got to be careful."

'বহুরূপী' (Chamelon) বা জেনারেলের ভাইয়ের কুকুরের কৌতুক গল্পটি সর্বজনবিদিত। কুকুরের মালিকানা নিয়ে বিব্রত পুলিশ-সার্জেন্ট ওচুমেলেভের যে পরম উপভোগ্য সংকট, তা কিছুটা ক্যারিকেচারধর্মী হলেও জারতন্ত্রী পুলিশের একটি নিখুঁত চিত্রণ। অথবা কেবল জারতন্ত্র কেন—এর মধ্যে মানব-চরিত্রেরই একটি চিরন্তন রূপ ধরা দিয়েছে।

তাঁর 'ছয় নম্বর ওয়াড" (Ward No. 6) রুশীয় সামন্ততন্ত্রের বীভৎসতম প্রতীক চিত্র। সমস্ত গল্পটিই যেন দুঃস্বপ্ন দিয়ে ঘেরা। এই দীর্ঘ গল্পটি পড়বার পরে আমাদের স্নায়ু বহুক্ষণ ধরে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। আমলাতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার যে ভয়ংকর মূর্তি এতে ফুটেছে—তার আতংকটি বর্ণনাতীত।

একটি মফঃস্বলের শহরের ছোট হাসপাতালের একান্তে স্থাপিত আবর্জনা ও উপেক্ষার মধ্যে 'ছয় নম্বর ওয়াড" মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের আবাস। ইভান দ্‌মিত্রিচ এই ওয়াডের একজন রোগী। আপাতদৃষ্টিতে সে পাগল, অপরাধভীতির অর্থহীন মনোযন্ত্রণার দ্বারা সে তাড়িত। তার সখ্য ঘটল হাসপাতালের সহৃদয় ডাক্তার আন্দ্রে ইয়েফিমিচের সঙ্গে। এই দুজনের সংলাপে এবং ডাক্তারের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চেকভ

দেখিয়েছেন—পৃথিবীর সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষগুলোই যেন উন্মাদ নামে চিহ্নিত—আর চতুর্দিকের দুর্নীতিপরায়ণ শয়তানেরা তাদের শৃঙ্খলে বন্দী করে রাখতে চায়। তাই সৎ, ধর্মভীরু, বিশ্বাসী ও হৃদয়বান ডাক্তার ইয়েফিমিচকেও শেষ পর্যন্ত ছয় নম্বর ওয়ার্ডে এসে জায়গা নিতে হয় এবং উন্মাদাগারের দ্বাররক্ষক—নরকের প্রহরী নিকিতার নির্যাতনে তার মৃত্যু ঘটে। সামন্ততান্ত্রিক দুর্নীতির সমস্ত দুঃস্বপ্ন এসে এই গল্পটির মধ্যে ধরা দিয়েছে। পড়তে পড়তে ক্রোধে এবং যন্ত্রণায় পাঠক অস্থির হয়ে ওঠেন। জানা যায়, এই গল্প পড়ে ক্ষুব্ধ উত্তেজিত লেনিন বিনিদ্র রাত যাপন করেছেন, চীৎকার করে বলেছেন, 'না—না, এ চলতে পারে না, কিছুতেই চলতে পারে না।'

শুধু প্রতীকী তাৎপর্যই নয়—এর রূঢ় বাস্তবতাও স্মরণযোগ্য। মফঃস্বলের হাসপাতাল সম্পর্কে উদ্ধৃত বর্ণনাটি আমাদের কাছেও সম্ভবত অতিরঞ্জিত মনে হবে না ঃ

"The superintendent, the matron and the medical assistants robbed the patients of their food, and as for the old doctor who held the post before Andrei Yefimich it was said that he speculated in the spirits alloted to the hospital and kept a veritable harem, recruited from nurses and female patients !"

রুশীয় ব্যুরোক্রেসি আর ভগ্ন-মেরুদণ্ড মানুষের বিকৃতির একটি অপরূপ চিত্র হিসেবে চেকভের 'কেরানীর মৃত্যু' (Death of a Clerk) গল্পকে গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

"চমৎকার একটি রাত্রিতে চমৎকার একজন কেরানী (the excellent Clerk) 'চেরভিয়াকভ্' (রুশ শব্দার্থে 'শ্রী পোকা') বসেছে অপেরা দেখতে—দ্বিতীয় সারিতে। নিজেকে তার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুখী জীব বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটল। হঠাৎ প্রবলভাবে হেঁচে ফেলল সে। আর তার হাঁচির শব্দে, এবং স্পর্শেও, স্বভাবতই বিরক্ত হয়ে সামনের সারির একটি ভদ্রলোক একবার বিড় বিড় করে উঠে রুমাল দিয়ে টাক এবং ঘাড় মুছে ফেললেন।

সর্বনাশ! এ কা'র গায়ে হেঁচে ফেলেছে 'শ্রী পোকা' চেরভিয়াকভ! ইনি যে স্বয়ং যোগাযোগ-বিভাগের মন্ত্রী সিভিল জেনারেল ব্রিঝালভ! যদিও চেরভিয়াকভ এঁর অধীনে চাকরি করে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন একটি নিদারুণ লোকের কাছে এ কি ভয়ানক অপরাধ তার! সুতরাং সে করজোড়ে নিবেদন করলে, আমায় ক্ষমা করুন!

জেনারেল অপেরায় নিমগ্ন ছিলেন। তার ক্ষমা প্রার্থনার বহরে বিব্রত হয়ে বললেন, আচ্ছা—আচ্ছা, তাতে কিছু হয়নি—এখন চুপ করো, দেখতে দাও আমাকে।

'শ্রী পোকা'র আর সংশয় যায় না। বোধ হয় রাগই করেছেন। বিরতির সময় আবার ক্ষমা চাইতে গেল জেনারেলের কাছে। ভদ্রলোক ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলেন, 'শ্রী পোকা'র ঘ্যানঘ্যানানিতে এবার একটু বিরক্ত হলেন এবং সংক্ষেপেই থামিয়ে দিলেন তাকে। বাড়ী ফিরে মহা অস্বস্তিতে রাত কাটাল 'শ্রী পোকা'। পরদিন সকালেই সেজেগুজে আবার ক্ষমাপ্রার্থনা করতে গেল জেনারেলের কাছে।

জেনারেলের প্রায় কাঁদবার উপক্রম। এ কি জ্বালাতন লাগল পেছনে! বললেন, 'মজা পেয়েছ নাকি আমাকে নিয়ে?' 'শ্রী পোকা'র মুখের সামনেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে।

'মজা পেয়েছ!' 'শ্রী পোকা'র মাথায় বজ্রাঘাত। তবু জোর করে একবার ভাবল, ভয় কিসের? আমি তো ওর অধীনে চাকরি করি না! ভদ্রতা করতে গেলাম—আর এই ব্যবহার! চুলোয় যাক্ জেনারেল—আমি ওকে গ্রাহ্যই করি না।

কিন্তু এ আত্মপ্রত্যয় নিতান্তই সাময়িক—কারণ পোকা চিরকাল পোকাই থাকে। পরদিন সকালেই আবার সে গেল জেনারেলের কাছে দরবার করতে—'আমি মজা করতে আসিনি স্যার—ক্ষমা চাইতে এসেছি—কর্তাদের আমি চিরকাল সম্মান করি—আমি কি আপনাকে'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবার জেনারেলের মাথায় খুন চড়ে গেল। সশব্দে মাটিতে পা ঠুকে গর্জে বললেন, বেরোও—বেরোও এখান থেকে—

—অ্যাঁ!

—বেরোও বলছি এক্ষুনি—আবার প্রচণ্ড পদতাড়না এবং সিংহগর্জন।

যেন মেজের উপর সেই লাথিটা তারই গায়ে এসে লেগেছে, এইভাবেই ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ল 'শ্রী পোকা' চেরভিয়াকভ। তার সমস্ত বুদ্ধি-সুদ্ধি বিগড়ে গেল, টলতে টলতে বাড়ী ফিরে অফিসের পোশাকেই সোফার উপরে বসে পড়ল এবং সেই ভাবেই তার মৃত্যু হল।"

গল্পটি হাসির ছটায় উদ্ভাসিত, কিন্তু এর অন্তরতলচারী বেদনা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই স্পর্শ করে। মানুষের এই ভীরুতা, মেরুদণ্ডহীনতা, পোকার অধম এই নির্বীর্যতা—কারা দায়ী এর জন্যে? কা'র স্বার্থে মনুষ্যত্বের এমন কদর্য বিকৃতি ঘটে চলেছে? চার্চের উদ্দেশে, রাজতন্ত্র সম্পর্কে—সমাজের দিকে—যে চোখ ফেরাবার আভাস দিয়েছিলেন বোকাচ্চো এবং রাবল্যা, এখানে তা উদ্যত "**Pointing finger**" হয়ে দেখা দিয়েছে।

সমাজের দিকেই তাকানো যাক। 'কোরাস গার্লে'র সেই নিঃশব্দে সর্বস্ব-সম্প্রদানের পর কোল্পাকভের যে মানসিক প্রতিক্রিয়া, তার মধ্যেও চেকভের এই অন্তর-যন্ত্রণার আর একটি অভিব্যক্তি ধরা দিয়েছে। কাপুরুষ কোল্পাকভের ভণ্ড আত্মমর্যাদাবোধ এক মর্মঘাতী ব্যঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়েছে। তার পরম পবিত্রা সতী-সাধ্বী স্ত্রী এসে শেষে কোরাস্ গার্লের কাছে নতজানু হল, এ অপমান সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না ঃ

"She! A lady! So proud! Ready to go on to her knees to a thing like you! And I brought her to this! I shall never forgive myself. Never! Go away, you slut! She'd have gone down on her two bended knees to you! O God, forgive me!"

কিন্তু এইখানেই চেকভের শেষ কথা নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আশাবাদী শিল্পী আগামী বিপ্লবের অনিবার্য পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। তাঁর কবি-দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল ভবিষ্যৎ ইতিহাসের দীপ্তোজ্জ্বল মূর্তি। মানুষের শক্তি এবং সাধনাকে অভিনন্দন জানিয়ে তাই তিনি বলেছেন:

"It is a common saying that all the land a man requires is three yards. But only a dead man needs three yards. A living man needs not three yards, and not a manor, but the entire earth, all of nature, where he can give full play to all the qualities and characteristics of his untrammelled spirit."

কথাগুলির মধ্যে তলস্তয় সম্পর্কে একটু নিরীহ কটাক্ষপাত থাকতে পারে, কিন্তু এর মূল তাৎপর্য সবিশেষ লক্ষণীয়। মোপাসাঁর সঙ্গে চেকভের পার্থক্য এইখানেই। ফরাসী রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় সমাজ ও জীবনকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করে রিয়্যালিজমের জন্যে তৎপর হলেও মোটের উপর বালজাক্ ও ফ্লোব্যার আত্মতৃপ্তই ছিলেন। ফরাসী লেখকেরা তৃতীয় রিপাবলিকের সঙ্গে যা হোক একটা সম্মানজনক রফা করে নিয়েছিলেন—নেপোলেয়* বংশের প্রতি তাঁদের কিঞ্চিৎ মোহই ছিল। তাই ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধে যখন প্যারীর পতন ঘটল, তখন দুরন্ত জ্বালায় ফ্লোব্যার তাঁর চিঠিতে প্রিন্সেস্ মাতিলদ্‌কে লিখছেন: "Poor France"! একশো বছর ধরে সে আমেরিকা, গ্রীস, তুরস্ক, স্পেন, ইতালী, বেলজিয়াম—সকলের জন্যে লড়েছে, আর আজ ফ্রান্সের দুঃসময়ে "they all stand coldly by and watch her die!"[১]।

সেদিন এই অপমান এমন করে তাঁদের বুকে বেজেছিল যে তার জ্বালায় তিলে তিলে জ্বলে মরলেন প্রস্‌পের মেরিমে, প্রেভস্ত পারাদো আত্মহত্যা করলেন। আবার এই অসম্মানের মধ্য থেকেই সেদিন নতুন করে রাজনৈতিক চেতনাসমুখ গভীরতর সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা এসে গেল:

"France, jolted back to serious-mindness by disastar, was above all to give heed to writers who could enlighten her on the causes of her unhappiness."[২]।

ন্যাচারালিস্ট্ জোলা ড্রাইফাসের জন্যে লেখনী ধরলেন—রচনা করলেন

১। Letters of Gustave Flaubert, P. 171

২। A History of France, André Maurois, (Trans. by Binesse), P. 424

জার্মিনাল। ওদিকে দুর্ভাগ্যের পায়ে নিজেকে বলি দিলেন রাজতন্ত্রবিলাসী প্রাচীন মেরিমে, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত নবীন গী-দ্য-মোপাসাঁ।

কিন্তু সে দুর্ভাগ্য আন্তন চেকভের নয়। তিনি তো ফ্লোব্যার প্রভাবিত বস্তুবাদী যন্ত্রণার মধ্যেই কাল কাটাননি—তাঁর সম্মুখে মহান লিও তলস্তয়। মানুষের মুক্তি, পবিত্রতা ও শুভচেতনায় তাঁর অগাধ বিশ্বাস। 'এম্মা বোভারী'কে বাঁকা চোখ দিয়ে দেখেছেন ফ্লোব্যার—জীবনের রূপ তাঁর কাছে সম্পূর্ণ সুস্থ নয়, সবটা স্বাভাবিকও নয়। গুরুর কাছ থেকে এই খণ্ড এবং অর্ধ সত্য জীবনতত্ত্ব লাভ করে, তার উপর জার্মান কামানে বিধ্বস্ত পারীর ধ্বংসরূপ দেখে—বিষণ্ণ ও রোগকাতর মোপাসাঁ দিনের পর দিন অন্ধকারেই ডুবে চললেন—নরম্যাণ্ডীর কৃষকেরা তাঁকে রক্ষা করতে পারল না। অন্যদিকে গণসংগ্রামের ভবিষ্যৎ বাণী শুনছেন চেকভ—মাথার উপর তলস্তয়ের দৃষ্টি দুটি কল্যাণ-দীপের মতো জ্বলছে, তিনি অনুভব করছেন জর্জিয়া থেকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত এক মহাশক্তি জেগে উঠবার জন্যে পার্শ্ব-পরিবর্তন করছে। তাই তীরবিদ্ধ হরিণের মতো মৃত্যুমুখী মোপাসাঁর কণ্ঠে যখন আর্ত অভিশাপ ধ্বনিত হচ্ছে, তখন চেকভের মানস-মরাল নিষ্ঠুর জীবনের শরাঘাতে আহত পক্ষ নিয়েও শরতের স্বর্ণাভ আকাশে ডানা মেলে দিয়েছে। চেকভ যে জোর করে আশাবাদী হয়েছেন তা নয়, জীবনের নিষ্ঠুরতাকে তিনি অস্বীকার করেননি, বিষণ্ণ হয়েছেন, দুঃখ দিয়েছেন, তবু মৌলিক বিশ্বাস তাঁর জেগে ছিল নতুন দিগন্তের দিকেই। একখানি চিঠিতে চেকভ যুগ-শিল্পীর দায়িত্ব এইভাবে নির্দেশ করছেন ঃ

"He who desires nothing, hopes for nothing, and is afraid of nothing, cannot be an artist."

আর তাঁর বিখ্যাত নাটক 'চেরী অর্চার্ডে'' ঘোষণা করেছেন ঃ

"Do you know that in three or four hundred years all the earth will become flourishing garden ?"

কিন্তু তাঁর স্বদেশবাসীকে সে তিন-চারশো বছর অপেক্ষা করতে হয়নি। তার অনেক—অনেক আগেই তাঁর দেশে সেই স্বপ্নের অনেকখানি সফল হয়েছে। তাঁর 'ডার্লিঙ' ওলেঙ্কা তার যথাস্থান খুঁজে পেয়েছে, তাঁর 'স্কুল মাস্টার' আজ আর পরিণত বয়সে হতাশায় আর শূন্যতায় ডুবে যায় না ; তাঁর 'স্কুল মিস্‌ট্রেস' ম্যারিয়ার শূন্য জীবনে—ক্লেদাক্ত শীতল রিক্ততার মধ্যে নতুন করে এসে পড়েছে মস্কোর সোনালী আলো—আজ সত্যিই তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে স্বপ্নের মানুষ হানভ।

শুধু বক্তব্য নয়—আঙ্গিকেও চেকভের অসাধারণ কৃতিত্ব। তরুণ চেকভ তৎকালীন বিখ্যাত লেখক ও সমালোচক—'অরণ্যমর্মর'-এর রচয়িতা কোরোলেঙ্কোকে একবার বলেছিলেন ঃ "যদি অনুমতি করেন, তাহলে আপনার টেবিলের ওই অ্যাশ্‌ট্রেটিকে নিয়েও আমি গল্প লিখতে পারি।"

এ শুধু কথার কথাই নয়। চেকভের ছোট গল্পগুলি বার বার এইটিই

প্রমাণ করেছে যে জীবনের গভীর এবং বৃহৎ সত্যকে প্রমাণ করবার জন্য কোন বিশাল আয়োজন করতে হয় না ; প্রতিদিনের অতি-পরিচিত, সহজ জীবনের মধ্য থেকেই গল্পের উপকরণ সংগ্রহ করা চলে।

ফরাসী এন্‌সাইক্লোপিডিস্ট্ বিদ্রোহী লেখক দ্যনি দিদরো আর্টের একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন : 'Art is that which finds the uncommon in the commonplace and the commonplace in the uncommon." চেকভের গল্পেই এর সবচাইতে ভালো প্রমাণ পাওয়া যায়। নিতান্তই সরল, পরিচিত নৈকট্যের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেছেন অসামান্যতাকে, ক্ষুদ্রতম উপকরণ অবলম্বন করে বিপুলতম সত্যের সন্ধান দিয়েছেন তিনি। যেমন, বাড়ীতে পোষা বিড়ালটির কয়েকটা বাচ্চা হয়েছে ('An Incident') ; স্বাভাবিক ভাবেই ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দের উত্তেজনার এবং উৎকণ্ঠার সীমা নেই। কিন্তু মুহূর্তেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল—যখন কাকা পেত্রুসার কুকুর নীরো কয়েক মিনিটের মধ্যে বাচ্চাগুলিকে গলাধঃকরণ করল। একবিন্দু সহানুভূতি বড়দের মুখে দেখা গেল না, বাবা-মা হাসলেন মাত্র। নীরো মুখ চাটতে চাটতে ল্যাজ নেড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, "The cat is only one who is uneasy," আর :

"Vanya and Nina got to bed, shed tears and spend a long time thinking about the injured cat, and the cruel, insolent, and unpunished Nero." (গার্নেটের অনুবাদ)

এই ধরনের সামান্য প্রাত্যহিকতার আশ্রয়ে গল্প রচনা আজ আর নতুন কথা নয় ; কিন্তু সেদিন চেকভই এর প্রধান পরীক্ষক ছিলেন। সম্ভবত মোপাসাঁর কিছু গল্প থেকে তিনি এর প্রেরণা পেয়ে থাকবেন (যথা—'এক টুকরো দড়ি'), কিন্তু চেকভের কলমেই প্রধানত 'Commonplace' 'Uncommon' হয়ে উঠতে পেরেছে।

বৃত্তাকার, কাহিনীমুখ্য গল্পের মোড় ফিরিয়েছে চেকভ। একটি মুহূর্ত, একটি দার্শনিক উপলব্ধি, কোনো চরিত্রের চকিত চমক, ক্বচিৎ আবেগের স্পন্দন—এরা সবই চেকভের গল্পের বিষয়ীভূত হয়েছে। তাঁর তথাকথিত গল্পে 'গল্প' নেই—এ নিয়ে অনেকে অভিযোগ করেছেন, এমন কি আজও সমারসেট মমের মুখে এই নালিশ আমরা শুনতে পাই। কিন্তু একালের প্রতিটি গল্প-লেখকই জানেন যে দীর্ঘ বিবৃত কাহিনীর চাইতে কোনো ক্ষণ-মুহূর্তের মর্মোদ্ধার বা একটি বিলম্বিত বিবরণের চাইতে কোনো চকিত মনস্তাত্ত্বিক উদ্ভাসন শিল্প হিসেবে কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়। জেম্‌স জয়েস্ থেকে আরম্ভ করে হেমিংওয়ে পর্যন্ত আজ গল্পসাহিত্যে চেকভেরই উত্তরাধিকার।

গল্পলেখক চেকভের সবচাইতে বৈপ্লবিক কৃতিত্ব বোধ হয় এইখানে।

আর একটি বিশেষ ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ না করলে উনিশ শতকের রুশ

সাহিত্যের পরিচয় সম্পূর্ণ হতে পারে না। লন্ডনের হাইড্ পার্কে যেমন পিটার প্যানের, তেমনি লেনিনগ্রাদের "গ্রীষ্মোদ্যানে" (Summer Garden-এ)-ও একটি পাথরের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে তাঁর—শিশুরা তার চারদিকে খেলা করে বেড়ায়।

এই মানুষটি এ যুগের ঈশপ—কথার জাদুকর। নাম ইভান ক্রাইলভ (Ivan Krilov)।

রূপকথা এবং নীতিগল্পে এ-কালীন ইয়োরোপীয় প্রতিনিধি হিসেবে ফ্রান্সের লা ফঁত্যান (La Fontaine), জার্মানীর গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয় এবং ডেনমার্কের হান্স ক্রিশ্চিয়ান আন্ডেরসেনের নাম আমাদের কাছে সুপরিচিত। কিন্তু ক্রাইলভ সম্বন্ধে আমাদের অচেতনা বিস্ময়কর।

এই জন্যই বিস্ময়কর যে ক্রাইলভের নীতিগল্পগুলি মাত্র ফেবল-সাহিত্যেরই অনুবর্তন নয়, এই উপদেশাত্মক কাহিনীগুলির অন্তরালে রুশিয়া আক্রমণ এবং সমসাময়িক কাল পরিপূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাই বার্ণার্ড শ যেমন জনৈক ভ্রমণকারীকে একদা বলেছিলেন, 'শ-কে দেখলেই ইংল্যান্ডকে দেখা হয়ে যায়, তেমনি ক্রাইলভ সম্বন্ধেও রুশিয়ায় বলা হত :

ক্রাইলভ

"If you want to understand our people, read Krilov."

শিশুচিত্ত রঞ্জনে ক্রাইলভের নিজস্ব প্রতিভা তো আছেই—কিন্তু তাঁর পরিচয় সেইখানেই সম্পূর্ণ নয়। অস্কার ওয়াইল্ডের রূপকথা যেমন নামত শিশু-সাহিত্য হয়েও মূল বক্তব্যে অন্যতম তাৎপর্য বহন করে, তেমনি ক্রাইলভের প্রায় গল্পই রূপকের ছদ্মবেশে সমকালীন সমাজগত ও রাজনীতিক অবস্থার রূপায়ণ। গল্পগুলির আভ্যন্তরীণ গূঢ়ার্থ অনুধাবন করতে পারলে ক্রাইলভকে মাত্র শিশু-সাহিত্যের সীমানাতেই অবরুদ্ধ রাখা যাবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁর "বিচারপতি শৃগাল" গল্পটির সংক্ষিপ্ত রূপ বিবৃত করা যাক :

"কোনো কৃষক, বিচারপতি শেয়ালের আদালতে ভেড়ার নামে একটি মামলা উপস্থিত করছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, খামার-বাড়ীর যে উঠোনে ভেড়া ঘুমুচ্ছিল, মুরগীরাও সেইখানেই ছিল। সকালে দেখা গেল দুটি মুরগীর ছানা উধাও—তাদের পাখা এবং হাড় মাত্র পড়ে রয়েছে।

ভেড়া সবিনয়ে ধর্মাবতারকে জানাল যে সারারাত সে ঘুমিয়েছে—এ সবের কিছুই জানে না। প্রতিবেশীরাও সবাই সাক্ষ্য দেবে যে সে অত্যন্ত ভালো ছেলে—কোন অন্যায় কখনো করেনি। সর্বোপরি, তার চতুর্দশ পুরুষেও কেউ মাংসাশী নয়।

বিচারপতি শেয়াল বললে, 'ভেড়ার সাফাই অগ্রাহ্য। উঠোনে সে ছাড়া রাত্রে কেউই ছিল না। আর এ কথাই বা কে না জানেন যে মুরগীর ছানা অতীব লোভনীয় সুখাদ্য ? ভেড়া যে সে-লোভ সম্বরণ করতে পারবে এ

অবিশ্বাস্য। অতএব ভেড়ার প্রাণদণ্ড হল। কৃষক তার পশমগুলি পাবে আর মাংসটা কোর্ট-ফী বাবদ আদালতে জমা হবে।"

এ বিচার যে নিছক ভেড়ারই নয়, আইন-আদালতের কাছে দুর্বল যে ভেড়ার বিচারই পেয়ে আসছে চিরকাল, এই বাস্তব স্থূল সত্যটিই গল্পে অভিব্যক্ত হয়েছে। ক্রাইলভের গল্প থেকে স্পষ্টই অনুভব করা যায় প্রাণি-মূলক নীতিকথা যুগের পরিবর্তনে নতুন রূপ গ্রহণ করতে চলেছে, রীতি-নীতি-ধর্ম-সমাজকে সমালোচনা করবার কালোচিত অভিনব দায়িত্ব তার মধ্যে বিন্যস্ত হয়েছে। তাই চেকভের 'বহুরূপী' বা 'কেরানীর মৃত্যু'র সঙ্গে ক্রাইলভের গল্পও শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠযোগ্য।

এখানে একটু কালাতিক্রমণ ঘটলেও ক্রাইলভের প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত শ্চেদ্রিন (Soltykov Shchedrin)-কে স্মরণ করতে হয়। ফেবুলের ধরণেই এই লেখকও কিছু তীব্র গল্প রেখে গেছেন, যেগুলি প্রাণিমূলকতার ছদ্মবেশে তখনকার জার সাম্রাজ্যবাদের ওপর মর্মঘাতী আঘাত বর্ষণ করছে। 'Bears Government' জঙ্গী হিংস্রতার রূপায়ণ, 'The Eagle, Patron of Arts' অভিজাততন্ত্রের শিল্পপ্রীতির মর্মোদ্ঘাটন, 'The Selfless Rabbit' মেরুদণ্ডহীন আনুগত্য এবং শোষক সম্প্রদায়ের নির্লজ্জ চিত্র। শ্চেদ্রিনের এই গল্পগুলির আবেদন আজও অব্যাহত, এর বক্তব্য আজও সমান সত্য এবং এর ফলশ্রুতি এখনও সমান চাঞ্চল্যকর।

রুশ কথাসাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতকের শেষপাদে আর একটি বিশ্ববন্দিত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটল।

ছন্নছাড়া, ভবঘুরে, গৃহত্যাগী একটি তরুণ। বিচিত্র জীবন ও জীবিকার পথ-পরিক্রমায় সে ক্লান্ত, তিক্ত। তার মনের সামনে ভাসছে জার্মান কবি হাইনের একটি পংক্তি: "I have a toothache in my heart—"

কাজান শহরের তখন যেন আত্মহত্যার ধুম পড়ে গেছে। আমাদের এই

গোর্কী

তরুণ ভবঘুরে কারুজীবীও সেদিন সেই রমণীয় মৃত্যুর ডাক শুনল। আলেক্সি মাক্সিমভ্ পেশকভ্ বাজার থেকে একটি রিভলবার কিনল, রাত্রির অন্ধকারে চলে গেল কাজানা নদীর ধারে, গুলি করল নিজের বুকে। কিন্তু অত সহজেই তার মৃত্যু হল না। পরদিন তার আহত রক্তাক্ত দেহকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। আর তার কোটের পকেটে পাওয়া গেল বিচিত্র একটি চিঠি:

"I lay the blame of my death on the German poet Heine, who invented a toothache of the heart......please make a post-mortem examination of my remains and ascertain what devil has possessed me of late..."

ডাক্তার মাথা নেড়ে বললে, "তিন দিনের মধ্যেই এ ছোকরা মারা যাবে।"

অর্ধচেতন রোগী জবাব দিলে, "না, আমি মরব না।"

"The professor (ডাক্তার) lost his temper. He was apparently of the opinion that the sick man was conducting himself in a way that was hardly polite."১

কিন্তু দুর্বিনীত রোগী আলেক্সি পেশকভ্ মরল না। তার অনেক কাজ বাকি ছিল তখনো; আরো অনেক অভিজ্ঞতা, কারাবাস, অনেক বৈচিত্র্য। সব সঞ্চিত হচ্ছিল নিজের নোট-বইয়ের পাতায় পাতায়। বোল্‌শেভিক বিপ্লবের অগ্নিচক্রের সঙ্গে ক্রমে তার সম্পর্ক রচিত হল। পরিচয় হল আলেকজান্দার মেফোদিভিচ্ কাল্যুঝ্‌নির সঙ্গে—তিফ্লিসে।

কাল্যুঝ্‌নির কাছে নিজের অভিজ্ঞতার গল্প বলছিল আলেক্সি পেশকভ্। বলছিল, ভল্‌গার তীরে তীরে, বেসারাবিয়ায় তার অপরূপ জীবনযাত্রার কথা।

মুগ্ধ হয়ে শুনল কাল্যুঝ্‌নি। মনে হল এমন করে যে বলতে পারে তার লেখাও হবে অসামান্য।

কাল্যুঝ্‌নি বললে, 'তুমি গল্প লেখো।'

'কী নিয়ে লিখব ?'

'তুমি যাদের দেখেছ তাদের নিয়ে। যে জীবনকে চিনেছ তাকে নিয়ে।'

পেশকভ্ গল্প লিখলো—বুড়ো জিপসীর মুখে শোনা 'রাদ্দা আর লয়কো' (Radda and Loyko)-র কাহিনী। অপূর্ব সে রচনা। কাল্যুঝ্‌নি লেখাটি নিয়ে গেল 'কাভ্‌কাস্' (Kavkas) নামে বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকের কাছে।

কাহিনী পড়ে সম্পাদক মুগ্ধ। কিন্তু গল্পের নীচে লেখকের নাম কই ? কে এর রচয়িতা ?

তখনই কলম তুলে নিলে আলেক্সি মাক্সিমভ্ পেশকভ্। গল্পের তলায় স্বাক্ষর করল "মাক্সিম গোর্কী"। নামার্থ: "চরম তিক্ত"।

কিন্তু চরম তিক্ততার মধ্যে দিয়েও মাক্সিম গোর্কীর যাত্রা শুরু হল মহত্তম মানব-প্রীতির অভিমুখেই। সেই প্রথম গল্প "Makar Chudra"-ই তাঁর খ্যাতি এবং পরিচিতি এনে দিলে।

একদিকে বিপ্লবী কর্মধারা, অন্যদিকে সাহিত্যজীবন। অসামান্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গল্পের পর গল্প লিখে চললেন গোর্কী। 'সেমিনভে'র রুটির কারখানার স্মৃতি নিয়ে এল, "Twentysix Men and a Girl"; নিজের বিচার এবং কারাবাস থেকে জন্ম নিল "The Trotting Ordeal"; দেখা দিল "A Matter of Clasps", জালিক জীবনের স্মৃতি থেকে এল "Malva", একটি অপরূপ রাত্রি রূপায়িত হল "Once in the Autumn"-এ, "Chelkash" এল তাঁরই পরিচিত জীবন থেকে, তাঁরই মানস-সঞ্চয় থেকে অমর ভাবে শিল্পিত হল "The Birth of a Man."

১৯০১ সালে গোর্কী সেণ্ট্ পিটার্সবার্গে। তাঁর চোখের সামনেই নির্দয়ভাবে একটি বিপ্লবী ছাত্র-শোভাযাত্রাকে দমন করল পুলিশ। বেদনাহত,

১। From the Bank of the Volga—A. Roskin, P. 36

ক্রোধর্জর গোর্কী একটি তীব্র প্রবন্ধে ধিক্কার দিলেন উৎপীড়ক সরকারকে, লিখলেন তাঁর বেদমন্ত্র "ঝঞ্ঝাবিজয়ী পেট্রোল পাখীর গান' (Song of the Stormy Petrel) ঃ

"The waters roar……The thunder crashes……

Livid lightning flares in storm-cloud o'er the vast expanse of ocean and the flaming darts are captured and extinguished by the waters, while the serpentine reflections writhe, expiring, in the deep.

The storm ! The storm will be soon breaking.

Still the valiant stormy petrel proudly wheels among the lightning, o'er the roaring, raging ocean, and his cry resounds exaltant, like a prophecy of triumph—

Let it break in all its fury !"

এই ঝড়, এই বজ্র, এই ক্রুদ্ধ গর্জমান সমুদ্র সেদিনের জারতন্ত্রের হিংস্র রূপ—আসন্ন বিপ্লবকে দমন করবার জন্য তার প্রাণপণ প্রয়াস। কিন্তু আন্তন চেকভের আহত-হংস এবার গোর্কীর "Stormy Petrel" হয়ে নেমে এসেছে। আজকের বিপ্লবী তরুণ, ক্ষুব্ধ শ্রমিক, জাগ্রত বুদ্ধিজীবীর শক্তিকে রোধ করতে পারে কে ? বজ্র আরো হুংকার করুক, ঝঞ্ঝা আরো প্রবল হোক—মৃত্যুর সমুদ্র আরো ভয়াল হয়ে উঠুক—বিপ্লবের ঝড়ের পাখিরা আরো আনন্দে তরঙ্গে তরঙ্গে মুক্তির গান গেয়ে নেচে বেড়াবে।

গোর্কীর সাহিত্য এই ঝোড়ো পাখির গান।

তাঁর সাহিত্য-সাধনার সর্বোচ্চ সাফল্য বিংশ শতাব্দীতে অর্জিত হলেও উনিশ শতকের শেষাংশে—আট বৎসরের মধ্যেই তাঁর অনেকগুলি ভালো গল্প লেখা হয়ে গেছে। এই গল্পগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। এদের কতকগুলির মধ্যে তৎকালীন বিপ্লবী আন্দোলনের ছায়া যেমন পড়েছে, তেমনি অন্যগুলিতে একেবারে নীচের তলার "Lower Depth"-এর মানুষগুলির, ভল্‌গার বিস্তীর্ণ তটভূমিতে—কৃষ্ণসাগরের তীরে তীরে—সাধারণ রুশবাসীর, অতি বাস্তব জীবনও নিপুণভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

গোর্কীর গল্পাবলীর পরিচিতি অনাবশ্যক—বিশ্ব-সাহিত্যে তারা এত বেশি পঠিত যে তাদের সম্পর্কে নতুনভাবে ভাষ্য করার কিছুই নেই। চেকভের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য হল, চেকভ প্রধানত মধ্যশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীর গল্পকার—গোর্কীর স্বাচ্ছন্দ্য মাটির মানুষের সহজ জীবনে। "চেল্‌কাশ" কিংবা "মাল্‌ভা" চেকভের কলমে রূপ পেতো না। আঙ্গিকের দিক থেকেও পার্থক্য আছে। গল্পরচনায় চেকভ "The Master"—তাঁর কলারীতি সর্বকালের ছোটগল্প-লেখকের আদর্শ। কিন্তু গোর্কীর কারু-পদ্ধতি সে হিসেবে কিছু শিথিল এবং অমার্জিত। কোনো কোনো গল্প ন্যাচারালিজমের দিকেও ঝুঁকে পড়েছে, মোপাসাঁর পটভূমিতে ফ্রান্সে জন্ম নিলে তাঁর লেখা কী রূপ

নিতে পারত, তা অনুমান করা শক্ত। গোর্কীর কাহিনীর বন্ধন শিথিল—আতিশয্যও আছে। কিন্তু গোর্কীর প্রধান মহিমা চরিত্র-চিত্রণে—তাঁর বিশাল দেশের মহান্ মানবসমাজ তাঁর গল্প-সাহিত্যে এক বিপুল-ব্যাপ্ত "চরিত্র-চিত্রশালা"র দ্বার খুলে দিয়েছে ; আগামী বিপ্লবের ইতিহাস যারা রচনা করবে—'৯ই জুলাইয়ে'র রক্তাক্ত কাহিনীতে যাদের রুদ্রগর্জন, গোর্কী তাদেরই সামগ্রিক রূপকার। গোর্কীর 'Tales of Italy', ছোট ছোট নক্সার ভিতর দিয়ে এই ধরণের বিশিষ্ট রচনা।

লেখক হিসেবে নিজেকে উত্তীর্ণ করবার জন্যে গোর্কী যে সাধনা করেছেন, তা-ও তাঁর চারিত্রিক নিষ্ঠারই পরিচায়ক। তাঁর নিজের সকৌতুক স্বীকারোক্তি এই প্রসঙ্গে কিছুটা আহরণ করা যাক ঃ

"In general I tried to make use of an 'elegant' style. Here is an instance : 'The drunk man stood embracing the lamp post, a smile on his face, examining his flickering shadow.' The night, incidentally, as I myself had written, was windless and moonlit ; in those times street-lanterns were not lit in such nights, and besides even were the lanterns lit, the man's shadow would be a steady one if there was no wind.…

'The sea was smiling', I wrote, and for a long time thought that it was good to say so. In my persuit of beauty I was constantly at variance with precision of decision and had a way of misplacing things and describing people wrongly…

Such errors, petty though they be seem, are of great importance, for they transgress the truth of Art." (Gorky, 'How I learnt to Write.')

এই আত্মসমালোচনা প্রতিটি লেখকের স্মরণ রাখা উচিত, বিশেষভাবে প্রত্যেক গল্পলেখকের। গল্পের যে-কোনো শব্দ, যে-কোনো বর্ণনা, যে-কোনো ইঙ্গিত যদি অপরিহার্যতায় বিধৃত এবং ব্যঞ্জিত না হয়, তা হলে তা কখনোই পূর্ণাঙ্গ শিল্প-সফলতা লাভ করতে পারে না।

গোর্কীর এক পা প্রাক্-বিপ্লব যুগে, এক পা বিপ্লবোত্তর কালে। তারপর নতুন যুগ ঃ Socialist Realism-এর আবির্ভাব ঃ "A dialectical interpretation of reality and its criterion in the needs and aims of an evolving Socialist Society."[১]

বিপ্লবভীত শিল্পী ইভান্ বুনিন্ স্বদেশ ত্যাগ ক'রে "Dark Avenue"-এর যৌন ও ব্যক্তি সমস্যাভিত্তিক গল্প লিখেছেন—'Crocodile'-এর জোশেংকো (Zoshchenko) ব্যঙ্গ করতে গিয়ে মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছেন।

১। George Reavy, Soviet Literature To day, p. 20

কিন্তু 'সোস্যালিস্ট্ রিয়ালিজম্'কে অনুসরণ করেছেন অন্যেরা। বিখ্যাত নিকোলাই তিখোনভ চেকভের উত্তরসাধক, কাব্যিক সৌন্দর্যের সঙ্গে কৌতুকের স্বাদ মিশিয়েছেন ভি. ইলিনকভ্ (Ilyenkov), ঘটনাবিচিত্র গল্প লিখেছেন লেভ্ কাসিল্ (Lev Kassil), 'ডনত্রয়ীর' বিশ্বপরিচিত ঔপন্যাসিক মিখেইল্ শোলোকভ বলিষ্ঠ গল্প উপহার দিয়েছেন। গেব্রিলোভিচ (Gabrilovich), স্তাভ্স্কি (Stavsky), সিমোনভ (Simonov) এবং 'হ্যাপিনেসে'র স্বনামধন্য স্রষ্টা পাভ্লেঙ্কো (Pavlenko)-র নামও সাম্প্রতিক রুশ-গল্পসাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু আধুনিক রুশ গল্প আর আমাদের আলোচ্য নয়—তা বর্তমানের সম্মুখে বিদ্যমান। সোস্যালিস্ট রিয়ালিজ্মের মন্ত্রদীক্ষিত সাহিত্য ভবিষ্যতের কাছ থেকেই তার প্রাপ্য মূল্য লাভের জন্য অপেক্ষা করে আছে। তার শিল্পগত সার্থকতা এ-যুগের কাছে এখনো সম্পূর্ণ নির্ণীত হয়নি।

কিন্তু চসারের উত্তরাধিকার থেকে ইংল্যান্ড কী পেলো ?

গীতি-কবিতা এবং নাটকের প্রভাবে ছোটগল্প বা উপন্যাস কিছুই তখন মাথা তুলতে পারছিল না। প্রথম রন্যাসাঁসের উত্তুঙ্গ শিখর থেকে তখন প্রবল শক্তিতে নেমে আসছে শেকস্পীয়র-বেন্ জন্সনের নাট্যপ্রবাহ—তার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে ন্যাশের 'দুর্ভাগ্য পথিক' (The Unfortunate Traveller) কিংবা সিড্নির 'আরকাডিয়া'। তার পরে মিল্টনের গম্ভীরমন্দ্র 'প্যারাডাইজ লস্টে' পিউরিটানিজ্মের আবির্ভাব—তার স্বর্গমর্ত্যচারী বিপুল রূপের কাছে উপন্যাস দাঁড়াতেই পারল না। উপন্যাস অবশ্য নতুন প্রাণশক্তি নিয়ে ফিরে এল জনসনের যুগে—ডিফো-গোল্ড্-স্মিথের সম্ভাবনাকে সম্ভব করলেন 'পামেলা'র রিচার্ডসন, 'জোসেফ অ্যান্ড্রুজ'-এ দীপ্ত প্রকাশ ঘটল ফিল্ডিঙের, একে একে দেখা দিলেন জর্জ স্মোলেট্, লরেন্স স্টার্ণ, জেন অস্টেন।

কিন্তু ছোটগল্প কোথায় ? অন্তত তার পূর্ব সংকেত ?

অষ্টাদশ শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে The Lady's Monthly Museum-এ মহিলা লেখিকাদের কিছু কিছু গল্পচর্চার প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে[১]। সেই সময় নারী-লেখিকাদের উৎসাহ দেবার জন্য (এবং সম্ভবত গ্রাহিকা সংখ্যা বাড়ানোর জন্যও) তাঁদের কাছ থেকে চার পাতার মতো সংক্ষিপ্ত রোমান্স, নভেল, টেল ইত্যাতি চাওয়া হচ্ছে সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে। সংক্ষিপ্ত বলার বিশেষ কারণ—অতিকায় বই লেখবার জন্য তখন প্রবল একটি প্রবণতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই পত্রিকাতেই মেরিয়া এজওয়ার্থ নীতি ও সুশিক্ষামূলক গল্প বিস্তার করে কিছু সুনাম অর্জন করেছিলেন, জার্মান 'Horror Stories'-ও তাঁর গল্পে ছায়া ফেলেছিল। হানা মুর

১। English Short Story, H. S. Canby, P. 210

লিখেছিলেন প্রচুর নীতিগল্প—বহুদিন পর্যন্ত সেগুলি আদৃত হয়েছিল, বিশেষভাবে শিশুশিক্ষার প্রয়োজনে।

ইংল্যাণ্ডে আধুনিক ছোটগল্পের স্কেচ পড়তে আরম্ভ হয়েছিল অবশ্য অষ্টাদশ শতকের প্রথমেই। মত্যাঁনের Essais-এর প্রভাব পড়েছে ইংরেজদের উপর—কিন্তু পর্তুগীজ বংশোদ্ভব ও ইহুদী মায়ের সন্তান আত্মকেন্দ্রিক ফরাসীর মেজাজ ইংল্যাণ্ডে আসেনি। বেকন মত্যাঁনের ধারায় লিখলেন গভীর-গম্ভীর নিবন্ধমালা, কেউ কেউ বা মত্যাঁনের সরস জীবন-ব্যাখ্যানকে সকৌতুক সমাজ-সমালোচনার কাজেও লাগালেন। ফলে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করল স্টীলের 'ট্যাট্‌লার', তারপর এল অ্যাডিসনের 'স্পেক্‌টেটর'। আর 'স্পেক্‌টেটরে' দেখা দিলেন একটি অনন্যসাধারণ চরিত্র—যাঁর নাম স্যার রোজার ডি কভারুলি। স্টীল্‌ অবশ্য মিস্টার বিকারস্টাফ্‌কে আমদানি করেছিলেন—কিন্তু রোজার ডি কভার্লির পাশে বিকারস্টাফ দাঁড়াতে পারেন নি। (অবশ্য রোজার ডি কভার্লির সূচনাও স্টীল্‌ই করেছিলেন—অ্যাডিসনের হাতেই এই চরিত্রটির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়েছে।)

"The most lovable Englishman" এই রোজার ডি কভার্লির সহায়তায় ইংরেজ সমাজ-জীবনের চমৎকার সব নক্সা এঁকেছেন অ্যাডিসন—সেই সঙ্গে তাঁর নায়কটিও আমাদের অতি প্রিয়বস্তু হয়ে উঠেছেন। সাংবাদিক-সুলভ ভাষায়, কৌতুকের রসান দিয়ে, রচনাভঙ্গিকে ছোটগল্পের দিকে অনেকখানিই এগিয়ে দিয়েছিলেন অ্যাডিসন। নমুনা হিসেবে হোমরীয় নাট্য-অভিনয় দেখতে গিয়ে স্যার রোজারের প্রতিক্রিয়া উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ

"When Sir Roger saw Andromache's obstinate refusal to her lover's importunities, he whispered me in the ear that he was sure she would never have him to which he added, with a more than ordinary vehemence, You do not imagine, Sir, what it is to have to do with a widow. Upon Pyrrhus his threatening afterwards to leave her, the knight shook his head, and mutterrd to himself : Ay do if you can. This part dwelt so much upon my friend's imagination, that at the close of the third act. as I was thinking of something else, he whispered in my ear, 'These widows sir, are the most perverse creatures in the world. But pray (says he), you that are a critic, is this play according to your dramatic rules as you call them ? Should your people in tragedy always talk to be understood ? Why, there is not a single sentence in this play that I do not know the meaning of."

সর্বজনবিদিত সৃষ্টি থেকে 'অলম্‌ অতিবিস্তরেণ।' ট্র্যাজেডী নাটকের গুরুগম্ভীর বাগ্‌বিন্যাসকে মৃদু ব্যঙ্গ করা এ তো একটি গৌণ উদ্দেশ্য, কিন্তু

তাকে ছাপিয়ে চমৎকার একটি চরিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে—বাংলা-সাহিত্যে বীরবলের জমিদারের সেই 'যাত্রা দর্শন' মনে পড়ে যায়, ভাষাভঙ্গিতে স্পষ্টই গল্প-লেখকের আমেজ। এইসঙ্গে জনসনের 'The Rambler'-ও স্মরণীয়।

ইংরেজি কথাসাহিত্যে চরিত্র এল, ভাষাও এল ; কিন্তু তা সত্ত্বেও রচনার সীমা ছাড়িয়ে এরা গল্পের মধ্যে উত্তীর্ণ হল না। বিবিধ চরিত্রের আবির্ভাব ঘটল, কিন্তু তারা আত্মলক্ষ্য হয়ে মানসলোকে যাত্রা করল না, লেখক নিজের মুখোমুখি হয়ে বসলেন না, আসর বসালেন সামাজিক পানশালাতেই। ডিফো-গোল্ড্স্মিথের অনুবর্তনে ঔপন্যাসিকেরাই পদক্ষেপ করলেন। জন্সনীয় যুগের পালা সাঙ্গ হতে না হতে এল ফরাসী বিপ্লব—রোমান্টিক কবিতার পালা। বায়রণ এবং শেলী, মোপাসাঁর যন্ত্রণা এবং চেকভের স্বপ্নের সূচনা রেখে গেলেন। ইতোমধ্যে প্রশ্ন উঠলঃ "Who will tell us a story ?" এবং উত্তরও এল জি. কে. চেস্টারটনের ভাষায়ঃ "Sir Walter Scott, ofcourse"।

উপন্যাসের পর উপন্যাসে, প্রেম, বীরত্ব ও অ্যাড্ভেঞ্চারে, স্কট রোমান্টিক কল্পনার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে গেলেন—শ্রোতাদের সর্বাঙ্গীণ তৃপ্তিতে কোথাও কোনো ফাঁক রাখলেন না তিনি। কিন্তু তখনো ছোটগল্পের দেখা নেই।

ছোটগল্পের দেখা নেই বটে, কিন্তু অ্যাডিসন-স্টীলের প্রায় একশো বছর পরে ইংল্যান্ডের সাংবাদিকতায় আবার একদল 'এসেয়িস্টে'র আবির্ভাব হল। ব্ল্যাক্উড্স্ লন্ডন ম্যাগাজিনে চার্লস্ ল্যাম লিখলেন তাঁর "Essays of Elia", ইলিয়ার মধ্য দিয়ে পুনরুত্থান ঘটল স্যার রোজার ডি কভার্লি'র—অবশ্য ভিন্নরূপে, ভিন্ন পরিবেশে। ওই একই কাগজে ডি. কুইন্সি লিখলেন তাঁর 'অহিফেন বিলাসের' "Confessions".

ডি. কুইন্সির এলোমেলো স্বপ্নে কাব্যমণ্ডিত ফ্যান্টাসিয়ার অবকাশ ছিল। আর 'ইলিয়ার নিবন্ধাবলীতে' ল্যাম আবার ছোটগল্পের সম্ভাবনা এনে দিয়েছিলেন। তাঁর রচনাতে কাব্যরঞ্জিত আত্মজিজ্ঞাসা কখনো কখনো কাহিনীতে রূপায়িত হয়েছে। ইলিয়ার 'My Relations' ছোটগল্পের চরিত্র-চিত্রণের দিকে অগ্রসর হয়ে আছে—'Dream Children'-এর দীর্ঘনিঃশ্বসিত রসিকতা গল্পকে প্রলুব্ধ করে। 'A Dissertation Upon Roats Pig'-এর তথাকথিত কৌতুকোজ্জ্বল চৈনিক গল্পটি তো অমর হয়ে আছে।

কিন্তু তবুও ছোটগল্প হল না। এগিয়ে চলল কবিতা-নাটক-উপন্যাস। এড্গার অ্যালান পো-র প্রত্যক্ষ প্রভাবে, অনেক পরে একাধারে পো এবং বাল্জাকের যুগ্ম শিষ্যত্ব নিয়ে উল্লেখযোগ্য গল্প লিখলেন রবার্ট লুই স্টিভেন্সন্। হয়তো স্টিভেন্সন্ চিররুগ্ন ছিলেন বলেই একদিকে তাঁর গল্পে ভীতি এবং আতঙ্কের ছায়া পড়েছে—অন্যদিকে তাঁর অসুস্থ শরীর দূরে-দূরান্তে মানস অভিযান করে বেড়িয়েছে। আর এই সময় ফ্রান্স এবং

রুশিয়া আধুনিক ছোটগল্পের অভিমুখে বহুদূরে অগ্রসর হয়ে গেছে।

কিন্তু ইংল্যাণ্ডে তৈরী হল না ছোটগল্প? কেন তার জীবনের মধ্য থেকে তা সহজ ভাবে বিকশিত হল না? কেন তার নিজস্ব মৃত্তিকার স্বাভাবিক ফসল ছোটগল্প নয়?

আসলে ইংল্যাণ্ড কবিতা আর নাটকেরই দেশ। সেইজন্যই গিয়োভানি বোক্কাচ্চোর গদ্য চ্যানেল পার হয়ে যখন ইংল্যাণ্ডে এসে পেঁছুল তখন তাকে 'Versify' করলেন জিওফ্রে চসার—তাঁর কাছ থেকে নাটকের উপকরণ নিলেন উইলিয়ম শেক্সপীয়ার। (অবশ্য 'ইতালীয় নভেলা'র অন্যতম লেখক মাত্তেও বান্দেল্লোর কাছেও শেক্সপীয়ার ঋণী।) তাই ব্যক্তি-চেতনার বিদ্রোহী সত্তার সঙ্গে যখন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক সংঘাত প্রবল হয়ে উঠল, তখন তা নব-গীতিকবিতার রোমাণ্টিক খাতেই ফেনোচ্ছ্বসিত হল। বড় জোর লী-হাণ্ট্ লিখলেন 'উনুনের পার্শ্ববর্তী বিড়ালের রূপককথা'—তা ল্যাম-ডি্-কুইন্সিরই পন্থানুসরণ মাত্র।

আরো দুটি-একটি কারণ এই প্রসঙ্গে অনুমান করা যেতে পারে। ফরাসী বুদ্ধিজীবীর যে উগ্র ব্যক্তিত্ববোধ বারে বারে 'বজ্রমুদ্যতম্' রূপে দেখা দিয়েছে, কিম্বা রুশিয়ার জারতন্ত্রের দুঃশাসনে লেখকদের প্রাণের যে ধিকি-ধিকি আগুন সাইবেরিয়ার অতি শীতল নির্বাসনেও নির্বাপিত করা যায়নি—ইংল্যাণ্ডে অনুরূপ চেতনা যেন আমরা দেখতে পাই না। বিক্ষোভ জেগেছে বার বার, যন্ত্রের নব আবির্ভাবে ম্যাঞ্চেস্টারের শ্রমিকের দুর্গতি কশাইখানার শূকরকেও ছাড়িয়ে গেছে, জন্ম নিয়েছে চার্টিস্ট্ আন্দোলন, চেলশিয়ার শ্রমিকদের উপর অশ্বারোহী রাজসৈন্য খোলা তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যে ক'জন বুদ্ধিজীবী তাদের দাবি-দাওয়াকে সমর্থন করেছেন, ভদ্রশ্রেণীর ইংরেজের কাছ থেকে বিশেষ প্রীতি তাঁরা পাননি। শেলির শোচনীয় দুর্গতি সাধারণ ইংরেজকে তেমন চঞ্চল করেনি—লী হাণ্ট এবং জন হাণ্টের কারাবরণে তাদের এমন কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, তাই মানবতার উপাসক শিল্পী ও সমালোচক হ্যাজ্‌লিট্ তাঁর কালে **"most hated man"** বলে চিহ্নিত হন; তাই টম পেনকে পলায়নের সুযোগ করে দেবার দায়িত্বে কবি ব্লেকের মাথার উপরে খড়্গ দুলতে থাকে। ইংরেজ তার রাজার আনুগত্যে অটল বলেই ক্রমওয়েলের কঙ্কালকে সমাধি থেকে তুলে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাতে তার বিবেকে বাধে না। আজ পর্যন্ত চরিত্র-ধর্মে ইংরেজ সবচাইতে রক্ষণশীল জাত—পৃথিবীর সমস্ত অগ্রসর দেশেই রাজবংশ যখন কফিনের তলায় গলে যাচ্ছে—তখন রাণীর প্রতি আনুগত্যে সে পর্বতের চাইতেও অটল-অচল। রাজা এবং পার্লামেন্টের উপর বরাত দিয়েই সে নিশ্চিন্ত হতে চায়, ব্যক্তিসত্তার 'অহং বোধ' যেন তার ভালো লাগে না।

তাছাড়া উনিশ শতকের পৃথিবীতে ইংরেজই তো সবচাইতে সুখী! এমনিতেই গল্প-লেখকের ক্ষুব্ধ ব্যক্তিচেতনা ইংল্যাণ্ডে কখনো বিশেষ প্রশ্রয় পায় না; তার উপর ওই সময় জারতন্ত্র এবং সার্ফডমের ক্ষোভে রুশ লেখকরা

যখন জর্জরিত আর ফ্রান্সে যখন ব্যর্থ বিপ্লবের উত্তরকালীন অনিশ্চয়তা—আত্মধিক্কার, আশা-শঙ্কার দ্বন্দ্ব ও রিয়ালিজমের দাবি, তখন ইংল্যান্ডের ভাগ্যভূমিতে একাদশ বৃহস্পতির অধিষ্ঠান ঘটেছে। সপ্ত-সমুদ্রের উপর দিয়ে সগৌরবে চলেছে তার স্পর্ধিত বাণিজ্যতরী, বহন করে আনছে পৃথিবীর ভাণ্ডার লুট করা রাশি রাশি সোনা—**"England was basking under the warm colonial sun !"**

সমৃদ্ধি আর স্বাচ্ছন্দ্যে পরিতৃপ্ত ইংরেজ তখন স্বাভাবিক ভাবেই উপন্যাসের মন্থর ব্যাপ্তির মধ্যে গা এলিয়ে দিয়েছে। শুধু ব্যাপ্তিই নয়; উপনিবেশিক অপহরণের তুষ্টিতে, পরিপূর্ণ নৈশভোজের পর 'ফায়ার-প্লেসের' পাশে পা মেলে ইংরেজ যে উপন্যাস পড়তে চাইত, অন্তত হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী রোমন্থন তাতে না থাকলে তার মন খুশি হতে পারত না। উপন্যাস নীতিমূলক, ঘরোয়া এবং রোমান্সধর্মী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অল্প-স্বল্প ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও মন্দ কথা নয়, আর মেয়েদের উপর কিছু আক্রমণ থাকলে সেটাও বেশ উপভোগ্য মনে হত—স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে 'জন বুল' তখনো শ্রদ্ধান্বিত নয়—**"Woman is an animal who delights in finery !"**

আর উপনিবেশের বিপুল সাম্রাজ্যে দিকে দিকে ইংরেজ তখন অনিবার্য নিয়মেই বহির্মুখ—**Extravert**; আফ্রিকার গভীরব্যাপ্ত বিশাল অরণ্যে সে সিংহ-জলহস্তী শিকার করছে, মিশরের মরুভূমিতে "ভ্যালী অব দি কিংসে"র দিকে সে তাকিয়ে আছে বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে—ভারতের বনভূমিতে তার বন্দুকের গুলিতে বিদ্যুল্লেখার মতো লাফিয়ে উঠছে **"Velvet Tigers"**; সেই সঙ্গে চলছে তরে ব্যাপক বাণিজ্য, দেশে দেশে তৈরি করছে খনি, রবার, চা, কফি আর নীলের জমি। ইংল্যান্ডের প্রতিটি মানুষ স্বপ্ন দেখছে কবে সে ভারতবর্ষে গিয়ে নবাবের (তখনকার ভাষায় **Nabob**-এর) ঐশ্বর্য লাভ করবে।

এই বহির্মুখীনতা আর বিশাল সমুদ্রের বিস্তীর্ণ আহ্বানে ইংরেজি সাহিত্যের একদিকে আলেকজান্ডার সেলকার্কের হাতছানি (রবিনসন ক্রুশোর উপকরণ)—ফরাসী সমালোচকেরা বলেছেন, রবিনসন ক্রুশোর দ্বীপসাম্রাজ্য সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের আকাঙ্ক্ষারই রূপক ইতিবৃত্ত; অন্যদিকে মন্থরছন্দ মৃদুগম্ভীর জীবনযাত্রার প্রলম্বিত-লয়ের সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ, কৌতুকের অট্টহাসি আর খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের কাহিনী। এর সঙ্গে ফরাসী বা রুশ-সাহিত্যের মর্মমুখী, সমাজসচেতন, তীক্ষ্ণ-তীব্র ছোটগল্পের কোনো সাধর্ম্য নেই—সে মনন-চিন্তনই কোথাও নেই। ফিলডিং প্রমুখ লেখকদের রচনার যে আক্রমণ মেলে তার উদ্দেশ্য **"gentlemen"**-দের উন্নত ও সংশোধিত করা, রাবল্যার ভয়ঙ্কর অট্টহাস্য কখনো তার মধ্যে ধ্বনিত হয়নি। থ্যাকারের 'ভ্যানিটি ফেয়ার' কিংবা 'পেনডেনিসে' যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ আছে, তাও রক্ষণশীল মনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। ইংল্যান্ডের ছোটগল্প সেইজন্যই প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইয়োরোপীয় গল্পসাহিত্যের কাছাকাছিও যেতে পারেনি।

আর. এল. স্টিভেনসন

ডক্টর জেকিল এবং মিস্টার হাইড্ খ্যাত ওই স্টিভেনসনই খানিকটা স্মরণীয়। অজানা সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে অভিযাত্রী ইংরেজের রোমান্টিক্ কল্পনা তাঁর প্রশান্ত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের 'ব্ল্যাক্ ম্যাজিক'-মূলক গল্পগুলিতে রূপ পেয়েছে ('The New Arabian Nights'), পো-র অনুসরণে তাঁর কাহিনী 'The Suicide Club'-এর আতঙ্ক ও অপরাধ-প্রবণতার মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। তাঁর ব্যাধি-জর্জর দেহ কখনো সুদূরের পিপাসায় 'রত্নদ্বীপে'র যাত্রী, কখনো রোগ-যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন তাঁর অসুস্থ কল্পনা 'সারাটোগা ট্রাঙ্ক'র ('The Saratoga Trunk') মধ্যে রক্তাক্ত বিভীষিকা আর সমাধিক্ষেত্র থেকে প্রেতগ্রস্ত 'শব অপহরণের' পৈশাচিক দুঃস্বপ্ন দেখছে—'বোতলের মধ্য থেকে শয়তান' ('The Imp in the Bottle') কখনো বা কালো জিভ লকলকিয়ে অভিশপ্ত আত্মিকের জন্য প্রতীক্ষা করছে।

এ-ছাড়া 'The Jungle Book'-এর স্রষ্টা রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিঙও বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। তাঁর অরণ্য-কাহিনীগুলি অভিনব—বিশেষভাবে ভারতীয় অরণ্যভূমি ও বন্যজন্তু তাঁর কল্পনার রসে ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে. 'রিকি-টিকি-টাভি' আর 'মোগলি'র দল অবিস্মরণীয় হ'তে পেরেছে। কিন্তু বিশ্বমানের বিচারে কিপ্‌লিঙ এমন কিছু মহান্ গল্পকার নন।

ইংরেজি গল্পসাহিত্যের দৈন্য সম্বন্ধে আধুনিক কালেও সমারসেট মম ক্ষুব্ধচিত্তে বলছেন: **The short story is not an art that has flourished in Britain, but whether this is because brevity, point and form are not qualities that are natural to English writers of fiction, or whether because the outlet has not been sufficiently favourable to encourage good writers to employ their gifts in this medium, I do not know."**[১] মম আরো বলেছেন—ইংরেজ গল্পলেখক যা-কিছু লেখেন, তা চেকভ এবং হেনরি জেমসের 'Minor key' অনুসরণ ছাড়া কিছুই নয়।

তা হলেও বিংশ শতকের ইংরেজী ছোটগল্প কিছু কৃতিত্ব দেখিয়েছে। মম নিজে আছেন, ডি. এইচ্. লরেন্স, ক্যাথারিন ম্যানস্‌ফিল্‌ড্ (যদিও মূলত নিউজিল্যাণ্ডবাসিনী), অস্‌বার্ট সিট্‌ওয়েল, এইচ-ই-বেট্‌স্, গ্রাহাম গ্রীন, জন কোলিয়ার, ই. এম. ফরস্টার ইত্যাদিও কিছু ভালো গল্প লিখেছেন। গ্রীন, মম, ফরস্টার এবং বেট্‌স্ তো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার অধিকারী।

আর ইংল্যাণ্ড যদি ভালো গল্প না লিখে থাকে—আয়াল্যাণ্ড খানিকটা ক্ষতিপূরণ করেছে। জেমস্ জয়েসের 'দ ডাবলিনাস" আছে. লিয়াম ও-ফ্ল্যাহার্টি তাঁর বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতায় প্রাণিজগতের অপরূপ সব গল্প লিখেছেন, সিয়ান ও-ফাওলেন এবং এ-ই-কপার্ড স্থায়ী গৌরব অর্জন করেছেন। যুগের অনিবার্য প্রয়োজনে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জেও ছোটগল্প বিকশিত হতে বাধ্য—কারণ তা কালেরই শস্য। সামাজিক অবস্থার আবর্তন-বিবর্তনের ফলে

১। Maugham, Modern English and American Literature, P. 43

দ্রুতগতি ও দীপ্তিমান এই সাহিত্য আজ সারা পৃথিবীতেই দিগ্বিজয়ী পদক্ষেপ করেছে।

সামান্য হলেও উনিশ শতকের গল্পে জার্মানীরও কিছু ভূমিকা আছে ঃ

ব্রুনহিল্ড্ এবং গুড্রুন-এর আদিম সঙ্গীত দিয়ে আত্তিলার বংশধরদের সাহিত্য-যাত্রা। নাইট্দের প্রেমকাহিনী "Minnesongs" থেকে চারণ-গাথা নেমে এল লোকসঙ্গীতে। জার্মান রোমান্সে—সম্ভবত প্রুশীয় সামন্ততন্ত্রের উদ্দাম আদিমতার ফলেই বিভীষিকা সৃষ্টির একটা স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়—যা Gothic Horror নামে চিহ্নিত হয়েছে। ইতিমধ্যে কালান্তর ঘটে গেল জার্মানীর মানসক্ষেত্রে। রিফর্মেশনের পালা—মার্টিন লুথারের যুগ—তাঁর রচিত স্তোত্র এবং বাইবেলের অনুবাদ জার্মানীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করল। লুথারের মন্ত্রগীতি "Ein Feste Burg Ist unser Gott (স্বয়ং ঈশ্বরই আমাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ)"—কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল। তারপর এল আবার ত্রিশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধের দুর্দিন—জার্মান সাহিত্য-সংস্কৃতি সব কিছু বিভীষিকার মধ্যে ডুবে গেল। সেই দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে ইংরেজী ও ফরাসী সাহিত্যের কাছ থেকে ভিক্ষান্ন নিয়ে জার্মান সাহিত্যের কোনোক্রমে অস্তিত্ব রক্ষা চলতে লাগল।

অষ্টাদশ শতকে ফ্রেডারিক দি গ্রেটের 'তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়'। সেই আলোকচ্ছটায় জার্মান জাতির সুপ্তিভঙ্গ হল, প্রভাত-পাখীর কলধ্বনিতে যেন চারদিক মুখর হয়ে উঠল। জার্মানীতে রন্যাসাঁসের পদক্ষেপ ঘটল। এলেন ক্লপস্টক, লেসিং, ভীল্যান্ড (Weiland) গোয়টে, শিলার, রিখ্টার, গ্রিম ভ্রাতৃযুগল, হফ্মান, হাইনে। এইখানেই শুরু হল সত্যিকারের জার্মান সাহিত্য।

গোয়টে কেবল বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম মহাকবিই নন—জার্মান কথা-সাহিত্যের তিনি অন্যতম আদি নায়ক। তাঁর 'তরুণ ভের্টারের দুঃখ' (The Sorrows of Young Werther) আত্মজীবনীমূলক রচনা—প্রেমে, বেদনায় ও কবিত্বের স্পর্শে একটি উল্লেখযোগ্য খণ্ড উপন্যাস। প্রেম এবং দুর্বাসনা ভের্টারের জীবনকে আত্মহত্যার পথে চালিত করেছিল। বইখানি বিশ্বজয়ী নেপোলেয়ঁকে এতই আকৃষ্ট করে যে মুগ্ধচিত্তে এটিকে সাত বার পড়েছিলেন তিনি। গোয়টের বন্ধু ও স্বনামধন্য কবি জোহান্ ফন্ শিলারও গদ্যকাহিনী লেখার চেষ্টা করেছিলেন। শিলারের গল্পে বোক্কাচোর প্রভাব চোখে পড়ে। তাঁর 'ভাগ্যের খেলা' (The Sport of Destiny) গল্পটিকে প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় ঃ

আলোসিয়াস্ ফন 'জি' (পুরো নামটি সত্য ঘটনা বোধে গোপন করেছেন শিলার)—তাঁর রাজ্যের রাজার চরম প্রিয়ভাজন ছিলেন এবং সেই প্রীতির ফলে তিনি ধাপে ধাপে রাজানুগ্রহের চরম শিখরে উঠে প্রধান-মন্ত্রিত্ব লাভ করেন। কিন্তু এই পদন্নোতিই আলোসিয়াসের পক্ষে কাল হল। তিনি উদ্ধত ও অহঙ্কারী হয়ে উঠলেন, অধস্তন সামন্তদের

শিলার

সঙ্গে অসম্মানকর ব্যবহার করতে লাগলেন। ফলে একজন ইতালীয় কাউণ্ট্ জোসেফ মার্তিনেৎসো তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে মিথ্যা অভিযোগে শেষে তাঁকে অন্ধ-কারাগারে পাঠিয়ে দিল। বহু দুঃখ পেয়ে মুক্তি পেলেন আলোসিয়াস—নির্বাসিত হলেন বিদেশে, আবার লাভ করলেন ভাগ্যের দয়া, দেশে ফিরে এসে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠাও পেলেন। কিন্তু সুখ-শান্তি-যৌবন আর ফিরে পেলেন না তিনি।

গল্পের গঠন-রীতিতে বোক্কাচ্চোর প্রভাব, পরিশেষে একটি অতি স্পষ্ট 'মর‍্যাল্'—'উদ্ধত হয়ো না, অহংকারী হয়ো না—তা হলে পতন অনিবার্য।' রন্যাসাঁসের ফলে একদিকে যেমন কবি-কল্পনার মুক্তি, অন্যদিকে সর্বাত্মক জাগরণের পালা। জোহান ভোল্ফগাং গোয়্টের ফাউস্ট যেন যুগসত্তার আত্মিক সংগ্রাম ও জয়ের কাহিনী—শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্তির বার্তা; শিলারের এই গল্পটিও রন্যাসাঁসের সেই সত্যকেই অন্তর্লোকে বহন করেছে।

'জার্মান জাতি'কে আত্মপরিচয় লাভ করতে হবে, সন্ধান করতে হবে কী ঐশ্বর্য সংরক্ষিত আছে তার নিজের ভাণ্ডারে। সেই ঐতিহ্য-জিজ্ঞাসা থেকেই দুই ভাই ইয়াকব লুড্‌ভিগ গ্রীম (Jacob Ludwig) এবং ভিল্‌হেল্‌ম কার্ল গ্রীম (Wilhelm Karl) তাঁদের 'রূপকথা'র সংকলন করলেন। পৃথিবীর শিশু-সাহিত্যে গ্রীমের রূপকথার নাম সর্বাগ্রে। শিশু-সাহিত্য হয়েও এই 'রূপকথা'র ভাষা ও বর্ণনা গোয়্টে বা শিলারের আড়ষ্ট মন্থর ভাষাকে গতি দিল, প্রাণ দিল।

আর্ণস্ট্-ডবলু-হফ্‌মান (Ernst W. Hoffmann)-ও রূপকথা লিখলেন, কিন্তু তার সঙ্গে কৌতুক ও ব্যঙ্গ মিশিয়ে বয়স্কদের জন্যেও উপভোগ্যতা এনে দিলেন। যেমন তাঁর 'ক্রাকাতুক' (Krakatuk)-এর গল্পে রাজকন্যা পার্লিপাটের যখন জন্ম হল, তখন আনন্দে রাজা ও তাঁর মন্ত্রী, সেনাপতি সবাই এক পায়ে নাচতে শুরু করলেন। পার্লিপাট দু পাটি মুক্তোর মতো দাঁত নিয়েই জন্মেছিলেন। পুলকিত চিত্তে লর্ড চ্যান্সেলর যখন তাঁকে আদর করতে গেলেন, তখন:

হফ্‌মান

"She bit the lord chancellor's thumb so hard that he cried out, "O Gemini !" Some say he cried out "O dear !" but on this subject peoples opinions are very much divided, even to the present day. In short, Perlipat bit the lord chancellor on the thumb, and all the kingdom immediatly declared that she was the wittiest, sharpest, cleverest girl—"

অনুবাদটি স্বয়ং থ্যাকারের, অতএব অনুমান করা যেতে পারে এতে মূল জার্মানের সৌন্দর্য অব্যাহত আছে। এ থেকে লক্ষণীয় ভাষাটি কেমন স্বচ্ছন্দ এবং কৌতুকস্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। আর এর অন্তরালে যে ব্যঙ্গটি নিহিত আছে, সেটি বয়স্কদের পক্ষে একান্ত উপভোগ্য। আবার হফ্‌মানের এইটিই একমাত্র পরিচয় নয়। Gothic Horror-এর ছায়া তখনও যে জার্মান

সাহিত্যিকদের আচ্ছন্ন করে ছিল, হফ্‌মানের কতকগুলি আতঙ্ক-জর্জর গল্পে তার নিদর্শন আছে। মনে হয়, পরে এডগার অ্যালান পো তাঁর দ্বারা একান্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর একটি গল্পে জনৈক নাবিক জাহাজের খোলের মধ্যে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ে এবং তার বেরুবার ঢাকনাটি আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে পাশের বয়লার রুমে আগুন জ্বলে ওঠে এবং তার অসহ্য উত্তাপে অসহায় বন্দী নাবিকের যে মৃত্যু-যন্ত্রণা আরম্ভ হয়—তার বীভৎসতার তুলনা নেই। হফ্‌মানের নাকি শেষ জীবনে মস্তিষ্ক-বিকার ঘটেছিল। অসম্ভব নয়—এ গল্পে যেন তারই ইঙ্গিত। এ ছাড়া তাঁর অসামান্য ভয়াল গল্প—"The Lost Reflection" শয়তানের কাছে মানুষের দুর্গতির এক দুঃস্বপ্নময় কাহিনী। গল্পের নায়ক ইতালীতে গিয়ে এক পরমাসুন্দরী মোহিনী নারীর ছলনায় পড়ে। তার প্রলোভনে এবং মেয়েটির সঙ্গী এক মূর্তিমান শয়তানের প্ররোচনায় সে নিজের ছায়াকে তাদের হাতে সমর্পণ করে। তখন ছায়াহীন এই ব্যক্তিত্বটি সংসারে কোথাও স্থান পায় না—স্ত্রী পর্যন্ত তাকে পরিত্যাগ করে, চির অভিশপ্ত হয়ে শুরু হয় তার দুঃসহ জীবন। ওই ছায়া তার আত্মার প্রতীক, ওই নারী চিরন্তন প্রতারণার বিগ্রহ। এই কাহিনী মেরিমের 'কারমেনে'র মতোই একটি বিশ্বখ্যাত অপেরায় রূপ পেয়েছে। হফ্‌মানের অন্যান্য খ্যাত গল্প "The Sandman" অথবা "The Deserted House" তাঁর এই বিকৃত মানসের পরিচয়। নতুন আলো আর অতীত তমসা—হফ্‌মানের রচনায় দুই-ই প্রকটিত।

জার্মান কথাসাহিত্যে বিশ্ববিখ্যাত কবি হেনরিখ্‌ হাইনেরও কিছু দান রয়েছে। তাঁর 'নির্বাসিত দেবতারা' (Gods in Exile) রাব্‌ল্যার বইতে এপিস্তেমোর নরক-বর্ণনা স্মরণ করায়। রচনাটি নিবন্ধ এবং গল্পের মাঝামাঝি। এই অপূর্ব লেখাটির সঙ্গে

হাইনে

শিক্ষিত পাঠকমাত্রেরই পরিচয় থাকা উচিত। ক্রীশ্চান ধর্মের অভ্যুদয়ে প্রাচীন গ্রীক দেবতারা পৃথিবীর যত্রতত্র পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, ছদ্মবেশে আত্মরক্ষা করতে তাঁরা সচেষ্ট। আপোলো, মার্স, বেকার্স—সকলেরই চরম দুর্গতি—**"Many of these poor refugees, deprived of shelter and ambrosia, were now forced to work at some plebian trade in order to earn a livelihood. Under this circumstances several, whose shrines had been confiscated, became wood-choppers and day-labourers in Germany, and were compelled to drink beer** (বিখ্যাত জার্মান বিয়ার !) **instead of nectar !"**

সবচেয়ে দুর্গত হচ্ছেন আকাশের অধীশ্বর বজ্রধর জুপিটার স্বয়ং। এখন তিনি আর অলিম্পীয় সমুচ্চতায় বাস করেন না ; বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ দেবরাজ একটি দুর্গম নির্জন দ্বীপে ভাঙা কুটীরে আশ্রয় নিয়েছেন। দ্বীপটি খরগোসে ভরা—তাদের চামড়া দিয়ে তিনি লজ্জা-নিবারণ করেন এবং বছরে

এক সময় কিছু অসভ্য সেই দ্বীপে এলে জুপিটার তাদের কাছেও খরগোসের চামড়া বেচে নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করে থাকেন। জন্মের পর ক্রীট্ দ্বীপে যে তাঁকে দুধ দিয়ে মানুষ করেছিল সেই আলথিয়া এখন একটি বন্ধ্যা ছাগী হয়ে তাঁর কাছেই বসে থাকে ; আর তাঁর পাশে রোঁয়া-ওঠা যে হাড়গিলের মতো জীর্ণ পাখিটা রয়েছে—সে-ই হল তাঁর বিখ্যাত ঈগল, যে তার নখরাগ্রে জুপিটারের মৃত্যু-বজ্র বহন করত। বিশ্বত্রাস জুপিটারের এখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না ছাড়া গত্যন্তর নেই।

লেখাটির সকৌতুক জার্নালিস্ট্ ভঙ্গির মধ্যে প্রচ্ছন্ন দীর্ঘশ্বাস আছে—যে-বেদনায় কীট্স্ অতীত গ্রীসের পথে পথে স্বপ্ন-প্রয়াণ করেছিলেন, সেই গৌরবময় সৌন্দর্য-প্রোজ্জ্বল অতীতের দিকে অভিসার আছে: "The Golden Age—the Golden Age—come back!" আর আছে রাজতন্ত্রের প্রতি হাইনের সুনিবিড় মমতা: "Mein Kaiser, Mein Kaiesr, gefangen—" 'আমার সম্রাট, আমার সম্রাট—কারারুদ্ধ!'

গল্প-সাহিত্যের ভিত্তি রচনা ধীরে ধীরে এইভাবেই হয়ে আসছিল ভাষার সারল্যে, কৌতুকের ছটায়, কবিমননের সৌন্দর্য-স্পর্শে। থিয়োডোর ডাবলু স্টর্ম (Theodor W. Storm) কাব্যসুরভিত চমৎকার রোমান্টিক্ গল্প লিখলেন। তাঁর 'ইমেন্সি' (Immensee) আজকের দিনেও অনুবাদযোগ্য —এমন একটি স্নিগ্ধ পরিচ্ছন্ন ও গভীর গল্পকে আজও আদর্শ বলে ধরা যেতে পারে। স্টর্ম-এর গল্পে প্রতীকের ব্যবহার ছোটগল্প সৃষ্টির একটি মূল্যবান উপকরণ। ব্যর্থ প্রেমিকের করুণ নৈরাশ্য চাঁদের আলোয় ফুটন্ত লিলিটির মতো ক্রমেই দূরে সরে গেছে—তার জীবনের বিফল আকাঙ্ক্ষাটির মতোই স্বপ্ন-কমল বাস্তবে ধরা দেয়নি।

"Green Henry" নামে বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসের রচয়িতা—স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক গট্ফ্রিড্ কেলারও (Gottfreid Keller)-ও কিছু চমৎকার গল্প উপহার দিয়েছেন। তাঁর 'সেন্ট্ ভাইটালিসের গল্প' আনাতোল ফ্রাঁ-র "ত্যা" (Thais)-কে স্মরণ করায়। গল্পের নায়ক সেন্ট ভাইটালিস্—খোসমেজাজী, রসিক এক সন্ন্যাসী, একটি পতিতা নারীকে উদ্ধার করার ব্রত নিয়েছিলেন। প্রচুর অপমান এবং প্রহার লাভ করেও তিনি কিছুতেই দমলেন না। শেষ পর্যন্ত মেয়েটিই যে কেবল উদ্ধার হল তা নয়, সন্ন্যাস ছেড়ে দিয়ে—গৃহস্থ সেজে ভাইটালিস্ তাকে বিয়েই করে ফেললেন। যদিও 'ভাইটালিস্'-কাহিনীর প্রসন্ন মধুর পরিণামের সঙ্গে 'ত্যা'-র বীভৎস সমাপ্তির ("A vampire—a vampire!") আকাশ-পাতাল তফাৎ—তবু কেলারের কাছে আনাতোল ফ্রাঁসের ঋণী থাকা অসম্ভব নয়। আর এই গল্পই মমের শ্রেষ্ঠ গল্প 'The Rain'-এর উৎস।

উনিশ শতকের শেষের দিকে জার্মান ছোটগল্প প্রায় পূর্ণতা লাভ করেছে। হারমান সুডারমান (Hermann Sudermann), আর্থার স্নিৎস্লার (Arthur Schnitzler), কবি এবং স্বনামধন্য নাট্যকার গেরহার্ট হাউপ্ট্মান

(Gerhart Hauptman), ইয়াকব ভাসারমান (Wassermann)—এঁরা সবাই-ই এসে গেছেন। তারপর টমাস মান, স্টেফান এবং আর্নল্ড ৎস্ইগ্ (Zweig), ও পল হেসির গল্প। একেবারে সাম্প্রতিক কাল।

স্ডারমানেই জার্মান ছোটগল্প সুস্পষ্ট শিল্পরীতিতে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। স্বভাবত দীর্ঘায়ু জার্মান স্ডারমান ঊনবিংশ-বিংশ দুই শতকেই সমভাবে পদক্ষেপ করেছেন। তাঁর রচনায় মোপাসাঁর গল্প-রীতির প্রভাব, অথচ চেকভের পরিচ্ছন্নতায় তা মার্জিত। স্ডারমানের "প্রাক্ নববর্ষ দিনের স্বীকারোক্তি" (The New Year's Eve Confessions) শিল্পসফল ছোট গল্পের উদাহরণ ঃ

এই বিশেষ দিনে দুই বৃদ্ধ বন্ধু অন্যান্য বছরের মতোই মিলিত হয়েছে। একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার, অপরজন দর্শন-শাস্ত্রের বিদায়ভোগী অধ্যাপক।

স্ডারমান

প্রতি বৎসরের সঙ্গে এবারের পরিবেশের পার্থক্য আছে। এবার আর মাঝখানে গৃহকর্ত্রী নেই। ক্যাপটেনের স্ত্রী—যে বরাবর এই দুজনকে আজকের এই দিনে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা জানাত—সে পৃথিবীর ও-পারে চলে গেছে।

তার মৃত্যু যেন এ বছরের উৎসব দিবসটির উপরেও মরণের শান্ত-বিষণ্ণ ছায়া ফেলেছে। অধ্যাপক বললে, 'আগামী বছর এই দিনে আমরাও হয়তো আর বেঁচে থাকব না। মৃত্যু আমাদেরও আসন্ন হয়ে এসেছে। তাই চল্লিশ বছর ধরে তোমার কাছে যে-কথা গোপন রেখেছিলাম, আজ তা আমি বলে যাব।'

অধ্যাপক বলতে আরম্ভ করল।

কী সেই গোপন কথাটি? ক্যাপ্টেন যৌবনে ছিল চরিত্রহীন—স্ত্রীকে ঘরে ফেলে রেখে বাইরে যাপন করত উদ্দাম জীবন। এমনি এক বর্ষশেষ রাত্রে যখন অধ্যাপক আর ক্যাপ্টেনের স্ত্রী তার জন্য প্রতীক্ষা করছে তখন ক্যাপ্টেনের মত্ততা চলছে এক নর্তকীর প্রমোদ আবাসে। বাড়ীর কথা তার মনেও নেই। অনেক রাতে টলতে টলতে যখন সে ফিরল, তখন উৎসব-সন্ধ্যাটিই বিষাক্ত হয়ে গেছে।

সেদিন—অপরিমেয় ব্যথার উচ্ছ্বাসে যে দুর্বলতা প্রকাশ করেছিল ক্যাপ্টেনের স্ত্রী—তা থেকে তার সম্বন্ধে প্রলোভন জাগল অধ্যাপকের মনে। বন্ধুত্বের মর্যাদা ভুলে গিয়ে প্রণয় প্রার্থনা করল বন্ধুপত্নীর কাছে।

পাশের ঘরে তখন মদের নেশায় লুটিয়ে আছে ক্যাপ্টেন। বন্ধুপত্নী সস্নেহে অধ্যাপকের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে, 'তুমি ভালো হও।'

এই একটি শান্ত স্নেহের অভিব্যক্তিতেই শাসনের সমুদ্যত বজ্র। অধ্যাপক বুঝল, আর এগোনো চলবে না। উদ্দাম প্রবৃত্তিবেগকে প্রাণপণ চেষ্টায় নিয়ন্ত্রিত করল অধ্যাপক, ডুবে গেল দর্শনের মধ্যে, তার বাসনাকে নিয়ন্ত্রিত করল আধ্যাত্মিক সহমর্মিতায়। ক্যাপ্টেনের চোখের সামনেই দিনের পর দিন তারা দুজন উৎসাহে দার্শনিক আলোচনা করেছে—

বিশ্লেষণ করেছে গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা ; কিন্তু অধ্যাপকের মনের অন্তরালে অন্তঃশীলা ধারায় যা বয়ে গেছে সে হল তার ব্যর্থ, বঞ্চিত প্রেম।

সেই অপরাধের ক্ষমাপ্রার্থনাতেই আজ বন্ধুর কাছে স্বীকারোক্তি করছে অধ্যাপক।

ক্যাপ্টেন বললে, 'আরে ধেৎ, ক্ষমা-টমা আবার কী! এ ঘটনা তো চাল্লশ বছর আগে আমার স্ত্রীই আমাকে বলেছিল। আরো কী বলেছিল, জানো? পৃথিবীতে একমাত্র তোমাকেই সে ভালোবাসে। আর সেই জন্যই তো সারাজীবন আমি অন্য মেয়ের প্রেমের সন্ধানে ছুটে বেরিয়েছি।'

গল্পটির শেষে মোপাসাঁর মতো অ্যাণ্টি-ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টির চেষ্টা আছে, আবার চেকভের মতো শান্ত-সংযমেও এটি নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ এই দুই গুরুর প্রভাবে জার্মান ছোটগল্প একটা বিশ্বমান—স্ট্যান্ডার্ড—লাভ করেছে।

ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও অনুরূপভাবে ছোটগল্প বিকশিত হতে শুরু করেছে উনিশ শতকে। কিন্তু দূরে-দূরান্তে আর পর্যটন করে লাভ নেই। ছোটগল্পের অন্যতম প্রধান মৃত্তিকা আমেরিকা প্রদক্ষিণ করে আমরা পাশ্চাত্ত্য দেশে উনিশ শতকীয় এই সাহিত্যের উন্মীলন-পর্ব সাঙ্গ করব। সাহিত্যের বিচারে ফ্রান্স, রুশিয়া এবং আমেরিকা—বস্তুত এই তিনটি দেশেই ছোটগল্পের সফল আত্মবিকাশ এবং আত্মবিস্তার হয়েছে—বাকী দেশগুলি তাতে সহযোগিতা করেছে মাত্র। ইতালী নভেলা আর গিয়োভানি বোক্কাচ্চোর লীলাভূমি হয়েও ঐতিহ্যের ধারা রাখতে পারেনি—যদিচ বিংশ শতকে পিরান-দেল্লো, সিলোনে, কার্লো আভরো কিংবা মোরাভিয়া বেশ কিছু ভালো গল্প লিখেছেন।

১৮৮২ সালে পারী চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে ইউনাইটেড স্টেট্স্ অব্ আমেরিকার সগৌরব প্রতিষ্ঠা। তারপর ওয়াশিংটন-জেফারসনের নেতৃত্বে ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্বাচ্ছন্দ্যে ও সৌভাগ্যে তার নির্বিঘ্ন অগ্রগতি চলতে লাগল। তখন পর্যন্ত, ইংল্যান্ডের সঙ্গে তার রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গেলেও, এবং কিছুসংখ্যক 'লয়্যালিস্ট্' ছাড়া অধিকাংশ লোকই ব্রিটেন সম্পর্কে অত্যন্ত বিদ্বিষ্ট মনোভাব পোষণ করলেও সাহিত্য-সংস্কৃতির জন্যে আমেরিকানরা "Mother Land"-এর দিকেই তাকিয়ে থাকত। কপিরাইট্ আইনের তোয়াক্কা না রেখেই রাশি রাশি ইংল্যান্ডের বই আমেরিকার প্রকাশকেরা নিশ্চিন্তে মুদ্রিত করত। ব্যবসায়ী মার্কিনীরা বিদেশী পণ্যের মতোই বইয়ের ব্যবসা করত—স্থানীয় সাহিত্য বা সংস্কৃতির জন্যে তাদের বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা ছিল না। মার্কিনী লেখকেরা বই লিখলে প্রকাশক জুটত না, পত্র-পত্রিকায় স্থানীয় লেখকদের রচনা মুদ্রিত হলে পারিশ্রমিক দেওয়াটা নিতান্ত বাহুল্য বলেই পরিগণিত হত। আমেরিকান সাহিত্যের কোনো স্বতন্ত্র সত্তাই ছিল না। কারণ 'আমরা মার্কিনী হলেও সমুদ্রের এপারে-ওপারে আমাদের সংস্কৃতি এক—"Mother Land"-এর শেক্স্পীয়ার-

মিল্‌টন আমাদেরই প্রতিনিধি ; সুতরাং নতুন লেখকের বই না ছেপে বিনা দায়িত্বেই থ্যাকারের উপন্যাস বরং পুনর্মুদ্রিত করব।'

ক্রমশই দেশে অসন্তোষের গুঞ্জন শুরু হল। সম্ভবত উপেক্ষিত 'গেঁয়ো যোগীরা'ই বলতে লাগলেন মাদারল্যান্ড্ যেমন আছে—তেমনি থাক ; কিন্তু এখন আমরা আলাদা জাতি, আমাদের ইতিহাস এখন পৃথক। অতএব আমেরিকার জাতীয় চেতনার অভিব্যক্তি চাই সাহিত্যে—সম্পূর্ণভাবে স্বদেশীয় সাহিত্য চাই। (হুইটম্যানের জাতীয়তাবাদের আবেগমত্ততা এই মনোভঙ্গিরই রূপায়ণ।)

আমাদের সাহিত্যে উৎস কোথায় খুঁজে পাব আমরা ? আমাদের বর্তমান জীবনের ভিতরে ? সেখানেও চরিত্র-বৈচিত্র্য নেই—মানুষ মাত্রেরই যেটুকু ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকে—তাই-ই আছে, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নেই। কোনো বড় ঘটনা—কোনো মারাত্মক দুর্নীতিও অনুষ্ঠিত হয় না ; এক কথায় নিস্তরঙ্গ শান্ত প্রবাহ, অন্তরঙ্গে বহিরঙ্গে এখন কোনো ঘাত-প্রতিঘাতই বিদ্যমান নেই—যা নিয়ে আমাদের সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে। তাই জেম্‌স ফেনিমোর কুপার সক্ষোভে লিখেছেন :

"There is scarcely an ore which contributes to the wealth of the author that is found here in veins as rich as Europe. There are no annals for the historian ; no follies (beyond the most vulgar and commonplace) for the satirist ; no manners for the dramatist ; no obscure fictions for the writer of Romance ; no gross and hardly offence against decorum for the moralist ; (অবশ্য কুপার আজ বেঁচে থাকলে পাপ এবং বীভৎস বিকৃতির পীঠস্থান তাঁর স্বদেশ সম্পর্কে কী বলতেন অনুমান করা যায় না) nor any of the rich artificial auxiliaries of poetry"—[১]

তবু আশা ছাড়লে চলবে না। আমেরিকার নিজস্ব 'হিউমার' আছে—তার সুযোগ নিতে হবে ; তার সাধারণ জীবনের মধ্যে থেকেই অসাধারণকে আবিষ্কার করতে হবে। তাই উপকরণের সন্ধানে Red Indian-দের জীবনে প্রবেশ করেছেন স্বয়ং কুপার—লিখেছেন তাঁর Trilogy—বিশেষ করে বিখ্যাত 'The Last of the Mohicans.'

সেই অসাধারণকে আবিষ্কার করার আগেই, কন্টিনেন্টাল ভাবধারা থেকে আবির্ভাব হয়েছিল ওয়াশিংটন আর্ভিঙের। ওয়াশিংটন আর্ভিং "may be regarded as the first author produced in the new Republic."[২]

জর্জ ওয়াশিংটনের আশীর্বাদের স্পর্শ পড়েছিল শিশু আর্ভিঙের মাথায়। মার্কিন জাতীয় সাহিত্যকে তিনি পথ দেখালেন। মূলত ঐতিহাসিক এবং

১। Literature in America, Ed. by Philip Rahv, P. 32

২। The Cambridge Hist. of American Lit, Vol I, chap V

জীবনচরিতকার তাঁর কৌতুকস্নিগ্ধ বিদগ্ধ মনের ছোঁয়ায় লিখলেন "The Sketch Book", শোনালেন 'Rip-van Winkle'-এর অপূর্ব কাহিনী।

'স্কেচ্ বুকের' নক্সায় অ্যাডিসন-স্টীলের 'স্পেকটেটর' এবং 'ট্যাটলারের' প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। 'র‍্যাম্ব্লার'-(The Rambler) খ্যাত জনসনের 'অরিয়েণ্টাল' কল্পনাও তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, তার ফল—ক্যাট্স্কিল পাহাড়ের মাথায় রিপ-ভ্যান উইংকলের যুগনিদ্রা।

ইতিহাস বা জীবনী রচনায় আর্ভিঙের কৃতিত্ব যাই থাক, মার্কিনী ছোটগল্পেরও তিনি অগ্রদূত। তাঁর পরেই স্মরণীয় নাম—ন্যাথানিয়েল হথর্ন (Nathaniel Hawthorne)। অথবা স্মরণীয় নয়—অবিস্মরণীয় নাম।

হথর্নের ব্যক্তিস্বরূপ নিয়ে অসংখ্য আলোচনা হয়েছে। তিনি কি রোমাণ্টিক পিউরিটান? ফরাসী সমালোচকের ভাষায় তিনি কি দুঃখবাদী —"Un Romancier Pessimiste?" না তাঁর জীবনদর্শন "Transcendentalism"—এমার্সনীয় "ঊর্ধ্ববিহার"? তর্ক চলতে থাকুক। পাঠকের এ কথাই মনে হয়, নিঃসঙ্গতাবিলাসী হথর্ন্ স্বাভাবিক কারণেই মনের দিক থেকে আধ্যাত্মিক দার্শনিকতার ভিতর মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। নিছক লেখক হিসাবেই জীবিকা নির্বাহ করবার প্রথম দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার দাম হথর্নকে দিতে হয়েছে দারিদ্র্যে, মাসিকপত্রে গল্প লিখেছেন বিনা পারিশ্রমিকে, পরপর সাতজন প্রকাশক তাঁর বাইয়ের পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়ায় রচনার ছিন্ন টুকরোগুলো ফায়ারপ্লেসের অগ্নিতে নিবেদন করেছেন যন্ত্রণা-জর্জর চিত্তে। তাই তাঁর মুক্তি আলো-অন্ধকারের জগতে, বাস্তব-অবাস্তবের ছায়াপথে। সেইজন্যেই গল্পের উপকরণ তিনি যতটা সংগ্রহ করেছেন বাইরে থেকে, তার বেশী আহরণ করেছেন অন্তরলোকে। গল্পলেখক হথর্নের সার্থকতা এই, ব্যর্থতাও এইখানে। "Twice Told Tales" তাঁর প্রতিনিধিত্বমূলক গল্পের সংকলন।

হথর্ন

জীবন এবং জগৎকে দর্শনের আলোকে অনুরঞ্জিত করে, লাভ ক্ষতি বাসনা বেদনার ঊর্ধ্বলোকে অবস্থান করে এবং বক্তব্যে পিউরিটান হয়েও হথর্নের কিছু কিছু গল্প প্রাত্যহিক জীবনরসে উজ্জ্বল। হথর্ন যেন নিজেকে নিয়েই গল্প লিখেছেন, লোকচরিত্রের গভীরে তেমন করে যাননি, গল্পগুলি মনোমন্থনে ভারগ্রস্ত,—তা হলেও তাঁর মধ্যে চেকভসুলভ একটি শিল্প-সৌন্দর্য আছে। তাঁর 'দুই বৃদ্ধ প্রেমিক' (Two old Lovers) গল্পটিকে সংক্ষেপে স্মরণ করা যাক। মোপাসাঁর 'Regret' গল্পের এ যেন কাব্যরূপ:

"সারা জীবন একটি পুরুষ ও নারী পরস্পরকে ভালোবাসল। কিন্তু পুরুষ নিজের কথা বলতে পারল না—নারী আত্মনিবেদন করতে পারল না তার কাছে। প্রিয়ার সঙ্গে দৈনন্দিন কথাবার্তা—সামাজিক সম্পর্ক সবই আছে, তবু ভীরু মানুষটি নিজের সংকোচে কোনোদিনই বলতে পারল না: আমি তোমাকেই চাই।

বছরের পর বছর কাটল। যৌবন গড়িয়ে এল বার্ধক্য। নারী জানলা

দিয়ে দেখে পথ বেয়ে চলেছে এক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ, নুয়ে পড়েছে বয়সের ভারে; তার 'সানডে কোর্টটি' ছিঁড়ে গেছে এক জায়গায়—কিন্তু তাঁর ঘরে এমন গৃহকল্যাণী কেউ নেই যে কোটটি একটু সেলাই করে দেবে। অযত্ন আর অনাদরের প্রতিমূর্তি একটি। যন্ত্রণায় নারীর চোখে জল আসে।

তারপর বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায়। বৃদ্ধা শেষ দেখতে গেছে তাকে। সেই মুহূর্তে আচ্ছন্ন ঝাপসা দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখল মুমূর্ষু, যেমন করে পাকা ফসলে বাতাস ধ্বনি তোলে—তেমনি—ক্ষীণ খসখসে গলায় বললে, 'মেরিয়া, আমি মরতে চলেছি—কিন্তু—সারাজীবন তোমাকে আমি বলতে চেয়েছিলাম —তুমি আমাকে বিবাহ করো'।"

বহুকাল আগে মুখ ফুটে কথাটি বলতে পারলে তৎক্ষণাৎ তার প্রার্থনা পূর্ণ হত। কিন্তু একটুমাত্র সংকোচের জন্যে দুটি জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। এ যেন নির্জন-নিঃশব্দ হথর্নেরও মানস-চিত্র, সারাজীবন তিনি এইভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েও পারলেন না—দার্শনিক নৈঃসঙ্গ্যের ছায়ায় মায়ায় নির্বাসিত হয়ে রইলেন। হেনরি ডেভিড থোরোর মতো তিনি প্রকৃতিমুগ্ধ সন্ন্যাসী নন—তাই 'ওয়ালডেনে'র একাকিত্বের অধ্যাত্ম-আনন্দ আস্বাদন করা হথর্নের পক্ষে সম্ভব হল না।

পিউরিটান মনোভাব আর চিন্তালোকের আলোছায়ার খেলা হথর্নের অনেক ক'টি গল্পেই সুন্দরভাবে পাওয়া যায়। একটা প্রশান্ত বিষাদ যেন গল্পগুলির উপর ঘনগম্ভীর মেঘমায়া বিকীর্ণ করে রেখেছে। এরই একটি **'David Swan'**। স্টেজ কোচের জন্যে পথের বনের মধ্যে অপেক্ষমান এবং ঘুমন্ত কিশোর ডেভিডের জীবনে কোটি কোটি অর্থ ছায়া ফেলে বিদায় নিল, প্রেম বৃথা তাকে জাগাতে চেষ্টা করল, মৃত্যু এসে হাত বাড়িয়েই সরিয়ে নিলে। আসলে জীবনে সব সমান—শেষ পর্যন্ত একটিমাত্র শূন্য পরিণামই সব কিছুর যোগফল!

এই অদ্ভুত নির্বেদের চেতনাতেই **'Un Romancier Pessimiste'** অবস্থান করেছেন। তাঁর **'The Grey Champion'** গল্পে পাই, আমেরিকার ব্রিটিশ-শাসন-শৃঙ্খলিত শোষিত জনতার মধ্যে আবির্ভূত হবেন এক রহস্যময় কালপুরুষ—এক দৈবসত্তা—যাঁর বজ্রকণ্ঠের শাসনে অত্যাচারের সমস্ত শক্তি স্তব্ধ হয়ে যাবে। এই মহাশক্তির উপর নির্ভরশীল বলেই হয়তো হথর্ন পিউরিটান, মানবিক ইচ্ছা, চেষ্টা, প্রত্যাশার ব্যর্থতা সম্বন্ধে এত সজাগ। তাই পাহাড়ের কোলে ছোট কুটীরটিতে যে রাত্রে পথিক আশ্রয় নিতে আসে, উত্তাপ আর প্রীতির মধ্যে যে রাত্রিতে প্রেমের স্বপ্ন গুঞ্জরিত হয়—যে রাত্রে পৃথিবীর সমস্ত সুখ এসে সম্মুখে অঞ্জলি বাড়ায়, সেই রাত্রেই বিধাতার নিদারুণ ব্যঙ্গের মতো নামে **'Landslide'**—এক মুহূর্তে মৃত্যুর আঘাতে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

হথর্নের দুটি প্রতিনিধিত্বমূলক গল্প: **'Dr. Heideggar's Experiment'** এবং **'The Birthmark'**ই এর প্রমাণ। ডাক্তার হাইডেগার

চির-যৌবন উৎসের জল সংগ্রহ করে তাঁর তিনটি বয়োজীর্ণ বন্ধু এবং জনৈকা বান্ধবীকে পান করিয়েছিলেন। তারা যৌবন লাভ করে উদ্দাম আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠল, কিন্তু জানত না—সৃষ্টির অনিবার্য নিষ্ঠুর স্রোতকে কখনো বিপরীতমুখে ফেরানো যায় না। তাই তাদের যৌবন ক্ষণিকের জন্য বিকশিত হয়ে উঠে—বিভ্রান্তি জাগিয়ে আবার পঞ্চান্ন বছর আগেকার গোলাপের মতোই শুকিয়ে ঝরে গেল। এই গল্পে মানুষের যৌবন-স্বপ্নকে চমৎকার একটি প্রজাপতির প্রতীকের সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

'The Birthmark' গল্পটি ভয়ঙ্কর—অন্ধকার শক্তি এতে আরো নিদারুণভাবে উপস্থিত। ডাক্তার এলমার (Aylmer)-এর পরমাসুন্দরী স্ত্রী জর্জিয়ানার গালে বিচিত্র একটি জন্মতিল ছিল। হঠাৎ দেখলে মনে হত কার যেন ছোট একটি হাতের পাঞ্জা সেখানে আঁকা রয়েছে। সেটি দেখতে ভালোই লাগত—অনেকেই বলত, ওটি বিউটি স্পট। কিন্তু অদ্ভুত মনোবিকারে এলমার ভাবলেন—জর্জিয়ানার সুন্দর স্বর্গীয় মুখে ও যেন মরণশীল পৃথিবীর স্বাক্ষর। ভাবতে ভাবতে ডাক্তারের মানসিক বিপর্যয় ঘটল, অশান্তি ঘনিয়ে এল দুজনের সুখী দাম্পত্য জীবনে। শেষ পর্যন্ত জর্জিয়ানা জন্মচিহ্নটি অপসারণ করবার এক বিপজ্জনক পরীক্ষায় স্বীকৃতি দিলেন। এলমার তাঁর বিজ্ঞানী-বিদ্যার চরমোৎকর্ষ দেখিয়ে জন্মচিহ্নটির বিলুপ্তি ঘটালেন, কিন্তু সেই সঙ্গে জর্জিয়ানার জীবনদীপও নিবে গেল।

দুটি গল্পেই যে পরিবেশ উপস্থিত করেছেন লেখক, তা যেমন অদ্ভুত তেমনি অস্বস্তিকর। দুঃখাত্মক রোমান্টিসিজমের শ্বাসরোধী মায়ায় এরা পাঠককে আবেষ্টন করে। 'Rappaccini's Daughter' শীর্ষক আন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভয়ঙ্কর গল্পটি বিষাক্ত নারীরূপের এক নিদারুণ বার্তাবহ। যে কথা আগেই বলেছি, বিষণ্ন পরাভূত এক নির্বেদের মধ্যে অশরীরীর সঞ্চরণে শিহরিত যেন কোনো পরিত্যক্ত প্রাচীন প্রাসাদে হথর্নের নিঃসঙ্গ রাত্রিযাপনা। গল্পগুলি পাঠকের চেতনায় সেই না-সত্য না-বাস্তবের এক দুর্বোধ প্রভাব বিস্তার করে দেয়—মনে হয় প্রতি মুহূর্তে তার প্রতি পদক্ষেপে এক অদৃশ্য নিষ্ঠুর শক্তি তাকে অনুসরণ করছে।

জর্জিয়ানার মৃত্যুলগ্নে ঃ

"As the last crimson tint of the birthmark—that sole token of human imperfection faded from her cheek, the parting breath of the new perfect woman passed into the atmosphere, and her soul lingering for a moment near her husband, took its heavenward flight. Then a hoarse, chuckling laugh was heard again !"

গল্পে ডাক্তারের সহকারী অ্যাড্‌মিনাডাবের এই হাসির শব্দ মানুষের পূর্ণতার স্বপ্নকে—তার জ্ঞানের দম্ভকে যেন বিদ্রূপের আঘাতে জর্জরিত করে তোলে। মনে পড়ে যায়, কামুর 'The Fall' উপন্যাসে অন্ধকার স্যান

নদীর তীরে সেই রহস্যময় হাসির কল-ঝঙ্কার।

গল্প বলবার ক্ষমতায় হথর্ন সিদ্ধকাম লেখক। পারিপার্শ্বিক রচনায়, বর্ণনার কবিত্বে তিনি বিশ্বসাহিত্যের স্মরণীয়দের একজন। কিন্তু তাঁরই আত্মার অন্ধকারে অবগাহন করে, তাঁর মহিমাকে অতিক্রান্ত হয়ে অতঃপর যিনি মার্কিন গল্পসাহিত্যে আবির্ভূত হলেন, তিনি এডগার অ্যালান পো।

আপাতদৃষ্টিতে পো-কে সম্পূর্ণ বিপরীত গোত্রের শিল্পী বলে মনে হয়, কিন্তু বহু জায়গায় হথর্নের সঙ্গে তাঁর সুগভীর মিল আছে। সে হল ওই মানসিক নিঃসঙ্গতা। তারই জন্য হথর্ন বিষণ্ণ দার্শনিকতার ছায়াপথের যাত্রী—পো বিভীষিকার নরকে উদ্‌ভ্রান্ত আত্মিক।

দরিদ্র অভিনেতা-অভিনেত্রীর সন্তান পো—পরভৃতের মতো পালক পিতার গৃহে লালিত। এই পরান্নজীবিতার সঙ্গে মায়ের নামের মিথ্যা কলঙ্ক আশৈশব তাঁর স্নায়ুকে পীড়ন করেছে।

এডগার অ্যালান পো

পালক পিতা অ্যালান কোনদিন তাঁকে খুব প্রীতির দৃষ্টিতে দেখেননি, তার উপর অসংযত সুরাসক্তি পো-র জীবনে চিরকালের অভিশাপ টেনে এনেছে। দুর্ভাগ্য, দারিদ্র্য হতাশা, কোহল, চিররুগ্না স্ত্রী—সব কিছু মিলে যেন প্রেতগ্রস্তের মতোই দিন কাটিয়েছেন পো. মাত্র চল্লিশ বছরে মদমত্ত অবস্থায় তাঁর পরম শোকাবহ অপমৃত্যু ঘটেছে।

কবি, সমালোচক, গাল্পিক, খরবুদ্ধি সাংবাদিক—সবদিকেই অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন পো। কবি বোদ্‌ল্যার ও গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয় সেদিন তাঁর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন; কাব্যে সাংকেতিকতার আন্দোলনেও তিনি অন্যতম পুরোধা। মার্কিন সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি কতটা শ্রদ্ধেয় তা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও তিনি যে প্রধানভাবে স্বীকার্য, এ নিয়ে মতদ্বৈধ কোথাও নেই।

পো-র বিভীষিকাগ্রস্ত মনোজগতের ছবি ভয়াবহ হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর বিখ্যাত (অথবা কুখ্যাত) 'The Raven' কবিতায়। এই দাঁড়কাক যেন তাঁর উপরে প্রেতলোকের প্রহরীর মতো নিষ্ঠুর পাহারা দিয়ে চলেছে ঃ

> **"And the Raven, never flitting, still is**
> **Sitting—still is sitting**
> **On the pallid bust of Pallas just above**
> **my chamber door ;**
> **And his eyes have all the seeming of a**
> **Demon that is dreaming,**
> **And the lamp-light o'er him streaming**
> **Throws his shadow on the floor ;**
> **And my soul from out that shadow**
> **That lies floating on the floor**
> **Shall be lifted nevermore !"**

এই ভয়াল দাঁড়কাক—মৃত্যু আর যন্ত্রণার প্রতীক এই ছায়া, সত্যিই পো-র জীবন থেকে কোনোদিন অপসারিত হয়নি। সেই জন্যই তিনি লিখেছেন 'দ্য পিট অ্যান্ড দ্য পেন্ডুলাম', 'জীবন্ত হৃদয়' (The Tell-Tale Heart), 'কালো বেড়াল' (The Black Cat), 'রক্ত-মৃত্যুর মুখোস' (The Masque of the Red Death), 'ঘূর্ণিগর্ভে অবতরণ' (A Descent into the Malestrom) কিংবা 'আশার বংশের পতন' (The Fall of the House of Ushers)।

নিজের মনোযন্ত্রণার সঙ্গে সম্ভবত পো 'গথিক' সাহিত্যের আতঙ্ক-কাহিনীগুলির সমমর্মিতা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই চতুর্দিকে এক দুঃস্বপ্নের বেড়াজাল রচনা করে যেন গল্প লিখতে বসেছেন তিনি। এইদিক থেকে আর্ণস্ট টি.এ. হফ্‌ম্যানের যোগ্য শিষ্য পো। তাঁর 'কালো বেড়াল' পড়ে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ আজো সন্ধ্যার অন্ধকারে কালো বেড়াল দেখে আঁত্‌কে ওঠে ; 'জীবন্ত হৃদয়ের' প্রতিটি স্পন্দন যেন নরক থেকে শয়তানের পদধ্বনির মতো উঠে আসে, 'মেল্‌স্ট্রমের' গল্পে সামুদ্রিক ঘূর্ণিপাকের ফেনিল প্রলয়-বিবরে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে করতে যখন যুবক ধীবরের মাথার চুলগুলো সমস্ত সাদা হয়ে যায়, তখন সেই সঙ্গে আমাদেরও নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। 'দ্য পিট্‌ অ্যান্ড্‌ দ্য পেন্ডুলামে'র বাঁকা খড়্গটি আমাদের স্নায়ুকে ছিন্নভিন্ন করে তিলে তিলে নেমে আসতে থাকে, 'আশার বংশের পতন' কাহিনীতে রোমাঞ্চকর মধ্যরাত্রে যখন কবরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে-আসা মেয়েটি দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ায়, তখন গল্পের বক্তার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকেরও চৈতন্যলুপ্তির উপক্রম ঘটে।

সহজ স্বাভাবিক জীবনের সন্ধান পাননি—তাই নেশাজর্জর বিকৃত দৃষ্টিতে এই প্রেত-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন পো। তবে গাল্পিক হিসেবে এই পরিচয়ই তাঁর একমাত্র নয় ; বিশ্বসাহিত্যে তিনিই হলেন প্রথম গোয়েন্দা কাহিনীর লেখক—অপরাধতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগে তাঁর ফরাসী বন্ধু দ্যুপ্যাঁ (Dupin) প্রথম বেসরকারী গোয়েন্দা। 'রু মর্গের হত্যা' (The Murders of Rue Morgue), 'মারি রজেট্‌ রহস্য' (The Mystery of Marie Roget) এবং বহুখ্যাত 'চোরাই চিঠি' (Purloined Letter) পো-র বিশ্লেষণী বৈজ্ঞানিক মানসের পরিচয় এবং বর্তমানের সবচেয়ে জনপ্রিয় 'সাহিত্যে'র আদিম উৎস। 'Pirate Gold'-এর রহস্য সন্ধানে তাঁর 'The Gold Bug' অন্যতম প্রথম পদক্ষেপ।

অভাবের তাড়নায় এবং সাংবাদিকতার প্রয়োজনে পো 'Magazinist' গল্পলেখক হিসেবে নিন্দিত হয়েছেন। সমারসেট মম বহুকাল পরে এই নিন্দার জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন—'কে ম্যাগাজিনিস্ট্‌ নয় ? পত্র-পত্রিকা না থাকলে পৃথিবীতে ক'টি ছোটগল্পই বা লেখা হত ?' সে আলোচনা এখন থাক। কিন্তু পত্রিকার প্রয়োজনে লিখতে গিয়েই পো ছোটগল্পের কলারীতিকে একটা নির্দিষ্ট রূপ দিয়ে গেছেন। নির্ধারিত পরিসরে, একটি

বিশেষ ঘটনাকে নির্বাচন করে, তার মধ্যে বাঞ্ছিত তাৎপর্য আরোপ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। পো-র এই প্রয়োজন-সঞ্জাত শিল্পরূপ তখন ছোটগল্পের সংজ্ঞায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। হথর্নের 'Twice Told Tales'-এর মুখবন্ধরূপে পো-ই প্রথম ছোটগল্পের বিজ্ঞানসম্মত সূত্র দিতে চেয়েছেন :

"A skilful literary artist has constructed a tale. If wise, he has not fashioned his thoughts to accomodate his incidents; having conceived, with deliberate care, a certain unique or single *effect* to be wrought out, he then invents such incidents —he then combines such events as may best aid him in establishing this preconceived effect."

এই সংজ্ঞা আজকের দিনে ক'জন ছোটগল্প-লেখক মানবেন জানি না, কিন্তু পো-র সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকায় যেন একটা নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটল। সে হল ছোটগল্প রচনার আন্দোলন। পৃথিবীর কোনো দেশে গল্প সৃষ্টির জন্যে কখনো এমন সর্বজনীন মহোৎসব শুরু হয়নি—উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত এমনভাবে ষাট বছর ধরে অবিচ্ছিন্ন গল্পসাহিত্যের চর্চা হয়নি আর কোথাও। চেকভ আর মোপাসাঁর দেশে উপন্যাসের ন্যগ্রোধতরুর পাশে কুঞ্জের মতো দেখা দিয়েছে গল্প, আর আমেরিকায় ছোটগল্পের দেবদারু-বীথি সযত্নে রচিত হয়েছে। তাই মার্কিনী ছোটগল্পেই শৈল্পিক সিদ্ধি পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়েছে, তাই আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ গল্পকার হতে পেরেছেন, এই কারণেই সাম্প্রতিক সেরা ছোটগল্পের জন্য পাঠককে আমেরিকারই দ্বারস্থ হতে হয়।

গ্রাহাম্‌স্ ম্যাগাজিন, হার্পার্স্ ম্যাগাজিন, পুট্‌নাম্‌স্ ম্যাগাজিন আর অ্যাট্‌লান্টিক ম্যাগাজিন ছোটগল্পের জন্য বাহু প্রসারিত করে দিলে। হথর্নের 'বিষণ্ণ ঊর্ধ্ববিহার' নয়, পো-র আতঙ্ক-কাহিনীও নয়—সহজ পরিচিত, দৈনন্দিন জীবনের কথাচিত্র—

"The Public is learning that men and women are better than heroes and heroines."[১]

এই সহজ জীবনের ডাকে—**'Real thing'** সৃষ্টির প্রেরণায় একে একে এগিয়ে এলেন রোজ টেরী কুক (**Rose Terry Cooke**), ফিট্‌স্-জেমস্ ও' ব্রায়েন (**Fitz-James O' Brien**), এডোয়ার্ড-ই-হেল (**Edward E. Hale**) এবং হেন্‌রি জেম্‌স্ (**Henry James**)।

হেন্‌রি জেম্‌স্ আজ আর তেমনভাবে স্মৃত নন্। যদিও টি-এস্ এলিয়ট তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, **"He is the most intelligent man of his**

১। The Cambridge Hist. of American Lit. Vol II. P. 372

generation,"[১] তা হলেও আজ তাঁকে গল্পলেখকদের সারিতে তেমন ভাবে দেখা যায় না, প্রধানত তীক্ষ্ণধার মননশীল সমালোচনা আর কয়েকটি উপন্যাসের মধ্য দিয়েই তিনি বেঁচে থাকবেন। অথচ একসময় গল্পকার হিসেবে অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তিনি—ইংল্যাণ্ডের গল্পলেখকেরা তাঁর দ্বারাই বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

জেমস

হেনরি জেমসের উপর পো-র প্রভাব ছিল, কিন্তু তিনি অচিরাৎ তা থেকে মুক্ত হয়েছেন এবং তাঁর নিজত্বের সমুজ্জ্বল পরিচিতি রেখেছেন। ছোটগল্পকে তিনিও একটা নির্দিষ্ট সূত্র দিলেন ঃ

"According to James, a short story was the analysis of a situation, the phychological phenomenna of a group of men and women at interesting moment."

এই সংজ্ঞার ফল খুব ভালো হয়েছে একথা বলা যায় না। একটি বিশেষ পরিস্থিতির বিশ্লেষণ আর সেই সঙ্গে কতকগুলি নর-নারীর মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন—এর পরিণামে এক ধরণের জটিল গল্প লিখেছেন হেনরি জেমস। তাতে অনুভূতির চাইতে প্রাধান্য পেয়েছে বুদ্ধির বিস্তার; স্বচ্ছতা নেই—তা কুহেলিময়; গতি কম—একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বড় বেশি আবর্তিত হচ্ছে। যা তিন পাতায় শেষ হত—তাকে ত্রিশ পাতা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন হেনরি জেমস্। পো-র ধরণে লেখা তাঁর **'The Turn of the Screw'** এই রকম। তাঁর সম্ভবত শ্রেষ্ঠ গল্প **'The Beast in the Jungle'** এক অনন্য শিল্পীর অদ্বিতীয় রচনা।

হেনরির জেমসের কৃতিত্ব এইখানেই যে একালীন ছোটগল্পের মধ্যে তিনি বুদ্ধির দীপ্তশিখা জেলে দিয়েছেন—তাঁর লেখা যতই বিলম্বিত পল্লবিত হোক, তার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ ভাবগত ঐক্য (**Unity of Impression**) তিনি রক্ষা করতে পেরেছেন। জেমস ছিলেন বৈজ্ঞানিক—জাগতিক এবং মানসিক প্রতিটি বস্তুকেই কার্যকারণসূত্রে তিনি বিধৃত করতে চেয়েছেন, মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে—বিভিন্ন চরিত্রের রাসায়নিক মিশ্রণে তাঁর বিশিষ্ট সিদ্ধান্তে পেঁছেছেন তিনি। আঙ্গিকেও তিনি বিজ্ঞানীসুলভ শৃঙ্খলা রাখতে চেয়েছেন। **"Impressionistic story of situations from the stand-point of scientific truth"**—জেমসকে বিশিষ্ট গৌরব দিয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম লীলার কাহিনী গড়ে তোলবার আধুনিক পদ্ধতির প্রথম পরীক্ষক তিনি; নিজে সম্পূর্ণ সফল হন নি—কিন্তু ভবিষ্যতের অসীম সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছেন।

হেনরি জেমস প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য সমালোচকরূপে ভাষায় সচেতন বৈদগ্ধ্য বিস্তার করেছিলেন, তাঁর গল্পেও সেই ভাষাগত বিশিষ্টতাই প্রথম

১। **Literature in America, Ed. by Philip Rahv, P. 228**

লক্ষণীয়। তাঁর রচনারীতি একালের সাংবাদিকসুলভ দ্রুত সংক্ষিপ্ত গতিবেগের উপর নির্ভরশীল নয়—তা বিলম্বিত, পরিশীলিত, ইঙ্গিতময় এবং বিসর্পিল। জেমসের রচনায় এই বিশিষ্ট ভঙ্গীটির রস গ্রহণ করতে না পারলে তাঁর গল্পকে আত্মসাৎ করা কঠিন। ভাষার এই আভিজাত্য ও বুদ্ধির উজ্জ্বলতাকে উপেক্ষা করে যাঁরা গল্পের জন্যই প্রধানত ব্যাকুল—হেনরি জেমস তাঁদের জন্যে কলম ধরেন নি।

ঘনীভূত বাক্যের সুকৌশল বিন্যাসে জেমস আশ্চর্য পরিবেশ রচনা করেছেন তাঁর গল্পে। একটি উদাহরণ নিলে বোঝা যাবে ঃ

I remember entertaining, as we moved together over the turf, a strong impulse to say something intensely personal, something violent and important, important for *me*—such as that I had never seen her so lovely for that particular moment was the sweetest of my life, But always, in youth such words have been on the lips many times before they're spoken to any effect ; and I had the sense, not that I did'nt know her enough—I cared little for that—but that she did'nt sufficiently know me."

জেমসের এই স্টাইল বিদগ্ধ পাঠকের মনে সম্মোহনের মতো আবেশ সৃষ্টি করে—তার রসবোধের উপর লেখকের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে দেয়। হফম্যান, পো এবং হথর্ন, জেমসের বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের দ্বারা একসঙ্গে সংহত হয়ে গল্পটিকে পাঠককে মনোজগতের এক গভীর গহনে নিয়ে যায়, স্বভাবতই লৌকিক থেকে অলৌকিক—প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষের মধ্যে প্রবেশ-দ্বারটি মুক্ত করে দেয়। তাঁর সুদীর্ঘ গল্প 'The Turn of fhe Screw'-তে অলৌকিকতার এই সম্মোহন বিস্তার—তাঁর ভৌতিক কাহিনী 'Sir Edmund Orme' মনস্তাত্ত্বিক সত্যে স্বীকৃতি লাভ করে।

হেনরি জেমসের এই শিল্পরীতি মননশীল গল্পলেখকদের অনেক সময় আকৃষ্ট করলেও তাঁর সার্থক শিষ্যের সংখ্যা নগণ্য। 'তাঁর স্টাইল, তাঁর ব্যক্তিত্ব'—সেই ব্যক্তিত্বকে নকল করা যায় না। তাই বলতে গেলে জেমসের ঐতিহ্য জেমসের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সামগ্রী ছোটগল্প ক্রমশই ক্ষিপ্রগামী ও মিতবাক্ হয়ে উঠছে, একান্তভাবে ভাষার কারুকার্য রচনা এবং মন্থর বিশ্লেষণের সুযোগ তার কোথায় ? তবু 'Select Readers'-এর লেখকরূপে এবং মনঃসমীক্ষার প্রয়াসে তিনি নিজস্বে দীপ্তমান হয়ে থাকবেন।

এরপরেই স্মরণীয় ফ্রান্সিস্ ব্রেট্-হার্ট। তাঁর 'The Luck of the Roaring Camp' গল্পটি দেশকে চকিত করে তুলেছিল। ছোটগল্পকাররূপে ব্রেট-হার্ট তখন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

দীর্ঘদিন ক্যালিফোর্নিয়ায় বাস করে তিনি মার্কিনী গোল্ড্‌রাশের যে

অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তা তাঁর পূর্বোক্ত গল্পটি ছাড়াও "The Outcasts of the Poker Flat" প্রভৃতিতে ফুটে উঠেছে। মানুষের প্রতি মমতাও তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোনো সোভিয়েট সমালোচক তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন:

"The characters are simple folk thrown by fate into a wild and majestic region. Their life is tough and hard, but beneath their rough exterior the writer finds and brings out the most human feelings—sympathy, friendliness and heroism. Bret-Harte finds the gold of California in the heart of his characters."[১]

এছাড়া অ্যালড্রিচ (Aldrich), স্টকটন (Stockton), জনস্টন (Johnston) প্রভৃতি আমেরিকার ছোটগল্পকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। উনিশ শতকের শেষভাগে বিশেষ উল্লেখযোগ্যতা নিয়ে দেখা দিয়েছেন জ্যাক লণ্ডন এবং ও. হেনরি।

জ্যাক লণ্ডন

বস্তুবৈচিত্র্যে—বিচিত্র অভিজ্ঞতায়—সভ্যতার সীমান্ত ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তের জগৎকে সাহিত্যভাত করায় জ্যাক লণ্ডনের কৃতিত্ব। ব্যক্তি-জীবনে ভাগ্যান্বেষী জ্যাক লণ্ডন সোনার সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন আলাস্কার পার্বত্য অঞ্চলে, 'ফার'-এর ব্যবসা করতে মেরু অঞ্চলের হাজার হাজার মাইল তুষার-প্রান্তর পরিক্রমা করেছেন। তাঁর গল্পে একদিকে যেমন রুদ্র প্রকৃতির নিষ্ঠুর রূপ—অন্যদিকে তেমনি সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে সীমাহীন মমতা। জ্যাক লণ্ডনের গল্পে পো-র মতোই নিষ্ঠুর ভয়াবহতা, আর সেই সঙ্গে ব্রেট-হার্টের উচ্ছলিত মানবপ্রীতি।

লণ্ডনের 'To Build A Fire' গল্পটিই মনে করা যাক। মেরুর দিগন্ত-বিস্তারের মধ্য দিয়ে একটি লোক ফিরছে ইউকোনের তাঁবুর দিকে—তার সঙ্গী একটি কুকুর। কিন্তু সে পথ হারিয়েছে। তারপর হতভাগ্য লোকটি আগুন জ্বালবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে—শূন্যের পঁচাত্তর ডিগ্রী নিচের অসহ্য শীতে কিভাবে ধীরে ধীরে মরে গেল—তারই নিপুণ. নিখুঁত বর্ণনা আছে এই গল্পে। হাতদুটো ক্রমেই জমে যাচ্ছে, আগুন জ্বালবার উপায় নেই, তখন লোকটা ভাবছে, কুকুরটাকে হত্যা করে তার তপ্ত রক্তে এবং অন্ত্রে নিজের হাত গরম করে নেবে একটুখানি; কুকুরও তার মতলব বুঝতে পেরেছে—কিছুতেই তার কাছে আসছে না।

বিবরণটি উদ্ধৃত করার প্রলোভন দমন করা অসম্ভব:

"The sight of the dog put a wild idea into his head. He remembered the tale of the man, caught in a blizzard, who killed a steer and crawled inside the carcass, and so he was

১। G. Gunkin.

saved. He would kill the dog and bury his hands in the warm body until the numbness went out of them. Then he could build another fire. He spoke to the dog, calling to him ; but in his voice was a strange note of fear that frightened the animal, who had never known the man to speak in such way before. Something was the matter, and its suspicious nature sensed danger—it knew not what danger, but somewhere, somehow, in its brain arose an apprehension of the man. It flattened its ears down at the sound of the man's voice, and its restless, haunching movements and the liftings and shiftings of its forefeet became more pronounced but it would not come to the man."

এই গল্পের আতঙ্ক পো-কে স্মরণ করায়—পিট্‌ অ্যান্ড পেণ্ডুলামের চাইতে এর বিভীষিকা কিছুমাত্র ন্যূন --এ কথা পাঠকের মনে হবে না। কিন্তু তবুও পার্থক্য আছে। এডগার অ্যালান পো যেন তিক্ততা আর ভীতির এক বিচিত্র লোকে বাস করছেন—যেন নরকের দ্বার পেরিয়ে তাঁর প্রেতলোকে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু জ্যাক লণ্ডনের গল্পে মানবতার সুরটিই প্রধানত—মেরুদেশের পটভূমি হোক আর যা-ই হোক এ যেন আমাদের প্রাত্যহিকতার রক্তনাড়ীর সঙ্গেই সম্বন্ধ। পো-র গল্পে আমরা দুঃস্বপ্নের মধ্যে মূর্ছিত হয়ে থাকি, জ্যাক লণ্ডনের গল্পে আমাদের যন্ত্রণা-জর্জরিত জীবনই যেন প্রতীকিত হয়ে ওঠে।

'To Build A Fire'-এর আর একদিকে 'A Piece of Steak'; এই গল্প থেকেই বোঝা যাবে, জ্যাক লণ্ডনের মধ্যে পো-র চাইতেও প্রধান ভাবে রয়েছেন চেকভ। টম কিং নামে জনৈক মুষ্টিযোদ্ধার কাহিনী 'A Piece of Steak'। একদা টম কিংয়ের দুরন্ত যৌবন ছিল; খ্যাতনামা বক্সার ছিল সে, রিঙে নেমে সেদিন হাজার হাজার টাকা ডলার রোজগারও করেছে। কিন্তু আজ তার বয়েস হয়ে গেছে—এখন তরুণ প্রতিযোগীদের সঙ্গে সে আর পেরে ওঠে না। তার ঘরে আজ আর খাবার নেই—স্ত্রী-সন্তান তার উপবাসী। তাই টাকার প্রয়োজনে আবার একজন নবীন মুষ্টিযোদ্ধার সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় নামতে চলেছে টম।

শরীর দুর্বল হয়ে গেছে—অথচ লড়তে হলে ভালো করে খাওয়া চাই তার। তাই গৃহের শেষ খাদ্যটুকু সে খেতে বসেছে। খাওয়ার সময় ভাগ না বসায় এইজন্য অভুক্ত সন্তানদের পাশের ঘরে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে—অনাহারপীড়িতা স্ত্রী ঘরের শেষ সম্বল এক পেনি দিয়ে টমের জন্যে রুটি কিনে এনেছে, ধারে সংগ্রহ করে এনেছে যৎসামান্য মাংস।

সকলের মুখের গ্রাস—যা স্ত্রী-সন্তানের রক্তের মতো—তাই খেয়ে টম কিং দুই মাইল পথ হেঁটে চলল বক্সিং লড়তে। যদি জেতে, তাহলে অভাব

মিটবে, একমুঠো খাদ্যও উঠবে সকলের মুখে। যদি না জেতে—কিন্তু সে কথা ভাববারও উপায় নেই। জিততেই হবে টম কিংকে—বাঁচতে হবে—বাঁচাতে হবে স্ত্রীকে, সন্তানদের।

কিন্তু টম জিততে পারল না। প্রাচীনের অভিজ্ঞতা নবীনের গতির কাছে হার মানল। কপর্দকহীন, নিঃস্ব, প্রহারে জর্জরিত টম টলতে টলতে বাড়ী ফিরে চলল। আর তখন তার মনে পড়ল, যৌবনে বহুকাল আগে একবার সে প্রাচীন স্টোশার বিলকে নক্‌আউটে পরাজিত করেছিল। নিজের অসীম লাঞ্ছনা এবং অসহ্য যন্ত্রণায় টমের মনে হল: "**Poor old Stowsher Bill! He could understand now why Bill had cried in the dressing room!**" ব্যক্তি-বেদনাকে ছাড়িয়ে সমগ্র মুষ্টিজীবী সম্প্রদায়েরই মর্মান্তিক ট্র্যাজিডির যে সংকেতটি একেবারে শেষের বাক্যটিতে লণ্ডন দিয়েছেন তাতেই সমগ্র গল্পটি অসাধারণ রূপ ধরেছে। অপূর্ব এর আবেদন—বিন্দু বিন্দু অশ্রুসেচনেই যেন এটি রচিত বলে মনে হয়। পৃথিবীর গল্পসাহিত্যে জ্যাক্ লণ্ডনের স্থান কোথায় জানি না; কিন্তু নিখুঁত টেক্‌নিকে, মানব-মমতার অভিসেচনে **A Piece of Steak** জ্যাক লণ্ডনকে অমর করে রাখবে। তা ছাড়া **An Odyssey of the North, the Lost Face, The Heathen** কিংবা **Love of Life**-ও তাঁর সেরা গল্প।

উনিশ শতকীয় মার্কিনী গল্পসাহিত্যে শেষ নাম ও. হেন্‌রির।

হেন্‌রি সম্পর্কে বিরূপতা আজ সর্বত্র সোচ্চার। পাঠকমহলে তাঁর জনপ্রিয়তা যত বেশি, বিদগ্ধজনের কাছে তাঁর নিন্দাও তত প্রবল। একজন সমালোচক তো সক্রোধে বলেছেন, ব্রেট-হার্ট এবং ও. হেন্‌রি আমেরিকার সাহিত্যের কলঙ্ক। অনুরূপ বিদ্বেষে সমারসেট মম ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার প্রতিনিধিস্থানীয় সংকলন রচনা করতে গিয়ে সব্যঙ্গে ও. হেন্‌রিকে বর্জন করেছেন।

ও. হেন্‌রি

কারণ ও. হেন্‌রির অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্‌স্ গল্পের শেষে একটি অদ্ভুত চমক—'নিছক বর্বরতা' ছাড়া কিছুই নয়; "তিনি যেন মদের আড্ডায় আসর জমিয়েছেন—গল্পের শেষে শ্রোতাদের পিঠে অভদ্র চপেটাঘাত করে—তাদের চমকে দিয়ে তিনি অট্টহাস্য করে ওঠেন।" তা ছাড়া তাঁর গল্পে নাকি কোনো মর‍্যালও নেই।

অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সের বাড়াবাড়ির জন্য ও. হেন্‌রি নিশ্চয় সমালোচ্য। তিনি গল্প গড়েছেন কিন্তু চরিত্র তেমনভাবে গড়তে পারেন নি—সে ত্রুটিও তাঁর থাকতে পারে। এইচ্ জি ওয়েল্‌স্ যে লীলাচ্ছলে বলেছিলেন—"**The short story is youngman's sport**"—এই লঘুতাবাচক সংজ্ঞা ও. হেন্‌রির গল্প সম্বন্ধে কিছুটা যে প্রযোজ্য তা-ও হয়তো ঠিক। কিন্তু 'ও. হেন্‌রি মার্কিন সাহিত্যের কলঙ্ক'—এতটা লজ্জিত হওয়ার কারণ বোঝা যায় না। মর‍্যাল্ বলতে কী বোঝায়—সমালোচকেরাই জানেন, কিন্তু ও. হেন্‌রির নিশ্চয়ই একটি বক্তব্য আছে। পৃথিবীর আর কোনো লেখকেরই গল্প বোধ

হয় দেশে দেশে এত অনূদিত বা অপহৃত হয় নি। ও. হেন্‌রির গল্প যদি নিছক "Youngman's sport"ই হত—হলে এই সমাদর কখনোই সম্ভব হত না। অবশ্য কেউ যদি বলেন, তিনি নিতান্তই "For the vulgar' গল্প লিখেছেন, সেক্ষেত্রে বলবার কিছুই নেই!

প্রথম শ্রেণীর লেখক ও. হেন্‌রি নিশ্চয়ই নন, তাঁর শিল্পরীতির দুর্বলতাও স্বীকার্য। তবু মানতেই হবে—ও. হেন্‌রিতে মর‍্যাল্‌ আছে। দুঃখ ও কারাবরণ সহ্য করেছেন, সাধারণ মানুষের সংস্রবে এসেছেন, যারা সমাজে ক্রিমিন্যাল বলে নিন্দিত, যারা নিতান্তই ধুলোমাটির মানুষ, কৌতুক ও ব্যঙ্গের আঙ্গিকে তাদের বাস্তব প্রাণচিত্র ফুটিয়েছেন ও. হেন্‌রি। 'The Gift of Magi' (মেজাইয়ের উপহার), 'The Skylight Room', 'Whistling Dick's Christmas' (এটি ও. হেন্‌রির প্রথম রচনা), 'A Retrieved Reformation'—এসব গল্পকে কে ভুলতে পারে? 'The Green Door' গল্পের মানবতা অথবা 'The Furnished Room'-এর মিনিয়নেটের করুণ স্বপ্ন-গন্ধ স্মৃতি থেকে কখনো মুছে যাবার নয়। আজকে আমেরিকায় গণ-চেতনামূলক সাহিত্য নিন্দিত—"আন্‌-আমেরিকান"—সেই মনোভাবই কি ও. হেন্‌রির জন্য এতটা লজ্জাবোধের কারণ? গোল্‌ড-রাশের উন্মত্ততা ফোটাতে গিয়ে সাধারণ নিচের তলার মানুষের মহান ঐশ্বর্যময় দিক ফুটিয়ে তুলেছেন বলেই কি ব্রেট-হার্টের ওপর এমন তীব্র আক্রোশ? মম নিজেই ও. হেন্‌রির মতো "Whip crack' সমাপ্তির পক্ষপাতী, তাই কি 'ধ্বনিটিকে ব্যঙ্গ করবার জন্য প্রতিধ্বনি'র চেষ্টা? আমরা —সাধারণ পাঠক এই কথাই বলতে পারি, জীবনবোধে, কৌতুকরসে এবং গল্পগঠনের কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল ও. হেন্‌রি এত সহজেই বাতিল হয়ে যাবেন না।

বিশ্ব-গল্পসাহিত্যের আলোচনায় এই পর্বে বাংলা দেশকেও বাদ দেওয়া চলবে না, কারণ এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই পৃথিবীর অন্যতম প্রধান গল্পকার বাংলা দেশে আত্মপ্রকাশ করলেন।

টেল্‌ বা উপাখ্যান জাতীয় গল্প, আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের গোড়ার দিকে, ইংরেজির প্রভাবে আবির্ভূত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই "Novelle" পর্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে' ভূদেব মুখোপাধ্যায় এদের সূচনা করে দেন। বঙ্কিমচন্দ্রও লেখবার চেষ্টা করেন 'রাধারাণী', 'যুগলাঙ্গুরীয়'। (আসলে আধুনিক ছোটগল্পের সংকেত বঙ্কিমের 'কমলাকান্ত' বা 'লোকরহস্যের' ব্যঙ্গাত্মক রচনাগুলির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।) রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী অনেকগুলি ছোট ছোট গল্প লিখেছিলেন, বৃত্তান্তমূলক এই সব গল্পের নিজস্ব সাহিত্যিক আস্বাদ আছে এবং গল্পসাহিত্যে স্বর্ণকুমারী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়া। সেই সঙ্গে গল্পকাররূপে অধুনা বিস্মৃত-প্রায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তও বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

প্রাথমিক যুগের গল্পলেখকদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথই বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর রচনায় বিষয়-বৈচিত্র্য ছিল, নিষ্ঠাও ছিল; বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রনাথের অনেক সাধুবাদ করেছেন, তিনি তাঁর পরম গুণগ্রাহী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও যে গল্প রচনার প্রতি একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, তাঁর কৃপণ এবং অসতর্ক সৃষ্টির মধ্যেই তার নিদর্শন রয়ে গেছে। 'সাহিত্য' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিও কিছু কিছু গল্পের চর্চা করেছিলেন। এসব ছাড়া আরো খুঁটিনাটি নামের একটি দীর্ঘ তালিকাও উপস্থিত করা যায়।

কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লেখকচিত্তের এবং সমাজচিন্তার যে বিশিষ্ট একটি অবস্থার মধ্যে ছোটগল্প গড়ে ওঠে, বাংলা সাহিত্যে সেই লগ্ন তখনো অনাগত। সেই অন্তর-যন্ত্রণা এবং সামাজিক আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রস্তুতি ঘটছিল রাজনীতিক মেঘাড়ম্বরের মধ্যে—বঙ্কিম যার পূর্বসূচনা রেখে গিয়েছিলেন 'কমলাকান্তের দপ্তরে'। বাংলা ছোটগল্পের যুগ-পুরুষ রবীন্দ্রনাথ তখনও লিখছেন 'প্রভাত সঙ্গীত', 'কড়ি ও কোমল'। কিন্তু যথাসময়ে কালের ডাক তাঁর কানে এসে পৌঁছুল, 'দুন্দুভিতে হল রে কার আঘাত শুরু।' উনিশ শতাব্দীর শেষ দশকে, সেই 'যুগ-দুন্দুভি'র আহ্বানেই সাড়া দিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পশিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাই উনিশ শতকীয় গল্পধারার আলোচনায় বাংলা সাহিত্যেরও সগৌরব একটি স্বীকৃতি প্রাপ্য।

আধুনিক ছোটগল্প যে ব্যক্তিক-সামাজিক অনিশ্চয়তায় অথবা কোন সন্ধিলগ্নেই প্রধানত সৃষ্ট হয়ে ওঠে—রবীন্দ্রনাথের গল্পসাহিত্যেও আমরা সেইটিই নতুনভাবে দেখতে পাই। তাঁর গল্প লেখার সূচনা হয় সাধারণ ভাবে ১২৯৮ সালে—অর্থাৎ তাঁর ত্রিশ বৎসর বয়স থেকে। এদিক থেকে এরা তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টিতে কনিষ্ঠ।

রবীন্দ্রনাথের রচনার পিছনে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিটি রয়েছে—সেইটিই বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মতো। এই সময়ের আগে এবং পরে, বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে, রাজনৈতিক আন্দোলনের মেঘ ঘনিয়েছে। ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক পর্বের যে সুযোগ-সুবিধে একদল মধ্যশ্রেণীকে দেওয়ানী আর বেনিয়ানগিরির অকুণ্ঠিত লুঠের সুযোগ করে দিয়েছিল, সে সুযোগ ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নগ্নতা ভারতবর্ষে যে দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে, তার রূপ ১৮৮১ সালে লণ্ডনে বসেই কার্ল মার্কস্ দেখতে পেয়েছিলেন: "Quite apart from what they appropriate to themselves annually *within* India, speaking only of the *value of commodities* the Indians have gratuitously and annually to *send over* to England—it amounts to *more than the total sum of income of the sixty millions of agricultural and industrial labourers of India*! This is a bleeding process, with a vengeance! The famine years are

pressing each other and in dimensions till now yet suspected in Europe!" ১

মার্ক্‌স্‌ বুঝেছিলেন, এই অবস্থা—এই দুঃশাসন বেশিদিন চলতেই পারে না—এর প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। **'In *India* serious complications, if not a general outbreak, is in store for the British Government."** সেই জটিলতাটা দেখা দিয়েছিল এইভাবে ঃ

"১৮৭০ হইতে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত সময়টা ছিল বড় বড় দুর্ভিক্ষ ও দুঃখ-দুর্দশার অধ্যায়। দাক্ষিণাতোর কৃষক বিদ্রোহ ক্রমবর্ধমান গণবিক্ষোভেরই প্রকাশ। ১৮৭৭ সালে সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ এবং ব্যয়বহুল রাজ্যাভিষেক উৎসব একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। রাণী ভিক্টোরিয়া ভারতসম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষিত হইলেন। ঠিক ঐ সময়েই আবার দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ বাধে। অসন্তোষ দমনের জন্য গবর্নমেণ্ট চণ্ডলীলার আশ্রয় লন[২]। ১৮৭৮ সালে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র সম্পর্কিত আইনের (ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্‌ট্‌) দ্বারা সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করা হইল। ইহার পরের বৎসর অস্ত্র আইন হিংস্র জানোয়ারের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীর আত্মরক্ষার উপায়টুকুও কাড়িয়া লয়, প্রকাশ্য জনসভা আহ্বানের অধিকার হ্রাস পায়।" (আজিকার ভারত, রজনী পাম দত্ত, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের অনুবাদ)

লর্ড লীটন দেশে ঝড়ের যে কালো মেঘ সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, তাতে বজ্র-বিদ্যুতের চমক শুরু হল ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে। দেশীয় বিচারক শ্বেতচর্ম ইয়োরোপীয়দের বিচার করবেন—এ কথা ভাবতেই ইয়োরোপীয় বণিক সমাজ এবং আমলাতন্ত্র ক্রোধে প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। নানা ছুতোয় দেশীয়দের উপর দমননীতি আরম্ভ হল। এদিকে জাস্টিস্‌ নরিসের তীব্র সমালোচনা ক'রে কারারুদ্ধ হলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর "কয়েক মাস পরে সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির চেষ্টায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কনফারেন্স আহূত হয়।—ইহা কংগ্রেসের অগ্রদূত। এই সব প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল দেশের মধ্যে ও বিদেশে অ্যাজিটেশন বা আন্দোলন সৃষ্টি করা। এই সকল সভা-সমিতিতে প্রায়ই কথার বাহুল্য, উচ্ছ্বাসের আতিশয্য প্রকাশ পাইত।…রবীন্দ্রনাথ এই সব আন্দোলন হইতে দূরেই ছিলেন, প্রত্যক্ষভাবে কিছুর মধ্যে থাকিতেন না। কিন্তু সাময়িক আন্দোলনকে যথেষ্ট সমালোচনা করিতেন—"[৩]।

১। **Letter of Marx and Engles (No 172), P. 340**

২। এই চণ্ডনীতি—বিশেষ করে আফগান বিদ্রোহ দমন করবার জন্য ইংরেজের হিংস্রতা ও দেশীয় বুদ্ধিজীবীদের উপর তার প্রতিক্রিয়ার খুব মূল্যবান তথ্য পাওয়া যাবে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ রচনা "কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র" এবং আরো নানা প্রসঙ্গে। ইন্দ্রনাথের এই তীক্ষ্ণধার সাংবাদিক satireগুলি ছোটগল্পের কাছাকাছি পৌঁছেছে—যদিও সম্পূর্ণ গল্প হয়ে ওঠেনি।

৩। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯

সে সমালোচনার অবশ্য বিবিধ কারণ ছিল। যাই হোক, এই সময় দুটি নট বিশিষ্ট ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে নামলেন। এঁদের একজন অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম, অপরজন লর্ড ডাফ্‌রিন। হিউম আর ডাফরিনের সম্মিলিত কৌশলে এবং ভারতীয় নরমপন্থীদের সহযোগিতায় জাতীয় আন্দোলনকে বিপথে নিয়ে গিয়ে এক আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল ১৮৮৫ সালে, তার নাম 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস'। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঠিক পরের বৎসরেই অনুরূপ উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগেরও জন্ম হয়েছিল।

নরমপন্থী নেতারা এই কংগ্রেসের মাধ্যমে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কর্মপ্রণালী নির্ধারণ করলেন বটে, কিন্তু এ-কথাও তাঁদের বুঝতে বাকি ছিল না যে তাঁরা আগ্নেয়গিরির মুখে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিছুকালের ভিতরেই চরমপন্থী উত্তেজনা ভারতবর্ষের দিকে দিকে আত্ম-প্রকাশ করতে লাগল—'মডারেটীয়' রাজনীতির নাগপাশ ছিন্ন করতে চরম-পন্থীর দল তৎপর হয়ে উঠলেন। মহারাষ্ট্রে আবির্ভূত হলেন বাল গঙ্গাধর টিলক, বাংলায় দেখা দিলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং বিপিনচন্দ্র পাল, আর পাঞ্জাব থেকে কেশরী-গর্জন মন্দ্রিত হল লালা লাজপৎ রায়ের।

কিন্তু চরমপন্থীরাও বেশিদিন তাঁদের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলেন না। তাঁদের মধ্যে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের অনুপ্রবেশ ঘটল। ইংরেজ-বিদ্বেষ তাঁদের ভিতর এমনি প্রচণ্ড আকার ধরল যে ঈশ্বর গুপ্তের অনুসৃতিতে "বিদেশের ঠাকুরে"র চাইতে স্বদেশের সারমেয় তাঁদের পূজনীয়তর বলে বোধ হল। প্রবল জাতি-অভিমান তাঁদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে লাগল—আর্যত্বের জয়ধ্বজা উড়ল আকাশে; ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতাই যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতা—এইটিই তাঁদের মূল প্রতিপাদ্য হয়ে দাঁড়াল।

রবীন্দ্রনাথের অবস্থাটি এ-সময়ে বড় বিচিত্র।

মডারেট-পন্থার ভিক্ষাভাণ্ডে তাঁর কোনোদিনই আস্থা ছিল না। চরম-পন্থীদের রক্তমেঘে তিনি অশুভ সংকেত প্রত্যক্ষ করছিলেন। তাঁর মনে প্রশ্ন উঠেছিল: "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?"

এই সময়ে অনুষ্ঠিত "শিবাজী উৎসবে" যোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর "ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা"র বাণীকে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন বটে,[১] কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাঁর অবস্থা তখন ত্রিশঙ্কুর পর্যায়ী। নরম পন্থার সহযোগিতার নীতি এবং চরম পন্থার আর্যত্বের উন্মাদনা—কোনোটিই তাঁর পক্ষে রুচিকর বা যুক্তিগ্রাহ্য বলে বোধ হয়নি; ফলে দু-দলের কারো সঙ্গেই তাঁর মর্ম-সম্বন্ধ ঘটল না।

রবীন্দ্রনাথ দেশকে দেশরূপেই দেখতে চেয়েছিলেন; ছোট সুখ, ছোট ব্যথা নিয়ে তার যে একটা মানবিক মূর্তি আছে, সেইটিই ছিল তাঁর বিশেষ-

১। লক্ষ্য করবার মতো, কোনো সংকলনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটিকে স্থান দেন নি। কারণ সুস্পষ্ট।

ভাবে বাঞ্ছিত রূপ। কিন্তু সেই রূপকে তিনি নরমপন্থীর বক্তৃতায় পেলেন না—চরমপন্থীদের "আর্যত্ব-সাধনা"র মধ্যেও নয় ; বরং নিবিড় বেদনার সঙ্গেই উপলব্ধি করলেন, এই সমস্ত আন্দোলন দিকে দিকে মানুষে মানুষে একটা উগ্র ঘৃণাকেই উন্মথিত করে তুলছে, সৃষ্টি করেছে তিক্ত জাতিবৈর। রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই যে অখণ্ড মানব-মৈত্রীর সাধক—এই আন্দোলনের মধ্যে যেন তিনি সেই 'মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান'-ই প্রত্যক্ষ করলেন, বেদনায় ও অনিশ্চয়তায় তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

এই সময় রবীন্দ্রনাথকে যেতে হল শিলাইদহে।

তাঁর এই শিলাইদহ-যাত্রা বাংলা গল্পসাহিত্যে সবচাইতে স্মরণীয় ঘটনা। পদ্মার চর থেকে সোনার তরীতে বোঝাই করে ছোটগল্পের সোনার ফসল তিনি বঙ্গ-ভারতীর বন্দরে এনে পেঁাছে দিলেন।

পদ্মার কূলে কূলে, বিরাট 'চলন-বিলে'র বিচিত্র প্রকৃতিতে, বাংলার পল্লী-জনপদে এক নতুন জীবনকে আবিষ্কার করলেন তিনি। এইখানেই যেন স্বদেশ-লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর যথার্থ পরিচয় হল। নগরের রাজনীতিক কোলাহলে, বক্তৃতার কুয়াশায়, বল্গাবিহীন উন্মত্ত সাংবাদিকতার ধূলিজালে যে বৃহত্তর দেশের জীবন-ছবি অস্পষ্ট—আচ্ছন্নপ্রায়, নির্মল আকাশের বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপের তলায় দাঁড়িয়ে এইবার যেন তাকে সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ করতে পারলেন রবীন্দ্রনাথ। একটা আশ্চর্য উপলব্ধিতে চঞ্চল হয়ে উঠলেন বিশ্বকবি—তাঁর প্রকৃতিবোধের সঙ্গে মানববোধ এসে মিলিত হল।

এ-ই দেশ, এ-ই জীবন। তার সুখ-দুঃখ মন্দ-ভালো নিয়ে এ-ই তার পূর্ণতর রূপ। কোলাহলক্লান্ত এবং 'আর্যামি'র তাড়ায় বিপর্যস্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-সাধনার একটি শ্যামল দর্ভাসনকে বিস্তীর্ণ দেখতে পেলেন এখানে।

'ছিন্নপত্রে' রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার মানসিক অবস্থার অত্যন্ত হৃদ্য পরিচয় মেলে। এক জায়গায় লিখছেন : "আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্তহৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে ক'রে এনে দিয়েছে।"[১]

এই অশ্রুর ধনগুলির ব্যথা-বেদনা—তাদের আঁকড়ে রাখার জন্য মর্তজননীর মমতা—সব মিলে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এক নতুন সৌন্দর্য—নতুন আনন্দের প্লাবন নেমে এসেছে। দেখছেন বেদের টোল—তাদের মাটির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা বিচিত্র জীবন ; চোখে পড়ছে গ্রামের মেয়েটি কেমন ক'রে তার "একটি ছোট উলঙ্গ শীর্ণ কালো ছেলেকে খালের জলে নাওয়াতে এসেছে"—কাশিতে জর্জরিত ছেলেটা ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে আপত্তি করায় নিষ্ঠুরভাবে তাকে প্রহার করছে। দেখতে পাচ্ছেন, গ্রামের ছোট ছোট ছেলে-

১। ছিন্নপত্র, ১৮ সংখ্যক

মেয়েরা কাঠের মাস্তুলকে গড়িয়ে গড়িয়ে খেলা করছে—তাঁর মনে তৈরি হচ্ছে ফটিক চক্রবর্তীর গল্প। একটি পুরুষালি ধরনের চুলছাঁটা ছোট মেয়ে চলেছে শ্বশুরবাড়ীতে—'সমাপ্তি'র মৃন্ময়ী তাঁর মনে অংকুরিত হচ্ছে; পোস্টমাস্টার এসে গল্প শুনিয়ে যাচ্ছেন—একাধারে 'পোস্টমাস্টার' আর 'মণিহারা'র ভূমিকা তৈরি হয়ে যাচ্ছে।

আর আছে প্রকৃতি। উদার—বিশাল—অফুরন্ত। পদ্মার দিগন্ত-বিস্তার, জ্যোৎস্না-পরিকীর্ণ ধু-ধু চর, হু হু হাওয়ায় দোলালাগা বন-ঝাউ, সবুজ ক্ষেতের অকৃপণ প্রাণোচ্ছ্বাস, সহজ সরল অপরূপ জীবন:

"দুই ধারে মেয়েরা স্নান করছে, কাপড় কাচছে, এবং ভিজে কাপড়ে এক-মাথা ঘোমটা টেনে জলের কলসী নিয়ে ডান হাত দুলিয়ে ঘরে চলেছে। ছেলেরা কাদা মেখে জল ছুঁড়ে মাতামাতি করছে, এবং একটা ছেলে বিনা সুরে গান গাচ্ছে, 'একবার দাদা ব'লে ডাক্ রে লক্ষ্মণ'।"[১]

প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে জীবনের চিরকালের ছন্দটি শুনতে পেলেন রবীন্দ্রনাথ: "মাঠের চাষা গান গাচ্ছে, জেলেডিঙি ভেসে চলেছে, বেলা যাচ্ছে, রৌদ্র ক্রমেই বেড়ে উঠছে, ঘাটে কেউ স্নান করছে, কেউ জল নিয়ে যাচ্ছে—এমনি ক'রে এই শান্তিময়ী নদীর দুই তীরে, গ্রামের মধ্যে, গাছের ছায়ায়, শত শত বৎসর গুন্ গুন্ শব্দ করতে করতে ছুটে চলেছে।"[২]

কলকাতার রাজনীতিক ঘূর্ণাবর্ত থেকে অনেক দূরে যখন প্রকৃতি এবং সহজ জীবনের এই আনন্দধারায় রবীন্দ্রনাথ মগ্ন রয়েছেন, তখন বাংলা সাহিত্য থেকে এক নতুন আহ্বান এল তাঁর কাছে। ১২৯৮ সালের প্রথম দিকে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হল 'সাপ্তাহিক হিতবাদী'। এই কাগজটি নরমও নয়—গরমও নয়, মোটামুটি আদর্শবাদী মধ্যপন্থী পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করল। এই কাগজের কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথকে পত্রিকার 'সাহিত্য-সম্পাদক' নির্বাচন করলেন, কথা হল, কবি প্রত্যেক সংখ্যায় একটি করে ছোটগল্প 'হিতবাদী'র পাঠকদের পরিবেষণ করবেন। সানন্দে সম্মত হলেন রবীন্দ্রনাথ। মানসী সোনার তরীর পুষ্প-বিথারের নব-মঞ্জরিত পত্রপুটরূপে বিকশিত হল তাঁর ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথ পর-পর প্রতি সপ্তাহে লিখলেন 'দেনা পাওনা', 'গিন্নী', পোস্টমাস্টার,' 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি", 'ব্যবধান' এবং 'রামকানাইয়ের নিবুদ্ধিতা'। তারপর 'হিতবাদী'র কর্তারা দাবী করলেন, এত গম্ভীর গল্প চলবে না, আরো হাল্কা চালে লিখতে হবে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা সম্ভব হল না। 'হিতবাদী'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হল, কিন্তু 'সাধনা' পত্রিকার কল্যাণে গল্প লেখা বহুদিন পর্যন্তই এগিয়ে চলল অচ্ছেদ্য ভাবে।

কী আনন্দে রবীন্দ্রনাথ সেদিন গল্প লিখে চলেছিলেন, তাঁর একটি

১। ছিন্নপত্র, ২২ সংখ্যক

২। ছিন্নপত্র, ৩৮ সংখ্যক

চিঠিতে 'মেঘ ও রৌদ্রে'র পূর্ব সূচনায়, তার অভিব্যক্তি এই রকম :

"আজ কাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছুই না ক'রে ছোট ছোট গল্প লিখতে বসি, তাহলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হতে পারলে হয়তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব, তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে, এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকাল বেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনা-রাজ্যে অবতারণ করা গেছে।" (ছিন্নপত্র, ১০৬ সংখ্যক)

এই গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য বিবিধ। একদিকে সরল জীবনের সহজ কথা, অন্যদিকে প্রকৃতির উদার সুন্দর রহস্যময়তা। 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি যেমন অতি ক্ষুদ্র একটি অনাথিনী বালিকার হৃদয়-বেদনায় আচ্ছন্ন, তেমনি তার মধ্যে প্রকৃতির রহস্যঘন সত্তাটিও নিজেকে বিকীর্ণ করে দিয়েছে। এই গল্পের শেষাংশে লেখক বলেছেন :

"ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তি-শাস্ত্রের বিধান বহু বিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুতে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে—"

এ শুধু জীবনের ধর্মই নয়—পৃথিবীর অন্তরের সত্যটিও এই। 'ছিন্নপত্রে'র ১৮ নম্বরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "আমরা হতভাগ্যেরা তাদের (মর্তহৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে) ধরে রাখতে পারিনে, বাঁচাতে পারিনে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য সে তা করেছে।"

জীবন-রহস্য এসে এই গল্পে বিশ্ব-রহস্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, একটি তুচ্ছ ব্যক্তিক-বেদনা জগদ্ব্যাপী সুবিশাল ট্র্যাজেডীর সংকেত রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এ রমেশচন্দ্র দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল বা টিলকের দেশ-চেতনা নয় ; এ মহাবিশ্বের মর্মকাহিনী— একটি প্রাণ-বিন্দুতে দুঃখ-সিন্ধুর অভিব্যঞ্জনা।

উত্তরজীবনের একটি কবিতায় সাধারণ সামান্য মানুষের জীবন-বিচিত্রার মধ্যে এইভাবেই নিত্যকালের কলধ্বনি শুনেছেন রবীন্দ্রনাথ :

"ঐ না-জানা গ্রামের প্রান্তে সকালবেলায় পূবে
সূর্য ওঠে, সন্ধেবেলায় পশ্চিমে যায় ডুবে।
দিনের সকল কাজে,
স্বপ্ন দেখা রাতের নিদ্রা মাঝে,
ঐ ঘরে, ঐ মাঠে,
ঐখানে জল আনার পথে ভিজে-পায়ের ঘাটে,

পাখি-ডাকা ঐ গ্রামেরই প্রান্তে,
ঐ গ্রামেরই দিনের অন্তে স্তিমিতদীপ রাতে
তরঙ্গিত দুঃখ সুখের নিত্য ওঠা নাবা—
কোনোটা বা গোপন মনে, বাইরে কোনোটা বা।

তারা যদি তুলত ধ্বনি, তাদের দীপ্ত শিখা
ঐ আকাশে লিখত যদি লিখা,
রাত্রি-দিনকে কাঁদিয়ে তোলা ব্যাকুল প্রাণের ব্যথা
পেত যদি ভাষার উদ্বেলতা,

তবে হোথায় দেখা দিত পাথর ভাঙা স্রোতে
মানব চিত্ত তুঙ্গশিখর হতে
সাগর খোঁজা নির্ঝর সেই, গর্জিয়া নর্তিয়া
ছুটছে যাহা নিত্যকালের বক্ষে আবর্তিয়া

কান্নাহাসির পাকে—
তাহা হলে তেমনি করেই দেখে নিতেম তাকে
চমক লেগে হঠাৎ পথিক দেখে যেমন করে
নায়েগারার জলপ্রপাত অবাক দৃষ্টি ভরে।"

('চলতি ছবি')

ছোটগল্প লিখতে গিয়ে তুচ্ছ পল্লী-জীবনের ভেতরেও রবীন্দ্রনাথ সেদিন নায়েগ্রা প্রপাতের মতো প্রাণ-তরঙ্গের দুরন্ত গর্জন শুনেছিলেন।

দেশকে একান্ত করে দেখা কখনোই রবীন্দ্রনাথের ধর্ম নয়—বরং স্বদেশীয়ানার বিরুদ্ধে সর্বদাই তাঁর সোচ্চার প্রতিবাদ। দেশের উপর আছে পৃথিবী, জাতির ঊর্ধ্বে অবস্থিত সর্বমানবিকতা। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে সমকালীন রাজনীতির চাইতেও বড় স্থান দিলেন মানুষের চিরকালের সত্যকে, চিরদিনের সমস্যাকে, সুখ-দুঃখ-আশা-আনন্দকে। তাই তাঁর ছোটগল্প যুগসম্ভব হয়েও যুগাতিক্রমী, স্থানিক হয়েও সর্বদেশীয়।

সমাজক্ষেত্রে একান্ত ঘরের গল্প আমরা পেলাম 'দেনা-পাওনা'। বরপণ প্রথার হৃদয়হীনতা আর স্বার্থের সংকীর্ণতার রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম রামসুন্দরের চরম লাঞ্ছনায় এবং নিরুপমার মৃত্যুতে। সমাজ-জিজ্ঞাসার pointing finger যেন উদ্যত হয়ে উঠল এখানে। আবার 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি" কিংবা 'রামকানাইয়ের নিবুদ্ধিতা' এই বিশ্ব-সত্যকেই প্রমাণ করল যে এই কুটিল-বৈষয়িকতার জগতে বিশ্বাসী সরল মানুষের স্থান নেই—এ কালের স্বার্থ-সর্বস্বতার নিরিখে তারা উপহাস্যতার উপকরণ মাত্র।

যে কথা বলেছি, 'হিতবাদী'র সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হলেও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প লেখা বন্ধ হল না। কলকাতায় ফিরে তিনি 'সাধনা'র সম্পাদনা গ্রহণ করলেন। একটানা লিখে চললেন গল্প। সমাজ-সমস্যা এল 'ত্যাগ', 'সমস্যা পূরণ', 'খাতা', 'বিচারক', 'দিদি', 'প্রায়শ্চিত্ত' ইত্যাদি গল্পে।

পরাধীনতার মর্মজ্বালা ফুটে বেরুল 'মেঘ ও রৌদ্রে'—কিন্তু তারও শেষ কথাকে কবি টেনে আনলেন মেঘ ও রৌদ্রের চিরন্তন জীবননাট্যে। আমলাতান্ত্রিকতা এবং পুলিশের সমালোচনারূপে দেখা দিল 'দুবুদ্ধি'। কবি-কল্পনার ঝঙ্কার বেজে উঠল 'ক্ষুধিত পাষাণে'র মালব-কৌশিক রাগে, 'অতিথি'র মল্লারে, 'এক রাত্রি'র বেহাগে। বিচিত্র রসের গল্প হয়ে দেখা দিল 'মহামায়া', 'জীবিত ও মৃত', 'সম্পত্তি সমর্পণ' ও 'মণিহারা।' নারীর শক্তিময়তার উদ্বোধন ঘটল 'মানভঞ্জনে', 'দৃষ্টিদানে', 'কঙ্কালে'। শাশ্বত পিতৃহৃদয়ের নিত্য-বাণী ঘোষিত হল 'কাবুলিওয়ালা'য়। ১৮৯১ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত, দশ বৎসরের মধ্যে বাংলা ছোটগল্পকে পরিপূর্ণ যৌবনের লাবণ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনা উনিশ শতকের শেষপাদে বাংলা সাহিত্যে সবচাইতে প্রধান ঘটনা।

এই গল্পগুলির স্বাদ এবং সৌন্দর্য একেবারেই স্বতন্ত্র। যদিও ছোটগল্প ঐকোৎসজাত গীতি-কবিতারই পার্শ্বপ্রবাহ, তা হলেও বাস্তবভূমির সঙ্গে ব্যবহারিক সম্বন্ধের জন্য তার রূপ-রীতি, চাল-চলন পৃথক হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই দুইয়েরই চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। কাব্যমূলকতা তাঁর ছোটগল্পের সঙ্গে সহজাত কবচ-কুন্ডলের মতো অচ্ছেদ্য। 'ক্ষুধিত পাষাণে'র তো কথাই নেই—'অতিথি' ধর্মত মনস্তাত্ত্বিক হয়েও কাব্য-পরিণতি লাভ করেছে। যাযাবরচিত্ত তারাপদর পলায়নের পটভূমিটি এই :

"দেখিতে দেখিতে পূর্ব দিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল—পূবে বেগে বাতাস বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল......সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে ;—মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে ; দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল—"

আর তারই আহ্বানে বিশ্বজগতের সেই রথযাত্রায় বেরিয়ে পড়ল তারাপদ। স্বভাবে ঘরছাড়া একটি কিশোরচিত্তকে রবীন্দ্রনাথ কাব্যব্যঞ্জনার মধ্যে মুক্তি দিলেন।

বস্তু-বৈচিত্র্য মনস্তাত্ত্বিকতা, ভাষার তীক্ষ্ণতা, উইটের ঔজ্জ্বল্য—রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সব ক'টি গুণই বিদ্যমান। উত্তরকালে ভাষা-চাতুর্যে, উচ্চাঙ্গের মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োগে এবং চরিত্র নির্মাণে গল্পগুলি আরো পূর্ণতা লাভ করেছে—লেখকের চরম সিদ্ধি আমরা পেয়েছি তাঁর শেষতম সংগ্রহ "তিন সঙ্গী"তে। কিন্তু মাত্র উনিশ শতকের গণ্ডিতেই গল্পকার হিসাবে তাঁর মহিমমূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতা-নাটক-প্রবন্ধ-উপন্যাসের স্থান যেখানেই নির্ধারিত হোক, মাত্র গল্পলেখক রূপেই তিনি বিশ্ব-

সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাদের সঙ্গে আসন লাভের যোগ্য।

রাজনীতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ গল্প রচনা আরম্ভ করেছিলেন; কিন্তু তাঁর গল্পসাহিত্যে সেদিন যেটি বক্তব্য ছিল, সাময়িকতার উচ্চ ও উগ্র কোলাহলের ভিতর চিরদিনের যে অপরিবর্তনীয় জীবন-ছন্দটি তিনি ফোটাতে চেয়েছিলেন, পরবর্তীকালের একটি কবিতায় সেটিকে তিনি এইভাবেই ব্যক্ত করেছেন :

"ইতিহাসের গ্রন্থে আরো খুলবে নতুন পাতা,
নতুন রীতির সূত্রে হবে নতুন জীবন গাঁথা।
যে হোক রাজা যে হোক মন্ত্রী কেউ র'বে না তারা
বইবে নদীর ধারা,
জেলেডিঙি চিরকালের, নৌকো মহাজনী,
উঠবে দাঁড়ের ধ্বনি।
তখনো সেই বাজবে কানে যখন যুগান্তর
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।"

রবীন্দ্রনাথের পশ্চাদনুবর্তনে ছোটগল্পের চর্চায় বাংলা দেশ অগ্রসর হল। প্রমথ চৌধুরীর কথাও এ সময়ে বিশেষভাবে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের গল্প রচনা আরম্ভ হওয়ার আগেই তিনি বাংলা গল্পসাহিত্যের ভবিষ্যতের নির্দেশ পেয়েছিলেন। ফরাসী গল্পধারার অনুসরণ না করলে সার্থক বাংলা ছোটগল্প যে লেখা হতে পারবে না, প্রমথ চৌধুরীর মনীষাদীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে তা ধরা দিয়েছিল। তাই তিনি প্রসপের মেরিমের একটি গল্পকে "ফুলদানি" নামে অনুবাদ করে আধুনিক গল্পের আদর্শরূপে তুলে ধরেছিলেন। এই ঘটনাটিও বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে সবিশেষ মূল্যবান। এ প্রসঙ্গে স্বর্গত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন :

"বাংলায় ছোটগল্পের আদর্শ কি হইবে, সে বিষয়ে সুরেশচন্দ্রের সাহিত্য সম্মেলনে আলোচিত হয়। আলোচনার সময় প্রমথনাথ চৌধুরী বলেন, ফরাসী ছোটগল্পই ছোটগল্পের আদর্শ হওয়া উচিত—বাংলায় সেই আদর্শ গ্রহণ করিলে ভাল হয়। আলোচনা অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলোপদায়ী মনে করিয়া প্রমথনাথ প্রস্পের মেরিমের গল্প ফুলদানী বাংলায় অনুবাদ করেন। উহা ঐ বৎসর (১২৯৮ বঙ্গাব্দ) ৬ষ্ঠ সংখ্যা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়।"

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের উনিশ শতকীয় অধ্যায়ে নিজস্ব ভূমিকা এবং রবীন্দ্রনাথের দান সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী স্বয়ং যা বলেছেন, তা এই :

"আমি কলম ধরেই, 'ফুলদানী' নামক একটি গল্প ফরাসী থেকে অনুবাদ করি। সে গল্প যে পুনর্মুদ্রিত করি নি তার কারণ, গল্পটি প্রসিদ্ধ গল্প হলেও আমার কাঁচা হাতের স্পর্শে তার যথার্থ রূপ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। গল্পটির লেখক **Maupassant** নন—**Merime'e** নামক তাঁর পূর্ববর্তী জনৈক খ্যাতনামা সাহিত্যিক।

এরপর বাঙালী লেখকরা Maupassant-র বহু গল্প বাংলায় অনুবাদ করেন। আমি যদি এক্ষেত্রে কোনো পথ দেখিয়ে থাকি তবে তা অনুবাদের পথ। কিন্তু এই অনূদিত বিলেতি গল্পগুলি বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গ বলে গ্রাহ্য হয়নি।

বঙ্গসাহিত্যের অপর নানা ক্ষেত্রেও যেমন, এ ক্ষেত্রেও তেমনি রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন আদি লেখক। আমার বিশ্বাস, তিনি সর্বপ্রথম হিতবাদী পত্রিকায় ছোট ছোট গল্প লিখতে শুরু করেন; তারপর সাধনায় তাঁর বহু গল্প প্রকাশিত হয়। তিনি হচ্ছেন বঙ্গসাহিত্যে ছোটগল্পের আদিস্রষ্টা, এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টি অফুরন্ত। অথচ রবীন্দ্রনাথের গল্প Maupassant-র প্রভাব হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বাঙলার অধিকাংশ লেখকের গল্পে স্পষ্ট লক্ষিত হয়।"[১]

এই প্রভাবের ফলেই একের পর এক লেখক এগিয়ে এলেন। বাংলা মাসিক পত্রিকায় ছোটগল্প এক অপরিহার্য উপকরণে পরিণত হল।

আর রবীন্দ্রনাথের সাধনার ফলেই উনবিংশ শতাব্দীর গল্পসাহিত্যের ইতিহাসে বাংলা সাহিত্যও স্থানলাভের অধিকারী হল। লক্ষ্য করবার মতো, রবীন্দ্রনাথের গল্পসৃষ্টির কালে ইংল্যাণ্ডের কথাসাহিত্যে একজনও আন্তর্জাতিক মর্যাদার গল্পকার নেই—অথচ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইংলণ্ডীয় সাহিত্যেরই সবচাইতে বেশি পরিচয় ছিল। সম্ভবতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে কিছু পরিমাণে ফরাসী গল্পকারদের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন, কিন্তু সে পরিচয় কতখানি গভীর, তা নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা কঠিন।

রবীন্দ্রনাথের উপর চেকভের প্রভাব নেই—মোপাসাঁরও নয়। চেকভ যেমন "created his own world", রবীন্দ্রনাথও তেমনি ভাবেই তাঁর নিজস্ব গল্পের পৃথিবী গড়ে নিয়েছেন উপেক্ষিত পল্লী-বাংলার মর্মলোকে।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে বাংলা গল্পসাহিত্যে আর একটি নামের উল্লেখ প্রয়োজন। তিনি ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'ভূত ও মানুষ' উনিশ শতকের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে (১৮৯৬), 'মুক্তা-মালা' (১৯০১)-র বেশির ভাগ গল্পও এই সময়ের ভিতরেই রচিত।

প্রাচীন বৈঠকী মেজাজের সঙ্গে সমাজ-সমালোচনা মেশানো তাঁর গল্পগুলি ভবিষ্যতে বাংলা রসগল্পের দ্বার মুক্ত করে দিয়েছে। সহজ সরল তাঁর ভাষা, কৌতুকে স্নিগ্ধ, পর্যবেক্ষণে সুনিপুণ, সমালোচনায় নির্মম। তিনিও নিজের জন্য স্বতন্ত্র একটি জগৎ সৃষ্টি করে নিতে পেরেছিলেন। পরবর্তী 'ডমরু চরিতে'র তো কথাই নেই—তাঁর 'লুল্লু' কিংবা 'নয়ানচাঁদের ব্যবসা' যাঁরা পড়েননি, কী সম্পদ থেকে যে বঞ্চিত হয়েছেন, তা তাঁরা জানেন না।

আর এর মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও বাংলা সাহিত্যে এসে গেছেন। 'দাসী' পত্রিকায় 'একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবন-চরিত' (১৮৯৬)

১ কথাগুচ্ছ, এম. সি. সরকার, ভূমিকা, পৃঃ ৫—৬

দিয়ে তাঁর যাত্রা আরম্ভ হয়েছে, 'প্রদীপ ও ভারতী'তে আরো কয়েকটি গল্প প্রকাশ করে মুদ্রিত করেছেন 'নবকথা'। বাঙালীর পারিবারিক জীবনের শিল্পী প্রভাতকুমার বিদেশী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, ফরাসী এবং ইংরেজীর সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল, কিন্তু বিদেশী-প্রভাবমুক্ত সরল সকৌতুক গল্পেই তিনি বাঙালীর অন্তরলোকে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছেন, যে সৌভাগ্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও ঘটেনি। অথচ গল্পের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথেরই সাক্ষাৎ শিষ্য।

রবীন্দ্রনাথের সর্বাত্মক মহিমায়, ত্রৈলোক্যনাথের রসের বৈঠকে এবং প্রভাতকুমারের স্নিগ্ধ ঘরোয়া আমেজে উনিশ শতকেই বাংলা গল্প একটি বিশিষ্ট গৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে উঠল।

ভারতীয় 'ফেব্‌ল'-এ যার আরম্ভ, দশকুমার থেকে আরব্য উপন্যাসে যার ক্রমানুসরণ, ইতালীর নভেলা, বোক্কাচ্চো, চসার এবং রাব্‌ল্যাতে যার আধুনিকীকরণ—উনিশ শতকীয় ছোটগল্পে তার বিবর্তন সম্পূর্ণ হয়ে গেল। নানা দিকে পরিক্রমা করে আমরা তার পরিপুষ্ট রূপ প্রত্যক্ষ করলাম। আধুনিক ছোটগল্প বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন লেখকের কলমে, বিভিন্ন মননের স্পর্শ-পাতে, তার স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে স্পষ্ট-চিহ্নিত হয়ে গেল। সে আর রোমান্স্ নয়, নভেল্ বা নভেলাও নয়; এখন সে স্বয়ংসিদ্ধ—ছোটগল্প—'The Short Story'; কাজেই এর পর থেকে আমরা আর ছোটগল্পের ইতিহাসকে অনুসরণ করব না। বিংশ শতাব্দীর পাঠকের কাছে এখন সে নিজ মহিমায় দীপ্যমান।

অধ্যাপক ফ্রেড্ লিউয়িস্ প্যাটি (Fred Lewis Patty)-র ভাষায়ঃ

"Everywhere, in France. in Russia, in England, in America, more and more the impressionistic prose tale, the conte, short, effective, a single blow, a moment of atmosphere, a glimpse at climatic instant—came."

তা হলে ইমপ্রেশ্যান বা প্রতীতিমূলক, গদ্যরূপী, সংক্ষিপ্ত একটি আঘাতমুখ্য, বিশেষ কোনো পরিবেশাশ্রয়ী, ঐকসংকট-নির্ভর একটি শিল্প-বস্তুই হল আধুনিক ছোটগল্প।

এই উনিশ শতকের 'বিচিত্র অবদানটি' (Peculiar product of nineteenth century)-কে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে নানাভাবে আমরা বোঝবার চেষ্টা করব। এখন আর দেশ-দেশান্তরে ইতিহাসের পশ্চাদনুবর্তনের প্রয়োজন নেই। ইতিবৃত্ত আমরা জেনেছি, এইবার তার কর্ম ও ধর্মকে জানবার প্রয়াস করা যাক।

॥ সাহিত্যে ছোটগল্প প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥